সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

পাঠক মহলের প্রতি অনুরোধ, এ গ্রন্থটি পাঠ করার পূর্বে অবশ্যি এ লেখকের 'ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ' গ্রন্থটি পাঠ করে নেবেন। কারণ ঐ গ্রন্থটিকে আমাদের বর্তমান গ্রন্থটির প্রথম অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। এমনকি লেখক তাঁর মূল গ্রন্থটি যখন উর্দু ভাষায় প্রথম প্রকাশ করেন তখনও উল্লেখিত গ্রন্থটিকে সুদ ১ম খণ্ড এবং বর্তমান গ্রন্থটিকে সুদ ২য় খণ্ড নাম দেন। অবশ্যি পরবর্তীকালে তিনি প্রথমটিকে 'ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ' এবং দ্বিতীয়টিকে 'সুদ' নাম দেন। বাংলা সংস্করণে আমরা বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্য রেখে এর নামকরণ করেছি 'সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং।'

পাঠক মহলে গ্রন্থটি যথাযথভাবে পেশ করতে পেরে আমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি।

—প্রকাশক

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. আবদুল খালেক মজুমদার
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ৪৭·

৮ম প্রকাশ

জমাদিউল আউয়াল	১৪২৮
জ্যৈষ্ঠ	১৪১৪
জুন	২০০৭

বিনিময় মূল্য ঃ ১৩০.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

سـود-এর বাংলা অনুবাদ

SUD-O-ADHUNIK BANKING by Sayiid Abul A'la Maududi. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Price : Taka 130.00 Only.

সূচীপত্র

সুদ সম্পর্কিত ইসলামী আইন ও বিধি-নির্দেশাবলী অনুধাবন করার ব্যাপারে আধুনিক যুগের মানুষ ব্যাপক বিভ্রান্তির শিকারে পরিণত হচ্ছে। এর মূল কারণ হচ্ছে, ইসলাম যে অর্থব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল আজকের যুগে তার কাঠামো ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। তার মূলনীতি, আদর্শ ও বৈশিষ্ট্যগুলো মন থেকে উবে গেছে। এ সংগে আমাদের চতুষ্পার্শ্বের চলমান বিশ্বের সমগ্র এলাকা জুড়ে 'পুঁজিবাদী' নীতির ভিত্তিতে একটি সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী অর্থব্যবস্থার ভিত্ গড়ে উঠেছে। এ পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা কার্যত আমাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছে এবং তার নীতি, আদর্শ ও বৈশিষ্ট্যগুলো আমাদের মন-মস্তিষ্ককে প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছে। তাই কোনো অর্থনৈতিক বিষয় আলোচনা করতে গেলেই আমরা পুঁজিবাদী দৃষ্টিকোণ থেকেই তার বিভিন্ন দিক যাঁচাই-পর্যালোচনা করি। আমাদের আলোচনা ও অনুসন্ধানের সূচনা এমনভাবে হয় যার ফলে আমরা প্রথমেই অর্থব্যবস্থা সম্পর্কিত পুঁজিবাদী নীতি ও আদর্শগুলো মেনে নেই, তারপরে কোনো অর্থনৈতিক পদ্ধতির বৈধতা ও অবৈধতার প্রসংগ উত্থাপন করি। কিন্তু অনুসন্ধানের এ পদ্ধতি যে মূলত ক্রটিপূর্ণ, একটু চিন্তা-ভাবনা করলে তা সহজেই অনুধাবন করা যায়। আদর্শ ও মূলনীতির দিক দিয়ে ইসলামী অর্থব্যবস্থা পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী। উভয়ের উদ্দেশ্য, প্রাণসত্তা ও পদ্ধতি একেবারেই আলাদা, এ ক্ষেত্রে কোনো বিষয় সম্পর্কিত পুঁজিবাদী নীতি ও আদর্শকে স্বীকার করে নেয়ার পর যদি ইসলামী অর্থনীতির কোনো একটি বিধানের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায় তাহলে নিসন্দেহে তা ক্রটিপূর্ণ মনে হবে অথবা তা এমনভাবে সংশোধন করে দেয়া হবে যার ফলে তা ইসলামী আইনের নীতি ও আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে সম্পূর্ণরূপে পুঁজিবাদী ছাঁচে ঢালাই হয়ে যাবে। পরিণামে তার ইসলামী প্রাণসত্তা বিলুপ্ত হবে। তার সাহায্যে ইসলামী আইনের উদ্দেশ্য হাসিল করা সম্ভব হবে না। এমনকি চেহারা, চরিত্র ও নীতিগতভাবে তা নিজেকে একটি ইসলামী বিধান হিসেবে পরিচয় দান করার সমস্ত বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলবে।

এ মৌলিক ক্রটির কারণে আমাদের অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ ও চিন্তাবিদগণ সুদ সম্পর্কিত ইসলামী বিধানসমূহ অনুধাবন করতে অক্ষম হয়েছেন এবং সেগুলোর উদ্দেশ্য ও কারণ উপলব্ধির ক্ষেত্রে পদে পদে ভুল করে চলেছেন। তাঁরা আদতে জানেনই না কোন্ নীতির ভিত্তিতে ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ? কি তার উদ্দেশ্য ও প্রাণসত্তা ? সুদকে কেন হারাম গণ্য করা হয়েছে ? সুদের লেনদেনের বিভিন্ন পর্যায়ে তার হারাম হবার কি কি কারণ

নিহিত রয়েছে ? যেসব লেনদেনের ক্ষেত্রে ঐ কারণগুলো বিরাজ করে ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ঐ ধরনের লেনদেনের অনুপ্রবেশ ঘটানোর কুফল ও পরিণাম কি ? এসব মৌলিক বিষয় উপেক্ষা করে যখন তারা পুরোপুরি পুঁজিবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে সুদ সম্পর্কিত ইসলামী বিধানসমূহ নিরিক্ষণ করতে থাকে তখন সুদ হারাম হবার স্বপক্ষে কোনো যুক্তিই তারা খুঁজে পান না। কারণ সুদ হচ্ছে পুঁজিবাদের প্রাণ। তার শিরা-উপশিরায় এরই প্রবাহ সঞ্চারমান। এ প্রাণ প্রবাহ ছাড়া পুঁজিবাদের সমস্ত কাজ-কারবারই অচল। পুঁজিবাদী নীতির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা কোনো অর্থব্যবস্থা সুদ বিহীন হবার কথা কল্পনাই করা যায় না। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, এ চিন্তাবিদগণ তাত্ত্বিক ও প্রয়োগগত দিক থেকে ইসলামকে বর্জন করলেও আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এখনো যথারীতি ইসলামের অনুগামী। তাঁরা স্বেচ্ছায় ইসলামের শিকল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতেও রাজি নন। কাজেই আকীদা-বিশ্বাসের নিগড়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা থাকার কারণে সুদ হারাম হবার ব্যাপারটি তাঁরা অস্বীকার করতে পারেন না। কিন্তু তাঁদের জ্ঞান ও কর্ম সুদ সম্পর্কিত ইসলামী বিধানের নিগড় ছিন্ন করতে তাঁদেরকে বাধ্য করে।

দীর্ঘকাল থেকে মন ও মস্তিষ্কের এ দ্বন্দ্ব চলছে। তবে বর্তমানে এর মধ্যে আপোষ করার একটা সহজ উপায় বের করা হয়েছে। তা হচ্ছে এই যে, ইসলামী আইনের এমন একটি ব্যাখ্যা দিতে হবে যার ফলে সুদের বিষয়গুলো সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত না হবার কারণে তা যথারীতি সাধারণভাবে হারাম থাকবে। কিন্তু অন্যদিকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সুদের যতগুলো খাত আছে তার প্রায় সবগুলোই বৈধ বলে গণ্য হবে। বড়জোর পুঁজিবাদী নীতির ভিত্তিতে যার বিরুদ্ধে কোনো যুক্তি পাওয়া যায় তাকে মহাজনী সুদ বা চড়া সুদে ঋণদান (USURY) হিসেবে গণ্য করা হবে। কিন্তু তাকেও পুরোপুরি বিলুপ্ত করে দেয়ার কোনো কারণ তাঁরা খুঁজে পাচ্ছেন না। তাঁদের মতে যুগের প্রয়োজনে ঐ সুদটি নতুনভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে মাত্র। তাঁদের একথা বলার অর্থ হচ্ছে এই যে, সুদের হার যেন কখনো এমন পর্যায়ে পৌঁছে না যায় যার ফলে ঋণগ্রহীতার পক্ষে তা আদায় করা অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং কোনো অবস্থায় যেন তা চক্রবৃদ্ধি হারে নির্ধারিত সুদের পর্যায়ে না পৌঁছে যায়।

এ চিন্তাবিদ ও বিশেষজ্ঞগণ না জেনে না বুঝেই এ প্রতারণার ফাঁদে পড়েছেন। একই সংগে দুটো বিপরীতমুখী জলযানে আরোহণ করা কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষে শোভা পায় না। যদি অজ্ঞতার কারণে, ভুলক্রমে সে এ কাজ করে থাকে তাহলে আসল ব্যাপার সম্পর্কে অবহিত হবার সাথে সাথেই তাকে নিজের ভুল সংশোধনে এগিয়ে আসতে হবে। দুটো জলযানের মধ্য থেকে একটিকে বাছাই করে নিয়ে অন্যটি থেকে তাকে পা টেনে নিতে হবে।

এটিই হবে তার জন্য যথার্থ বুদ্ধিমানের কাজ। সুদ হারাম কি হারাম নয় এবং তার সীমানা চিহ্নিত করার আলোচনা অনেক পরবর্তী পর্যায়ের কথা, সর্বপ্রথম ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যকার নীতিগত ও তাৎপর্যিক পার্থক্যটুকু যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে হবে। অতপর যেসব নীতি ও বিধি-বিধানের ভিত্তিতে পুঁজিবাদ ও কম্যুনিজমের দুই প্রান্তিক ব্যবস্থার মাঝামাঝি ইসলাম একটি ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছে, কুরআন ও হাদীসের বিধানসমূহ বিশ্লেষণ করে ঐ নীতি ও বিধানসমূহ সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। এ আলোচনা থেকে একথা দ্ব্যর্থহীনভাবে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, ইসলাম যে পদ্ধতিতে মানুষের অর্থনৈতিক বিষয়াদির সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা করে তাতে সুদের কোনো স্থান নেই। বরং যেসব মতবাদ, আদর্শ, মানসিকতা ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কারণে সুদী লেন-দেনের বিভিন্ন অবস্থার সৃষ্টি হয়, ইসলাম সেগুলোর মূলোৎপাটন করে। এরপর দুটো পথের মধ্য থেকে যে কোনো একটির নির্বাচন অপরিহার্য হয়ে পড়বে। একটি পথ হচ্ছে, ইসলামের অর্থনৈতিক বিধানসমূহ প্রত্যাখ্যান করে পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক বিধানের প্রতি প্রত্যয় ও আস্থা স্থাপন করা। এ অবস্থায় ইসলামের নীতি ও বিধানসমূহ সংশোধন করার জন্যে কষ্ট স্বীকার করতে হবে না। বরং ইসলামী বিধানের আনুগত্য অস্বীকার করাই হবে সহজ ও সোজা পথ। দ্বিতীয় পথটি হচ্ছে, ইসলামের অর্থনৈতিক বিধানসমূহকে নির্ভুল মনে করা এবং সকল প্রকার সুদকে সজ্ঞানে হারাম বলে বিশ্বাস করা। তবে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার উদরে অবস্থান করার কারণে অবশ্যই নিজেকে ঐ হারাম ব্যবস্থা থেকে সংরক্ষিত রাখতে অক্ষম হওয়া স্বাভাবিক। এ অবস্থায় কেউ সুদী লেনদেন করতে চাইলে করতে পারে। কারণ তাকে অবশ্যি যে কোনো গোনাহ করার স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। কিন্তু মুসলমান হবার কারণেই কোনো ব্যক্তি সুদকে বৈধ ঘোষণা করে সুদী লেনদেন করার দুঃসাহস করতে পারে না। হারাম খাওয়ার গোনাহকে হালকা করে নিজের বিবেকের দংশন থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্যে সে এমন বস্তুকে পবিত্র গণ্য করার চেষ্টা করতে পারে না, যাকে খোদা ও তাঁর রসূল অপবিত্র ঘোষণা করেছেন। কোনো ব্যক্তি ইসলামী আইন প্রত্যাখ্যান করে যে কোনো অনৈসলামী আইনের আনুগত্য করার অবশ্যি অধিকার রাখে। এমনকি শেষ পর্যায়ে এসে ইসলামী আইনের কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিয়ে অনৈসলামী আইনের আওতাধীনে একজন গোনাহগার নাগরিক হিসেবে বাস করার স্বাধীনতাও তার আছে অথবা অবস্থার চাপে পড়ে সে এমনটি করতে বাধ্যও হতে পারে। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই ইসলামী আইনকে সুবিধামত যে কোনো অনৈসলামী আইনে রূপান্তরিত করে পরিবর্তিত আইনকে ইসলামী আইন বলে দাবী করার অধিকার কারোর নেই।

ইসলাম, পুঁজিবাদ ও কম্যুনিজমের নীতিগত পার্থক্য

সামনে অগ্রসর হবার আগে দুনিয়ায় এ পর্যন্তকার সৃষ্ট অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগুলোর নীতিগত পার্থক্য ও এ পার্থক্যের ফলে অর্থনৈতিক বিষয়াদির প্রকৃতির মধ্যে কোন্ ধরনের পার্থক্য সূচিত হয় তা অবশ্যই আমাদেরকে জানতে হবে।

ছোটখাটো মতপার্থক্যের কথা বাদ দিয়ে আমরা দুনিয়ার অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগুলোকে তিনটে বড় বড় ভাগে বিভক্ত করতে পারি। এর প্রথমটি হচ্ছে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা (CAPITALISTIC SYSTEM), দ্বিতীয়টিকে বলা হয় কম্যুনিজম (COMMUNISM) এবং তৃতীয়টি হচ্ছে, ইসলাম প্রদত্ত অর্থব্যবস্থা। নিম্নোক্ত আলোচনায় আমি উপরোল্লিখিত তিনটি অর্থব্যবস্থার নীতিগত পার্থক্য বর্ণনা করবো।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থা

পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার ভিত্তি যে মতবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত তার মূলকথা হচ্ছে ঃ প্রত্যেক ব্যক্তি একাই তার স্বোপার্জিত সম্পদের মালিক। তার উপার্জিত সম্পদে কারোর কানাকড়িও অধিকার নেই। নিজের সম্পদ সে ইচ্ছামতো ব্যয় করতে পারে। অর্থোপার্জনের যেসব উপায়-উপকরণ তার আয়ত্তাধীন থাকে সেগুলো কুক্ষিগত করে রাখার এবং কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধার না করে সেসব ব্যবহার করতে অস্বীকার করার অধিকারও তার আছে। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে স্বাভাবিক স্বার্থপরতা রয়েছে তা থেকেই পুঁজিবাদের জন্ম। এর পরিপূর্ণ রূপটি এমন এক মারাত্মক পর্যায়ে উপনীতি হয় যা মানব সমাজের কল্যাণ ও উন্নতির জন্য অপরিহার্য গুণাবলীকে স্তিমিত ও নিষ্প্রভ করে দেয়। নৈতিক দৃষ্টিকোণ বাদ দিয়ে নিছক অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলেও দেখা যাবে যে, এ মতবাদের অনিবার্য পরিণতিতে সম্পদ বণ্টনের ভারসাম্য বিপর্যস্ত হয়েছে। সম্পদ আহরণের উপায়-উপকরণসমূহ ক্রমাগতভাবে একটি অধিকতর ভাগ্যবান বা অপেক্ষাকৃত সতর্ক মানব গোষ্ঠীর কুক্ষিগত হয়েছে। ফলে বাস্তবে সমাজ দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে ঃ একটি হচ্ছে বিত্তশালী ও অপরটি বিত্তহীন শ্রেণী। বিত্তশালী শ্রেণী সম্পদ আহরণের যাবতীয় উপায়-উপকরণ কুক্ষিগত করে কেবলমাত্র নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থোদ্ধারে তা ব্যয় করে

এবং নিজের সম্পদ অধিকতর বৃদ্ধি করার জন্য সমাজের সামগ্রিক স্বার্থকে ইচ্ছামতো বিসর্জন দেয়। আর বিত্তহীন দরিদ্র হতভাগ্যের দল ধন-সম্পদের যাবতীয় অংশ ও সুযোগ-সুবিধা থেকে চিরতরে বঞ্চিত হয়। বিত্তবানদের স্বার্থের ঘানিটানার জন্য জীবনপাত করে দিনান্তে নিজের পেট পূর্তির জন্য সামান্যতম উপাদান সংগ্রহ করা ছাড়া তাদের গত্যন্তর থাকে না। এ ধরনের অর্থব্যবস্থা একদিকে সুদখোর মহাজন, কারখানা মালিক ও অত্যাচারী জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব ঘটায় এবং অন্যদিকে সৃষ্টি করে ঋণভারে জর্জরিত ও অধিকার বঞ্চিত শ্রমিক-মজুর-কৃষকদের এক সর্বহারা শ্রেণীর। এ অর্থব্যবস্থা যে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয় সেখান থেকে স্বাভাবিকভাবেই দয়া, মায়া, মমতা, সহানুভূতি, সহৃদয়তা ও পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব বিলুপ্ত হয়ে যায়। সেই সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই সম্পূর্ণত নিজের ব্যক্তিগত আয়-উপার্জনের উপর নির্ভর করে জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়। সেখানে কেউ কারো সাহায্য করে না, কেউ কারোর বন্ধু হয় না। অভাবী ও দরিদ্রের জীবন সংকীর্ণতর ও দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই বেঁচে থাকার সংগ্রামে লিপ্ত হয়। একে অন্যের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক ও প্রতিহিংসামূলক প্রচেষ্টা ও কর্মে অবতীর্ণ হয়। সর্বাধিক পরিমাণ অর্থ ও জীবন যাপনের সামগ্রী লাভ করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে, নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সেগুলো কুক্ষিগত করে রাখে এবং কেবলমাত্র সম্পদ বৃদ্ধির কাজে সেসব ব্যবহার করে। আর যারা এ সম্পদ সঞ্চয় ও বৃদ্ধির অভিযানে ব্যর্থ হয় অথবা এতে পুরোপুরি অংশ গ্রহণে সক্ষম হয় না দুনিয়ার বুকে তাদের কোনোই সহায় থাকে না। তাদের জন্য ভিক্ষাও সহজলভ্য হয় না। তাদের জন্য কারোর মনে একবিন্দু করুণাও জাগে না। তাদের সাহায্যের জন্য একটি হাতও প্রসারিত হয় না। এরপর তাদের সামনে দুটি মাত্র পথ খোলা থাকে। জীবন যন্ত্রণা থেকে মুক্তি লাভের জন্য তাদেরকে হয় আত্মহত্যা করতে হবে, নয় তো অপরাধমূলক ও নৈতিকতা বিরোধী নিকৃষ্টতর বৃত্তি অবলম্বন করে ক্ষুধার জ্বালা নিবারণ করতে বাধ্য হতে হবে। এছাড়া তৃতীয় কোনো পথ তাদের সামনে থাকে না।

পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় অনিবার্যভাবে মানুষের মধ্যে সম্পদ সঞ্চয় এবং তা মুনাফাজনক কাজে ব্যয় করার প্রবণতা জন্মে। ফলে সেখানে লিমিটেড কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়, ব্যাংক কায়েম করা হয়, প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের ব্যবস্থা হয়, ইনস্যুরেন্স কোম্পানী গঠিত হয় এবং সমবায় সমিতিসমূহ গড়ে উঠতে থাকে। অর্থ উৎপাদনের এ সমস্ত পদ্ধতি ও ব্যবস্থার মধ্যে 'আরো বেশী অর্থ উৎপাদন করো' নীতি ও প্রেরণাই কার্যকর থাকে। ব্যবসায়িক লেনদেন অথবা সুদী কারবার পরিচালনা করে—যে কোনোভাবেই এ অর্থ উৎপাদন করা যেতে

পারে। পুঁজিবাদের দৃষ্টিতে সুদ ও ব্যবসায়িক লেনদেনের মধ্যে কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই। তাই পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় এ দু'টি কেবল পরস্পরের সাথে মিশ্রিত হয়েই যায় না বরং ব্যবসায়-বাণিজ্যির ক্ষেত্রে এরা একটি অপরটির প্রতি পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এ অর্থব্যবস্থায় ব্যবসায়ের জন্য সুদ এবং সুদের জন্য ব্যবসায় একান্ত অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। এদের একটি অপরটির সাহায্য ছাড়া উন্নতি লাভ করতে পারে না। সুদ বিহনে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সমস্ত গ্রন্থীই ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।

কমিউনিষ্ট অর্থব্যবস্থা

পুঁজিবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী আর একটি অর্থব্যবস্থা রয়েছে, তাকে বলা হয় কমিউনিষ্ট অর্থব্যবস্থা, এ অর্থব্যবস্থার মূলকথা হচ্ছে ঃ অর্থ উৎপাদনের যাবতীয় উপায়-উপকরণ সমাজের সম্মিলিত মালিকানার অন্তর্ভুক্ত। কাজেই কোনো বস্তুকে ব্যক্তিগত মালিকানার অন্তর্ভুক্ত করে নিজের ইচ্ছামতো তা ব্যবহার করার ও তা থেকে ব্যক্তিগতভাবে মুনাফা অর্জন করার অধিকার কারোর নেই। সমাজের সম্মিলিত স্বার্থে ব্যক্তি যেসব কাজ করবে কেবল মাত্র সেই কাজগুলোরই সে পারিশ্রমিক পাবে। তার জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণাদি সরবরাহ করার দায়িত্ব সমাজ গ্রহণ করবে এবং তার বিনিময়ে তাকে সমাজের নির্দেশ মতো কাজ করে যেতে হবে।

পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পদ্ধতিতে এ মতাদর্শটি নতুনতর অর্থনৈতিক সংগঠন কায়েম করে। এ অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তি মালিকানার অস্তিত্বই স্বীকৃত নয়। কাজেই ব্যক্তির অর্থ সঞ্চয় করে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় তা ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করার অবকাশ কোথায়? নীতি ও আদর্শের বিরোধের কারণে এখানে পদ্ধতিরও পরিবর্তন হয়েছে। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা কারখানা, ব্যাংকিং, ইনসুরেন্স, জয়েন্ট স্টক কোম্পানী ও এ ধরনের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানাদি ছাড়া চলতে পারে না। অন্যদিকে কমিউনিষ্ট অর্থব্যবস্থার গঠনাকৃতি ও তার কার্যক্রমের মধ্যে এসব প্রতিষ্ঠানের কেবল অবকাশই নেই তা নয় বরং এগুলোর প্রয়োজনও অনুপস্থিত। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার প্রকৃতির সাথে সুদের মিল যতোটা গভীর কমিউনিষ্ট অর্থব্যবস্থার প্রকৃতির সাথে তার অমিলও ততোটাই সুস্পষ্ট। কমিউনিষ্ট অর্থব্যবস্থা সুদি লেনদেনের ভিত্তিমূলই ধ্বসিয়ে দেয়। এ অর্থনীতি কোনো অবস্থায় ও কোনো আকৃতিতে সুদকে বৈধ প্রতিপন্ন করে না। এ অর্থনীতিতে বিশ্বাসী কোনো ব্যক্তির পক্ষে একাধারে কমিউনিষ্ট থাকা ও সুদি লেনদেন করা কোনোক্রমেই সম্ভবপর নয়।

মনে রাখতে হবে, এখানে কমিউনিষ্ট অর্থব্যবস্থার নিছক আদর্শিক দিকের আলোচনা করা হয়েছে। অন্যথায় কার্যত কমিউনিষ্ট অর্থব্যবস্থা রাশিয়ায় একটা বড় রকমের ডিগবাজী খেয়েছে এবং তার চরমপন্থী মতাদর্শকে কার্যকর করতে ব্যর্থ হয়ে পুঁজিবাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে। কাজেই বর্তমানে সেখানে যারা প্রয়োজনের অতিরিক্ত পারিশ্রমিক পায় তারা নিজেদের অতিরিক্ত অর্থ ব্যাংকে জমা রাখতে এবং তা থেকে সুদ গ্রহণ করতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে পুঁজিবাদ ও কমিউনিষ্ট অর্থব্যবস্থা দু'টি চরমপন্থী ও পরস্পর বিরোধী মতাদর্শ। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা ব্যক্তিকে অবশ্যই তার স্বাভাবিক অধিকার দান করে কিন্তু তার নীতি ও আদর্শের মধ্যে এমন কোনো বিষয় নেই, যা ব্যক্তিকে সমাজের সম্মিলিত স্বার্থের সেবা করতে উদ্বুদ্ধ করতে বা অন্ততঃপক্ষে প্রয়োজনের সময় তাকে সে জন্য বাধ্য করতে পারে। বরং সে আসলে ব্যক্তির মধ্যে এক ধরনের স্বার্থান্ধ মানসিকতা সৃষ্টি করে। এর ফলশ্রুতি স্বরূপ প্রত্যেকেই নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থোদ্ধারের জন্য সমাজের বিরুদ্ধে কার্যত সংগ্রাম করতে থাকে। এ সংগ্রামের কারণে ধন-বন্টনের ক্ষেত্রে ভারসাম্য সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়ে যায়। একদিকে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ভাগ্যবান সমগ্র সমাজের অর্থনৈতিক উপকরণাদি হস্তগত করে লাখপতি ও কোটিপতিতে পরিণত হয় এবং এ অর্থ বিনিয়োগ করে আরো বেশী পরিমাণ অর্থ জমা করে যেতে থাকে। অন্যদিকে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক দৈন্য বেড়ে যেতে থাকে। ধন-বন্টনের ক্ষেত্রে তাদের অংশ হ্রাস পেতে পেতে শেষ পর্যন্ত শূন্যের কোঠায় গিয়ে ঠেকে। অবশ্যি প্রাথমিক পর্যায়ে পুঁজিপতিদের ধন-সম্পদের মহত্তম অভিব্যক্তি মানবিক তমদ্দুনে এক চোখ ঝলসানো চাকচিক্যের সৃষ্টি করে সন্দেহ নেই। কিন্তু অসম ধন বন্টনের চূড়ান্ত পরিণতি স্বরূপ অর্থনৈতিক জগতের দেহে রক্তের প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়, শরীরের বৃহদাংশ রক্তাল্পতার দরুন শুকিয়ে নষ্ট হয়ে যায় এবং অস্বাভাবিক রক্তচাপ হেতু প্রধান অংগগুলো ধ্বংসের সম্মুখীন হয়।

কমিউনিষ্ট ব্যবস্থা এ রোগের চিকিৎসা করতে চায়। কিন্তু একটি নির্ভুল উদ্দেশ্য লাভের জন্য তা একটি ভ্রান্ত কর্মপন্থা অবলম্বন করে। তার উদ্দেশ্য হচ্ছে ধন-বন্টনের ক্ষেত্রে সমতা ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত করা। নিসন্দেহে এটি একটি যথার্থ ও নির্ভুল উদ্দেশ্য। কিন্তু এজন্য সে যে পদ্ধতি অবলম্বন করে তাকে সরাসরি মানব প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ বলা যেতে পারে। ব্যক্তি মালিকানা অধিকার থেকে ব্যক্তিকে বঞ্চিত করে তাকে সম্পূর্ণরূপে সমাজের একজন কর্মচারী ও দাসে পরিণত করা কেবলমাত্র অর্থব্যবস্থার ক্ষেত্রেই নয় বরং অধিকতর ব্যাপকার্থে মানুষের সমগ্র তমদ্দুনিক জীবনের জন্যও ক্ষতি ও ধ্বংসের

বার্তাবহ। কারণ এর ফলে অর্থনৈতিক কাজ কারবার ও তমদ্দুনিক ব্যবস্থার প্রাণপ্রবাহ ও তার মূল প্রেরণা শক্তি নিঃশেষিত হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে মানুষের ব্যক্তিগত স্বার্থ ও লাভই তাকে মানবিক তমদ্দুন ও অর্থব্যবস্থায় সর্বশক্তি নিয়োগ করে কর্ম ও প্রচেষ্টায় উদ্বুদ্ধ করে। প্রথমদিকে আদর্শবাদের ক্ষেত্রে কমিউনিজম একথা অস্বীকার করেছিল। বরং তার চরমপন্থী দার্শনিক এতদূর বলেছিলেন যে, মানুষ কোনো প্রকার জন্মগত প্রবণতার অধিকারী নয়, সবকিছুই পরিবেশের সৃষ্টি এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সাহায্যে ব্যক্তির মধ্যে এমন পর্যায়ের সামাজিকতা ও সমাজবদ্ধ মানসিকতা (SOCIAL MINDEDNESS) সৃষ্টি করা যেতে পারে যার মধ্যে ব্যক্তি স্বার্থ প্রবণতার লেশমাত্রও থাকবে না। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা কমিউনিষ্টদের এ ভুল ভেঙ্গে দিয়েছে। বর্তমানে রাশিয়ার শ্রমিক ও কর্মচারীদের মনে কর্মপ্রেরণা সৃষ্টি করার জন্য তাদের ব্যক্তি স্বার্থ বোধকে উজ্জীবিত করার নিত্য নতুন পন্থা অবলম্বন করা হচ্ছে।

আসলে এটি মানুষের প্রকৃতিগত স্বার্থপ্রিয়তা। কোনো প্রকার যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে মানুষের মন-মস্তিষ্ক থেকে এ প্রবণতাকে উৎখাত করা সম্ভবপর নয়। মুষ্টিমেয় অসাধারণ ব্যক্তির কথা বাদ দিলে মধ্যম শ্রেণীর সাধারণ মানুষদের সম্পর্কে বলা যায় যে, তারা নিজেদের মন-মস্তিষ্ক, হাত ও শরীরের সর্বশক্তি কেবলমাত্র এমন কাজে ব্যয় করলেও করতে পারে যার সাথে তার ব্যক্তি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। এ স্বার্থ সম্ভাবনাটুকুই যদি অবশিষ্ট না থাকে এবং সে জানতে পারে যে, তার জন্য লাভ ও মুনাফা অর্জনের যে সীমা নির্ধারিত হয়েছে হাজার প্রচেষ্টা চালিয়েও তার বাইরে সে এক কানাকড়িও অর্জন করতে পারবে না, তাহলে তার সমুদয় চিন্তা ও কর্মশক্তি নিস্তেজ ও নিষ্প্রভ হয়ে পড়বে। সে নিছক একজন শ্রমিকের মত কাজ করে যাবে। কাজ করা ও পারিশ্রমিক লাভ করা এ ছাড়া নিজের কাজের প্রতি অন্য কোনো প্রকার আগ্রহই তার থাকবে না।

এ হচ্ছে কমিউনিষ্ট সমাজের আভ্যন্তরীণ দিক। এর বাইরের ও বাস্তব দিক হচ্ছে এই যে, সমাজের কয়েকজন ব্যক্তি পুঁজিপতিকে নির্মূল করে একজন মাত্র বৃহৎ পুঁজিপতির উদ্ভব ঘটানো হয়। সেই বৃহৎ পুঁজিপতি হচ্ছে কমিউনিষ্ট সরকার। অ-কমিউনিষ্ট সরকারের পুঁজিপতি ব্যক্তিদের মধ্যে যে নগণ্যতম পরিমাণ সুকোমল মানবিক বৃত্তি ও ভাবপ্রবণতা দেখা যায়, কমিউনিষ্ট সরকার-রূপ এ বৃহৎ পুঁজিপতির মধ্যে তার ছিটেফোঁটাও দেখা যায় না। সে নিছক একটি নিষ্প্রাণ যন্ত্রের ন্যায় ব্যক্তির নিকট থেকে কাজ আদায় করে নেয় আবার যন্ত্রেরই ন্যায় একাধিপত্য ও স্বৈরতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তাদের মধ্যে জীবন ধারণের উপকরণাদি বন্টন করে। দুঃখ-বেদনার স্বাভাবিক মানবিক সমবেদনাটুকু বা

যোগ্যতা, দক্ষতা ও আন্তরিকতার কোনো প্রকার কদর ও স্বীকৃতির অবকাশই সেখানে নেই। সে মানুষকে মানুষের মতো নয় বরং যন্ত্রের কল-কব্জার মতো খাটায়। তাদের চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে হরণ করে নেয়। এ কঠোর নির্যাতন ও স্বৈরতন্ত্র ছাড়া কমিউনিষ্ট অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হতে ও প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না। কারণ এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মানব প্রকৃতি সর্বক্ষণ বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত থাকে। কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রের জনগণকে যদি চিরন্তন নির্যাতন ও স্বৈরতন্ত্রের লৌহ শৃংখলে আবদ্ধ করে রাখা না হয় তাহলে ধীরে ধীরে তারা সমগ্র কমিউনিষ্ট ব্যবস্থাটিকেই ছিন্নভিন্ন করে দেবে। এ কারণেই বর্তমান বিশ্ব রঙ্গমঞ্চে সোভিয়েত রাশিয়ার কমিউনিষ্ট সরকারকে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় যালেম ও স্বৈরতান্ত্রিক সরকাররূপে অবতীর্ণ হতে দেখা যাচ্ছে। রাশিয়ার কমিউনিষ্ট সরকার তার জনগণকে এমন কঠিন লৌহশৃংখলে আবদ্ধ করে রেখেছে দুনিয়ার কোনো গণতান্ত্রিক বা ব্যক্তিতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যার কোনো নজির পাওয়া যাবে না। সোভিয়েত সরকারের এ যুলুম ও স্বৈরতান্ত্রিক নির্যাতন নিছক ঘটনাক্রমে ষ্ট্যালিনের ন্যায় একজন একনায়কের শাসনের ফল নয় বরং আসলে কমিউনিষ্ট ব্যবস্থার প্রকৃতি ও অন্তর্নিহিত শক্তিই মারাত্মক ধরনের একনায়কত্বের জন্ম দিয়ে থাকে।

ইসলামী অর্থব্যবস্থা

এ দু'টি পরস্পর বিরোধী অর্থব্যবস্থার মাঝখানে ইসলাম একটি ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা কায়েম করে। এ অর্থ ব্যবস্থার মূলনীতি হচ্ছে ঃ ব্যক্তিকে অবিশ্য তার পরিপূর্ণ স্বাভাবিক ও ব্যক্তিগত অধিকার দান করতে হবে এবং এ সংগে ধন-বন্টনের ভারসাম্যও বিনষ্ট হতে পারবে না। ইসলামী অর্থব্যবস্থা একদিকে ব্যক্তিকে ব্যক্তি মালিকানার অধিকার ও নিজের ধন-সম্পদ ইচ্ছামতো ব্যয়- ব্যবহার করার ক্ষমতা দান করে এবং অন্যদিকে ভিতর থেকে এসব অধিকার ও ক্ষমতার উপর কিছু নৈতিক বিধি-নিষেধ আরোপ করে এবং 'বার' থেকে এগুলোকে কতিপয় আইনের শৃংখলে বেঁধে দেয়। এর ফলে কোনো স্থানে সম্পদ ও উৎপাদনের উপকরণাদির অস্বাভাবিক কেন্দ্রীভূত হবার সম্ভাবনা বিলুপ্ত হয়। ধন ও উৎপাদন উপকরণাদি হামেশা আবর্তিত হতে থাকে এবং এ আবর্তন এমনভাবে চলতে থাকে যার ফলে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি তা থেকে নিজের উপযোগী অংশটুকু লাভ করতে পারে। এ উদ্দেশ্যে ইসলাম তার নিজস্ব স্বতন্ত্র পদ্ধতিতে অর্থনৈতিক সংগঠন কায়েম করে। ইসলামের এ অর্থনৈতিক সংগঠনের প্রাণসত্তা, নীতি ও কর্মপদ্ধতি পুঁজিবাদ ও কমিউনিষ্ট ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

ইসলামের অর্থনৈতিক আদর্শের সংক্ষিপ্ত সার হচ্ছে ঃ অর্থনৈতিক জীবনে প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সকল ব্যক্তির সমষ্টিগত স্বার্থ পরস্পরের সাথে গভীর সম্পর্কযুক্ত। তাই উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ ও বিরোধের পরিবর্তে সমঝোতা ও সহযোগিতা বর্তমান থাকা উচিত। ব্যক্তি যদি সামষ্টিক স্বার্থের বিরুদ্ধে প্রচেষ্টা চালিয়ে সমাজের সম্পদ নিজের নিকট কেন্দ্রীভূত করে এবং তা আটকে রাখার বা ব্যয় করার ব্যাপারে নিছক নিজের ব্যক্তি স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখে তাহলে এর ফলে কেবলমাত্র সমাজই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না বরং শেষ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিজেও এ ক্ষতির শিকার হবে। অনুরূপভাবে সমাজ ব্যবস্থা যদি এমনভাবে গঠিত হয়ে থাকে যেখানে সমাজের স্বার্থে ব্যক্তি স্বার্থকে বিসর্জন দিতে হয় তাহলে সেখানে শুধু ব্যক্তিই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না বরং শেষ পর্যায়ে গিয়ে এর ক্ষতি সমাজকেও স্পর্শ করবে। কাজেই ব্যক্তির সমৃদ্ধির মধ্যেই সমাজের কল্যাণ এবং সমাজের সমৃদ্ধির মধ্যেই ব্যক্তির কল্যাণ। এ সংগে সমাজের ব্যক্তিবর্গের মধ্যে স্বার্থপরতা ও সহানুভূতির ভারসাম্য রক্ষিত হওয়ার ওপরই উভয়ের সমৃদ্ধি নির্ভর করে। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের ব্যক্তিগত লাভ ও স্বার্থ উদ্ধারের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে কিন্তু এ প্রচেষ্টা এমনভাবে চালাতে হবে যার ফলে অন্যের ক্ষতি না হয়। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের সামর্থ অনুযায়ী ধন উপার্জন করতে পারে কিন্তু তার উপার্জিত সম্পদে অন্যের অধিকারও থাকবে। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের সম্পদের বিনিময়ে অন্যের নিকট থেকে মুনাফা অর্জন করবে এবং অন্যকেও তার নিকট থেকে মুনাফা অর্জনের সুযোগ দেবে। এ মুনাফা বণ্টন ও অর্থ আবর্তনের ধারাবাহিকতা জারী রাখার জন্য নিছক ব্যক্তিদের হৃদয় অভ্যন্তরে কতিপয় নৈতিক গুণাবলী সৃষ্টি করে দেয়া যথেষ্ট হবে না বরং এ সংগে সমাজে এমন আইন প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে যার সাহায্যে অর্থ উপার্জন ও ব্যয় ব্যবস্থাকে যথাযথ নির্ভুল ও ভারসাম্য পূর্ণ পদ্ধতিতে পরিচালিত করা যায়। এর অধীনে কাউকে ক্ষতিকর উপায়ে অর্থ উপার্জনের অধিকার দেয়া যাবে না। যে অর্থ ও সম্পদ বৈধ উপায়ে অর্জিত হয়েছে তাও এক স্থানে কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকবে না বরং তা ব্যয়িত ও দ্রুত আবর্তিত হতে থাকবে।

এ মতাদর্শের উপর যে অর্থনৈতিক সংগঠনের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে তার উদ্দেশ্য যেমন এক দিকে কতিপয় ব্যক্তিকে কোটিপতি বানিয়ে অবশিষ্ট সবাইকে অভুক্ত রাখা নয় তেমনি অন্যদিকে কাউকেও কোটিপতি হতে না দিয়ে জোরপূর্বক সবাইকে তাদের স্বাভাবিক তারতম্য সত্ত্বেও সমান অবস্থায় আসতে বাধ্য করাও তার উদ্দেশ্য নয়। এ উভয় প্রান্তিক অবস্থার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করে ইসলামী অর্থব্যবস্থা কেবলমাত্র সকল ব্যক্তির অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূর্ণ করতে চায়। যদি প্রত্যেক ব্যক্তি অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে নিজের স্বাভাবিক

সীমার মধ্যে অবস্থান করে অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করে, অতপর নিজের উপার্জিত অর্থ ব্যয় করার ক্ষেত্রে মিতব্যয়িতা ও পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতার প্রতি দৃষ্টি রাখে তাহলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কারণে সমাজে যে অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি হয় তার কোনো সম্ভাবনাই দেখা যায় না। কারণ এ অর্থব্যবস্থা কোনো ব্যক্তিকে কোটিপতি হতে বাধা না দিলেও এর আওতাধীনে কোনো কোটিপতির সম্পদ তার হাজার হাজার ভাইয়ের অনাহারে দিন যাপন করার কারণে পরিণত হয় না। অন্যদিকে এ অর্থব্যবস্থা অবশ্যি আল্লাহর সৃষ্ট সম্পদ থেকে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার অংশ দিতে চায় না। কিন্তু এজন্য ব্যক্তির নিজের অর্থোপার্জনের শক্তি ও যোগ্যতার উপর সে কোনো কৃত্রিম বিধি-নিষেধ আরোপ করে না।

ইসলামী অর্থব্যবস্থা ও তার মূলনীতি

পুঁজিবাদ ও কমিউনিজমের মধ্যবর্তী পর্যায়ে ইসলাম যে ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক মতাদর্শ অবলম্বন করেছে তার ভিত্তিতে একটি কার্যকর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য সে নৈতিক শক্তি ও আইন উভয়ের সাহায্য নিয়েছে। নৈতিক শিক্ষার সাহায্যে সে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির মন-মানসকে এ ব্যবস্থার স্বতঃস্ফূর্ত আনুগত্য করার জন্য তৈরী করে। অন্যদিকে আইনের বলে তাদের ওপর এমন সব বিধি-নিষেধ আরোপ করে যার ফলে তারা এ ব্যবস্থার চৌহদ্দীর মধ্যে নিজেদেরকে আটকে রাখতে বাধ্য করে এবং এর সুদৃঢ় প্রাচীর ভেদ করতে সক্ষম হয় না। এ নৈতিক বিধি-বিধান ও আইনসমূহ হচ্ছে ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূল স্তম্ভ। এগুলো এবং এই ব্যবস্থার প্রকৃতি সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করার জন্য এ সবের বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন।

এক ঃ উপার্জন মাধ্যমে বৈধ-অবৈধের পার্থক্য

এ প্রসঙ্গে প্রথম কথা হচ্ছে, ইসলাম তার অনুসারীদেরকে অর্থ উপার্জন করার অবাধ সুযোগ দেয় না। বরং উপার্জনের পন্থা ও উপায়ের ক্ষেত্রে সামাজিক স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে বৈধ ও অবৈধতার পার্থক্য সৃষ্টি করে। এ পার্থক্যের একটা মূলনীতি রয়েছে। তা হচ্ছে এই যে, ধন উপার্জনের যেসব পন্থা ও উপায় অবলম্বিত হলে এক ব্যক্তির লাভ ও অন্য ব্যক্তির বা ব্যক্তিবর্গের ক্ষতি হয় তা সবই অবৈধ। অন্যদিকে যেসব উপায় অবলম্বন করলে ধন-উপার্জন প্রচেষ্টার সাথে জড়িত প্রত্যেক ব্যক্তিই তার ন্যায়সংগত সুফল ভোগ করতে পারে তা সবই বৈধ। এ মূলনীতিটি কুরআন মজীদে নিম্নোক্তভাবে বিবৃত হয়েছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ قف وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ○ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَانًا وَّظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا ط ـ(النساء :

"হে ঈমানদারগণ ! তোমরা পরস্পরের ধন-সম্পদ অবৈধ উপায়ে ভক্ষণ করো না। তবে পারস্পরিক সম্মতি অনুযায়ী ব্যবসায়িক লেনদেন করতে পারো। আর তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে (অথবা পরস্পর পরস্পরকে) ধ্বংস করো না। আল্লাহ তোমাদের অবস্থার প্রতি করুণাশীল। যে ব্যক্তি সীমা অতিক্রম করে যুলুম সহকারে এরূপ করবে তাকে আমি অগ্নির মধ্যে নিক্ষেপ করবো।"–(সূরা আন নিসা ঃ ২৯-৩০)

এ আয়াতে পারস্পরিক লেনদেনকে ব্যবসায় বলা হয়েছে। পারস্পরিক সম্মতিকে এর সাথে শর্ত হিসেবে সংযুক্ত করে এমন সব লেনদেনকে অবৈধ গণ্য করা হয়েছে যার মধ্যে চাপ সৃষ্টি ও প্রতারণার কোনো উপকরণ থাকে অথবা এমন কোনো চালবাজী থাকে যা দ্বিতীয় পক্ষ জানতে পারলে এ লেনদেনে নিজের সম্মতি প্রকাশে কোনো দিনই প্রস্তুত হবে না। এরপর আরো জোর দেয়ার জন্য বলা হয়েছে, "তোমরা পরস্পরকে ধ্বংস করো না।" এর দুটি অর্থ হতে পারে। এ দুটি অর্থই এখানে প্রযোজ্য। একটি অর্থ হচ্ছে, তোমরা একে অন্যকে ধ্বংস করো না এবং দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে, তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে ধ্বংস করো না। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, যে ব্যক্তি নিজের লাভের জন্য অন্যের সর্বনাশ করে সে যেন তার রক্তপান করে এবং পরিণামে সে এভাবে নিজের ধ্বংসের পথ উন্মুক্ত করে।

এ নীতিগত নির্দেশটি ছাড়াও কুরআনের বিভিন্ন স্থানে অর্থ উপার্জনের নিম্নোক্ত পদ্ধতিগুলোকে হারাম গণ্য করা হয়েছে ঃ

০ উৎকোচ (আল বাকারা ১৮৮ আয়াত)।

০ ব্যক্তি সমষ্টি নির্বিশেষে সবার সম্পদ আত্মসাৎ (আল বাকারা ২৮৩ ও আলে ইমরান ১৬১ আয়াত)।

০ চুরি (আল মায়েদা ৩৮ আয়াত)।

০ এতিমের অর্থ অন্যায়ভাবে তসরুফ (আন নেসা ১০ আয়াত)।

০ ওজনে কম করা (আল মুতাফফিফীন ৩ আয়াত)।

০ চারিত্রিক নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী উপকরণসমূহের ব্যবসায় (আন নূর ১৯ আয়াত)।

০ বেশ্যাবৃত্তি ও দেহ বিক্রয় লব্ধ অর্থ (আন নূর ২, ৩৩ আয়াত)।

০ মদ উৎপাদন, মদের ব্যবসায় ও মদ পরিবহন (আল মায়েদা ৯ আয়াত)

০ জুয়া ও এমন সব উপায়-উপকরণ যেগুলোর মাধ্যমে নিছক ঘটনাচক্রে ও ভাগ্যক্রমে একদল লোকের সম্পদ অন্য একদল লোকের নিকট স্থানান্তরিত হয় (আল মায়েদা ৯০ আয়াত)।

০ মূর্তিগড়া, মূর্তি বিক্রয় ও মূর্তি উপাসনালয়ের সেবা (আল মায়েদা ৯০ আয়াত)।

০ ভাগ্য গণনা ও জ্যোতিষির ব্যবসায় (আল মায়েদা ৯০ আয়াত)।

০ সুদ খাওয়া (আল বাকারা ২৭৫, ২৭৮ থেকে ২৮০ এবং আলে ইমরান ১৩০ আয়াত)।

দুই ঃ ধন সঞ্চয়ের নিষেধাজ্ঞা

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ হচ্ছে এই যে, বৈধ উপায়ে যে ধন উপার্জন করা হবে তা পুঞ্জীভূত করে রাখা যাবে না। কারণ এর ফলে ধনের আবর্তন বন্ধ হয়ে যায় এবং ধন-বণ্টনে ভারসাম্য থাকে না। যে ব্যক্তি ধন সঞ্চয় করে রাশীকৃত ও পুঞ্জীভূত করে রাখে সে নিজে যে কেবল মারাত্মক নৈতিক রোগে আক্রান্ত হয় তাই নয় বরং মূলত সে সমগ্র মানব সমাজের বিরুদ্ধে একটি জঘন্যতম অপরাধ করে। এর ফল তার নিজের জন্যও খারাপ হয়। এজন্য কুরআন কার্পণ্য এবং কারুনের ন্যায় সম্পদ কুক্ষিগত ও পুঞ্জীভূত করে রাখার কঠোর বিরোধিতা করেছে। কুরআন বলে ঃ

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ط -(ال عمران : ١٨٠)

"যারা আল্লাহ্ প্রদত্ত অনুগ্রহে কৃপণতা করে, তারা যেন একথা মনে না করে যে, তাদের এ কাজ তাদের জন্য মঙ্গলজনক বরং প্রকৃতপক্ষে এটা তাদের জন্য ক্ষতিকর।"−(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৮০)

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝(التوبة :

"যারা স্বর্ণ-রৌপ্য সঞ্চয় করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দাও।"−(সূরা আত তাওবা ঃ ৩৪)

একথা পুঁজিবাদের ভিত্তিতে আঘাত হানে। উদ্বৃত্ত অর্থ জমা করে রাখা এবং জমাকৃত অর্থ আরো অধিক পরিমাণ অর্থ সংগ্রহে খাটানো—এটিই হচ্ছে পুঁজিবাদের মূল কথা। কিন্তু ইসলাম আদতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ জমা করে রাখা পছন্দ করে না।

তিন ঃ অর্থ ব্যয় করার নির্দেশ

সঞ্চয় করার পরিবর্তে ইসলাম অর্থ ব্যয় করার শিক্ষা দেয়। কিন্তু ব্যয় করার অর্থ বিলাসিতা ও আয়েশ-আরামের জীবনযাপন করে দু' হাতে অর্থ লুটানো নয়। বরং ব্যয় করার ক্ষেত্রে আল্লাহর পথের শর্ত আরোপ করে। অর্থাৎ সমাজের কোনো ব্যক্তির নিকট প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে উদ্বৃত্ত অর্থ থাকে সমাজের জন্য কল্যাণমূলক কাজে তা ব্যয় করতে হবে। এটিই হবে আল্লাহর পথে ব্যয়।

وَيَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ط قُلِ الْعَفْوَ ط (البقرة : ٢١٩)

"তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে যে, তারা কি ব্যয় করবে ? তাদেরকে বলে দাও, যা তোমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত (তাই ব্যয় করো)।"
–(সূরা আল বাকারা ঃ ২১৯)

وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ لا وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ط ـ

"আর সদ্ব্যবহার করো নিজের মা-বাপ, আত্মীয়-স্বজন, অভাবী-মিসকীন, আত্মীয় প্রতিবেশী, অনাত্মীয় প্রতিবেশী, নিজের মোলাকাতি বন্ধুবর্গ, মুসাফির ও মালিকানাধীন দাস-দাসীদের সাথে।"–(সূরা আন নিসা ঃ ৩৬)

وَفِىْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ○(الذريات : ١٩)

"তাদের অর্থ সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের অধিকার আছে।"
–(সূরা আয যারিয়াত ঃ ১৯)

এখানে এসে ইসলাম ও পুঁজিবাদের দৃষ্টিকোণ সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে যায়।

বিত্তবান মনে করে, অর্থ ব্যয় করলে দরিদ্র হয়ে যাবে এবং সঞ্চয় করলে বিত্তশালী হবে। কিন্তু ইসলাম বলে, অর্থ ব্যয় করলে কমে যাবে না বরং বরকত ও বৃদ্ধি হবে।

اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ ج وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً ط ـ(البقرة : ٢٦٨)

"শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্রের ভয় দেখায় এবং কার্পণ্যের ন্যায় লজ্জাকর কাজের হুকুম দেয় কিন্তু আল্লাহ তোমাদের নিকট মাগফেরাত ও অতিরিক্ত দানের ওয়াদা করেন।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৬৮)

বিত্তবান মনে করে কোনো কিছু ব্যয় করা হলে তা নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু ইসলাম বলে, না, তা নষ্ট হয়ে যায়নি বরং তার সর্বোত্তম লাভ তোমাদের নিকট ফিরে আসবে।

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لاَتُظْلَمُوْنَ○(البقرة : ٢٧٢)

"সৎকাজে তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তা তোমরা পুরোপুরি ফেরত পাবে এবং তোমাদের ওপর কোনোক্রমেই যুলুম করা হবে না।"
–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৭২)

وَاَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ○ لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ط -(الفاطر : ٢٩-٣٠)

"যারা আমার প্রদত্ত রেজেক থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে তারা এমন একটি ব্যবসায়ের আশা রাখে, যাতে কোনোক্রমেই লোকসানের সম্ভাবনা নেই। আল্লাহ তাদেরকে এর বিনিময়ে পুরোপুরি ফল প্রদান করবেন বরং মেহেরবানী করে তাদেরকে কিছু বেশী দান করবেন।"
–(সূরা আল ফাতির ঃ ২৯-৩০)

বিত্তবান মনে করে, সম্পদ আহরণ করে সুদী ব্যবসায়ে নিয়োগ করলে সম্পদ বেড়ে যায়। কিন্তু ইসলাম বলে, না, সুদের মাধ্যমে বরং সম্পদ কমে যায়। সৎকাজে অর্থ নিয়োগ করলেই সম্পদ বেড়ে যায়।

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ ط -(البقرة : ٢٧٦)

"আল্লাহ সুদ নির্মূল করেন ও দান-সাদকাকে প্রতিপালন ও ক্রমবৃদ্ধি করেন।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৭৬)

وَمَا اٰتَيْتُمْ مِنْ رِّبًا لِّيَرْبُوْا فِىْ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ج وَمَا اٰتَيْتُمْ مِنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ○ (الروم : ٣٩)

"তোমরা এই যে সুদ দাও মানুষের ধন-সম্পদ বৃদ্ধির আশায়, জেনে রাখো, আল্লাহর নিকট তা কখনো বৃদ্ধি লাভ করে না। তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যাকাত বাবদ যে অর্থ দান করে থাকো একমাত্র তার মধ্যেই ক্রমবৃদ্ধি হয়ে থাকে।"–(সূরা আর রূম ঃ ৩৯)

পুঁজিবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী এটি আর একটি নতুন মতবাদ। ব্যয় করলে অর্থ বেড়ে যাবে এবং ব্যয়িত অর্থ কেবল নষ্টই হবে না বরং কিছুটা অতিরিক্ত লাভ ও কল্যাণসহ পূর্ণ মাত্রায় ফিরে আসবে, অন্যদিকে সুদী ব্যবসায় অর্থ বৃদ্ধির পরিবর্তে অর্থ হ্রাস ও লোকসানের সূচনা করবে এবং যাকাত ও সাদকার মাধ্যমে অর্থ হ্রাসের পরিবর্তে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হবে—এ মতবাদটি আপাত দৃষ্টিতে অদ্ভুত ও বিস্ময়কর মনে হবে। শ্রোতা মনে করে সম্ভবত এগুলো নিছক আখেরাতের সওয়াবের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাপার। নিসন্দেহে আখেরাতের সওয়াবের সাথে এসব কথার সম্পর্ক রয়েছে এবং ইসলামের দৃষ্টিতে এটিই আসল গুরুত্বের অধিকারী। কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, এ দুনিয়াতেও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এ মতাদর্শটি একটি শক্তিশালী ভিত্তির ওপর

প্রতিষ্ঠিত। ধন সঞ্চয় করে সুদী ব্যবসায়ে নিয়োগ করার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ চতুর্দিক থেকে ধন আহরিত হয়ে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে চলে আসবে। সাধারণ মানুষের ক্রয়-ক্ষমতা প্রতিদিন কমে যেতে থাকবে। কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায় সর্বত্র মন্দাভাব দেখা দেবে। জাতীয় অর্থনৈতিক জীবন ধ্বংসের শেষ সীমায় পৌঁছে যাবে। অবশেষে এমন অবস্থার সৃষ্টি হবে যার ফলে পুঁজিপতিরাও নিজেদের সঞ্চিত ধন-সম্পদ অর্থ উৎপাদনের কাজে লাগাবার সুযোগ পাবে না।[১] বিপরীত পক্ষে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করলে এবং যাকাত ও সাদকা দান করলে পরিণামে জাতির সকল ব্যক্তির হাতে এ সম্পদ ছড়িয়ে পড়ে, প্রত্যেক ব্যক্তি যথেষ্ট ক্রয়-ক্ষমতার অধিকারী হয়, শিল্পোৎপাদন বেড়ে যায়, সবুজ ক্ষেতগুলো শস্যে ভরে ওঠে, ব্যবসায়-বাণিজ্যে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়, হয় তো কেউ লাখপতি-কোটিপতি হয় না কিন্তু সবার অবস্থা সচ্ছল হয় এবং পরিবারই হয় সমৃদ্ধিশালী। এ শুভ পরিণাম সম্পন্ন অর্থনৈতিক মতাদর্শটির সত্যতা যাঁচাই করতে হলে আমেরিকার বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে।[২] সুদ ভিত্তিক অর্থব্যবস্থার কারণে সেখানে ধন বণ্টনের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেছে এবং শিল্প ও বাণিজ্যের মন্দাভাব জাতির অর্থনৈতিক জীবনকে ধ্বংসের প্রান্তসীমায় পৌঁছে দিয়েছে। এর তুলনায় ইসলামী যুগের প্রথম দিকের অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যখন সেখানে পূর্ণাংগরূপে প্রতিষ্ঠিত করা হয় তখন মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে জাতীয় সচ্ছলতা ও সমৃদ্ধি এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যার ফলে লোকেরা যাকাত গ্রহীতাদেরকে খুঁজে বেড়াতো কিন্তু কোথাও তাদের সন্ধান পাওয়া যেতো না। এমন একজন লোকের সন্ধান পাওয়া যেতো না যে, নিজেই যাকাত দেবার যোগ্যতা ও ক্ষমতা অর্জন করেনি। এ দু'টি অবস্থাকে পাশাপাশি রেখে তুলনা করলে আল্লাহ সুদকে কিভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং সাদকাকে ক্রমোন্নতি ও ক্রমবৃদ্ধি দান করেন তা দ্ব্যর্থহীনভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হবে।

ইসলাম পুঁজিবাদী মানসিকতা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর এক মানসিকতা সৃষ্টি করে। পুঁজিপতি একথা কল্পনাই করতে পারে না যে, সুদ ছাড়া এক ব্যক্তি তার অর্থ সম্পদ আর এক ব্যক্তিকে কেমন করে দিতে পারে। সে অর্থ ঋণ দিয়ে তার বিনিময়ে কেবল সুদই আদায় করে না, বরং নিজের মূলধন ও তার সুদ আদায়

---

১. রসূলে করীম (স) নিম্নোক্ত হাদীসটিতে একথার প্রতিই ইংগিত করেছেন ঃ

ان الرباوان كثر فان عاقبة تصير الى قد ـ(ابن ماجه ـ بيهقى ـ احمد)

অর্থাৎ "সুদের পরিমাণ যত বেশীই হোক না কেন অবশেষে তা কম হতে বাধ্য।"

২. এ গ্রন্থ প্রণয়নের সময় আমেরিকায় যে ভয়াবহ অর্থনৈতিক মন্দাভাব দেখা দিয়েছিল সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে।

করার জন্য ঋণগ্রহীতার বস্ত্র ও গৃহের আসবাবপত্রাদি পর্যন্ত ক্রোক করে নেয়। কিন্তু ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে, অভাবীকে কেবল ঋণ দিলে হবে না বরং তার আর্থিক অনটন যদি বেশী থাকে তাহলে তার নিকট কড়া তাগাদা করা যাবে না, এমন কি ঋণ আদায়ের ক্ষমতা না থাকলে তাকে মাফ করে দিতে হবে।

وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ ط وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○(البقرة : ٢٨٠)

"ঋণ গ্রহীতা যদি অত্যধিক অনটন পীড়িত হয় তাহলে তার অবস্থা সচ্ছল না হওয়া পর্যন্ত তাকে সুযোগ দাও আর যদি তাকে মাফ করে দাও তাহলে তা হবে তোমাদের জন্য উত্তম। যদি তোমরা কিছু জ্ঞান রাখতে, তাহলে এর কল্যাণকারিতা উপলব্ধি করতে পারতে।"-(সূরা বাকারা ঃ ২৮০)

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পারস্পরিক সাহায্যের অর্থ হচ্ছে এই যে, প্রথমে পারস্পরিক সাহায্য সমিতির তহবিলে অর্থ দাখিল করে আপনাকে তার সদস্য হতে হবে, তারপর আপনার যদি কখনো অর্থের প্রয়োজন হয়, তাহলে সমিতি বাজারে প্রচলিত সাধারণ সুদের হারের তুলনায় কিছু কম হারে আপনাকে সুদী ঋণ দেবে। যদি আপনার কাছে অর্থ না থাকে তাহলে পারস্পরিক সাহায্য সমিতি থেকে আপনি কোনোই সাহায্য পেতে পারেন না। বিপরীত পক্ষে ইসলাম যে পারস্পরিক সাহায্যের পরিকল্পনা রাখে তা হচ্ছে এই যে, অর্থ ও সামর্থবান লোকেরা প্রয়োজনের সময় কেবল তাদের কম সামর্থবান ভাইদেরকে ঋণ দেবে না বরং তাদের ঋণ আদায় করার ব্যাপারেও সামর্থ অনুযায়ী তাদেরকে সাহায্য করবে। তাই 'আলগারেমীনা' অর্থাৎ ঋণগ্রস্তদের ঋণ আদায় করে দেয়াকেও যাকাতের অন্যতম ব্যয় ক্ষেত্র হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

পুঁজিপতি কখনো সৎপথে কোনো অর্থ ব্যয় করলে নেহাত লোক দেখানোর উদ্দেশ্যেই তা করে থাকে। কারণ এ সংকীর্ণচেতা ব্যক্তি মনে করে যে, এ অর্থ ব্যয়ের বিনিময়ে কমপক্ষে সুনাম ও সুখ্যাতি তার অবশ্যই প্রাপ্য। কিন্তু ইসলাম বলে, লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে অর্থ ব্যয় করা উচিত নয় এবং প্রকাশ্যে বা গোপনে যা-ই ব্যয় করা হোক না কেন অবিলম্বে কোনো না কোনো আকারে এর প্রতিদান পাওয়া যাবে, এ ধরনের কোনো উদ্দেশ্য যেন এর পিছনে না থাকে। বরং কাজের পরিণতির প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। এ দুনিয়া থেকে আখেরাত পর্যন্ত যতদূর দৃষ্টি প্রসারিত করা যাবে সর্বত্রই দেখা যাবে এ ব্যয়িত অর্থ সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং একের পর এক মুনাফা দিয়েই চলছে।

"যে ব্যক্তি লোক দেখাবার উদ্দেশ্যে নিজের অর্থ ব্যয় করে তার এ কাজকে এমন একটি প্রস্তর খণ্ডের সাথে তুলনা করা যেতে পারে যার ওপর ছিল মাটির আস্তরণ, সে এ মাটির মধ্যে বীজ বপম করেছিল কিন্তু পানির একটি প্রবাহ্ আসলো এবং সমস্ত মাটি ধুয়ে নিয়ে চলে গেলো। আর যে ব্যক্তি নিজের নিয়ত ঠিক রেখে আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে অর্থ ব্যয় করে তার এ কাজকে এমন একটি উৎকৃষ্ট জমির সাথে তুলনা করা যেতে পারে, যেখানে একটি উদ্যান রচনা করা হয়েছে, বৃষ্টি হলে সেখানে দ্বিগুণ ফল উৎপন্ন হয় আর বৃষ্টি না হলে নিছক ছোটখাট একটি স্রোতধারা তার জন্য যথেষ্ট।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ৩৬ রুকূ)

اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ ج وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَاۤءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ط ـ(البقرة : ٢٧١)

"যদি প্রকাশ্যে সাদকা দাও তাও ভালো কিন্তু যদি গোপনে দাও এবং দরিদ্রদের নিকট পৌঁছিয়ে দাও, তাহলে এটিই উত্তম হবে।"

–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৭১)

পুঁজিপতি যদি কখনো সৎকাজে কোনো অর্থ ব্যয় করে তাহলে তার পিছনে তার হৃদয়িক আবেগ ও সদিচ্ছা থাকে না বরং অনিচ্ছাকৃতভাবেই করে থাকে এবং এজন্য সে সবচেয়ে নিকৃষ্টমানের সম্পদ ব্যয় করে, তারপর নিজের শাণিত বাক্যবাণে বিদ্ধ করে অর্থ গ্রহীতার অর্ধেক প্রাণ বের করে নেয়। বিপরীত পক্ষে ইসলাম সবচেয়ে ভালো সম্পদ ব্যয় করার এবং ব্যয় করার পর নিজের অনুগ্রহ প্রকাশ না করা এমন কি প্রতিদানে কেউ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে এ আশাও পোষণ না করার শিক্ষা দেয়।

اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّاۤ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ص وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ ـ(البقرة : ٢٦٧)

"তোমরা যাকিছু উপার্জন করেছো আর যাকিছু আমি জমি থেকে তোমাদের জন্য বের করেছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করো, যেন বাছাই করে নিকৃষ্টতর বস্তু ব্যয় করো না।"

–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৬৭)

لَاتُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى ـ(البقرة : ٢٦٤)

"অনুগ্রহ প্রকাশ করে ও কষ্ট দিয়ে তোমাদের সাদকাসমূহ ধ্বংস করো না।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৬৪)

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا ۝ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَانُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّلَا شُكُوْرًا ۝ (الدهر : ٨ ـ ٩)

"আর তারা আল্লাহর প্রতি ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মিসকিন, এতিম ও কয়েদীকে আহার করায় এবং বলে, আমরা তোমাদেরকে খাওয়াচ্ছি আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে, (এজন্য) আমরা তোমাদের নিকট থেকে কোনো প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রত্যাশী নই।"-(সূরা দাহর ঃ ৮-৯)

নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ দু'টি মানসিকতার মধ্যে যে বিপুল ব্যবধান দেখা যাচ্ছে এ প্রশ্ন না হয় বাদই দিলাম। তবুও আমার বক্তব্য হচ্ছে, নিছক অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলেও কল্যাণ ও ক্ষতির এ দু'টি মতাদর্শের মধ্যে কোন্‌টি অধিক শক্তিশালী, নিরেট ও সুদূরপ্রসারী ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতে অধিকতর নির্ভুল। অতপর কল্যাণ ও ক্ষতি প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে আমি ইসলামের যে আদর্শ তুলে ধরেছি সেসব সামনে রেখে ইসলাম কোনো অবস্থায় সুদী কারবারকে বৈধ গণ্য করতে পারে, একথা চিন্তা করার কোনো অবকাশ আছে কি?

চার ঃ যাকাত

ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলাম যে দৃষ্টিভংগী পেশ করেছে তার সারমর্ম হচ্ছে এই যে, ধন একস্থানে পুঞ্জীভূত ও জমাটবদ্ধ হয়ে থাকতে পারবে না ; ইসলামী সমাজের যে কয়জন লোক তাদের উচ্চতর যোগ্যতা ও সৌভাগ্যের কারণে নিজেদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন-সম্পদ আহরণ করেছে ইসলাম চায় তারা যেন এ সম্পদ পুঞ্জীভূত করে না রাখে বরং এগুলো ব্যয় করে এবং এমন সব ক্ষেত্রে ব্যয় করে যেখান থেকে ধনের আবর্তনের ফলে সমাজের স্বল্প বিত্ত ভোগীরাও যথেষ্ট অংশ লাভ করতে সক্ষম হবে। এ উদ্দেশ্যে ইসলাম একদিকে উন্নত নৈতিক শিক্ষা প্রদান এবং উৎসাহ দান ও ভীতি প্রদর্শনের শক্তিশালী অস্ত্র প্রয়োগ করে দানশীলতা ও যথার্থ পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার প্রবণতা সৃষ্টি করে। এভাবে লোকেরা নিজেদের মনের স্বাভাবিক ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী ধন-সম্পদ সঞ্চয় করাকে খারাপ জানবে এবং তা ব্যয় করতে উৎসাহী ও আগ্রহী হবে। অন্যদিকে ইসলাম এমন সব আইন প্রণয়ন করে, যার ফলে বদান্যতার এ শিক্ষা সত্ত্বেও নিজেদের অসৎ মনোবৃত্তির কারণে যেসব লোক সম্পদ আহরণ করতে ও পুঞ্জীভূত করে রাখতে অভ্যস্ত হয় অথবা যাদের নিকট কোনো না কোনোভাবে সম্পদ সঞ্চিত হয়ে যায়, তাদের সম্পদ থেকে সমাজের কল্যাণ ও উন্নতি বিধানার্থে কমপক্ষে একটি অংশ অবশ্যই কেটে নেয়া হবে। একেই যাকাত বলা হয়। ইসলামের

অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এ যাকাতকে অত্যধিক গুরুত্ব দান করা হয়েছে, এমনকি একে ইসলামের একটি মূল স্তম্ভের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নামাযের পরে এ যাকাতের ওপরই সবচেয়ে বেশী জোর দেয়া হয়েছে এবং দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ যে ব্যক্তি অর্থ-সম্পদ সঞ্চয় করে, যাকাত না দেয়া পর্যন্ত তার ঐ সম্পদ হালাল হতে পারে না।

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا -(التوبة : ١٠٣)

"(হে নবী!) তাদের ধন-সম্পদ থেকে একটি সাদকা গ্রহণ করো, যা ঐ ধন-সম্পদকে পাক-পবিত্র ও হালাল করে দেবে।"-(সূরা তাওবা ঃ ১০৩)

এখানে 'একটি সাদকা' শব্দটি থেকে সাদকার একটি বিশেষ পরিমাণ বুঝা যায়। এ সঙ্গে রসূলে করীম (স)-কে এটি আদায় করার নির্দেশ দেয়ার ফলে একথা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সাধারণ স্বেচ্ছা প্রদত্ত সাদকা থেকে আলাদা এটি একটি ওয়াজিব ও ফরজ সাদকা অর্থাৎ যাকাত এবং বিত্তশালী লোকদের নিকট থেকে এ সাদকাটি অবশ্যই আদায় করতে হবে। কাজেই এ নির্দেশ অনুযায়ী রসূলে করীম (স) বিভিন্ন প্রকার সম্পদের জন্য নেসাবের (যে সর্বনিম্ন পরিমাণের ওপর যাকাত অপরিহার্য) একটি পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন। অতপর নেসাব পরিমাণ বা তদূর্ধ বিভিন্ন প্রকার সম্পদের উপর যাকাতের বিভিন্ন হার নির্ধারণ করেছেন সোনা, রূপা ও নগদ টাকা-পয়সার ওপর শতকরা আড়াই ভাগ এবং কৃষি উৎপাদনের ওপর সেচ ব্যবস্থার আওতাধীন জমি হলে শতকরা ৫ ভাগ ও সেচ ব্যবস্থার আওতা বহির্ভূত জমি হলে শতকরা ১০ ভাগ, ব্যবসায় পণ্যের উপর শতকরা আড়াই ভাগ, খনিজ দ্রব্যাদি (নিজস্ব মালিকানাধীন) ও গুপ্ত ধনের উপর শতকরা ২০ ভাগ যাকাত ধার্য করেছেন। এভাবে ব্যবসায়িক পণ্য হিসেবে ব্যবহৃত গবাদি পশু প্রভৃতি চতুষ্পদ প্রাণীর ওপর বিভিন্ন হারে যাকাত ধার্য করেছেন।

আয়াতের শেষ শব্দটি থেকে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, বিত্তশালী ব্যক্তির নিকট যে অর্থ সম্পদ সঞ্চিত হয় ইসলামের দৃষ্টিতে তা অপবিত্র এবং তার মালিক তা থেকে প্রতি বছর কমপক্ষে একটি বিশেষ পরিমাণ আল্লাহর পথে ব্যয় না করা পর্যন্ত তা পবিত্র হতে পারে না। 'আল্লাহর পথে' শব্দটির অর্থ কি ? আল্লাহ কারোর মুখাপেক্ষী নন। তাঁর অর্থ-সম্পদের প্রয়োজন নেই, তিনি অভাবীও নন। কাজেই তাঁর পথ বলে একথাই বুঝানো হয়েছে যে, বিত্তশালীদের সম্পদ ব্যয় করে জাতির দরিদ্র ও অভাবী লোকদেরকে সচ্ছল করার চেষ্টা করতে হবে এবং এমন সব কল্যাণমূলক কাজে এ সম্পদ নিয়োগ করতে হবে—যা থেকে সমগ্র জাতি লাভবান হতে পারবে।

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ـ (التوبة : ٦٠)

"মূলত সাদকা-যাকাত হচ্ছে ফকির[১] ও মিসকিনদের[২] জন্য এবং তাদের জন্য যাদেরকে সাদকা আদায়ের কাজে নিযুক্ত করা হয়, তাদের জন্য যাদের হৃদয়কে শক্তিশালী করার প্রয়োজন হয়[৩], লোকদেরকে বন্দীত্ব থেকে মুক্ত করার জন্য, ঋণগ্রস্তদের ঋণমুক্ত করার জন্য আল্লাহর পথে ব্যয় করার জন্য এবং মুসাফিরদের[৪] জন্য।"–(সূরা আত তাওবা ঃ ৬০)

এটিই মুসলমানদের কো-অপারেটিভ সোসাইটি, তাদের ইনস্যুরেন্স কোম্পানী এবং প্রভিডেন্ট ফাণ্ড। এখান থেকেই মুসলিম সমাজের বেকারদেরকে সাহায্য করা হয়। তাদের অক্ষম, বিকলাংগ, রুগ্ন, এতিম, বিধবা ও কর্মহীনদেরকে এ ব্যবস্থার মাধ্যমেই প্রতিপালন করা হয়। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই যে, এ বস্তুটি মুসলমানদেরকে ভবিষ্যৎ অন্ন সংস্থানের চিন্তা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করে। এর সহজ-সরল নীতি হচ্ছে, আজ এক ব্যক্তি বিত্তবান কাজেই সে অন্যকে সাহায্য করবে, আগামীকাল যখন সে অভাবী হয়ে পড়বে তখন অন্যরা তাকে সাহায্য করবে। দরিদ্র হয়ে পড়লে আমার অবস্থা কি হবে, একথা চিন্তা করার আমার কোনো প্রয়োজন নেই। মরে গেলে স্ত্রী ও ছেলে-পেলেদের কি অবস্থা হবে ? কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনার কবলে পড়লে, পীড়িত হয়ে পড়লে ঘর-বাড়ীতে আগুন লেগে গেলে, বন্যা কবলিত হয়ে পড়লে, দেউলিয়া হয়ে গেলে তখন কি অবস্থা দাঁড়াবে এবং এসব বিপদের হাত থেকে উদ্ধারের কি উপায় হবে—এসব চিন্তা করার আদৌ কোনো প্রয়োজন নেই। সফর অবস্থায় টাকা-পয়সা শেষ হয়ে গেলে জীবিকা নির্বাহের কি উপায় হবে ? একমাত্র যাকাত ব্যবস্থাই এ সমস্ত চিন্তা থেকে মানুষকে চিরন্তন মুক্তি দান করে। এ ক্ষেত্রে ইসলামী সমাজের একজন সদস্যের কাজ কেবল এতটুকুই

১. ফকির এমন সব লোকদেরকে বলা হয় যারা নিজেদের প্রয়োজনের চেয়ে কম অন্ন সংস্থান করার কারণে অন্যের সাহায্যের মুখাপেক্ষী।–(লিসানুন আরব)

২. মিসকিনের সংজ্ঞা বর্ণনা করে হযরত ওমর (রা) বলেছেন ঃ যারা অর্থ উপার্জন করতে পারে না অথবা অর্থ উপার্জনের সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত। এ সংজ্ঞার প্রেক্ষিতে যে দরিদ্র শিশু এখনো অর্থ উপার্জনের যোগ্যতা রাখে না এবং যেসব বেকার ও রুগ্নব্যক্তি সাময়িকভাবে উপার্জনের যোগ্যতা বঞ্চিত—তারা সবাই মিসকিন।

৩. এ দলের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে এমন সব নওমুসলিম যারা কুফর থেকে ইসলামে প্রবেশ করার কারণে সংকটে জর্জরিত হয়েছে।

৪. মুসাফির ব্যক্তির গৃহে সম্পদের প্রাচুর্য থাকলে ও সফর অবস্থায় অর্থ সংকটে পড়লে অবশ্যই যাকাত গ্রহণের হকদার।

থাকে যে, সে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ-সম্পদের একটি অংশ আল্লাহর ইনস্যুরেন্স কোম্পানীতে জমা দিয়ে বীমা করে নেবে। প্রকৃতপক্ষে এ সময় এ অর্থের তার কোনো প্রয়োজন নেই। এ অর্থ এখন যাদের প্রকৃত প্রয়োজন তাদের কাজে লাগবে। কাল যখন তার বা তার সন্তান-সন্ততিদের প্রয়োজন দেখা দেবে তখন কেবল তার নিজের প্রদত্ত সম্পদই নয় বরং তার চাইতে অনেক বেশী সম্পদ ফেরত পাবে।

এখানে আবার দেখা যায়, পুঁজিবাদ ও ইসলামের নীতি ও পদ্ধতির মধ্যে পরিপূর্ণ বৈপরীত্য। পুঁজিবাদের দাবী হচ্ছে, অর্থ সঞ্চয় করতে হবে এবং তার পরিমাণ বাড়াবার জন্য সুদ নিতে হবে। যার ফলে এ নালা দিয়ে গড়িয়ে আশে-পাশের লোকদের সবার টাকা-পয়সা এ পুকুরে এসে পড়বে। বিপরীত পক্ষে ইসলাম নির্দেশ দেয়, প্রথমত টাকা-পয়সা জমা করে বা আটকে রাখা যাবে না আর যদি কখনো জমা হয়ে যায় তাহলে এ পুকুর থেকে নালা কেটে দিতে হবে, যাতে শুকিয়ে যাওয়া ক্ষেতগুলোতে পানি পৌছে যায় এবং আশেপাশের সমস্ত জমি তরতাজা ও সবুজে শ্যামলে ভরে উঠে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ধন আবদ্ধ ও জমাটবদ্ধ হয়ে থাকে কিন্তু ইসলামী ব্যবস্থায় তা মুক্ত, স্বাধীন ও অবাধ গতিশীল। পুঁজিবাদের পুকুর থেকে পানি নিতে হলে প্রথমে আপনার পানি সেখানে অবশ্যই থাকতে হবে, নয় তো এক কাতরা পানি আপনি সেখান থেকে পেতে পারেন না। কিন্তু ইসলামী অর্থব্যবস্থার পুকুরের নিয়ম হচ্ছে এই যে, যার নিকট প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি থাকবে সে তার বাড়তি পানি ঐ পুকুরে ঢেলে দিয়ে যাবে এবং যার পানির প্রয়োজন হবে সে ওখান থেকে নিয়ে যাবে। বলাবাহুল্য মৌলিকত্ব ও স্বভাব-প্রকৃতির দিক দিয়ে এ দু'টি পদ্ধতি পরস্পরের সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। একটি অর্থব্যবস্থায় এ দুই বিপরীতধর্মী মতাদর্শকে একত্রিত করা কোনো ক্রমেই সম্ভবপর নয়। কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি এ ধরনের বিপরীতধর্মী মতাদর্শের একত্র সমাবেশের কথা কল্পনাই করতে পারে না।

পাঁচ ঃ মীরাসী আইন

নিজের ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রয়োজনে অর্থ ব্যয়, আল্লাহর পথে ব্যয় ও যাকাত আদায় করার পরও যে অর্থ-সম্পদ কোনো একস্থানে কেন্দ্রভূত হয়ে যাবে তাকে বিকেন্দ্রীভূত করার জন্য ইসলাম আর একটি পন্থা অবলম্বন করেছে। একে বলা হয় মীরাসী আইন। এ আইনটির উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে ব্যক্তি অর্থ-সম্পদ রেখে মৃত্যুবরণ করবে তা যতো কম বা বেশী হোক না কেন, তা কেটে টুকরো টুকরো করা হবে এবং নিকট-দূরের সকল আত্মীয়ের মধ্যে

ক্রমানুসারে বণ্টন করা হবে। যদি এমন কোনো ব্যক্তি থাকে, যার কোনো ওয়ারিস নেই তাহলে তাকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করার অধিকার দানের পরিবর্তে তার সম্পদ মুসলমানদের বায়তুলমালে জমা করে দিতে হবে। তাহলে সমগ্র জাতি এ থেকে লাভবান হতে পারবে। মীরাস বণ্টনের এ আইনের অস্তিত্ব একমাত্র ইসলামেই দেখা যায়, অন্য কোনো অর্থব্যবস্থায় এর অস্তিত্ব নেই। অন্যান্য অর্থব্যবস্থা এ ব্যাপারে যে নীতি নির্ধারণ করেছে তা হচ্ছে, এক ব্যক্তি যে অর্থ সঞ্চিত করে রেখে যায় তার মৃত্যুর পর তা এক বা একাধিক ব্যক্তির নিকট কেন্দ্রীভূত থাকে।[১] কিন্তু ইসলাম অর্থ কেন্দ্রীভূত করার পরিবর্তে তার বিকেন্দ্রীকরণের পক্ষপাতি, এর ফলে অর্থের আবর্তন সহজতর হয়।

ছয় ঃ গনীমত লব্ধ সম্পদ ও বিজিত সম্পত্তি বণ্টন

এ ক্ষেত্রেও ইসলাম একই দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী। যুদ্ধে সেনাবাহিনী যে গনীমতের অর্থ (শত্রুপক্ষের পরিত্যক্ত সম্পদ) হস্তগত করে সে সম্পর্কে ইসলাম একটি বিশিষ্ট আইন প্রণয়ন করেছে। এ অর্থ-সম্পদ পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হয়। চারভাগ সৈন্যদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হয় এবং অবিশিষ্ট এক ভাগ সাধারণ জাতীয় কল্যাণমূলক কাজে ব্যবহার করার জন্য রেখে দেয়া হয়।

وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ـ(النفال : ٤١)

"জেনে রাখো, গনীমত হিসেবে তোমরা যাকিছু হস্তগত করো তার এক পঞ্চমাংশ হচ্ছে আল্লাহ, তাঁর রসূল, রসূলের নিকটাত্মীয়, এতিম, মিসকিন ও মুসাফিরদের জন্য।"—(সূরা আল আনফাল ঃ ৪১)

আল্লাহ্ ও রসূলের অংশ বলে এমন সব কাজকে বুঝনো হয়েছে যেগুলো আল্লাহ ও রসূলের নির্দেশের আওতাধীন ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীনে দেয়া হয়েছে।

যাকাতে রসূলের নিকটাত্মীয়দের কোনো অংশ ছিল না বলে এখানে তাদের অংশ রাখা হয়েছে।

অতপর এ পঞ্চমাংশে আরো তিন শ্রেণীর অংশ বিশেষভাবে রক্ষিত হয়েছে। জাতির এতিম শিশুদের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করা এবং তাদেরকে জীবন সংগ্রামে অংশ নেয়ার যোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য এতে তাদের অংশ

১. জ্যেষ্ঠ পুত্রের স্থলাভিষেক (Primogeniture) এবং একান্নবর্তী পরিবার (Joint Family System) প্রথা এ নীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত।

রক্ষিত হয়েছে। মিসকিনদের অংশ রাখা হয়েছে—বিধবা মহিলা, বিকলাঙ্গ, অক্ষম, রুগ্ন ও অভাবী প্রভৃতি যার অন্তর্ভুক্ত। আর রাখা হয়েছে ইবনুস সাবীল অর্থাৎ মুসাফিরদের অংশ। নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে ইসলাম মুসলমানদের মধ্যে মুসাফিরকে আপ্যায়ণ করার প্রবণতা সৃষ্টি করেছে। এ সঙ্গে যাকাত, সাদকা ও যুদ্ধলব্ধ গনীমতের সম্পদেও তার অংশ রেখেছে। এ ব্যবস্থার কারণে মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য, ভ্রমণ-পর্যটন, শিক্ষা-অধ্যয়ন, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাবলী পরিদর্শন ও অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য যাতায়াত সহজতর হয়েছে।

যুদ্ধের ফলে ইসলামী রাষ্ট্র যেসব সম্পদ-সম্পত্তির মালিক হয় ইসলাম সেগুলোকে সম্পূর্ণরূপে ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীন রাখার বিধান দিয়েছে।

مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ كَىْ لَايَكُوْنَ دُوْلَةً ۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ ۗ .... لِلْفُقَرَآءِ الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ .... وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ ....

وَالَّذِيْنَ جَآءُوْا مِنْ بَعْدِهِمْ ـ(الحشر : ٧ ـ ١٠)

"জনপদের অধিবাসীদের নিকট থেকে আল্লাহ, 'ফায়' (বিনা যুদ্ধে শত্রুপক্ষের যেসব সম্পদ হস্তগত হয়) হিসেবে যাকিছু দান করেছেন তা আল্লাহ, তাঁর রসূল, রসূলের নিকটাত্মীয়, এতিম, মিসকিন ও মুসাফিরদের জন্য, যাতে এগুলো কেবলমাত্র তোমাদের ধনীদের মধ্যে আবর্তিত না হয়। .... আর এর মধ্যে অভাবী মুহাজিরদেরও অংশ রয়েছে, যাদেরকে নিজেদের ঘর-বাড়ী ও সহায়-সম্পদ থেকে বেদখল করে নির্বাসিত করা হয়েছে। ..... আর তাদের অংশ রয়েছে যারা মুহাজিরদের আসার আগে মদীনায় ঈমান এনেছিল। ..... আর তাদের পরে ভবিষ্যত আগমনকারী বংশধরদেরও অংশ রয়েছে।"–(সূরা আল হাশর ঃ ৭-১০)

এ আয়াতগুলোতে কেবলমাত্র 'ফায়' লব্ধ অর্থের ব্যয় ক্ষেত্রগুলোর বিশদ বর্ণনা করা হয়নি বরং এই সঙ্গে যে উদ্দেশ্যে ইসলাম ফায়লব্ধ অর্থ-সম্পদ বন্টন তথা সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালনা করেছে সেদিকেও সুস্পষ্ট ইংগিত করা হয়েছে। অর্থাৎ অর্থ-সম্পদ যেন কেবলমাত্র তোমাদের ধনীদের মধ্যে আবর্তিত না হয়। কুরআন মজীদ ছোট একটি বাক্যের মধ্যে যে বিষয়বস্তু বর্ণনা করেছে সেটিই হচ্ছে সমগ্র ইসলামী অর্থব্যবস্থার ভিত্তিপ্রস্তর।

সাত ঃ মিতব্যয়ীতার নির্দেশ

ইসলাম একদিকে ধন-সম্পদ সমগ্র দেশবাসীর মধ্যে আবর্তন করার ও ধনীদের সম্পদ থেকে নির্ধনদের অংশ লাভ করার ব্যবস্থা করেছে, অন্যদিকে প্রত্যেক ব্যক্তিকে অর্থ ও সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে মিতব্যয়ী হবার নির্দেশ দিয়েছে। এভাবে অর্থনৈতিক উপায়-উপকরণ ব্যবহার করার ক্ষেত্রে ব্যক্তি কখনো প্রান্তিকতার আশ্রয় নিয়ে অর্থনৈতিক ভারসাম্য বিনষ্ট করবে না। এ ক্ষেত্রে কুরআনের মৌলিক শিক্ষা হচ্ছে ঃ

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا ○ (بنى اسرائيل : ٢٩)

"আর নিজের হাত না একেবারে গলায় বেঁধে রাখো আর না একেবারে তাকে খুলে দাও, যার ফলে পরবর্তীকালে আক্ষেপ করে বসে থাকার মতো অবস্থার সৃষ্টি হয়।"–(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৯)

وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَمًا ○

"আর আল্লাহর সৎকর্মশীল বান্দারা যখন ব্যয় করে, অমিতব্যয় করে না আবার কার্পণ্যও করবে না বরং এ দুটির মধ্যবর্তী ভারসাম্যপূর্ণ পন্থা অবলম্বন করে।"–(সূরা আল ফুরকান ঃ ৬৭)

এ শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে, প্রত্যেক ব্যক্তি যেন নিজের আর্থিক সঙ্গতির মধ্যে থেকেই অর্থ ব্যয় করে। তার অর্থ ব্যয় যেন কখনো এমন পর্যায়ে না পৌঁছায় যার ফলে তা তার আয়ের অংককে ছাড়িয়ে যায় এবং নিজের আজেবাজে খরচের জন্য তাকে অন্যের দ্বারে হাত পাততে হয় অথবা অন্যের উপার্জনে ভাগ বসাতে হয় এবং যথার্থ প্রয়োজন ছাড়াই অন্যের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করতে হয়। অতপর গায়ের জোরে সে ঋণদাতাকে কাঁচকলা দেখিয়ে ফিরবে অথবা ঋণ আদায় করার জন্য নিজের সব রকমের অর্থনৈতিক উপকরণ ব্যবহার করে অবশেষে ফতুর হয়ে ফকির ও মিসকিনদের খাতায় নিজের নাম লেখাবে। আবার সে যেন নিজের অর্থনৈতিক সামর্থের তুলনায় অনেক কম খরচ করার মতো কার্পণ্যও না দেখায়। নিজের আয় ও অর্থনৈতিক উপায়-উপকরণের সীমার মধ্যে থেকে ব্যয় করার অর্থ এ নয় যে, সে ভালো আয়-উপার্জন করলে নিজের সব টাকা-পয়সা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত আয়েশ-আরাম ও ভোগ বিলাসীতায় উড়িয়ে দেবে আর অন্যদিকে তার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশীরা চরম সংকটের মধ্যে দিন যাপন করবে। এ ধরনের স্বার্থান্ধ ব্যয় বাহুল্যকে ইসলাম অমিতব্যয়িতার মধ্যে গণ্য করেছে।

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ○ اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ۭ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا ○

"নিজের নিকটাত্মীয়কে তার অধিকার পৌঁছিয়ে দাও এবং মিসকিন ও মুসাফিরদেরকেও তাদের অধিকার দান করো। বাজে খরচ করো না। যারা অযথা ও বাজে খরচ করে তারা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার রব-প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ—না-ফরমান।"

–(বনী ইসরাঈল ঃ ২৬-২৭)

ইসলাম এ ক্ষেত্রে কেবলমাত্র নৈতিক শিক্ষা দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি বরং এ সঙ্গে কার্পণ্য ও অমিতব্যয়িতার চূড়ান্ত অবস্থা প্রতিরোধের জন্য আইনও প্রণয়ন করেছে। ধন বন্টনের ভারসাম্য বিনষ্টকারী সমস্ত পথ রুদ্ধ করার চেষ্টা করেছে। জুয়াকে হারাম ঘোষণা করেছে। মদ্যপান ও ব্যভিচারের পথ রোধ করেছে। অনর্থক ফূর্তিবাজী, তামাশা ও কৌতুকের এমন ব্যয়বহুল অভ্যাস নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে, যেগুলোর অনিবার্য পরিণতি অর্থ ও সময়ের অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়। সঙ্গীতের স্বাভাবিক প্রবণতাকে এমন পর্যায়ে উপনীত হতে দেয়নি যেখানে সঙ্গীত প্রিয়তা ও সঙ্গীতের মধ্যে ঐকান্তিক মগ্নতা মানুষের মধ্যে বহুবিধ নৈতিক ও আত্মিক ত্রুটি সৃষ্টির সাথে সাথে তার অর্থনৈতিক জীবনেও বিপর্যয় ও বিশৃংখলা সৃষ্টির কারণ হয়। সৌন্দর্য পিপাসার স্বাভাবিক প্রবণতাকেও একটি সীমার মধ্যে নিয়ন্ত্রিত করে। বহু মূল্য, পরিচ্ছদ, হীরা ও মণি-মানিক্যের অলংকার, সোনা ও রূপার তৈজস পত্রাদি, চিত্র ও ভাস্কর মূর্তি সম্পর্কে রসূলে করীম (স)-এর যে নির্দেশাবলী বিধৃত হয়েছে তার মধ্যে বহুতর কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এ সমস্ত কল্যাণের মধ্যে একটি মহত্তর কল্যাণ হচ্ছে এই যে, যে ধন-সম্পদ বহুসংখ্যক দরিদ্র ও অভাবী ভাইদের জীবনের নিম্নতম অপরিহার্য প্রয়োজনাদি পূর্ণ করতে পারে এবং তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে দিতে পারে, তাকে নিছক নিজের দেহ ও গৃহ সজ্জায় ব্যয় করা সৌন্দর্যপ্রীতি নয় বরং নিকৃষ্ট পর্যায়ের হৃদয়হীনতা ও স্বার্থপরতার পরিচায়ক।

মোটকথা ইসলাম একদিকে নৈতিক শিক্ষা ও অন্যদিকে সুনির্দিষ্ট আইন-কানুনের মাধ্যমে মানুষকে সহজ-সরল-অনাড়ম্বর জীবনযাপনের নির্দেশ দেয়। এ অনাড়ম্বর জীবনে মানুষের প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষার সীমানা কোনোক্রমেই এতটা ব্যাপকতর হতে পারে না, যার ফলে মধ্যম মানের আয়-উপার্জনের সংসার চালানো তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়বে এবং নিজের স্বাভাবিক সীমার বাইরে গিয়ে তাকে অন্যের উপার্জনে ভাগ বসাতে হবে অথবা যদি সে মধ্যম মানের অধিক আয় করতে সমর্থ হয়, তাহলে নিজের উপার্জিত সমস্ত অর্থ-

সম্পদ নিজেই ভোগ করবে এবং নিজের অপারগ ভাইদের সাহায্য করবে না, যারা মধ্যম মানের কম উপার্জন করে থাকে।

একটি প্রশ্ন

এ সংক্ষিপ্ত আলোচনায় ইসলামের সমগ্র অর্থব্যবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। এ আলোচনাটি পড়ার ও বারবার বিশ্লেষণ করার পর বিবেচনা করুন এ ব্যবস্থার কোন্খানে সুদকে বসানো যায় ? এ ব্যবস্থার যথার্থ প্রাণবস্তু, এর গঠনাকৃতি, এর বিভিন্ন অংশ ও তাদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক এবং এর অন্তর্নিহিত অর্থ ও উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করে বলুন, এর মধ্যে সুদী লেন-দেনের কোনো অবকাশ বা প্রয়োজন আছে কি ? এখানে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কোনো স্থান বা প্রয়োজন আছে কি ? এসব প্রশ্নের জবাব অবশ্যই নেতিবাচক হতে বাধ্য। তাহলে এ ক্ষেত্রে পুনর্বার গভীর দৃষ্টিতে আলোচনাটি পর্যালোচনা করে বলুন, এর মধ্যে নৈতিক, তমদ্দুনিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কোথাও কোনো ত্রুটি দেখা যায় কি? নৈতিকতা ও তমদ্দুনের উন্নততর নীতি ও আদর্শের কথা না হয় বাদই দিলেন। যদি মনে করেন, মানুষের জীবনে অর্থনীতির গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী, তাহলে আসুন, নির্ভেজাল অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করুন। এ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূলনীতি ও বিভিন্ন খুটিনাটি বিষয়ের মধ্যে কোনো ত্রুটি আছে কি ? যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে এর মধ্যে কি এমন কোনো সংশোধনী পেশ করা যায়, যা গ্রহণ না করলে এ ব্যবস্থা অসম্পূর্ণ বা ত্রুটিপূর্ণ থেকে যাবে ? এর চেয়ে উন্নততর এমন কোনো অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পেশ করা যেতে পারে কি, যেখানে ব্যক্তি ও সমষ্টির মধ্যকার অধিকার ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে এর চেয়েও অধিক নির্ভুল ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক কল্যাণের সমান সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে এর চেয়ে উন্নত পদ্ধতি অবলম্বিত হয়েছে ? যদি এটিও সম্ভবপর না হয় এবং আমরা বিশ্বাস করি, এটি কোনোক্রমেই সম্ভবপর হতে পারে না, তাহলে আপনার মতে বুদ্ধি-বিবেচনা কি একথাই দাবী করে যে, নিজের দুর্বলতার কারণে দুনিয়ার এ সর্বোত্তম অর্থব্যবস্থাকে বাদ দিয়ে আপনি দুনিয়ার নিকৃষ্টতম, সর্বাধিক ভ্রান্তিপূর্ণ ও ফলাফলের দিক থেকে সবচেয়ে বেশী ধ্বংসকর অর্থব্যবস্থা গ্রহণ করবেন ? উপরন্তু এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করার পর আপনি লজ্জিতও হবেন না, নিজের বিবেককে পাপের বোঝা বইতেও প্রস্তুত করবেন না এবং পাপকে পুণ্য, ফাসেকি ও সীমালংঘনকে আনুগত্য গণ্য করার জন্য কুরআন ও হাদীসের নির্দেশের মনগড়া ব্যাখ্যা করতে থাকবেন এবং ঐ ভ্রান্ত অর্থব্যবস্থার যাবতীয় গলিত নীতি ইসলামের পবিত্র-পরিচ্ছন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সাথে জুড়ে দেবার চেষ্টা করবেন, এ ক্ষেত্রে ইসলামের মূলনীতি, প্রাণসত্তা ও প্রকৃতির সাথে ঐ বস্তুগুলোর যতই বৈসাদৃশ্য

থাক না কেন আপনি তার কোনো পরোয়াই করবেন না। প্রথমে আপনি ডাক্তার প্রদত্ত ব্যবস্থাপত্র ফেলে দেন, তাঁর বিধৃত স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়মাবলী অবহেলা ও অস্বীকার করেন, যেসব বস্তু-বিষয় থেকে তিনি সতর্ক থাকতে ও আত্মরক্ষা করতে বলেছেন সেগুলো থেকে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করেন না। অবশেষে যখন রোগ বেড়ে যায় এবং মৃত্যু নিকটবর্তী হয় তখন আবার ঐ ডাক্তারকেই বলতে থাকেন, যে চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র আমাকে রোগগ্রস্ত করেছে আপনি নিজের হাতে আমাকে সে ব্যবস্থাপত্রটি লিখে দেন, যেসব অনিয়ম, অনাচার ও অখাদ্য আমার সর্বনাশ সাধন করেছে আপনি আমাকে সেগুলোর অনুমতি দেন, যে বস্তুটিকে আপনি হলাহল গণ্য করেছিলেন সেটিকে আবেহায়াত বলে ঘোষণা করে দেন। মূলত এটি চূড়ান্ত পর্যায়ের বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয়।

সুদ হারাম কেন

১—নেতিবাচক দিক

ইসলামী অর্থব্যবস্থা ও তার ভিত্তিসমূহের মধ্যে চারটি বিষয় মৌলিক গুরুত্বের অধিকারী ঃ

এক ঃ কতিপয় সীমা ও নিয়ন্ত্রণ সহকারে স্বাধীন অর্থনীতি,

দুই ঃ যাকাতের অপরিহার্যতা,

তিন ঃ উত্তরাধিকার আইন ও

চার ঃ সুদ নিষিদ্ধকরণ।

নিয়ন্ত্রণহীন পুঁজিবাদের ধ্বংসকারিতা এবং কমিউনিজম ও ফ্যাসিবাদের অপকীর্তি যাদের সন্মুখে উন্মোচিত হয়েছে তারা বর্তমানে উপরোল্লিখিত চারটি বিষয়ের মধ্যে কমপক্ষে প্রথমটিকে নীতিগতভাবে সত্য বলে মেনে নিতে শুরু করেছেন। অবশ্য এর বিস্তারিত অবস্থা সম্পর্কে মনে কিছু প্রশ্ন থেকে যায়। কিন্তু আমি আশা করি আমার "ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ" ও "ভূমির মালিকানা বিধান" গ্রন্থ দু'টি পাঠ করলে তারা এ প্রশ্নগুলোর জবাবও পেয়ে যাবেন।

যাকাতকে কেন ফরয করা হয়েছে এ বিষয়টি বর্তমানে দুনিয়ার সন্মুখে অনেকটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আজ পর্যন্ত কমিউনিজম, ফ্যাসিবাদ ও পুঁজিবাদী গণতন্ত্র সামাজিক ইনস্যুরেন্সের যে ব্যাপক ব্যবস্থার কথা চিন্তা করেছে যাকাত তার চেয়ে অনেক ব্যাপক আকারে সামাজিক ইনস্যুরেন্স ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে, একথা কোনো চিন্তাশীল, বিচক্ষণ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন লোকের নিকট অবিদিত নেই। কিন্তু যাকাতের বিস্তারিত বিধান না জানার কারণে এখানেও কিছু সংকট দেখা দেয়। একটি আধুনিক রাষ্ট্রের অর্থব্যবস্থায় যাকাত ও খুমুসকে (গনীমতের মালের এক-পঞ্চমাংশ) কিভাবে সংস্থাপিত করা যেতে পারে, এ ব্যাপারে মানুষের মনে বিরাট প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এ প্রশ্নের সমাধানের জন্য ইনশাআল্লাহ যাকাতের বিধানসমূহ সম্পর্কে সংক্ষিপ্তাকারে একটি পুস্তিকা লেখার চেষ্টা করবো।

উত্তরাধিকার আইনের ক্ষেত্রে দুনিয়ার অন্যান্য উত্তরাধিকার আইন থেকে আলাদা হয়ে ইসলাম যে পথ অবলম্বন করেছে পূর্বে তার কারণ ও অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য সম্পর্কে অধিকাংশ লোক অনবহিত ছিল এবং তারা এর বিরুদ্ধে নানান

প্রশ্ন উত্থাপন করতো। কিন্তু বর্তমানে ক্রমান্বয়ে সারা দুনিয়া এদিকে ধাবিত হচ্ছে। এমনকি রাশিয়ার কমিউনিষ্ট সমাজ ব্যবস্থাও ইসলামের এ উত্তরাধিকার আইনের অংশবিশেষ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে।*

কিন্তু এ নক্শার চতুর্থ অংশটি অনুধাবন করা আধুনিক যুগের মানুষের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে। বিগত শতাব্দীগুলোতে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা মানুষের মনে এ বদ্ধমূল ধারণা সৃষ্টি করেছে যে, সুদকে নিছক আবেগের বশবর্তী হয়ে হারাম গণ্য করা হয়েছে, কোনো ব্যক্তিকে সুদবিহীন ঋণ দান করা একটি নৈতিক সুবিধা দান ছাড়া আর কিছুই নয় এবং ধর্ম সুদকে হারাম গণ্য করে মানুষের প্রতি অযথা বাড়াবাড়ি করেছে। অন্যথায় ন্যায়ত সুদ সম্পূর্ণ যুক্তিসংগত এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তা কেবল আপত্তিহীনই নয় বরং কার্যত উপকারী ও অপরিহার্য। এ ভ্রান্ত মতবাদটির স্বপক্ষে জোরেশোরে প্রচার অভিযান চালানোর ফলে আধুনিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার যাবতীয় ত্রুটির প্রতি সবার দৃষ্টি পড়েছে কিন্তু তার এ বৃহত্তম মৌলিক ত্রুটিটি সবার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। এমনকি রাশিয়ার কমিউনিষ্ট ও সমাজতন্ত্রীরাও নিজেদের দেশে বৃটেন ও আমেরিকার ন্যায় সযত্নে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার এ বৃহত্তম ও কেন্দ্রীয় অনিষ্টকর বস্তুটি লালন করে চলেছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে এই যে, যেখানে মুসলমানদের সুদের প্রধানতম শত্রু হওয়া উচিত ছিল সেখানে তারা পাশ্চাত্যের এ বিভ্রান্তিকর প্রচারণায় মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হয়েছে। আমাদের পরাজিত মানসিকতার অধিকারী মুসলিম ভাইদের মনে সাধারণভাবে সুদ সম্পর্কে একটি ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। তাঁরা মনে করেন, যারা নিজেদের ব্যক্তিগত ব্যয় নির্বাহের জন্য ঋণ গ্রহণ করে একমাত্র তাদের নিকট থেকে সুদ নেয়া আপত্তিকর হতে পারে। আর ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করার জন্য যে ঋণ গ্রহণ করা হয় তার উপর সুদ ধার্য করা সম্পূর্ণ বৈধ, যুক্তিসংগত ও হালাল এবং দ্বীন, নৈতিকতা, বুদ্ধি, বিবেক ও অর্থ বিজ্ঞানের নীতি অনুসারে এতে কোনো দোষ থাকতে পারে না। উপরন্তু এ ব্যাপারে এমন একটা সুধারণা পোষণ করা হয় যার ফলে পুরাতন আমলের বেনিয়া ও মহাজনদের সুদের কারবার থেকে আধুনিক ব্যাংকিং-কে আলাদা মনে করা হয় এবং এসব ব্যাংকের 'পরিচ্ছন্ন'

* হালে সোভিয়েট ইউনিয়নের উত্তরাধিকার আইনে সন্তান, স্ত্রী, স্বামী, পিতা-মাতা, ভাই-বোন ও পালিত পুত্রকে উত্তরাধিকারী গণ্য করা হয়েছে। উপরন্তু এজন্য যে নীতি নির্ধারণ করা হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, নিজের অভাবী নিকটাত্মীয় ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যেও পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টন করার অসিয়াত করা যেতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে আত্মীয়দের অধিকারকে অগ্রাধিকার দান করা হয়েছে। এ সংগে এমন অসিয়াত নিষিদ্ধ করা হয়েছে যার মধ্যে নাবালক সন্তান বা দরিদ্র আত্মীয়দেরকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্য কার্যকর থাকে। এ আইন দৃষ্টে সহজেই অনুমান করা যায় যে, 'কমিউনিষ্ট প্রগতিবাদীরা' ১৯৪৫ সালে এমন একটি আইনের দিকে পশ্চাদপসরণ করেছে যা ৬২৫ সালে প্রণীত হয়েছিল।

ব্যবসায়কে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও পবিত্র মনে করে এর সাথে সকল প্রকার সম্পর্ক স্থাপন করাকে বৈধ গণ্য করা হয়। এজন্য বর্তমানে সুদের শরীয়াত নির্ধারিত সংজ্ঞা বদলাবার চেষ্টা করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, কুরআনে যে সুদকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে আধুনিক ব্যাংকের সুদ তার আওতাভুক্ত নয়। এ সমস্ত বিভ্রান্তিকর গোলক ধাঁধাঁ পেরিয়ে যারা বাইরে আসতে পেরেছেন তাদের পক্ষেও সুদকে আইনত নিষিদ্ধ ঘোষণা করার পর আধুনিক অর্থব্যবস্থা কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে তা উপলব্ধি করা কঠিন হয়ে পড়েছে।

আমার পরবর্তী আলোচনায় এ বিষয়গুলো সুস্পষ্ট করার চেষ্টা করবো।

সুদের যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা

সুদ কি যথার্থই একটি যুক্তিসংগত বিষয় ? কোনো ব্যক্তি ঋণ বাবদ প্রদত্ত অর্থের উপর সুদ দাবী করলে তাকে কি বুদ্ধিসম্মত বলা যেতে পারে এবং তার এ দাবীটি কি ন্যায়সংগত বলে বিবেচিত হবার যোগ্য। কোনো ব্যক্তি একজনের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করলে সে ঋণ বাবদ গৃহীত আসল অর্থ ফেরত দেবার সাথে সাথে তাকে কিছু সুদও প্রদান করবে এটা কি ইনসাফের দাবী ? সর্বপ্রথম এ প্রশ্নগুলোর মীমাংসা হওয়া উচিত। এ প্রশ্নগুলোর মীমাংসা হয়ে গেলে আমাদের আলোচনার অর্ধেক বিষয় আপনা-আপনি মীমাংসিত হয়ে যাবে। কারণ সুদ একটি যুক্তিসংগত বিষয় বলে বিবেচিত হলে সুদ হারাম হবার ব্যাপারটি নিষ্প্রাণ হয়ে পড়বে। আর যদি বুদ্ধি ও ইনসাফের দৃষ্টিতে সুদ যুক্তিসংগত প্রমাণিত না হয়, তাহলে মানব সমাজে এ অযৌক্তিক বিষয়টিকে টিকিয়ে রাখার প্রয়োজন কোথায়—এ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা যেতে পারে।

প্রথম ব্যাখ্যা

এ প্রশ্নের জবাবে আমরা সর্বপ্রথম যে যুক্তিটির সম্মুখীন হই তা হচ্ছে, যে ব্যক্তি নিজের সঞ্চিত ধন-সম্পদ অন্যকে ঋণ দেয় সে বিপদ বরণ করে, ত্যাগ স্বীকার করে, নিজের প্রয়োজন অপূর্ণ রেখে অন্যের প্রয়োজন পূর্ণ করে এবং যে সম্পদ থেকে সে নিজে উপকৃত হতে পারতো তা অন্যের হাতে সোপর্দ করে। ঋণ গ্রহীতা নিজের কোনো ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণ করলে তাকে অবশ্যি ঐ সম্পদের ভাড়া আদায় করা উচিত। যেমন বাড়ী, গাড়ী বা আসবাবপত্রের ভাড়া আদায় করা হয়ে থাকে। ঋণদাতা নিজের শ্রমোপার্জিত অর্থ নিজে ব্যবহার না করে তাকে প্রদান করে যে বিপদ বরণ করে নিয়েছে এ ভাড়া তার বিনিময় হিসেবেও বিবেচিত হতে পারে। আর ঋণগ্রহীতা এ অর্থ কোনো মুনাফা সৃষ্টিকারী কাজে খাটাবার জন্য গ্রহণ করে থাকলে ঋণদাতা অবশ্যি তার নিকট সুদ দাবী করার অধিকার রাখবে। ঋণগ্রহীতা যেখানে

অন্যের অর্থ থেকে লাভবান হচ্ছে সেখানে ঋণদাতা ঐ লাভের ন্যায্য অংশ পাবে না কেন ?

ঋণদাতা নিজের অর্থ অন্যের হাতে সোপর্দ করার ব্যাপারে বিপদ বরণ করে নেয় এবং ত্যাগ স্বীকার করে, একথা সত্য কিন্তু এ বিপদ বরণ ও ত্যাগ স্বীকারের মূল্য হিসেবে বছরে, ছ' মাসে বা মাসে শতকরা পাঁচ বা দশ ভাগ আদায় করার যৌক্তিকতা কোথায় ? বিপদ বরণ করে নেয়ার কারণে সে যুক্তিসংগতভাবে যে অধিকার লাভ করে তা হচ্ছে, সে ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে কোনো জিনিস বন্ধক স্বরূপ রেখে দিতে পারে অথবা তার কোনো জিনিস নিজের দায়িত্বে নিয়ে তাকে ঋণ দিতে পারে বা তার নিকট থেকে জামানত তলব করতে পারে। এসব কিছুতে সম্মত না হলে তার আদতে বিপদ বরণ না করা এবং ঋণদানে অস্বীকার করা উচিত। কিন্তু বিপদ কোনো ব্যবসায় পণ্য নয়, যার কোনো মূল্য দান করা যেতে পারে বা কোনো গৃহ, আসবাবপত্র ও যানবাহন নয়, যার কোনো ভাড়া আদায় করা যেতে পারে। অবশ্য ত্যাগ স্বীকারের ব্যাপারে বলা যেতে পারে যে, ব্যবসায়ে পরিণত না হওয়া পর্যন্তই তা ত্যাগ বলে গণ্য হতে পারে। ত্যাগ স্বীকারের উদ্দেশ্য থাকলে যথার্থ ত্যাগ স্বীকারই করা উচিত এবং এ নৈতিক কাজটির নৈতিক লাভের উপরই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। আর যদি বিনিময় ও পারিশ্রমিকের প্রশ্ন তোলা হয় তাহলে ত্যাগের কথা না উঠানোই সংগত বরং সরাসরি ব্যবসায়িক ভিত্তিতে অগ্রসর হওয়া উচিত। এ ক্ষেত্রে অবশ্যই তাকে জানাতে হবে যে, ঋণের ব্যাপারে আসল অর্থের বাইরে মাসিক বা বার্ষিক সে যে আর একটি অতিরিক্ত অর্থ আদায় করছে তার অধিকারী সে হলো কিসের ভিত্তিতে ?

এটা কি তার ক্ষতিপূরণ ? কিন্তু সে ঋণ বাবদ যে অর্থ দিয়েছে তা ছিল তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত। সে নিজেও এ অর্থটি ব্যবহার করছিল না। কাজেই এখানে আসলে কোনো ক্ষতি অনুষ্ঠিত হয়নি এবং এ ঋণদানের জন্য কোনো প্রকার ক্ষতিপূরণ লাভের অধিকারীও সে হতে পারে না।

এটা কি ভাড়া বাবদ প্রাপ্য অর্থ ? কিন্তু ভাড়া এমন সব জিনিসের হয়ে থাকে যেগুলোকে ভাড়াটের উপযোগী ও তার জন্য ব্যবহারযোগ্য করার জন্য মানুষ নিজের সময়, অর্থ ও শ্রম নিয়োজিত করে। ভাড়াটের ব্যবহারের কারণে সেগুলো নষ্ট হয়, ভেঙ্গে-চুরে যায়, যার ফলে সেগুলোর মূল্য কমে যেতে থাকে। ব্যবহার্য দ্রব্যাদি যেমন, আসবাবপত্র, গৃহ ও যানবাহনের ক্ষেত্রে এ সংজ্ঞা যথার্থ এবং এ বস্তুগুলোর ভাড়া আদায় করাও যুক্তিসংগত কিন্তু খাদ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে এ সংজ্ঞা যথার্থ নয়, যেমন গম, ফল ইত্যাদি এবং টাকা-পয়সাও এ একই

গোত্রভুক্ত। কারণ টাকা-পয়সা নিছক বস্তু ও সেবা ক্রয় করার একটি মাধ্যম ছাড়া আর কিছুই নয়। কাজেই এসব বস্তুর ভাড়ার প্রসঙ্গ অর্থহীন।

কোনো ঋণদাতা বড়জোর এতটুকু বলতে পারে ঃ আমার নিজের অর্থ থেকে আমি অন্যকে লাভবান হবার সুযোগ দিচ্ছি, কাজেই এ লাভে আমারও অংশ রয়েছে। এটা অবশ্যি যুক্তিসঙ্গত কথা। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, যে অভাবী ও বুভুক্ষ ব্যক্তি নিজের অভুক্ত সন্তানদের পেটে দু' মুঠো আহার যোগাবার জন্য আপনার নিকট থেকে ৫০ টাকা হাওলাত নিয়েছে সে কি সত্যিই ঐ টাকা থেকে এমনভাবে 'লাভবান' হচ্ছে যার ফলে আপনি তা থেকে নিজের অংশ হিসেবে মাসে মাসে শতকরা ২ টাকা বা ৫ টাকা হারে পাওয়ার অধিকারী হতে পারেন ? লাভবান সে অবশ্যি হচ্ছে এবং তাকে এ সুযোগটি নিসন্দেহে আপনিই দিয়েছেন কিন্তু বুদ্ধি-বিবেক, ইনসাফ, অর্থনীতি বিজ্ঞান, ব্যবসায় নীতি কিসের দৃষ্টিতে এ লাভ বা লাভবান হবার সুযোগকে এমন পর্যায়ে আনা যেতে পারে যার ফলে আপনি তার একটি আর্থিক মূল্য নির্ধারণ করতে পারেন ? ঋণগ্রহীতার বিপদ যতই কঠিন হবে এ মূল্যও ততই বাড়তে থাকবে, তার বিপদকাল যত দীর্ঘ হতে থাকবে আপনার প্রদত্ত এ 'লাভবান হবার সুযোগের' মূল্যও তত মাস ও বার্ষিক হারে বাড়তে থাকবে ? একজন অভাবী ও বিপদগ্রস্তকে নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থদান করার মতো বিরাট হৃদয়বত্তার অধিকারী যদি আপনি না হয়ে থাকেন তাহলে আপনার ঐ অর্থ তার নিকট থেকে ফেরত পাবার ব্যাপারে সর্বপ্রকারে নিশ্চিন্ত হয়ে নিন তারপরই তাকে ঐ অর্থ ঋণ দিন। এটাই আপনার জন্য যুক্তিসঙ্গত পন্থা। আর যদি ঋণ দিতেও আপনার মন সায় না দেয় তাহলে তাকে কোনো প্রকারে সাহায্য করবেন না, এও একটা যুক্তিসঙ্গত কথা। কিন্তু কোনো ব্যক্তির বিপদ-দুঃখ-কষ্ট আপনার জন্য মুনাফা সংগ্রহের সুযোগরূপে গণ্য হবে এবং অভুক্ত পেট ও মৃত্যু পথযাত্রী রোগী আপনার জন্য অর্থ খাটাবার (INVESTMENT) ক্ষেত্র বিবেচিত হবে ; উপরন্তু মানুষের বিপদ বাড়ার সংগে সংগে আপনার লাভের সম্ভাবনাও বেড়ে যেতে থাকবে এটা কোন্ ধরনের যুক্তিসঙ্গত ব্যবসা ?

'লাভবান হওয়ার সুযোগ দেয়া' যদি কোনো অবস্থায় কোনো আর্থিক মূল্যের অধিকারী হয় তাহলে তা কেবলমাত্র এমন এক অবস্থায় হতে পারে যখন অর্থ গ্রহণকারী তা কোনো ব্যবসায়ে খাটায়। এ অবস্থায় অর্থদানকারী একথা বলার অধিকার রাখে যে, তার অর্থ থেকে অন্য ব্যক্তি যে লাভ কুড়াচ্ছে তার মধ্যে তার ন্যায্য অংশ রয়েছে এবং এ অংশ তার পাওয়া উচিত। কিন্তু বলাবাহুল্য পুঁজি একাকী কোনো মুনাফা সৃষ্টির যোগ্যতা রাখে না। মানুষের শ্রম

ও যোগ্যতা তার সাথে যুক্ত হলে তবেই সে মুনাফা দানের যোগ্যতা অর্জন করে। আবার মানুষের শ্রম ও যোগ্যতা তার সাথে যুক্ত হবার সাথে সাথেই সে মুনাফা দান করতে শুরু করে না বরং মুনাফা দানের জন্য তার একটি মেয়াদের প্রয়োজন হয়। উপরন্তু তার মুনাফা দান নিশ্চিতও নয়। সেখানে ক্ষতি ও দেউলিয়া হবার সম্ভাবনাও থাকে। আর লাভজনক হবার ক্ষেত্রেও কোন্ সময় কি পরিমাণ মুনাফা দেবে তা পূর্বাহ্নে বলাও সম্ভব হয় না। এ ক্ষেত্রে মানুষের শ্রম ও যোগ্যতা যখন পর্যন্ত ঐ অর্থের ধারে-কাছেও পৌঁছাতে পারেনি তখন থেকেই বা কেমন করে অর্থদানকারীর মুনাফা শুরু হয়ে যেতে পারে ? উপরন্তু মুনাফার হার ও পরিমাণও বা কেমন করে নির্দিষ্ট করা যেতে পারে, যখন পুঁজির সাথে মানুষের মেহনত ও যোগ্যতার মিলনে মুনাফা সৃষ্টি নিশ্চিত নয় এবং কি পরিমাণ মুনাফা সৃষ্টি হবে তাও জানা নেই ?

যে ব্যক্তি নিজের অতিরিক্ত সঞ্চিত অর্থ কোনো মুনাফা সৃষ্টিকারী কাজে লাগাতে চায় তার শ্রম বিনিয়োগকারীদের সাথে অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে চুক্তি সম্পাদন করা এবং একটি স্থিরীকৃত হার অনুযায়ী লাভ ও লোকসানের অংশীদার হওয়া উচিত, এ ক্ষেত্রে এটিই একমাত্র যুক্তিসংগত পদ্ধতি হতে পারে। বিপরীত পক্ষে আমি যদি এক ব্যক্তির ব্যবসায়ে অংশীদার হবার পরিবর্তে তাকে একশো টাকা ঋণ দিয়ে থাকি এবং তাকে বলি, যেহেতু তুমি এ অর্থ থেকে লাভবান হবে তাই আমার টাকা যতদিন তোমার ব্যবসায়ে খাটবে ততদিন পর্যন্ত তুমি প্রতিমাসে আমাকে এক টাকা হারে মুনাফা দিতে থাকবে, এটা কোন্ ধরনের যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতি হতে পারে ? প্রশ্ন হচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ পুঁজির পিছনে পরিশ্রম খাটিয়ে তা থেকে মুনাফা অর্জিত হতে শুরু না হয় ততক্ষণ সেখানে কোন্ ধরনের সঞ্চিত মুনাফা থাকে যা থেকে আমি নিজের অংশ দাবী করার অধিকার রাখি ? যদি ঐ ব্যক্তি তার ব্যবসায়ের লাভের পরিবর্তে ক্ষতির সম্মুখীন হয় তাহলে কোন্ বিবেক ও ইনসাফের প্রেক্ষিতে আমি তার নিকট থেকে মাসিক মুনাফা আদায় করার অধিকার রাখতে পারি ? যদি তার মুনাফা মাসিক এক টাকার চেয়ে কম হয় তাহলে আমার মাসিক এক টাকা আদায় করার কি অধিকার আছে ? আর তার সমগ্র মুনাফাই যদি হয় এক টাকা তাহলে এ ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি সারা মাস নিজের সময়, শ্রম, যোগ্যতা, বুদ্ধি, সামর্থ ও নিজের ব্যক্তিগত পুঁজি সবকিছু খাটালো সে কিছুই পেলো না অথচ আমি কেবলমাত্র একশো টাকা তাকে দিয়ে চুপচাপ বসে ছিলাম কিন্তু মুনাফার সবটুকু আমি লুটেপুটে নিয়ে গেলাম, এটা কোন্ ধরনের ইনসাফ ? কলুর বলদও যদি সারাদিন ঘানি টানে তাহলে কলুর নিকট কমপক্ষে সে নিজের আহার চাইবার দাবী রাখে, কিন্তু এ সুদী ঋণ মানুষকে এমন এক বলদে পরিণত করে যে কলুর

জন্য সারাদিন ঘানি টানবে কিন্তু আহার তাকে বাইরে কোথাও থেকে সংগ্রহ করতে হবে।

তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেয়া যায় যে, কোনো ব্যবসায়ী ব্যক্তির মুনাফা ঐ নির্ধারিত অর্থের চাইতে বেশী হয়, যা ঋণদাতা সুদের আকারে তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়, তাহলেও বুদ্ধিবৃত্তি, ইনসাফ, ব্যবসায় নীতি ও অর্থনৈতিক রীতিনীতি কোনো কিছুর পরিপ্রেক্ষিতে একথা যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ করা যেতে পারে না যে, যারা আসল উৎপাদনকারী, যারা সমাজের প্রয়োজন প্রস্তুত ও সংগ্রহ করার জন্য নিজেদের সময় ব্যয় করে, পরিশ্রম করে, মস্তিষ্ক পরিচালনা করে এবং নিজেদের শরীর ও মস্তিষ্কের সমুদয় শক্তি ব্যবহার করে তাদের সবার লাভ সংশয়যুক্ত ও অনির্দিষ্ট থেকে যাবে, কিন্তু যে ব্যক্তি নিজের অতিরিক্ত সঞ্চিত অর্থ ঋণ দিয়েছে একমাত্র তার লাভ নিশ্চিত ও নির্ধারিত হবে। তাদের সবার জন্য ক্ষতির আশংকা রয়েছে কিন্তু তার জন্য রয়েছে লাভের গ্যারান্টি। সবার লাভের হার বাজারের দামের সাথে উঠানামা করে কিন্তু সে একাই এমন এক সৌভাগ্যবান ব্যক্তি যে নিজের জন্য লাভের যে অংক নির্ধারণ করে নিয়েছে মাসের পর মাস বছরের পর বছর তা কোনো প্রকার রদবদল ছাড়াই যথানিয়মে পেয়ে যেতে থাকে।*

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা

এ সমালোচনা থেকে একটি কথা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। অর্থাৎ সুদকে একটি যুক্তিসঙ্গত বস্তু গণ্য করার জন্য প্রথম পর্যায়ে যেসব যুক্তিকে যথেষ্ট মনে করা হয় একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে সেগুলোর দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে পড়ে। ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য যে ঋণ গ্রহণ করা হয় তার উপর সুদ আরোপ করার স্বপক্ষে কোনো বুদ্ধিসম্মত যুক্তিই থাকতে পারে না। এমনকি সুদের সমর্থকগণও এ দুর্বল মামলাটির ব্যাপারে হাত গুটিয়ে নিয়েছে। তবে

* এখানে অবশ্যি আপত্তি উত্থাপন করা যেতে পারে যে, তাহলে টাকার বিনিময়ে জমি বর্গা দেয়াকে কেমন করে বৈধ গণ্য করা যায়? তার অবস্থা ও সুদের সমপর্যায়ভুক্ত। কিন্তু এ আপত্তি আসলে তাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত হয় যারা আগাম টাকা নির্ধারিত করে জমি বর্গা দেয়। যেমন বিঘে প্রতি ২০ টাকা বা একর প্রতি ৫০ টাকা হিসেবে নির্ধারিত করে নেয়াকে যারা বৈধ গণ্য করে তাদের বিরুদ্ধে এ আপত্তি উত্থাপন করা যেতে পারে। আমি এ নীতির সমর্থক নই। আমি নিজেও একে সুদের সাথে সামঞ্জস্যশীল মনে করি। কাজেই এ আপত্তির জবাব দেয়া আমার দায়িত্ব নয়। এ ব্যাপারে আমার নীতি হচ্ছে, জমির মালিক ও কৃষকের মধ্যে ভাগ-চাষের সম্পর্কই যথার্থ। অর্থাৎ উৎপন্ন শস্যের কত অংশ কৃষকের ও কত অংশ জমি-মালিকের সে ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে একটি চুক্তি অনুষ্ঠিত হবে। যৌথ কারবারের অংশীদারিত্বের সাথে এর সাদৃশ্য রয়েছে। এ ধরনটিকে আমি বৈধ মনে করি। আর জমির ভাড়া সংক্রান্ত বিষয়ে যে অবস্থাটিকে আমি বৈধ মনে করি আমার 'ভূমির মালিকানা বিধান' গ্রন্থে তা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছি। তার বিরুদ্ধে এ আপত্তি উত্থাপিত হয় না।

ব্যবসায়ীক উদ্দেশ্যে যে ঋণ গ্রহণ করা হয় তার ব্যাপারেও সুদ সমর্থকদের সম্মুখে এ জটিল প্রশ্ন দেখা দেয় যে, এ সুদকে মূলত কোন্ বস্তুর মূল্য মনে করা হচ্ছে ? ঋণদাতা নিজের অর্থের সাথে ঋণগ্রহীতাকে এমন কি বাস্তব সত্ত্বামূলক (Substential) জিনিস দেয় যার একটি আর্থিক মূল্যও থাকে এবং মাসের পর মাস বছরের পর বছর যে ঋণ গ্রহীতার নিকট থেকে ঐ মূল্য লাভ করার অধিকারী হয় ? এ জিনিসটি চিহ্নিত করার জন্য সুদ সমর্থকগণকে যথেষ্ট বেকায়দায় পড়তে হয়েছে।

একদল বলে সে জিনিসটি হচ্ছে 'লাভবান হবার সুযোগ'। কিন্তু উপরের পর্যালোচনা থেকে আপনি বুঝতে পেরেছেন এ 'সুযোগ' কোনো নির্দিষ্ট, নিশ্চিত ও নিত্যকার বুদ্ধিপ্রাপ্ত মূল্যের স্বত্ব সৃষ্টি করে না বরং এটি এমন এক অবস্থায় আনুপাতিক লাভের স্বত্ব দান করে যখন প্রকৃতপক্ষে ঋণ গ্রহণকারী লাভের মুখ দেখে।

দ্বিতীয় দল সামান্য হেরফের করে বলে, সে জিনিসটি হচ্ছে 'অবকাশ' ঋণ-দাতা নিজের অর্থের সাথে এ 'অবকাশ' ব্যবহারের জন্য ঋণগ্রহীতাকে দান করে। এ অবকাশের একটি মূল্য রয়েছে এবং এটি দীর্ঘ ও দীর্ঘতর হবার সাথে সাথে এর মূল্যও বেড়ে যেতে থাকে। কোনো ব্যক্তি যেদিন থেকে অর্থ নিয়ে কাজে লাগায় সেদিন থেকে শুরু করে যেদিন ঐ অর্থের সাহায্যে প্রস্তুত দ্রব্য বাজারে পৌঁছে যায় এবং মূল্য আনে ঐদিন পর্যন্ত প্রতিটি মুহূর্ত ব্যবসায়ীর নিকট অতীব মূল্যবান। সে যদি এ অবকাশ না পায় এবং মাঝ পথেই তার নিকট থেকে অর্থ ফেরত নেয়া হয় তাহলে আদতে তার ব্যবসা চলতে পারে না। কাজেই যে ব্যক্তি অর্থ ঋণ নিয়ে ব্যবসায় খাটাচ্ছে তার নিকট এ সময়টি অবশ্যি একটি মূল্য রাখে এবং সে এ মূল্য থেকে লাভবান হচ্ছে। কাজেই অর্থদানকারীও লাভের অংশ পাবে না কেন ? আবার এ সময়ের কমবেশীর কারণে ঋণগ্রহীতার লাভের সম্ভাবনাও কমবেশী হতে থাকে। কাজেই সময়ের দীর্ঘতা ও স্বল্পতার ভিত্তিতে ঋণদাতা এর মূল্য নির্ধারণ করবে কেন ?

কিন্তু এখানেও আবার ঐ একই প্রশ্ন দেখা দেয়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি অর্থ দাতার নিকট থেকে ব্যবসায় খাটাবার জন্য অর্থ নিচ্ছে সে নিশ্চিতরূপে ব্যবসায় লাভ করবে, ক্ষতি করবে না—একথা সে কেমন করে জানলো ? উপরন্তু তার লাভও নিশ্চিতরূপে শতকরা একটি নির্দিষ্ট হারে হতে থাকবে কাজেই তা থেকে অর্থদানকারীকে অবশ্যই শতকরা একটি নির্দিষ্ট হারে অংশ আদায় করা উচিত—একথাই বা সে জানলো কেমন করে ? এছাড়া যে সময়ে সে ঋণগ্রহীতাকে নিজের অর্থ ব্যবহারের অবকাশ দিচ্ছে ঐ সময় প্রতি বছর ও

প্রতিমাসে নিশ্চিতরূপে একটি বিশেষ পরিমাণ মুনাফা অর্জিত হবে কাজেই এর একটি নির্দিষ্ট বার্ষিক বা মাসিক মূল্য স্থিরিকৃত হওয়া উচিত—এ হিসেব জানার জন্য কোন্ ধরনের যন্ত্রই বা তার নিকট আছে তা আমাদের অবশ্যই জানা উচিত ? সুদ সমর্থকদের নিকট এ প্রশ্নগুলোর কোনো সঠিক ও সংগত জবাব নেই। কাজেই আবার সে আগের কথায়ই ফিরে আসতে হয়। অর্থাৎ ব্যবসায়িক ব্যাপারে যদি কোনো জিনিস যুক্তিসঙ্গত হয়ে থাকে তাহলে তা হচ্ছে একমাত্র লাভ ও লোকসানের ভিত্তিতে অংশিদারিত্ব, নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট হারে যে সুদ চাপিয়ে দেয়া হয় তা নয়।

তৃতীয় ব্যাখ্যা

আর একদল বলে, মুনাফা অর্জন হচ্ছে অর্থের নিজস্ব গুণ। কাজেই কোনো ব্যক্তি যখন অন্যের সংগৃহীত অর্থ ব্যবহার করে তখন ঐ অর্থই এমন অধিকার সৃষ্টি করে যার ফলে অর্থদাতা সুদ চাইতে পারে এবং ঋণগ্রহীতা তা আদায় করতে বাধ্য। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপাদন ও সংগ্রহে সাহায্য করার শক্তি অর্থের রয়েছে। অর্থের সাহায্যে যে পরিমাণ দ্রব্য উৎপন্ন হয় তার সাহায্য ব্যতিরেকে সে পরিমাণ উৎপন্ন হতে পারে না। অর্থের সাহায্যে উন্নত ধরনের দ্রব্যাদি বেশী পরিমাণে তৈরী হয় এবং তা অধিক মূল্যে বাজারে বিক্রি হয় অন্যথায় দ্রব্যও কম উৎপন্ন হয়, তার মানও হয় নিম্নমুখী এবং বাজারে ভালো দামে বিক্রিও হয় না। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, মুনাফা অর্জনের গুণ অর্থের মধ্যে সন্নিহিত রয়েছে। কাজেই কেবল অর্থের ব্যবহারই অর্থদাতার জন্য সুদ লাভের অধিকার সৃষ্টি করে।

কিন্তু অর্থ মুনাফা দানের নিজস্ব গুণে গুণান্বিত প্রথমত এ দাবীটিই দ্ব্যর্থহীনভাবে ভ্রান্ত। যখন কোনো ব্যক্তি অর্থ নিয়ে কোনো ফলদায়ক কাজে লাগায় একমাত্র তখনই তার মধ্যে এ শক্তি সৃষ্টি হয়। একমাত্র তখনই একথা বলা যেতে পারে যে, অর্থগ্রহণকারী ব্যক্তি যেহেতু অর্থ ব্যবহার করে মুনাফা অর্জন করছে কাজেই এ মুনাফা থেকে অর্থদাতাকে অংশ দেয়া উচিত। কিন্তু যে ব্যক্তি রুগীর চিকিৎসা বা মৃতের কাফন-দাফনের জন্য অর্থ গ্রহণ করে তার এ অর্থ কোন্ ধরনের অর্থনৈতিক মূল্য সৃষ্টি করে, যা থেকে ঋণদাতা অংশগ্রহণ করতে পারে ?

উপরন্তু মুনাফাজনক কাজে যে অর্থ লাগানো হয় তা সব ক্ষেত্রেই নিশ্চিতরূপে অধিক মূল্য দান করে না। কাজেই মুনাফাদান অর্থের নিজস্ব গুণ এ দাবী অর্থহীন। অনেক সময় কোনো কাজে বেশী অর্থ লাগানো হয় কিন্তু এর ফলে মুনাফা বাড়ার পরিবর্তে কমে যায়। এমনকি অবশেষে তাতে লোকসান

দেখা দেয়। আজকাল কিছুদিন পর পর ব্যবসা জগতে যে অচলাবস্থার (CRISIS) সৃষ্টি হচ্ছে এর কারণ স্বরূপ একথাই বলা যায় যে, পুঁজিপতিরা নিজেদের ব্যবসায়ে যখন অজস্র অর্থ ঢেলে দিতে থাকে এবং উৎপাদন বেড়ে যেতে থাকে তখন দাম কমতে থাকে, ফলে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ বাড়ার সাথে সাথে দাম এত বেশী কমে যেতে থাকে যে, পুঁজি বিনিয়োগে কোনো প্রকার লাভের সম্ভাবনা থাকে না।

এছাড়াও পুঁজির মধ্যে মুনাফাদানের কোনো শক্তি যদি থেকে থাকে তাহলে তা বাস্তব রূপ লাভ করার জন্য আরো কয়েকটি জিনিসের উপর নির্ভরশীল হয়। যেমন পুঁজি ব্যবহারকারীদের পরিশ্রম, যোগ্যতা, বুদ্ধি-বৃদ্ধি ও অভিজ্ঞতা, ব্যবহারকালীন অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার আনুকূল্য এবং সমকালীন বিপদ-আপদ থেকে নিরাপত্তা লাভ। এ বিষয়গুলো এবং এ ধরনের আরো বহু বিষয় মুনাফাদানের পূর্বশর্ত। এগুলোর মধ্য থেকে কোনো একটি শর্ত না পাওয়া গেলে অনেক সময় পুঁজির সমস্ত মুনাফাদানের ক্ষমতাই শেষ হয়ে যায় বরং উল্‌টো লোকসানও দেখা যায়। কিন্তু সুদী ব্যবসায়ে পুঁজি দানকারী ব্যক্তি এসব শর্ত পূর্ণ করার দায়িত্ব গ্রহণ করে না এবং একথাও স্বীকার করে না যে, ঐ শর্তগুলোর কোনোটির অনুপস্থিতির কারণে তার পুঁজি মুনাফাদানে অক্ষম হলে সে সুদ গ্রহণ করবে না। সে বরং উলটো দাবী করে, তার পুঁজি ব্যবহার করলেই সে একটি নির্দিষ্ট হারে সুদ লাভের অধিকারী হয়। তার পুঁজি বাস্তবে কোনো প্রকার মুনাফা লাভে সক্ষম হোক বা না হোক তার এ অধিকারে কোনো পার্থক্য সূচিত হবে না।

অবশেষে যদি একথা মেনেও নেয়া যায় যে, পুঁজির মধ্যে মুনাফা দান করার ক্ষমতা রয়েছে, যার ভিত্তিতে পুঁজিদানকারী মুনাফার অংশীদার হবার অধিকার লাভ করে তাহলেও প্রশ্ন দেখা দেয়, আপনার নিকট এমন কোন্‌ হিসেব আছে যার ভিত্তিতে আপনি বর্তমানে পুঁজির মুনাফাদান করার ক্ষমতা নির্দিষ্ট করতে পারেন এবং যারা পুঁজি বিনিয়োগ করে সেই ভিত্তিতে তাদের সুদের হার নির্ধারিত করতে পারেন ? আর বর্তমান সময়ের জন্য কোনো হিসেবের ভিত্তিতে সুদের হার নির্ধারণ করা সম্ভবপর বলে যদি মেনে নেয়া হয় তাহলেও আমরা একথা বুঝতে সম্পূর্ণ অক্ষম যে, ১৯৪৯ সালে যে পুঁজিপতি কোনো ব্যবসা সংস্থাকে ১০ বছর মেয়াদে এবং অন্য একটি সংস্থাকে ২০ বছর মেয়াদে তৎকালীন প্রচলিত হারে সুদী ঋণ দিয়েছিলেন তিনি কিসের ভিত্তিতে একথা জানতে পেরেছিলেন যে, পরবর্তী ১০ ও ২০ বছরে পুঁজির মুনাফা দানের ক্ষমতা অবশ্যই ঐ ১৯৪৯ সালের পর্যায়েই থাকবে ? বিশেষ করে যখন ১৯৫৯ সালে বাজারে সুদের হার ১৯৪৯ সালের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এবং ১৯৬৯

সনে তার থেকেও আলাদা হতে বাধ্য। এক্ষেত্রে যে ব্যক্তি একটি সংস্থার সাথে দশ বছরের এবং অন্য একটি সংস্থার সাথে বিশ বছরের চুক্তি করে তাদের নিকট থেকে ১৯৪৯ সনের হার অনুযায়ী নিজের পুঁজির সম্ভাব্য মুনাফার অংশ চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করে নিয়েছিলেন তাকে আমরা কোন্ যুক্তির ভিত্তিতে এ অধিকার দান করবো ?

চতুর্থ ব্যাখ্যা

সর্বশেষ ব্যাখ্যায় একটু বেশী বুদ্ধি প্রয়োগ করা হয়েছে। এর সংক্ষিপ্ত সার হচ্ছে ঃ মানুষ প্রকৃতিগতভাবে দূরের ও ভবিষ্যতের লাভ ও আনন্দের উপর নিকটেরও উপস্থিত লাভ, আনন্দ, স্বাদ ও তৃপ্তিকে অগ্রাধিকার দান করে। ভবিষ্যত যতই দূরবর্তী হয় তার লাভ ও স্বাদ ততই সংশয়পূর্ণ হয় এবং সে অনুপাতে মানুষের দৃষ্টিতে তার মূল্যও কমে যায়। এ নিকটবর্তীর অগ্রাধিকার ও দূরবর্তীর পিছিয়ে পড়ার বিভিন্ন কারণ রয়েছে। যেমন ঃ

এক ঃ ভবিষ্যত অন্ধকারের গর্ভে জীবন অনিশ্চিত। কাজেই ভবিষ্যতের লাভ সংশয়পূর্ণ। এর কোনো চিত্রও মানুষের চিন্তাজগতে সুস্পষ্ট নয়। বিপরীত পক্ষে আজকের নগদ লাভ নিশ্চিত। মানুষ স্বচক্ষে তা প্রত্যক্ষও করছে।

দুই ঃ যে ব্যক্তি বর্তমানে কোনো বিষয়ের অভাব অনুভব করছে বর্তমানে তা পূর্ণ হওয়া ভবিষ্যতে কোনো এক সময় পূর্ণ হওয়ার চেয়ে অনেক বেশী মূল্যবান বিবেচিত হবে, যখন হতে পারে সে ঐ বিষয়ের অভাব অনুভব করবে না বা হয়তো অনুভব করতেও পারে।

তিন ঃ যে অর্থ বর্তমানে পাওয়া যাচ্ছে তা কার্যত প্রয়োজনীয় ও কার্যোপযোগী। এ প্রেক্ষিতে তা ঐ অর্থের উপর অগ্রাধিকার রাখে যা আগামীতে কোনো সময় অর্জিত হবে।

এ সমস্ত কারণে আজকের নগদ লাভ ভবিষ্যতের অনিশ্চিত লাভের উপর অগ্রাধিকার রাখে। কাজেই যে ব্যক্তি আজ কিছু অর্থ ঋণ নিচ্ছে তা অনিবার্যরূপে আগামীকাল সে ঋণদাতাকে যে অর্থ আদায় করবে তার চেয়ে বেশী মূল্যের অধিকারী। ঐ বাড়তি মূল্যটুকুই হচ্ছে সুদ। ঋণ দেবার সময় ঋণদাতা তাকে যে অর্থ দিয়েছিল, আদায় করার সময় বাড়তি মূল্য স্বরূপ ঐ সুদ আসল অর্থের সাথে মিশে তার সমান মূল্যে পৌছিয়ে দেয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ এ বিষয়টিকে নিম্নোক্তরূপে অনুধাবন করা যায় ঃ এক ব্যক্তি মহাজনের নিকট গিয়ে একশো টাকা ঋণ চাইলো। মহাজন তার সাথে চুক্তি করলো যে, আজ সে যে ১০০ টাকা দিচ্ছে এক বছর পর এর পরিবর্তে তাকে ১০৩ টাকা দিতে হবে। এ

ব্যাপারে আসলে বর্তমানের ১০০ টাকার বিনিময় হচ্ছে ভবিষ্যতের ১০৩ টাকার সাথে। বর্তমানের অর্থ ও ভবিষ্যতের অর্থের মনস্তাতিক (অর্থনৈতিক নয়) মূল্যের মধ্যে যে পার্থক্য দেখা যায় তা এ বাড়তি ৩ টাকার সমান। যতক্ষণ পর্যন্ত এ ৩ টাকা এক বছর পর আদায়কৃত ১০০ টাকার সাথে যুক্ত হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত তার মূল্য ঋণ প্রদান কালে ঋণদাতা প্রদত্ত ১০০ টাকার সমান হবে না।

যে সতর্কতা ও বুদ্ধিমত্তা সহকারে এ ব্যাখ্যা করা হয়েছে তার তারিফ না করে পারা যায় না। কিন্তু এখানে বর্তমান ও ভবিষ্যতের মনস্তাত্ত্বিক মূল্যের যে পার্থক্য বর্ণনা করা হয়েছে তা আসলে একটি বিভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।

সত্যিই কি মানব প্রকৃতি বর্তমানকে ভবিষ্যতের তুলনায় বেশী গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান মনে করে? তাই যদি হয়ে থাকে, তাহলে অধিকাংশ লোক তাদের সমস্ত উপার্জন আজই ব্যয় করা সংগত মনে করে না কেন? বরং তার একটি অংশ ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করা পছন্দ করে কেন? সম্ভবত শতকরা একজন লোকও আপনি পাবেন না যে ভবিষ্যতের চিন্তা শিকেয় তুলে রেখে বর্তমানের আয়েশ-আরাম ও স্বাদ-আহলাদ পূরণ করার জন্য সমুদয় অর্থ দু' হাতে খরচ করাকে অগ্রাধিকার দেবে। অন্ততপক্ষে শতকরা ৯৯জন লোকের অবস্থা এই যে, তারা আজকের প্রয়োজন অপূর্ণ রেখে আগামীকালের জন্য কিছু না কিছু সঞ্চয় করে রাখতে চায়। কারণ ভবিষ্যতে যেসব ঘটনা সংঘটিত হবে এবং মানুষকে যেসব প্রয়োজনের সম্মুখীন হতে হবে তন্মধ্যে অনেক সম্ভাব্য ঘটনা ও প্রয়োজনের কাল্পনিক চিত্র মানুষের মানস চোখে ভাসতে থাকে। বর্তমানে সে যে প্রয়োজন মিটিয়ে চলছে ও যে অবস্থার সাথে কোনো না কোনোক্রমে বুঝছে সেগুলোর চেয়ে ঐ সম্ভাব্য ঘটনা ও প্রয়োজনগুলো তার নিকট অনেক বেশী বড় ও গুরুত্বপূর্ণ রূপে প্রতীয়মান হয়। উপরন্তু বর্তমানেও মানুষ যেসব প্রচেষ্টা ও সাধনা চালিয়ে যাচ্ছে এগুলোরও উদ্দেশ্য তার নিজের উন্নততর ও অধিকতর ভালো ভবিষ্যত ছাড়া আর কি-ই বা হতে পারে? মানুষ আগামী দিনে ভালোভাবে জীবন যাপন করার উদ্দেশ্যেই তো আজ শ্রম-মেহনত করে যাচ্ছে। এমন কোনো নিরেট বোকার সন্ধান পাওয়াও কষ্টকর হবে যে নিজের ভবিষ্যতকে শ্রীহীন ও দুঃখ-দারিদ্র পর্যুদস্ত অথবা কমপক্ষে বর্তমানের তুলনায় শ্রীহীন করার বিনিময়ে নিজের বর্তমানকে সুখী-সমৃদ্ধিশালী করা পছন্দ করবে। মূর্খতা ও অজ্ঞতার কারণে মানুষ এমনটি করতে পারে অথবা কোনো সাময়িক ইচ্ছা-কামনার আবেগে অভিভূত হয়ে এহেন পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভবপর কিন্তু ভেবে-চিন্তে, বিচার-বিবেচনা করে কেউ এ কাজ করতে পারে না, অন্তত একে নির্ভুল ও যুক্তিসংগত বিবেচনা করতে পারে না।

মানুষ বর্তমানের নিশ্চয়তার বিনিময়ে ভবিষ্যতের ক্ষতি বরদাশত করে নেয়। কিছুক্ষণের জন্য এ দাবীর যথার্থতা স্বীকার করে নিলেও এ দাবীর ভিত্তিতে যে কথা প্রমাণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে তা কোনোক্রমেই যথার্থ প্রমাণিত হয় না। ঋণ গ্রহণ কালে ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার মধ্যে যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল তাতে বর্তমানের ১০০ টাকার দাম এক বছর পরের ১০৩ টাকার সমান ধার্য করা হয়েছিল। কিন্তু আজ এক বছর পর ঋণগ্রহীতা যখন ঋণ আদায় করতে গেলো তখন প্রকৃত অবস্থা কোন্ পর্যায়ে পৌঁছেছে ? এখন বর্তমানের ১০৩ টাকা অতীতের ১০০ টাকার সমান হয়ে গেছে। আর যদি প্রথম বছর ঋণগ্রহীতা ঋণ আদায় করতে সক্ষম না হয় তাহলে দ্বিতীয় বছরের শেষে দু' বছর আগের ১০০ টাকার দাম বর্তমানের ১০৬ টাকার সমান হয়ে যাবে। প্রকৃতপক্ষে অর্থের মূল্য ও মান নিরুপণের ক্ষেত্রে অতীত ও বর্তমানের মধ্যে এ অনুপাত কি যথার্থ ও নির্ভুল ? সত্যিই কি অতীত যতই পুরাতন হতে থাকে বর্তমানের তুলনায় তার দাম ততই বাড়তে থাকে ? সত্যিই কি অতীতের প্রয়োজনগুলোর পূর্ণতা এতবেশী মূল্যবান যার ফলে দীর্ঘকাল পূর্বে আপনি যে অর্থ পেয়েছিলেন এবং যা খরচ করার পর বিস্তৃতির গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে তা কালের প্রতিটি মুহূর্ত অতিক্রান্ত হবার সাথে সাথে বর্তমানের অর্থের চেয়ে বেশী মূল্যবান হয়ে যাচ্ছে, এমনকি একশো টাকা খরচ করার পর যদি পঞ্চাশ বছর অতিবাহিত হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে বর্তমানে তার দাম হবে আড়াই শো টাকার সমান ?

ন্যায়সঙ্গত সুদের হার

বুদ্ধি ও ন্যায়নীতির দিক থেকে সুদকে বৈধ ও সংগত প্রমাণ করার জন্য সর্বসাকুল্যে উপরোক্ত যুক্তিগুলোই পেশ করা হয়। আমাদের ইতিপূর্বেকার আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, যুক্তির সাথে এ নাপাক বস্তুটির কোনো দূরবর্তী সম্পর্কও নেই। সুদ দেয়া-নেয়ার স্বপক্ষে কোনো শক্তিশালী যুক্তিও পেশ করা যেতে পারে না। অথচ অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, এমনিতর একটি অযৌক্তিক বস্তুকে পাশ্চাত্যের পণ্ডিত-প্রবর ও চিন্তাশীলগণ সম্পূর্ণ স্বীকৃত ও সুস্পষ্ট বস্তু হিসেবে গণ্য করে নিয়েছেন এবং সুদের যৌক্তিকতাকে যেন একটি স্থিরীকৃত ও সর্বজন স্বীকৃত সত্য মনে করে সমস্ত আলোচনা সুদের ন্যায়সঙ্গত হার নির্ধারণের মধ্যে কেন্দ্রীভূত করেছেন। আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্যে সুদ সম্পর্কিত আলোচনার কোথাও সুদ দেয়া-নেয়ার যৌক্তিকতা ও অযৌক্তিকতার প্রসংগ দেখা যাবে না বরং সুদের অমুক হারটি অযৌক্তিক ও সীমাতিরিক্ত কাজেই তা আপত্তিকর ও অগ্রহণযোগ্য এবং অমুক হারটি ন্যায়সঙ্গত কাজেই তা গ্রহণযোগ্য এ বিতর্কের মধ্যেই সমস্ত আলোচনা আবর্তিত।

কিন্তু সত্যিই কি কোনো ন্যায়সঙ্গত হার আছে ? যে বস্তুটির নিজের ন্যায়সঙ্গত হবার কোনো প্রমাণ নেই তার হার যুক্তিসঙ্গত না অযৌক্তিক এ প্রসঙ্গ অবতারণার অবকাশ কোথায় ? কিছুক্ষণের জন্য আমরা এ আলোচনা না হয় স্থগিতই রাখলাম। এ প্রশ্ন বাদ দিয়ে আমরা মাত্র এতটুকু জানতে চাই, সুদের স্বাভাবিক ও ন্যায়সঙ্গত হার কোন্‌টি ? কোনো হারের ন্যায়সঙ্গত ও অন্যায় হবার মাপকাঠি কি ? সত্যিই কি বিশ্বজোড়া সুদী ব্যবসায়ে কোনো যুক্তিসঙ্গত (Rational) ভিত্তিতে সুদের হার নির্ধারণ করা হচ্ছে ?

এ প্রশ্নের ব্যাপারে ব্যাপক অনুসন্ধান চালিয়ে আমরা আবিস্কার করেছি দুনিয়ায় ন্যায়সঙ্গত সুদের হার নামক কোনো জিনিসের অস্তিত্বই কোনোদিন ছিল না। বিভিন্ন হারকে বিভিন্ন যুগে ন্যায়সঙ্গত গণ্য করা হয়েছে এবং পরে আবার সেগুলোকেই অন্যায় ও অসংগত ঘোষণা করা হয়েছে। বরং একই যুগে বিভিন্ন স্থানের ন্যায়সঙ্গত হারের মধ্যে পার্থক্য দেখা গেছে। প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ হিন্দু অর্থনীতিবিদ কৌটিল্যের বর্ণনা অনুযায়ী প্রাচীন হিন্দুযুগে বছরে শতকরা ১৫ থেকে ৬০ ভাগ সুদ ন্যায়সঙ্গত মনে করা হতো এবং বিপদাশংকা অত্যধিক বলে এ হার আরও বাড়ানো যেতো। অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে ও উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে ভারতীয় করদ রাজ্যগুলো একদিকে নিজেদের দেশীয় মহাজনবৃন্দ ও অন্যদিকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সরকারের সাথে যে আর্থিক লেনদেন করতো তাতে সাধারণত বার্ষিক শতকরা ৪৮ ভাগ সুদের হারের প্রচলন ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে (১৯১৪-১৮) ভারত সরকার বার্ষিক শতকরা সাড়ে ৬ ভাগ সুদের ভিত্তিতে যুদ্ধ ঋণ লাভ করেছিল। ১৯২০ ও ১৯৩০ এর মধ্যবর্তী সময়ে সমবায় সমিতিগুলোর সাধারণ সুদের হার ছিল শতকরা ১২ থেকে ১৫ ভাগ। ১৯৩০ ও ১৯৪০ এর আমলে দেশের আদালত-গুলো বার্ষিক শতকরা ৯ ভাগের কাছাকাছি সুদকে ন্যায়সঙ্গত গণ্য করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাছাকাছি সময়ে রিজার্ভ ব্যাংক অব ইণ্ডিয়ার ডিসকাউন্ট রেট বার্ষিক শতকরা ৩ ভাগ নির্ধারিত হয়েছিল এবং সমগ্র যুদ্ধকালে এ হার বর্তমান ছিল বরং শতকরা পৌনে তিন ভাগ সুদেও ভারত সরকার ঋণ লাভ করছিল।

এতো গেলো আমাদের এ উপমহাদেশের অবস্থা। ইউরোপের দিকে তাকালে সেখানেও প্রায় একই ধরনের চিত্র দেখা যাবে। ষোল শতকের মাঝামাঝি সময়ে ইংল্যাণ্ডে শতকরা ১০ ভাগ সুদের হারকে সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত গণ্য করা হয়েছিল। ১৯২০ সালের কাছাকাছি সময়ে ইউরোপের অনেক সেন্ট্রাল ব্যাংক শতকরা ৮/৯ ভাগ সুদ নির্ধারণ করতো। এ আমলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের (LEAGUE OF NATIONS) মাধ্যমে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ যে ঋণ লাভ করেছিল, তার হারও ছিল অনুরূপ। কিন্তু আজ আমেরিকা ও

ইউরোপের কোনো ব্যক্তির নিকট সুদের এ হারের কথা বললে সে চীৎকার করে বলতে থাকবে, এটা সুদ নয়, লুটতরাজ। আজ যেদিকে তাকান শতকরা আড়াই ও ৩ ভাগ সুদের পসরা দেখতে পাবেন। শতকরা ৪ ভাগ হচ্ছে আজকের সর্বোচ্চ হার। আবার কোনো কোনো অবস্থায় ১ ও $\frac{১}{২}$ বা $\frac{১}{৪}$ ভাগ সুদও দেখা যায়। কিন্তু অন্যদিকে দরিদ্র জনসাধারণকে সুদী ঋণদানকারী মহাজনদের জন্য ইংল্যাণ্ড ১৯২৭ সালে মানি লেণ্ডারস এ্যাক্টের মাধ্যমে শতকরা ৪৮ ভাগ সুদ বৈধ গণ্য করেছে। আমেরিকার আদালতগুলো সুদখোর মহাজনদের জন্য বার্ষিক শতকরা ৩০ থেকে ৬০ ভাগ সুদ গ্রহণ করার অনুমতি দান করেছে। এখন আপনি নিজেই বলুন, এর মধ্যে কোন্ হারটি স্বাভাবিক ও ন্যায়সঙ্গত ?

আর একটু অগ্রসর হয়ে আমরা জিজ্ঞেস করতে চাই, সত্যিই কি সুদের কোনো স্বাভাবিক ও ন্যায়সঙ্গত হার হতে পারে ? এ প্রশ্নটি পর্যালোচনা করলে আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন যে, সুদের হার কেবলমাত্র এমন অবস্থায় সঙ্গতভাবে নির্ধারিত হতে পারে। যখন ঋণগ্রহীতা তার ঋণলব্ধ অর্থ থেকে যে মুনাফা অর্জন করে। তার মূল্য নির্ধারিত থাকতো (বা করা যেতো)। যেমন এক বছর পর্যন্ত ১০০ টাকা ব্যবহার করলে—তা থেকে ২৫ টাকার ন্যায় মুনাফা লাভ করা যায়, একথা যদি নির্ধারিত হয়ে যায়, তাহলে এ সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব হয় যে, যে ব্যক্তির অর্থ সারাটা বছর ব্যবহার করে এ মুনাফা অর্জিত হলো সে এ মুনাফা থেকে ৫ টাকা বা আড়াই টাকা অথবা সোয়া এক টাকা পাওয়ার স্বাভাবিক ও ন্যায়সঙ্গত অধিকার রাখে। কিন্তু বলা বাহুল্য, এভাবে যে অর্থ ব্যবহার করা হয়, তার মুনাফা কোনোদিন নির্ধারিত হয়নি এবং হতেও পারে না। উপরন্তু বাজারে সুদের হার নির্ধারণের ক্ষেত্রে কখনো ঋণগ্রহীতা ঋণলব্ধ অর্থ থেকে কি পরিমাণ মুনাফা লাভ করছে, এমনকি কোনো মুনাফা লাভ করবে কিনা, সেদিকে দৃষ্টি রাখা হয় না। এক্ষেত্রে কার্যত যাকিছু হয় তা হচ্ছে, মহাজনী ব্যবসায়ে ঋণগ্রহীতার অলসতার প্রেক্ষিতে ঋণের মূল্য নির্ধারিত হয়। অন্যদিকে বাণিজ্যিক সুদের বাজারে অন্যতর ভিত্তিতে সুদের হারের উঠানামা হতে থাকে। বুদ্ধি, যুক্তি ও ন্যায়নীতির সাথে এর কোনো দূরতম সম্পর্কও থাকে না।

মহাজনী ব্যবসায়ে একজন মহাজন সাধারণত দেখে, যে ব্যক্তি ঋণ নিতে এসেছে, সে কত গরীব, ঋণ না পেলে তার দুঃখ ও দুর্দশা কি পরিমাণ বাড়বে? সাধারণত এসবের ভিত্তিতে সে তার সুদের হার পেশ করে। যদি সে কম গরীব হয়, কম টাকা চায় এবং তাকে বাহ্যত বেশী পেরেশান ও চিন্তাকুল না দেখায়। তাহলে তার সুদের হার হবে কম। বিপরীত পক্ষে সে যতই দুর্দশাগ্রস্ত ও বেশী

অভাবী হবে, ততই তার সুদের হার বাড়তে থাকবে। এমনকি, কোনো অর্ধাহারে অনাহারে দিন যাপনকারী ব্যক্তির পুত্র যদি কঠিন রোগাক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পর্যায়ে উপনীত হয়, তাহলে তার জন্য সুদের হার শতকরা চার-পাঁচশো তো পৌঁছে যাওয়া মোটেই অস্বাভাবিক বা বিস্ময়কর নয়। এ ধরনের অবস্থায় সুদের স্বাভাবিক হার প্রায়ই এ ধরনের হয়ে থাকে। এর একটি চরমতম দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে ১৯৪৭ সালে অমৃতসর ষ্টেশনের একটি ঘটনায়। ঐ বছর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভীতিপ্রদ দিনগুলোতে একদা অমৃতসর ষ্টেশনে জনৈক শিখ একজন মুসলমানের নিকট থেকে এক গ্লাস পানির স্বাভাবিক মূল্য হিসেবে ৩০০ টাকা আদায় করে। কারণ ঐ মুসলমানের পুত্র পিপাসায় মরে যাচ্ছিল এবং কোনো মুসলমান শরণার্থীর পক্ষে ট্রেন থেকে নীচে নেমে পানি আরহণ করা সম্ভবপর ছিল না।

মহাজনী ব্যবসায় ছাড়া অর্থনীতির অন্যান্য বাজারে সুদের হার নির্ধারণ ও তা কমবেশী করার ব্যাপারে যেসব ভিত্তির আশ্রয় নেয়া হয়, সেগুলো সম্পর্কে অর্থনীতি বিশেষজ্ঞগণ দু'টি ভিন্ন মতের অনুসারী।

একদল বলেন, চাহিদা ও সরবরাহের নীতিই হচ্ছে এর ভিত্তি। যখন অর্থ বিনিয়োগকারীর সংখ্যা কম হয় ও ঋণ দেয়ার মতো অর্থের পরিমাণ বেড়ে যায়, তখন সুদের হার নেমে যায়। এভাবে সুদের হার অনেক বেশী কমে গেলে লোকেরা একে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে এবং বেশী সংখ্যক লোক ঋণ নিতে এগিয়ে আসে। অতপর যখন অর্থের চাহিদা বাড়তে থাকে এবং ঋণ দেয়ার মতো অর্থের পরিমাণ কমে যেতে থাকে, তখন সুদের হার বাড়তে থাকে, অবশেষে তা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যার ফলে ঋণ গ্রহণের চাহিদা খতম হয়ে যায়।

এর অর্থ কি ? পুঁজিপতি সোজাসুজি ও যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতিতে ব্যবসায়ীর সাথে ব্যবসায়ে অংশীদার হয় না এবং তার যথার্থ মুনাফার ন্যায়সঙ্গত অংশগ্রহণেও তৎপর হয় না। বিপরীতপক্ষে সে এ ক্ষেত্রে আন্দাজ-অনুমান করে দেখে, এ ব্যবসায়ে ব্যবসায়ী কি পরিমাণ মুনাফা অর্জন করবে, সে প্রেক্ষিতে সে নিজের সুদ নির্ধারণ করে এবং মনে করে, এ নির্দিষ্ট পরিমাণ সুদ তার পাওয়া উচিত। অন্যদিকে ব্যবসায়ীও আন্দাজ-অনুমান করে দেখে যে, পুঁজিপতির নিকট থেকে সে যে অর্থ নিচ্ছে, তা থেকে সর্বাধিক কি পরিমাণ মুনাফা লাভ করা সম্ভব হবে, কাজেই সে প্রেক্ষিতে সে একটি বিশিষ্ট পরিমাণের অধিক সুদকে অসংগত মনে করে। উভয় পক্ষই আন্দাজ-অনুমানের (SPECULATION) ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়। পুঁজিপতি হামেশা ব্যবসায়ে মুনাফার অংক বেশী করেই

ধরে আর ব্যবসায়ী লাভের সাথে সাথে লোকসানের আশংকাও সামনে রাখে। এ কারণে উভয়ের মধ্যে একটি চিরস্থায়ী দ্বন্দ্ব বিরাজ করে। ব্যবসায়ী যখন মুনাফা লাভের আশায় পুঁজি বিনিয়োগ করতে চায় পুঁজিপতি তখন নিজের পুঁজির দাম বাড়াতে থাকে। এভাবে দাম বাড়াতে বাড়াতে অবশেষে তা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যখন এ ধরনের চড়া সুদে অর্থ ঋণ নিয়ে কোনো ব্যবসায় খাটালে তাতে কোনো প্রকারেই মুনাফার সম্ভাবনা থাকে না। এ পর্যায়ে পৌঁছে পুঁজি বিনিয়োগের পথ বন্ধ হয়ে যায় এবং অর্থনৈতিক উন্নতির গতিধারায় অকস্মাৎ ভাটা পড়ে। অতপর যখন সমগ্র ব্যবসায় জগত পরিপূর্ণ মন্দাভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে এবং পুঁজিপতি নিজের ধ্বংস প্রত্যক্ষ করতে থাকে, তখন সে সুদের হার এতদূর কমিয়ে দেয়, যার ফলে ঐ হারে অর্থ বিনিয়োগে ব্যবসায়ী লাভের আশা করে। এ সময় শিল্প-বাণিজ্যের বাজারে পুনর্বার অর্থ সমাগম হতে থাকে। এ থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে, পুঁজি ও ব্যবসায়ের মধ্যে যদি ন্যায়সঙ্গত শর্তে অংশীদারিত্বমূলক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত হতো, তাহলে দুনিয়ার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা একটি সুসামঞ্জস্য পদ্ধতিতে পরিচালিত হতো। কিন্তু আইন যখন পুঁজিপতির জন্য সুদের ভিত্তিতে ঋণদান করার পথ প্রশস্ত করলো, তখন পুঁজি ও ব্যবসায়ের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে জুয়াড়ি মনোবৃত্তির অনুপ্রবেশ ঘটলো এবং এমন জুয়াড়ি পদ্ধতিতে সুদের হার উঠানামা করতে থাকলো, যার ফলে সারা দুনিয়ার অর্থনৈতিক জীবনে একটা চিরস্থায়ী অচলাবস্থার সৃষ্টি হলো।

দ্বিতীয় দলটি নিম্নোক্তভাবে সুদের হারের যৌক্তিকতা প্রদর্শন করে। তাদের বক্তব্য হলো ঃ পুঁজিপতি যখন পুঁজি নিজের কাজে লাগানো অধিক পছন্দ করে, তখন সুদের হার বাড়িয়ে দেয়, আবার যখন তার এ ইচ্ছায় ভাটা পড়ে, তখন সুদের হারও কমে যায়। তবে পুঁজিপতি নগদ অর্থ তার নিজের কাছে রাখাকে অগ্রাধিকার দেয় কেন ? এর জবাবে তারা বিভিন্ন কারণ দর্শায়। নিজের ব্যক্তিগত বা ব্যবসায়িক প্রয়োজনের খাতে কিছু অর্থ রাখার প্রয়োজন হয়। আবার আকস্মিক প্রয়োজন ও অপ্রত্যাশিত অবস্থার মোকাবিলা করার জন্যও কিছু অর্থ সংরক্ষিত রাখতে হয়। যেমন ব্যক্তিগত ব্যাপারে কোনো অস্বাভাবিক খরচ অথবা হঠাৎ সুবিধাজনক সওদার সুযোগ সৃষ্টি হওয়া। এ দু'টি কারণ ছাড়া তৃতীয় একটি এবং অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে এই যে, ভবিষ্যতে কোনোদিন যখন দাম হবার জন্য পুঁজিপতি তার নিকট যথেষ্ট পরিমাণ নগদ টাকা সঞ্চিত রাখতে চায়। প্রশ্ন হচ্ছে, এসব কারণে অর্থকে নিজের ব্যবহার উপযোগী রাখার জন্য পুঁজিপতির মনে যে আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক হয়, তা কি বাড়ে-কমে ? সুদের হার উঠানামা করার সময় কি তার প্রভাব সুস্পষ্ট হয় ?

এর জবাবে তারা বলে ঃ অবশ্যি বিভিন্ন ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে কখনো এ আকাঙ্ক্ষা বেড়ে যায়, ফলে পুঁজিপতি সুদের হার বাড়িয়ে দেয় এবং ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগের পরিমাণ কমে যেতে থাকে। আবার কখনো এ আকাঙ্ক্ষা কমে যায়, তখন পুঁজিপতি সুদের হার কমিয়ে দেয়, ফলে শিল্প-বাণিজ্যে পুঁজি বিনিয়োগ করার উদ্দেশ্যে লোকেরা বেশী করে ঋণ নিতে থাকে।

এ মনোহর যুক্তি ও ব্যাখ্যাটির অন্তরালে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যাবে, ঘরোয়া প্রয়োজন বা ব্যক্তিগত ব্যবসায়িক প্রয়োজন স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক সব ধরনের অবস্থায় পুঁজিপতি নিজের জন্য যে পরিমাণ পুঁজিকে ব্যবহার উপযোগী রাখতে চায় তার পরিমাণ হতে পারে বড়জোর শতকরা পাঁচ ভাগ। কাজেই প্রথম কারণ দু'টিকে অযথা গুরুত্ব দেয়ার কোনো অর্থ হয় না। পুঁজিপতি যে কারণে নিজের শতকরা ৯৫ ভাগ পুঁজিকে কখনো সিন্দুকে ভরে রাখে আবার কখনো ঋণ দেয়ার জন্য বাজারে ছাড়ে, তা অবশ্যি তৃতীয় একটি কারণ। এ কারণটি বিশ্লেষণ করলে যে সত্য উপলব্ধি হয়, তা হচ্ছে, পুঁজিপতি নিজের দেশ ও জাতির অবস্থাকে অত্যন্ত স্বার্থপরতার দৃষ্টিতে অবলোকন করতে থাকে। এ সময় নিজের স্বার্থ চরিতার্থতার কিছু লক্ষণ তার সম্মুখে পরিস্ফুট হয়ে উঠলে তার ভিত্তিতে সে এমন সব অস্ত্র নিজের কাছে সর্বদা প্রস্তুত রাখতে চায়, যেগুলোর সাহায্যে সমাজের বিভিন্ন সংকট, সমস্যা ও বিপদ-আপদকে ব্যবহার করে সেগুলো থেকে অবৈধ সুবিধা ভোগ করা যায় এবং সমাজের উদ্বেগ-আকুলতা বৃদ্ধি করে নিজের সমৃদ্ধি ও সচ্ছলতা বাড়ানো সম্ভব হয়। এজন্য জীবন-জুয়ায় একটা বড় রকমের দাঁও মারার উদ্দেশ্যে সে পুঁজি নিজের জন্য আটক রাখে, সুদের হার বাড়িয়ে দেয়, শিল্প ও ব্যবসা ক্ষেত্রে অর্থের প্রবাহ হঠাৎ বন্ধ করে দেয় এবং সমাজের জন্য ডেকে আনে এক মহাবিপদ যাকে মন্দা (DEPRESSION) বলা হয়ে থাকে। অতপর যখন সে দেখে, এ পথে তার পক্ষে হারাম উপায়ে যে পরিমাণ অর্থ উপার্জন করা সম্ভব তা সে করে ফেলেছে এবং এভাবে অর্থ উপার্জন করা তার পক্ষে আর কোনোক্রমেই সম্ভব নয় বরং এখন তার ক্ষতির পালা শুরু হয়ে যাবে, তখন তার নীচ মনের অভ্যন্তরে 'অর্থকে নিজের জন্য ব্যবহার উপযোগী রাখার ইচ্ছা' নিস্তেজ হয়ে পড়ে এবং কম সুদের লোভ দেখিয়ে সে ব্যবসায়ীদেরকে তার নিকট রক্ষিত অর্থ সম্পদ কাজে লাগাবার জন্য ব্যাপকভাবে আহ্বান জানায়।

আধুনিক অর্থনীতি বিশেষজ্ঞগণ সুদের হারের এ দু'টি কারণই দর্শিয়ে থাকেন। অবশ্য স্ব স্ব পরিমণ্ডলে এ দু'টি কারণই যথার্থ। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এর মধ্যে যে কারণটিই যথার্থ হোক না কেন, তা থেকে সুদের ন্যায়সঙ্গত ও

স্বাভাবিক হার নির্ধারিত হয় বা হতে পারে কেমন করে ? এক্ষেত্রে হয় আমাদেরকে বুদ্ধি, জ্ঞান, ন্যায়ানুগতা ও স্বাভাবিকতার অর্থ ও ধারণা বদলাতে হবে, নতুবা একথা মেনে নিতে হবে যে, সুদ জিনিসটি নিজেই যে ধরনের অন্যায়, তার হারও তার চেয়ে বেশী অন্যায় ও অসংগত কারণের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় ও ওঠা-নামা করে।

সুদের অর্থনৈতিক লাভ ও তার প্রয়োজন

সুদ সমর্থকগণ সুদকে একটি অর্থনৈতিক প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেছেন এবং ধারণা পোষণ করেছেন যে, এর সাহায্য ব্যতিরেকে আমরা অনেক কিছু অর্থনৈতিক লাভ থেকে বঞ্চিত থেকে যাই। এ দাবীর সমর্থনে যেসব যুক্তি পেশ করা হয়, সেগুলোর সারাংশ নীচে প্রদত্ত হলো।

এক ঃ অর্থনীতির সমস্ত কাজ-কারবার পুঁজি সংগ্রহের উপর নির্ভরশীল। আর নিজেদের প্রয়োজনের ও আশা-আকাঙ্ক্ষার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে এবং আয়ের সমগ্র অংশকে নিজেদের জন্য ব্যয় না করে কিছু অংশ সঞ্চয় করা ছাড়া এ পুঁজি সংগ্রহ সম্ভবপর নয়। পুঁজি সংগ্রহের এ ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনো উপায় নেই। কিন্তু কোনো ব্যক্তি যদি তার ইচ্ছা-বাসনা ত্যাগ করার ও আত্মসংযমের কোনো প্রতিদান না পায়, তাহলে সে নিজের প্রয়োজন অপূর্ণ রাখতে ও সম্পদের স্বল্প ব্যবহার করতে উদ্যোগী হবে কেন ? এ সুদই তার সেই প্রতিদান। এরি আশায় বুক বেঁধে মানুষ অর্থ বাঁচাতে ও সঞ্চয় করতে প্রবৃত্ত হয়। কাজেই এ সুদকে হারাম গণ্য করা হলে আসলে উদ্বৃত্ত অর্থ সংরক্ষণের পথই রুদ্ধ হয়ে যাবে। অথচ এটিই হচ্ছে পুঁজি সংগ্রহ ও সরবরাহের আসল মাধ্যম।

দুই ঃ সকল মানুষের জন্য নিজের সঞ্চিত সম্পদ সুদের ভিত্তিতে ব্যবসায়ে খাটাবার পথ উন্মুক্ত থাকাই হচ্ছে অর্থনৈতিক কায়-কারবারের দিকে পুঁজি প্রবাহিত হওয়ার সহজতর উপায়। এভাবে সুদের লোভেই তারা অর্থ সঞ্চয় করতে থাকে, আবার সুদের লালসাই তাদেরকে নিজেদের সঞ্চিত অর্থ অযথা জমা না রেখে উৎপাদনশীল করার জন্য ব্যবসায়ীর হাতে সোপর্দ করে একটি নির্ধারিত হার অনুযায়ী সুদ আদায় করতে উদ্বুদ্ধ করে। এ দুয়ারটি বন্ধ করার অর্থ হবে কেবল মাত্র পুঁজি সঞ্চয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রেরণা শক্তিরই বিলুপ্তি নয় বরং সামান্য যাকিছু সংগ্রহীত হবে তাও ব্যবসায়ে খাটানো যাবে না।

তিন ঃ সুদ কেবল পুঁজি সংগ্রহ করে তাকে ব্যবসায়ের দিকে টেনে আনে না বরং তার অলাভজনক ও অনুপকারী ব্যবহারেরও পথরোধ করে। আর সুদের

হার এমন একটি বস্তু যা সর্বোত্তম পদ্ধতিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিভিন্ন প্রস্তাবিত ব্যবসায়ের মধ্য থেকে সবচেয়ে লাভজনক ও মুনাফাদায়ক ব্যবসায়ে পুঁজি বিনিয়োগের ব্যবস্থা করে। এছাড়া দ্বিতীয় এমন কোনো ব্যবস্থার সন্ধান পাওয়া যায়নি যা বিভিন্ন কার্যকর পরিকল্পনার মধ্য থেকে লাভজনককে অলাভজনক থেকে এবং অধিক লাভজনককে কম লাভজনক থেকে আলাদা করে অধিক লাভজনকের দিকে পুঁজিকে পরিচালিত করতে পারে। কাজেই সুদের বিলোপ সাধনের ফলে প্রথমত লোকদের অত্যন্ত বেপরোয়াভাবে পুঁজি ব্যবহার করতে দেখা যাবে, অতপর লাভ-ক্ষতির বাছ-বিচার না করে লাভজনক-অলাভজনক সব রকম কাজে তারা পুঁজি বিনিয়োগ করতে থাকবে।

চার ঃ ঋণ মানুষের জীবনের অপরিহার্য প্রয়োজনের অংগীভূত। ব্যক্তির নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারে এর প্রয়োজন দেখা দেয়, ব্যবসায়ী প্রায়ই এর মুখাপেক্ষী থাকে এবং সরকারী কাজ-কর্মও এর সাহায্য ছাড়া চলতে পারে না। নিছক দান-খয়রাত হিসেবে এত ব্যাপকভাবে ও বিপুলাকারে ঋণ সরবরাহ করা কেমন করে সম্ভব ? যদি পুঁজিপতিদেরকে সুদের লোভ দেখানো না হয় এবং মূলধনের সাথে সাথে সুদটাও তারা নিয়মিতভাবে পেতে থাকবে, এ নিশ্চয়তা তাদেরকে দান না করা হয় তাহলে তারা খুব কমই ঋণ দিতে উদ্বুদ্ধ হবে। এভাবে ঋণ দেয়া বন্ধ হয়ে গেলে সমগ্র অর্থনৈতিক জীবনের উপর এর ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে। এক দরিদ্র ব্যক্তি নিজের দুঃসময়ে মহাজনের নিকট থেকে ঋণ লাভ করে। এক্ষেত্রে সুদের লোভ না থাকলে তার আত্মীয়ের লাশ বিনা কাফন-দাফনে পড়ে থাকবে এবং কেউ তার দিকে সাহায্যের হাত প্রসারিত করবে না। এক ব্যবসায়ী নিজের দৈন্য ও সংকটকালে প্রয়োজনের সাথে সাথেই সুদে ঋণ লাভ করে এবং এভাবে তার কাজ চলতে থাকে। এ দুয়ারটি বন্ধ হয়ে গেলে কতবার যে সে দেউলিয়া হবে তা কল্পনাই করা যায় না। রাষ্ট্রের ব্যাপারেও একই কথা বলা যায়। সুদী ঋণের সাহায্যেই রাষ্ট্রের প্রয়োজন পূর্ণ হয়। অন্যথায় প্রতিদিন তাকে কোটি কোটি টাকা ঋণ দান করবে এমন দাতা হাতেম কোথায় পাওয়া যাবে ?

সুদ কি যথার্থই প্রয়োজনীয় ও উপকারী ?

এবার আমরা উপরোল্লিখিত লাভ ও প্রয়োজনগুলো বিশ্লেষণ করে দেখবো, এগুলো যথার্থই লাভ ও প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত কিনা অথবা নিছক শয়তানী প্রতারণা।

এ ব্যাপারে প্রথম ভুল ধারণা হচ্ছে, অর্থনৈতিক জীবনের জন্য ব্যক্তির স্বল্প ব্যয় ও অর্থ সঞ্চয়কে একটি প্রয়োজনীয় ও লাভজনক বিষয় মনে করা হয়েছে।

অথচ আসল ব্যাপার এর সম্পূর্ণ উল্টো। প্রকৃতপক্ষে অর্থনৈতিক উন্নতি ও সমৃদ্ধির মূল অন্যত্র প্রোথিত রয়েছে। মানুষের একটি দল সমষ্টিগতভাবে জীবনযাপনের যেসব উপকরণ তৈরী করতে থাকবে তা অতি দ্রুত বিক্রি হতে থাকবে, এর ফলে পণ্য উৎপাদন ও বাজারের চাহিদা পূরণের কাজ চক্রাকারে ভারসাম্য বজায় রেখে দ্রুততার সাথে চলতে থাকবে। এভাবেই অর্থনৈতিক উন্নতি ও সমৃদ্ধি আসতে পারে। এ অবস্থা কেবল তখনই সৃষ্টি হতে পারে যখন লোকেরা সাধারণভাবে অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা ও কর্মরত অবস্থায় যে পরিমাণ ধন-সম্পদ তাদের অংশে আসে তা ব্যয় করতে অভ্যস্ত হয় এবং এতটা প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী হয়, যার ফলে তাদের নিকট প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ জমা হয়ে গেলে দলের অপেক্ষাকৃত কম ভাগ্যবান লোকদের নিকট তা স্থানান্তর করে, ফলে তারাও অনায়াসে প্রচুর পরিমাণে নিজেদের জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনতে পারে। কিন্তু এর বিপরীত পক্ষে এখানে যা শিখানো হচ্ছে তা হচ্ছে এই যে, যার নিকট প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ পৌঁছে গেছে তাকে কৃপণতা অবলম্বন করতে হবে (যাকে আত্মসংযম ও ইচ্ছা-বাসনার কুরবানী প্রভৃতি শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে) নিজের সংগত প্রয়োজনের একটা বড় অংশ পূর্ণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে এবং এভাবে প্রত্যেক ব্যক্তিকে বেশী বেশী করে অর্থ সঞ্চয় করার চেষ্টা করতে হবে। এর ফলে পুঁজি একত্রিত হয়ে শিল্প ও ব্যবসায়ের উন্নতি বিধানে নিয়োজিত হবে। কিন্তু আসলে এর ফলে একটি বড় রকমের ক্ষতি হবে। তাহচ্ছে এই যে, বর্তমানে বাজারে যে পণ্য মওজুদ রয়েছে তার একটি বড় অংশ অবিক্রিত থেকে যাবে। কারণ যাদের মধ্যে পূর্ব থেকেই ক্রয় ক্ষমতা কম ছিল তারা অক্ষমতার কারণে অনেক পণ্য কিনতে পারেনি আর যারা প্রয়োজন পরিমাণ পণ্য কিনতে পারতো তারা সক্ষমতা সত্ত্বেও উৎপাদিত পণ্যের একটা বড় অংশ ক্রয় করেনি। আবার যাদের নিকট প্রয়োজনের চাইতে বেশী ক্রয় ক্ষমতা পৌঁছে গিয়েছিল তারা তা অন্যের নিকট স্থানান্তর করার পরিবর্তে নিজের নিকট আটক রেখেছিল। এখন যদি প্রতিটি অর্থনৈতিক আবর্তনের ক্ষেত্রে এ ধারা অব্যাহত থাকে এবং প্রয়োজন পরিমাণ ও প্রয়োজনের অধিক পরিমাণ ক্রয় ক্ষমতার অধিকারীরা নিজেদের এ ক্ষমতার বৃহত্তর অংশ উৎপাদিত পণ্য ক্রয়-ব্যবহার না করে এবং কম ক্রয় ক্ষমতার অধিকারীদেরকেও না দেয় বরং একে আটক করে সঞ্চয় করতে থাকে তাহলে এর ফলে প্রতিটি আবর্তনে দলের অর্থনৈতিক উৎপাদনের বিরাট অংশ অবিক্রিত থেকে যেতে থাকবে। পণ্যের চাহিদা কম হবার কারণে উপার্জনও কমে যাবে। উপার্জন কম হলে আমদানীও কমে যাবে। আর আমদানী কম হয়ে গেলে ব্যবসায় পণ্যের চাহিদা আরো বেশী কমে যেতে থাকবে। এভাবে

কয়েক ব্যক্তির অর্থ সঞ্চয় প্রবণতা বহু ব্যক্তির অর্থনৈতিক দূরবস্থার কারণে পরিণত হবে। অবশেষে এ অবস্থা ঐ অর্থ সঞ্চয়কারীদের জন্যও ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াবে। কারণ যে অর্থের সাহায্যে উৎপন্নজাত দ্রব্যাদি কেনার পরিবর্তে সে তাকে যক্ষেরধনের মতো আগলিয়ে রেখেছে এবং তিলে তিলে বাড়িয়ে চলছে পণ্যদ্রব্য তৈরী করার জন্য, অবশেষে ঐ পণ্যদ্রব্য তৈরী হলে তা কিনবে কে ?

এ বিষয়টি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করলে বুঝা যাবে, যে সমস্ত কারণে ব্যক্তি নিজের উপার্জিত অর্থ ব্যয় না করে সঞ্চয় করে রাখতে উদ্যোগী হয় সে কারণগুলো দূর করাই হচ্ছে আসল অর্থনৈতিক প্রয়োজন। সমগ্র সমাজের অর্থনৈতিক কল্যাণার্থে একদিকে এমন ব্যবস্থা করা প্রয়োজন যার ফলে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের দুঃসময়ে আর্থিক সাহায্য লাভ করতে পারে ; এভাবে লোকেরা নিজেদের উপার্জিত অর্থ জমা করার প্রয়োজন অনুভব করবে না, অন্যদিকে সঞ্চিত অর্থের উপর যাকাত আরোপ করতে হবে, এর ফলে মানুষের মধ্যে অর্থ জমা করার প্রবণতা কমে যাবে। এরপরও যে অর্থ-সম্পদ সঞ্চিত হতে থাকবে তা থেকে অবশ্যি অর্থের আবর্তনে যারা কম অংশ পেয়েছে তাদেরকে একটি অংশ দিতে হবে। কিন্তু এর বিপরীত পক্ষে এখানে সুদের লোভ দেখিয়ে মানুষের প্রকৃতিগত কার্পণ্যকে উস্কানী দেয়া হচ্ছে এবং যারা কৃপণ নয় তাদেরকেও অর্থ ব্যয় করার পরিবর্তে সঞ্চয়ের শিক্ষা দেয়া হচ্ছে।

অতপর এ ভুল পদ্ধতিতে সামষ্টিক স্বার্থের বিরুদ্ধে যে পুঁজি একত্রিত হয় তাকে অর্থ উৎপাদনকারী ব্যবসায়ের দিকে আনা হলেও সুদের ভিত্তিতে আনা হয়। সামষ্টিক স্বার্থের উপর এটি দ্বিতীয় দফা অত্যাচার। এ সঞ্চিত অর্থ যদি এমন এক শর্তে ব্যবসায়ে খাটানো হতো যেখানে অর্জিত মুনাফার হার অনুযায়ী পুঁজিপতিও তার অংশ লাভ করতো তাহলেও কোনো প্রশ্ন ছিল না। কিন্তু এ সঞ্চিত অর্থ এমন এক শর্তে বাজারে ছাড়া হচ্ছে যার ফলে ব্যবসায়ে লাভ হোক বা না হোক এবং কম মুনাফা হোক বা বেশী মুনাফা—তাতে পুঁজিপতির কিছু আসে যায় না, সে তার নির্ধারিত হার অনুযায়ী মুনাফা অবশ্যি পেতে থাকবে। এভাবে সামষ্টিক অর্থব্যবস্থাকে দুদিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে। একদিকে টাকা উপার্জন করে তা ব্যয় না করার ও জমা করে রাখার ক্ষতি এবং অন্যদিকে যে টাকা জমা করে রাখা হয়েছিল তা সামষ্টিক অর্থব্যবস্থার সাথে যুক্ত হলেও অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবসায় শামিল না হয়ে ঋণ আকারে সমগ্র সমাজের শিল্প ও ব্যবসায়ের ঘাড়ে চেপে বসেছে এবং প্রচলিত আইন তাকে নিশ্চিত মুনাফার জামানত দান করেছে। এ ভ্রান্ত ব্যবস্থাপনা এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে যার ফলে সমাজের বিপুলসংখ্যক লোক তাদের ক্রয়ক্ষমতা

সামগ্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যাদি ক্রয়ের কাজে ব্যবহার করার পরিবর্তে তা সঞ্চিত করে ক্রমান্বয়ে সুদ ভিত্তিক ঋণের আকারে সমাজের মাথায় চাপিয়ে দিয়ে চলছে। এ পরিস্থিতি সমাজকে মহাসংকটের সম্মুখীন করেছে। প্রতি মুহূর্তে তার সুদ ও ঋণের বোঝা বেড়ে যাচ্ছে। যে ক্ষেত্রে বাজারে তার উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা কম, ক্রেতার সংখ্যা কম, লাখো লাখো কোটি কোটি লোক নিজেদের অক্ষমতা ও অর্থ না থাকার দরুন তা কিনতে পারছে না আবার হাজার হাজার লোক নিজেদের ক্রয়ক্ষমতাকে বেশী সুদে ঋণ দেয়ার জন্য সঞ্চিত রেখে তা কেনার ব্যাপারে হাত গুটিয়ে নিচ্ছে, সে ক্ষেত্রে এ বর্ধিত ঋণ ও সুদ সে কিভাবে আদায় করবে?

সুদের উপকারিতা ও লাভজনক দিক সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে, এর চাপে ব্যবসায়ী পুঁজির যত্রতত্র অযথা ও অলাভজনক ব্যবহার না করে অধিকতর লাভজনক কাজে তা ব্যবহার করে। বলা হয়ে থাকে, সুদের হার তার অলৌকিক ক্ষমতার সাহায্যে নীরবে ব্যবসায়ের পথ নির্দেশ করার মহাদায়িত্ব পালন করে এবং এরি বদৌলতেই পুঁজি তার চলার সম্ভাব্য সকল পথের মধ্য থেকে ছাঁটাই-বাছাই করে সবচেয়ে লাভজনক ব্যবসায়ে নিজেকে নিয়োজিত করে। কিন্তু এ সুন্দর কথার পর্দা সরিয়ে ভিতরে উঁকি দিলে এর আসল উদ্দেশ্য ধরা পড়ে যাবে। প্রকৃতপক্ষে সুদের প্রথম কৃতিত্ব হচ্ছে এই যে, তার বদৌলতে উপকার ও লাভ এর সমস্ত ব্যাখ্যাই পরিত্যক্ত হয়েছে এবং ঐ শব্দগুলোর কেবল একটিমাত্র অর্থই রয়ে গেছে, তা হচ্ছে 'অর্থনৈতিক উপকার' ও 'বস্তুগত লাভ'। এভাবে পুঁজি বিরাট একাগ্রতা লাভে সক্ষম হয়েছে। প্রথমে অর্থনৈতিক লাভ ছাড়া অন্য ধরনের লাভের পথেও পুঁজির আনাগোনা হতো। কিন্তু এখন তার লক্ষ্য একটিমাত্র পথের দিকে। অর্থাৎ যে পথে অর্থনৈতিক লাভ ও সুবিধা নিশ্চিত একমাত্র সে পথেই তার গতি নিয়ন্ত্রিত। অতপর তার দ্বিতীয় কৃতিত্ব হচ্ছে এই যে, সমাজের লাভ বা স্বার্থোদ্ধার নয় বরং কেবলমাত্র পুঁজিপতির লাভ ও সীমিত স্বার্থোদ্ধারকেই সে পুঁজির লাভজনক ব্যবহারের মানদণ্ডে পরিণত করেছে। পুঁজির হার স্থির করে দেয় যে, পুঁজি এমন একটি কাজে ব্যবহৃত হবে যা পুঁজিপতিকে বার্ষিক শতকরা ৬ বা এর চেয়ে বেশী হারে মুনাফা দিতে সক্ষম। এর চেয়ে কম মুনাফাদানকারী কোনো কাজে পুঁজি খাটানোর কোনো যৌক্তিকতাই নেই। এখন মনে করুন, পুঁজির সামনে দুটো পরিকল্পনা পেশ করা হলো। একটা পরিকল্পনা হলো এমন কতকগুলো আবাসিক গৃহ নির্মাণের, যেগুলো আরামদায়ক হবার সাথে সাথে গরীব লোকেরা কম ভাড়ায় নিতে পারবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাটি হলো একটি বিরাট জাঁকালো প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণের। প্রথম পরিকল্পনাটি শতকরা ৬ ভাগের কম মুনাফাদানের আশা দেয় আর

দ্বিতীয়টি দেয় এর চেয়ে বেশী। অন্য কোনো অবস্থায় অজ্ঞতাবশত প্রথম পরিকল্পনাটির দিকে পুঁজির প্রবাহিত হবার সম্ভাবনা ছিল বা অন্ততঃপক্ষে এ দুটোর মধ্যে কোন্‌টার দিকে সে ঝুঁকবে তা নিয়ে তাকে যথেষ্ট সংশয় দোলায় দুলতে হতো। কিন্তু সুদের হারের এমনি মাহাত্ম যে তার নির্দেশে পুঁজি কোনো প্রকার দ্বিধা না করে সুড়সুড় করে দ্বিতীয় পরিকল্পনাটির দিকে অগ্রসর হয় এবং প্রথম পরিকল্পনাটিকে নির্দয়ভাবে পিছনে নিক্ষেপ করে। তার দিকে একবার ফিরেও তাকায় না। উপরন্তু সুদের হার ব্যবসায়ীকে এমনভাবে বাধ্য করে যার ফলে সে নিজের মুনাফাকে সবসময় পুঁজিপতি নির্ধারিত মুনাফার সীমারেখা থেকে উচ্চে রাখার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। এজন্য সে যে কোনো নৈতিকতা বিরোধী পদ্ধতি অবলম্বন করতে কুণ্ঠিত হয় না। যেমন, মনে করুন এক ব্যক্তি একটি চলচ্চিত্র কোম্পানী গঠন করলো। এ কোম্পানীতে সে যে পরিমাণ পুঁজি বিনিয়োগ করেছে তার সুদের হার হচ্ছে বছরে শতকরা ৬ ভাগ। এ ক্ষেত্রে তাকে অবশ্যি এমন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে যার ফলে তার লাভের হার ঐ শতকরা ৬ ভাগের চেয়ে বেশী হয়। নৈতিক পবিত্রতার অধিকারী ও তত্ত্ব-জ্ঞান সমৃদ্ধ কোনো চিত্র নির্মাণে যদি তার এ উদ্দেশ্য সফল না হয় তাহলে অবশ্যি সে উলংগ ও অশ্লীল চিত্র নির্মাণে উদ্যোগী হবে এবং এমনভাবে এর বিজ্ঞাপন ছড়াতে ও প্রপাগাণ্ডা করতে থাকবে যার ফলে মানুষ আবেগে ফেটে পড়বে এবং যৌন উত্তেজনার প্রবল স্রোতে প্রবাহিত হয়ে হাজার হাজার লাখো লাখো মানুষ প্রেক্ষাগৃহের দিকে ছুটবে।

সুদের সাহায্য ছাড়া যেসব লাভ ও উপকার সাধিত হওয়ার কোনো উপায় নেই সেগুলোর আসল চেহারা উপরে বিবৃত হলো। এখন সুদের সাহায্য ছাড়া যেসব প্রয়োজন পূর্ণ হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই সেগুলোর কিছু বিশ্লেষণ আমরা করতে চাই। নিসন্দেহে ঋণ মানুষের জীবনের অপরিহার্য প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত। মানুষের নিজের ব্যক্তিগত অভাব পূরণে ঋণের প্রয়োজন হয় আবার শিল্প, ব্যবসায়, কৃষি প্রভৃতি অর্থনৈতিক কাজ-কারবারেও সবসময় এর প্রয়োজন দেখা দেয় এবং রাষ্ট্রসহ সমস্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠান এর মুখাপেক্ষী থাকে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও একথা ঠিক নয় যে, সুদ ছাড়া ঋণ সংগ্রহ করা কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। আসলে সুদকে আইনসংগত গণ্য করার কারণে ব্যক্তি থেকে নিম্নে রাষ্ট্র পর্যন্ত সকল পর্যায়ে সুদ ছাড়া এক পয়সাও ঋণ লাভ করা কারোর পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। সুদকে হারাম গণ্য করে অর্থনীতির সাথে সাথে ইসলাম নির্দেশিত নৈতিক ব্যবস্থাকে কার্যকর করলে আজই দেখা যাবে ব্যক্তিগত অভাব, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সামাজিক প্রয়োজনের সকল ক্ষেত্রে সুদ বিহীন ঋণ পাওয়া যাচ্ছে বরং অনেক ক্ষেত্রে দানও পাওয়া যাবে। ইসলাম কার্যত এর প্রমাণ পেশ

করেছে। শত শত বছর ধরে মুসলমান সমাজ সুদ ছাড়াই উত্তম পদ্ধতিতে নিজেদের সমস্ত অর্থনৈতিক কাজ-কারবার চালিয়ে এসেছে। সুদ ব্যবস্থা লাঞ্ছিত আজকের এ ঘৃণিত যুগের পূর্বে মুসলমান সমাজ কোনোদিন কল্পনাই করতে পারতো না যে, সুদ বিহীন ঋণ লাভ করা কোনোক্রমেই সম্ভব না হওয়ার কারণে কোনো মুসলমানের লাশ কাফন-দাফন করা সম্ভব হয়নি বা ব্যবসায়িক প্রয়োজন অনুযায়ী কর্জে হাসানা না পাওয়ার কারণে মুসলমানদের শিল্প-বাণিজ্য-কৃষি দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছে অথবা মুসলমানরা তাদের সরকারকে সুদ বিহীন ঋণ দিতে রাজী না হওয়ায় কোনো মুসলিম সরকার কল্যাণমূলক কাজে বা জিহাদে অর্থ ব্যয় করতে সক্ষম হয়নি। কাজেই কর্জে হাসানার পরিকল্পনা কার্যকর করার যোগ্য নয় এবং ঋণের সমগ্র প্রাসাদটিই সুদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে, এ দাবী কোনো প্রকার যুক্তি ভিত্তিক প্রতিবাদের মুখাপেক্ষী নয়। আমরা নিজেদের শত শত বছরের কার্যধারার মাধ্যমে একে ভ্রান্ত প্রমাণ করে এসেছি।

আধুনিক যুগের অর্থনৈতিক প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে কার্যত সুদ বিহীন ঋণ লাভের জন্য কি পদ্ধতি অবলম্বিত হবে তা আমাদের এ অধ্যায়ের আলোচনা বহির্ভূত বিষয়। পরবর্তী এক অধ্যায়ে আমরা এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

২-ইতিবাচক দিক

আগের অধ্যায়ে আমরা যে আলোচনা করেছি তা থেকে প্রমাণ হয়েছে যে, সুদ যুক্তি ও ন্যায়সংগত নয় এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এর আদৌ কোনো প্রয়োজন নেই উপরন্তু এর মধ্যে যথার্থ লাভ ও উপকারের কোনো অংশও নেই। কিন্তু শুধুমাত্র এ নেতিবাচক কারণগুলোর ভিত্তিতে সুদ হারাম ঘোষিত হয়নি। বরং সুদ হারাম হবার আসল কারণ হচ্ছে এই যে, এটি চূড়ান্তভাবে ক্ষতিকর এবং অনেক দিক দিয়ে অনেক বেশী ক্ষতিকর।

এ অধ্যায়ে আমরা এর প্রতিটি ক্ষতিকর দিকের বিস্তারিত পর্যালোচনা করবো। আমাদের এ আলোচনার পর ইনশাআল্লাহ কোনো বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য এ নাপাক বস্তুটির হারাম হওয়া সম্পর্কে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকবে না।

সুদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষতি

প্রথমে নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার দৃষ্টিতে বিচার করা যাক। কারণ নৈতিকতা ও আত্মিক অনুভূতিই মানবতার মূল প্রাণশক্তি। মানবতার এ প্রাণশক্তির পক্ষে ক্ষতিকর যে কোনো বস্তুই অন্যদিক দিয়ে যতই লাভজনক হোক না কেন অবশ্যি পরিত্যাজ্য। এখন সুদের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, অর্থ সঞ্চয়ের আকাঙ্ক্ষা থেকে শুরু করে সুদী ব্যবসায়ের বিভিন্ন পর্যায় পর্যন্ত সমগ্র মানসিক কর্মকাণ্ড স্বার্থান্ধতা, কার্পণ্য, সংকীর্ণমনতা, মানসিক কাঠিন্য ও অর্থ পূজার পারদর্শিতার প্রভাবাধীনে পরিচালিত হয় এবং ব্যবসায়ে মানুষ যত এগিয়ে যেতে থাকে এ পারদর্শিতা ততই তার মধ্যে বিকাশ লাভ করতে থাকে। বিপরীতপক্ষে যাকাত ও সাদকার সংকল্প করা থেকে শুরু করে একে কার্যকর করা পর্যন্ত সমগ্র মানসিক কর্মকাণ্ড দানশীলতা, ত্যাগ, সহানুভূতি, ঔদার্য, উন্নতি মনন ও সদিচ্ছপুষ্ট গুণাবলীর প্রভাবাধীনে অনুষ্ঠিত হয় এবং এ পদ্ধতিতে অনবরত কাজ করতে থাকলে এ গুণগুলো মানুষের মধ্যে বিকাশ লাভ করতে থাকে। দুনিয়ায় কি এমন কোনো মানুষের সন্ধান পাওয়া যাবে যে ঐ দু' ধরনের নৈতিক গুণাবলীর মধ্যে প্রথমগুলোকে খারাপ ও শেষের গুলোকে ভালো বলে স্বীকার করবে না ?

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষতি

এবার সাংস্কৃতিক দিক থেকে বিচার করা যাক। সামান্য চিন্তা-ভাবনা করলে প্রত্যেক ব্যক্তি সহজেই বুঝতে পারবে যে, যে সমাজের লোকেরা

পারস্পরিক স্বার্থ সিদ্ধির ভিত্তিতে পরস্পরের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে, নিজের ব্যক্তি স্বার্থ উদ্ধার ও ব্যক্তিগত লাভ ছাড়া কেউ অপরের কোনো কাজে আসে না, একজনের অভাব অন্যজনের মুনাফা অর্জনের সুযোগ করে দেয় এবং বিত্তশালী শ্রেণীর স্বার্থ বিত্তহীন শ্রেণীর স্বার্থের প্রতিকূল হয়, সে সমাজ কোনোদিন সুদৃঢ় ও শক্তিশালী হতে পারে না। তার অংশগুলো হামেশা বিশৃংখলা ও বিক্ষিপ্ততার শিকার হতে থাকবে। এ পরিস্থিতির সাথে অন্যান্য কারণ এসে যুক্ত হলে এ ধরনের সমাজের বিভিন্ন অংশের পরস্পর সংঘর্ষশীল হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। বিপরীত পক্ষে যে সমাজের সামগ্রিক ব্যবস্থা পারস্পরিক সহানুভূতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, যার ব্যক্তিবর্গ পরস্পরের সাথে দানশীলতা ও ঔদার্যপূর্ণ ব্যবহার করে, যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি অন্যের অভাব ও প্রয়োজনের সময় প্রশস্ত হৃদয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় এবং বিত্তবানরা বিত্তহীনদের সাথে সহানুভূতিপূর্ণ সহযোগিতা বা কমপক্ষে ন্যায়ানুগ সাহায্যের পথ অবলম্বন করে, সেখানে পরস্পরের মধ্যে প্রেম-প্রীতি ভালোবাসা, কল্যাণাকাঙ্ক্ষা ও অন্তরঙ্গতা বিকাশ লাভ করবে। এ ধরনের সমাজের বিভিন্ন অংশ পরস্পরের সাথে সংযুক্ত ও পরস্পরের পরিপূরক হবে। সেখানে আভ্যন্তরীণ বিবাদ ও সংঘর্ষ সৃষ্টির কোনো সুযোগ থাকবে না। সেখানে পারস্পরিক সহযোগিতা ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষার কারণে উন্নতির গতি প্রথম সমাজের তুলনায় অনেক বেশী দ্রুত হবে।

অনুরূপ অবস্থা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও সৃষ্টি হবে। একটি জাতি অন্য জাতির সাথে দানশীলতা, ঔদার্য ও সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার করবে এবং তার বিপদের সময় নিতান্ত অন্তরঙ্গতা সহকারে সাহায্যের হাত প্রসারিত করবে। এ অবস্থায় অন্য পক্ষ থেকে এর জবাবে প্রেম-প্রীতি, কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক কল্যাণ কামনা ছাড়া অন্য কিছুর প্রকাশ সম্ভব নয়। বিপরীত পক্ষে একই জাতি যদি তার প্রতিবেশী জাতির প্রতি ব্যবহারে স্বার্থপরতা ও সংকীর্ণমনতার পরিচয় দেয় এবং তার বিপদকে ব্যবহার করে অবৈধভাবে লাভবান হতে চায়, তাহলে হয়তো তা থেকে অর্থনৈতিক লাভ বিপুল পরিমাণে অর্জনে সক্ষম হবে কিন্তু এরপর এ ধরনের 'শাইলক' প্রকৃতির প্রতিবেশীর প্রতি ঐ জাতির মনে কোনো আন্তরিকতা, ভালোবাসা ও কল্যাণাজ্ক্ষার অনুভূতি জাগরুক থাকবে না। বেশী দিনের কথা নয়, বিগত বিশ্বযুদ্ধকালে আমেরিকার নিকট থেকে বৃটেন একটি বড় অংকের ঋণ নিয়েছিল। BRETTON WOOD AGREEMENT নামে তাদের মধ্যে এ ব্যাপারে একটি ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বৃটেন তার ধনাঢ্য মিত্র ও যুদ্ধক্ষেত্রের সহযোগী আমেরিকার নিকট থেকে সুদমুক্ত ঋণ চাচ্ছিল। কিন্তু আমেরিকা সুদ ছাড়তে রাজী হয়নি।

কাজেই নিজের সমস্ত অক্ষমতা সত্ত্বেও বৃটেন সুদ দিতে রাজী হয়। ইংরেজ জাতির উপর এর যা প্রভাব পড়ে তা সমকালীন ইংরেজ কূটনীতিবিদ ও সাংবাদিকদের বক্তৃতা, বিবৃতি ও রচনাবলী থেকে সুস্পষ্টরূপে অনুমান করা যায়। প্রখ্যাত অর্থনীতি বিশারদ লর্ডকনেজ আঞ্জাহানী বৃটেনের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারটিকে চূড়ান্ত করেন। চুক্তি সম্পন্ন করার পরে দেশে ফিরে বৃটিশ পার্লামেন্টে বৃক্ততা প্রসঙ্গে তিনি বলেন ঃ "আমেরিকা আমাদেরকে সুদমুক্ত ঋণ দিতে রাজী হয়নি এ দুঃখ আমি সারা জীবন ভুলবো না।" মিঃ উইনষ্টন চার্চিলের ন্যায় আমেরিকার শ্রেষ্ঠতম বন্ধুও বলেন ঃ "আমাদের সাথে যে বেনিয়াসুলভ আচরণ করা হয়েছে তার গভীরে আমি অনেক বিপদাশংকা দেখতে পাচ্ছি। সত্য বলতে কি আমাদের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর এর অত্যন্ত বিরূপ প্রভাব পড়েছে।" তদানিন্তন অর্থমন্ত্রী ডঃ ডাল্টন এ চুক্তিটিকে অনুমোদন লাভের জন্যে পার্লামেন্টে পেশ করে বলেন ঃ "যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় আমরা এ ভারি বোঝা মাথায় নিয়ে বের হচ্ছি। আমরা একই উদ্দেশ্যে যে অসাধারণ ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করে এসেছি এটি তার চমৎকার ও অদ্ভুত প্রতিদান। ভবিষ্যতের ঐতিহাসিকগণই আমাদের এই মজার পুরস্কারটি সম্পর্কে যথার্থ মতামত প্রকাশ করতে পারবেন। -------- আমরা কর্জে হাসানা দানের আবেদন জানিয়েছিলাম কিন্তু জবাবে বলা হয়, এটা কার্যকর রাজনীতি নয়।"

সুদের এ স্বাভাবিক প্রভাব ও এর অনিবার্য মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া সবসময় সব অবস্থায় প্রকাশ হতে থাকবে। এক জাতি অন্য জাতিকে বা এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে সুদভিত্তিক ঋণ দিলে সর্বাবস্থায় এ প্রতিক্রিয়া হতে বাধ্য। ইংল্যাণ্ডের লোকেরা ব্যক্তিগত পর্যায়ে সুদী লেনদেনকে কোনো খারাপ কাজ বলে মেনে নিতে রাজী ছিল না এবং আজও রাজী নয়। আপনি কোনো ইংরেজকে সুদমুক্ত ঋণের কথা বললে সে তখনই জবাব দিয়ে বসবে, "জনাব এটা কার্যকর ব্যবসায়ের (PRACTICAL BUSINESS) নিয়ম নয়।" অথচ তার জাতীয় বিপদের দিনে তারই এক বন্ধু দেশ যখন তার সাথে ঐ একই কার্যকর ব্যবসায়ের পদ্ধতি অবলম্বন করে তখন প্রত্যেকটি ইংরেজ চীৎকার করে ওঠে। সুদ মনের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করে এবং সম্পর্ক খারাপ করে, এ সত্যের স্বপক্ষে তারাই সারা দুনিয়ার সামনে সাক্ষ্য প্রদান করেছে।

আর্থিক ক্ষতি

এরার এর অর্থনৈতিক দিকের আলোচনায় আসা যাক। অর্থনৈতিক জীবনের যেসব বিষয় কোনো না কোনোভাবে ঋণের সাথে জড়িত সুদও সেসব বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত। ঋণ বিভিন্ন প্রকারের ঃ

এক ঃ অভাবী লোকেরা নিজেদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে যে ঋণ নিয়ে থাকে।

দুই ঃ ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও চাষীরা নিজেদের লাভজনক কাজে খাটাবার জন্য যে ঋণ নেয়।

তিন ঃ সরকার নিজের দেশবাসীর জন্য যে ঋণ নিয়ে থাকে। এ ঋণ হয় বিভিন্ন প্রকৃতির। এর মধ্যে কোনো কোনো ঋণ অলাভজনক কাজে ব্যবহার করার জন্য গ্রহণ করা হয়। যেমন, খাল-খনন, রেলপথ ও সড়ক নির্মাণ, পানি, বিদ্যুৎ পরিকল্পনা কার্যকর করণ প্রভৃতি।

চার ঃ সরকার নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্যে বৈদেশিক সাহায্য হিসেবে গ্রহণ করে।

সুদ আরোপতি হবার পর এগুলোর প্রত্যেকটি কোন্ ধরনের ক্ষতির অবতারণা করে পৃথক পৃথক আলোচনার সাহায্যে তা আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করব।

অভাবী ব্যক্তিদের ঋণ

মহাজনী ব্যবসায়ে (MONEY LIENDING BUSINESS) সবচেয়ে বেশী সুদের লেনদেন হয়। এ আপদটি কেবল এ হিমালয়ান উপমহাদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। বিশ্বব্যাপী এর প্রসার। দুনিয়ার কোনো দেশ এ আপদমুক্ত নয়। এর কারণ হচ্ছে এই যে, দুনিয়ার কোথাও দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের জন্য জরুরী প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সহজ ঋণ লাভের কোনো ব্যবস্থা নেই। সুদমুক্ত ঋণ না হলেও অন্ততঃপক্ষে ব্যবসায়িক সুদের হারে ঋণ লাভের কোনো ব্যবস্থা কোথাও নেই। সরকার এ বিষয়টিকে নিজের দায়িত্ব বহির্ভূত মনে করে। সমাজ এর প্রয়োজন অনুভব করে না। ব্যাংক লাখো লাখো কোটি কোটি টাকার কারবারে হাত দেয়। তাছাড়া কোনো স্বল্প আয় সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে নিজের কোনো আকস্মিক প্রয়োজনের জন্য ব্যাংক পর্যন্ত পৌঁছে গিয়ে ঋণ গ্রহণ করাও সহজসাধ্য নয়। এসব কারণে সব দেশের কৃষক, শ্রমিক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, স্বল্প বেতনভূক কর্মচারী ও সাধারণ দরিদ্র লোকেরা নিজেদের চরম দুর্দিনে এমনসব মহাজনের নিকট থেকে ঋণ নিতে বাধ্য হয় যাদেরকে তারা নিজেদের ধারে কাছে শকুনির ন্যায় নিরন্তর শিকারের সন্ধানে ঘোরাফেরা করতে দেখে। এ মহাজনী ব্যবসায়ে সুদের হার এতবেশী যার ফলে একবার যে ব্যক্তি এ জালে পা দিয়েছে তার পক্ষে আর নিজেকে মুক্ত করা সম্ভব হয়নি। বরং অনেক ক্ষেত্রে দাদা যে ঋণ নিয়েছিল তা উত্তরাধিকার সূত্রে তার নাতিদের ঘাড়ে গিয়ে চেপে বসে এবং আসলের কয়েকগুণ বেশী সুদ আদায় করার পরও আসল ঋণের পাহাড় পূর্ববৎ বুকের ওপর চেপে বসে থাকে। অতপর অনেক

ক্ষেত্রে দেখা যায়, ঋণগ্রহীতা কিছুকাল যদি সুদ আদায়ের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে তাহলে আরোপিত সুদের অংককে আসলের অন্তর্ভুক্ত করে ঐ মহাজন নিজের আসল ও সুদ আদায় করার জন্য ঐ ব্যক্তিকে বর্ধিত সুদের হারে আর একটি বড় ঋণ দেয়, ফলে ঐ দরিদ্র ব্যক্তি আগের চেয়ে আরো বড় ঋণের বোঝার চাপে পিষ্ট হতে থাকে। ইংল্যাণ্ডে এ মহাজনী ব্যবসায় সর্বনিম্ন সুদের হার বছরে শতকরা ৪৮ এবং আইনের জোরে এ সুদ আদায় করা হয়। কিন্তু বাজারে এ সুদের সাধারণ হার প্রচলিত এবং যার মাধ্যমে সেখানকার কাজ-কারবার চলছে তা হচ্ছে বছরে শতকরা ২৫০ থেকে ৪০০ ভাগ। এছাড়াও বছরে শতকরা বার তেরশো পর্যন্ত সুদের দৃষ্টান্তও পাওয়া গেছে। আমেরিকায় মহাজনদের সুদের হার বছরে শতকরা ৩০ থেকে ৬০ পর্যন্ত কিন্তু তাদের সাধারণ কাজ-কারবার চলে বার্ষিক শতকরা ১০০ থেকে ২৬০ হারে। অনেক সময় এ হার শতকরা ৪৮০-তেও পৌঁছে যায়। আমাদের এ উপমহাদেশে অত্যন্ত সদাশয় মহাজনরা বার্ষিক শতকরা ৪৮ ভাগ সুদে ঋণ দিয়ে থাকে। অন্যথায় সুদের সাধারণ হার হচ্ছে বার্ষিক শতকরা ৭৫ এবং তা অনেক সময় শতকরা ১৫০-এ পৌঁছে যায় বরং শতকরা ৩০০ থেকে ৩৫০-এর দৃষ্টান্তও পাওয়া গেছে।

প্রত্যেক দেশের দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটা বিরাট অংশ এ মহাবিপদজালে নিজেদেরকে মারাত্মকভাবে জড়িয়ে ফেলেছে। এর ফলে স্বল্প আয়ের লোকদের উপার্জনের বৃহত্তর অংশ মহাজনের সিন্দুকে চলে যাচ্ছে। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে সামান্য রুজি-রোজগার তারা করে তার থেকে সুদ আদায় করার পর দু বেলা দু মুঠো পেট ভরে আহার করার মতো পয়সা তাদের হাতে অবশিষ্ট থাকে না। এ অবস্থা কেবল তাদের চরিত্র নষ্ট করে ক্ষান্ত হয় না, তাদেরকে অপরাধ প্রবণতার দিকেও ঠেলে দেয়, তাদের জীবনযাপনের মান নিম্নমুখী করে এবং সন্তানদেরকে নিম্নমানের শিক্ষা দিয়েই তাদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়। উপরন্তু এর একটি মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে এই যে, চিরন্তন দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী। দেশের সাধারণ কর্মজীবীদের কর্মশক্তি ও যোগ্যতা অনেকাংশে কমিয়ে দেয় এবং যখন তারা নিজেদের মেহনতের ফল অন্যদের ভোগ করতে দেখে তখন নিজেদের কাজে তাদের আগ্রহ ও মনযোগ কমে যায়। এ প্রেক্ষিতে বিচার করলে দেখা যাচ্ছে সুদী ব্যবসায় কেবল একটি যুলুমই নয় বরং একই সঙ্গে এর মধ্যে সামগ্রিক অর্থব্যবস্থার জন্য বিপুল ক্ষতি নিহিত রয়েছে। এটাকে চরম নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই বলা যেতে পারে না যে, জাতির যারা আসল উৎপাদক এবং যারা নিজেদের শ্রম-মেহনতে বিপুল ধন-ঐশ্বর্য ও সম্পদ সৃষ্টি করে জাতিকে সামষ্টিক সমৃদ্ধির দ্বারে এনে পৌঁছে

দিয়েছে জাতি তাদের গায়ে অনেকগুলো জোঁক বসিয়ে দিয়েছে। এ জোঁকগুলো রক্ত চুষে চুষে তাদেরকে নিস্তেজ করে ফেলেছে। ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাবে কত কর্ম-ঘন্টার ক্ষতি হয় এবং এর ফলে দেশের উৎপাদন কি পরিমাণ কমে যায় তার হিসেব লাগিয়ে এ বিপুল পরিমাণ ক্ষতির পথরোধ করার জন্য মশা নিধনযজ্ঞ শুরু করা হয়। কিন্তু সুদখোর মহাজনরা দেশের লাখো লাখো কর্মী বাহিনীকে কি পরিমাণ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, পেরেশান ও মনমরা করে দিচ্ছে, তাদের কর্মপ্রেরণাকে নিস্তেজ করে কি পরিমাণ কর্মশক্তি ক্ষয় করছে এবং দেশের উৎপাদনের উপর এর কি প্রভাব পড়েছে তার হিসেব লাগানো হচ্ছে না। বরং উল্টো ঐ মহাজনদের হাত শক্তিশালী করা হচ্ছে। দেশের বিপুল পরিমাণ কর্ম ঘাটতি ও উৎপাদন হ্রাসের নায়ক মহাজনদেরকে নির্মূল করার পরিবর্তে ঋণগ্রস্তদেরকে পাকড়াও করা হচ্ছে এবং মহাজনরা তাদের দেহ থেকে যে রক্ত শুঁষে নিতে পারছিল না দেশের আদালতগুলো তা তাদের দেহ থেকে নিংড়িয়ে নিয়ে মহাজনদের হাতে সোপর্দ করে দিচ্ছে।

এর দ্বিতীয় অর্থনৈতিক ক্ষতি হচ্ছে এই যে, এভাবে সুদখোর মহাজনরা দরিদ্র শ্রেণীর অবশিষ্ট ক্রয়শক্তিও ছিনিয়ে নেয়। অবশ্যি পূর্বেই লাখো লাখো লোকের বেকারত্ব ও কোটি কোটি লোকের অকিঞ্চিৎ আয় দেশের শিল্প ব্যবসায়ের উন্নতির পথে বাধার পাহাড় তৈরী করে রেখে ছিল। তদুপরি সচ্ছল পরিবারকে খরচ না করার পথ দেখানো হয়েছে বরং বেশী বেশী সম্পদ জমা করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। এর ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য আর এক দফা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সর্বোপরি লাখো লাখো কোটি কোটি দরিদ্র শ্রমিক-মজুররা নিজেদের অকিঞ্চিৎ বেতন ও পারিশ্রমিকের আকারে যে সামান্য ক্রয়শক্তির অধিকারী হয় তাকেও তারা নিজেদের জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয়ে ব্যয় করতে পারছে না। বরং তার একটি বড় অংশ মহাজনরা ছিনিয়ে নিচ্ছে এবং তার সাহায্যে প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র কেনার পরিবর্তে সমাজের মাথায় অতিরিক্ত সুদী ঋণের বোঝা চাপিয়ে দেয়ার জন্য তাকে ব্যবহার করছে। হিসাব করে দেখুন, দুনিয়ার ৫ কোটি লোক যদি মহাজনদের জালে জড়িয়ে পড়ে থাকে এবং তারা গড়পড়তায় মাসে ১০ টাকা করে সুদ আদায় করতে থাকে তাহলে এর অর্থ দাঁড়াবে প্রতি মাসে ৫০ কোটি টাকার পণ্য অবিক্রিত থেকে যাচ্ছে এবং এ বিপুল পরিমাণ অর্থ উৎপাদন যন্ত্রের দিকে ফিরে আসার পরিবর্তে প্রতি মাসে অতিরিক্ত সুদী ঋণ সৃষ্টির কাজে ব্যয়িত হচ্ছে।*

* উল্লেখযোগ্য ১৯৪৫ সালে বিভাগপূর্ব বৃটিশ ভারতের এক হিসেব মতে দেশে মহাজনী ঋণের পরিমাণ ছিল কমপক্ষে দশশো কোটি টাকা। এতো মাত্র একটা দেশের অবস্থা। এ থেকে সারা দুনিয়ায় এ ধরনের ঋণের পরিমাণ এবং ঐ ঋণ বাবদ মহাজনদের ঘরে যে পরিমাণ সুদ পৌছেছে তা আন্দাজ করা যেতে পারে।

বাণিজ্যিক ঋণ

এবার আমরা শিল্প ব্যবসায় ও অন্যান্য লাভজনক উদ্দেশ্যে গৃহীত ঋণে সুদ বৈধকরণের ক্ষতি পর্যালোচনা করতে চাই। শিল্প, ব্যবসায়, কৃষি ও অন্যান্য সমস্ত অর্থনৈতিক কাজ-কারবার পরিচালনায় যেসব লোক অংশগ্রহণ করে তাদের সবার স্বার্থ ও আগ্রহ ঐসব কারবারের উন্নতি বিধানে নিয়োজিত হওয়া উচিত। এসব কারবারের লোকসান তাদের সবার লোকসান হিসেবে বিবেচিত হতে হবে, তবেই তারা এর বিপদ থেকে বাঁচার সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালাবে। আবার এগুলোর লাভ তাদের সবার লাভ হিসেবে বিবেচিত হতে হবে, তবেই তারা এর উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধিতে সর্বাত্মক শক্তি নিয়োগ করবে। এ কারণে ব্যবসায়ে যারা নিজেদের দৈহিক শক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি ব্যবহার করছে না বরং শুধুমাত্র পুঁজি সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ করছে তাদের ব্যবসায়ে অংশগ্রহণ এমন পর্যায়ে হতে হবে যাতে করে তারা ব্যবসায়ের ভালো-মন্দের সাথে জড়িত থাকতে পারে এবং তার উন্নতি বিধানেও তাকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করার ব্যাপারে পরিপূর্ণ আগ্রহশীল থাকে। কিন্তু সুদ আইনসংগত ঘোষিত হবার পর পুঁজি মালিকদের জন্য শরীক বা অংশীদার হিসেবে ব্যবসায়ে পুঁজি খাটাবার পরিবর্তে ঋণদাতা হিসেবে ব্যবসায়ীকে পুঁজি ঋণ দিয়ে তা থেকে একটি নির্ধারিত হারে নিজের মুনাফা আদায় করার পথ প্রশস্ত হয়ে গেছে। এভাবে সমাজের অর্থনৈতিক কার্যক্ষেত্রে এমন একজন অসাধারণ ও অস্বাভাবিক কর্মীর আগমন ঘটেছে, যে উৎপাদন কাজে রত অন্যান্য সকল কর্মীর বিপরীতপক্ষে এ সমগ্র কাজের ভালো-মন্দ ও লাভ-ক্ষতির প্রতি কোনো প্রকার আগ্রহশীল হয় না। এ কাজে লোকসান হতে থাকলে সবার জন্য বিপদ দেখা দেয় কিন্তু তার জন্য লাভের গ্যারান্টি রয়ে গেছে। কাজেই সবাই লোকসান বন্ধ করার চেষ্টা করবে কিন্তু ব্যবসাটি পুরোপুরি দেউলিয়া না হওয়া পর্যন্ত সে চিন্তিত হবে না। ব্যবসা যখন লোকসানের খাতে চলবে তখন সে তাকে রক্ষা করার জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে না বরং নিজের অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে নিজের প্রদত্ত অর্থও টেনে নিতে চাইবে। অনুরূপভাবে খাদ্য উৎপাদন বাড়াবার ক্ষেত্রেও প্রত্যক্ষভাবে সে মোটেই আগ্রহশীল হবে না। কারণ তার মুনাফা সর্বাবস্থায় নির্ধারিত রয়েছে। কাজেই এ কাজের উন্নতি ও সাফল্য বিধানে সে মাথা ঘামাবে কেন ? মোটকথা সমগ্র সমাজের লাভ লোকসানের কোনরূপ তোয়াক্কা না করে এ অদ্ভুত ধরনের অর্থনৈতিক কমিটি একা আলাদা বসে নিজের পুঁজিকে ভাড়ায় খাটাতে থাকে এবং নির্ঝঞ্ঝাটে নিজের নির্ধারিত ভাড়া আদায় করতে থাকে।

এ ভুল পদ্ধতির ফলে পুঁজি ও ব্যবসায়ের মধ্যে সখ্যতা ও সহানুভূতিপূর্ণ সহযোগিতার পরিবর্তে নিকৃষ্ট ধরনের স্বার্থপরতামূলক সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে।

সমাজে যারা অর্থ সঞ্চার করার ও উৎপাদিত পণ্য কাজে লাগাবার ক্ষমতা রাখে তারা নিজেরা ঐ সমস্ত অর্থ কোনো ব্যবসায়ে খাটায় না অথবা কোনো ব্যবসায়ীর সাথে ব্যবসায়ে অংশীদারও হয় না বরং তারা নিজেদের অর্থাদি একটি নির্ধারিত মুনাফার জামানত সহকারে ঋণ হিসেবে ব্যবসায়ে খাটাতে চায়। আবার এ নির্ধারিত মুনাফার ব্যাপারেও তারা সর্বাধিক পরিমাণের প্রত্যাশা করে। এর বহুবিধ ক্ষতির মধ্য থেকে নীচে কয়েকটি সুস্পষ্ট ক্ষতির কথা উল্লেখ করা হলো ঃ

এক ঃ নিছক সুদের হার বাড়ার অপেক্ষায় পুঁজির একটি বিরাট অংশ আবার অনেক সময় বৃহত্তম অংশ নিস্তেজ হয়ে পড়ে থাকে। ব্যবহারযোগ্য উপকরণের উপস্থিতি সত্ত্বেও তাকে কোনো লাভজনক কাজে খাটানো হয় না। রুজি-রোজগারের সন্ধানে বহু লোক হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকে এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির চাহিদাও বাজারে যথেষ্ট থাকে, এতদসত্ত্বেও উপকরণাদি ব্যবহার করা হয় না, বেকার লোকদেরকে কাজে লাগানো হয় না এবং বাজারের যথার্থ চাহিদা অনুযায়ী পণ্য সরবরাহও করা হয় না। এর একমাত্র কারণ হচ্ছে এই যে, পুঁজিপতি যে হারে সুদ নিয়ে লাভবান হতে চায় তা পাওয়ার কোনো আশা না থাকার কারণে সে অর্থ ঋণ দিতে প্রস্তুত হয় না।

দুই ঃ অধিক সুদের হার এমন একটি লোভনীয় বস্তু যার ফলে পুঁজিপতি শ্রেণী ব্যবসায়ের দিকে পুঁজির প্রবাহকে ব্যবসায়ের যথার্থ প্রয়োজন ও স্বাভাবিক চাহিদা অনুযায়ী নয় বরং নিজের স্বার্থ অনুযায়ী কখনো বাড়াতে, কমাতে, আবার কখনো সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিতে থাকে। এর ফলে কি বিপুল পরিমাণ ক্ষতি সাধিত হয় তা একটি দৃষ্টান্ত থেকে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। মনে করুন, কোনো পানি সেচ কেন্দ্রের মালিক কৃষি ক্ষেত্রের চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী পানি ছাড়তে বা বন্ধ করতে রাজী নন। বরং তিনি পানি ছাড়ার ও বন্ধ করার জন্য নিজস্ব একটি বিধান তৈরী করেছেন। তার বিধান হচ্ছে যখন পানির প্রয়োজন থাকবে না তখন তিনি অত্যন্ত সস্তা দামে প্রচুর পানি ছাড়বেন আর যখনই ক্ষেতে পানির চাহিদা বেড়ে যাবে তখনই তিনি পানির দামও বাড়াতে থাকবেন, অবশেষে পানির দাম এতবেশী বাড়িয়ে দেবেন যার ফলে ঐ দামে ক্ষেতে পানি সিঞ্চন করা মোটেই লাভজনক বিবেচিত হবে না। এ পানি সেচ কেন্দ্রের মালিক কৃষকদের ও সারা দেশের খাদ্য ব্যবস্থার যে ক্ষতি সাধন করলেন অত্যধিক সুদের লোভে পুঁজি মালিকগণ দেশের সমগ্র অর্থব্যবস্থায় অনুরূপ ক্ষতির পথ উন্মুক্ত করেন।

তিন ঃ সুদ ও সুদের হারের বদৌলতে ব্যবসা-বাণিজ্য শিল্প ব্যবস্থা স্বাভাবিক নিয়মে ও স্বচ্ছন্দ গতিতে চলার পরিবর্তে এমন এক ব্যবসায়িক

চক্করে (TRADE CYCLE) পড়ে যায় ফলে তা বার বার মন্দার শিকারে পরিণত হয়। আগের আলোচনায় এ বিষয়টির উপর বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। তাই এখানে এর জের টানার কোনো প্রয়োজন নেই।

চার ঃ যেসব কাজে সাধারণ মানুষের লাভ ও সাধারণের স্বার্থে যেগুলো অত্যন্ত জরুরী কিন্তু অর্থনৈতিক দিক দিয়ে যেগুলো বাজারের প্রচলিত হারের সুদের মোটেই লাভজনক নয়, পুঁজি সেসব কাজের দিকে অগ্রসর হতেও রাজী হয় না। বিপরীত পক্ষে যেসব কাজ অপ্রয়োজনীয় হওয়া সত্ত্বেও অধিক লাভজনক, পুঁজি সেসব কাজের দিকে প্রবাহিত হয়। অন্যদিকে সে ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় সব রকম উপায় অবলম্বন করে সুদের হারের চেয়ে অধিক মুনাফা অর্জনের জন্য ব্যবসায়ীকে বাধ্য করে। এ ক্ষতিটির ব্যাখ্যাও আমরা ইতিপূর্বে করে এসেছি তাই এখানে তার পুনরাবৃত্তি করার কোনো প্রয়োজন নেই।

পাঁচ ঃ পুঁজিপতি দীর্ঘমেয়াদী ঋণে পুঁজি খাটাতে অনিচ্ছুক। কারণ একদিকে সে সাট্টাবাজীর জন্য বেশ বড় অংকের পুঁজি সবসময় নিজের কাছে জমা রাখতে চায় আবার অন্যদিকে সে মনে করে যদি ভবিষ্যতে কখনো সুদের হার বেশ বেড়ে যায় তাহলে কম সুদে তার বেশী টাকা আটক হয়ে যাওয়ায় সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ফলে শিল্প মালিকগণও নিজেদের সমস্ত কাজ-কারবারে সংকীর্ণমনা ও স্বল্পোদ্যমের পরিচয় দিতে বাধ্য হয় এবং স্থায়ী কল্যাণ ও উন্নতি বিধানার্থে কিছু করার পরিবর্তে কেবলমাত্র চালু কাজটি সম্পন্ন করতেই প্রয়াসী হয়। যেমন এ ধরনের স্বল্প মেয়াদী পুঁজি নিয়ে তাদের পক্ষে নিজেদের শিল্প-কারখানার জন্য অত্যাধুনিক মেশিন ও যন্ত্রপাতি কেনার জন্য বড় অংকের অর্থ ব্যয় করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। বরং তারা পুরানো মেশিনগুলো ঝালাই করে কোনোরকমে ভালো মন্দ দ্রব্যসামগ্রী বাজারে ছাড়তে বাধ্য হয়। এভাবে তারা ঋণ ও সুদ আদায় করতে এবং এ সংগে নিজেদের জন্য কিছু মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হবে। অনুরূপভাবে স্বল্পমেয়াদী ঋণের বদৌলতেই বাজারে পণ্যের চাহিদা কমে যেতে দেখে সংগে সংগেই কারখানা মালিক পণ্য উৎপাদন কমিয়ে দেয় এবং অন্তত কিছুক্ষণের জন্যেও উৎপাদনের গতি অপরিবর্তিত রাখার সাহস করে না। কারণ সে ভয় করে বাজারে পণ্যের দাম কমে গেলে সে দেউলিয়ার প্রান্তদেশে পৌঁছে যাবে।

ছয় ঃ বৃহৎ শিল্প ও ব্যবসায় পরিকল্পনার জন্য যে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ পাওয়া যায় সেগুলোর উপর নির্ধারিত বিশেষ সুদের হারও অনেক বড় বড় ক্ষতির সম্মুখীন করে। সাধারণত দশ, বিশ বা তিরিশ বছরের জন্য এ ধরনের ঋণ নেয়া হয়। শুরুতেই এ সমগ্র সময়ের জন্য সুদের একটি বার্ষিক বিশেষ হার

নির্ধারিত হয়। এ হার নির্ধারণ করার সময় আগামী দশ, বিশ বা তিরিশ বছরে দ্রব্য মূল্যের ওঠা-নামা কোথা গিয়ে ঠেকবে এবং ঋণগ্রহীতার মুনাফার সম্ভাবনা কি পরিমাণ কম-বেশী হবে বা আদৌ কোনো মুনাফাই হবে কিনা, সেদিকে দৃষ্টি রাখা হয় না এবং এ ব্যাপারে উভয় পক্ষ পূর্বাহ্নেই কোনো জ্ঞানের অধিকারী না হলে সেদিকে দৃষ্টি রাখাও সম্ভবপর নয়। মনে করুন ১৯৪৯ সালে এক ব্যক্তি ২০ বছরের জন্য শতকরা ৭ ভাগ সুদে একটি বড় অংকের ঋণ লাভ করলো এবং ঐ ঋণলব্ধ অর্থের সাহায্যে একটি বড় কাজ শুরু করলো। এখন সে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত ঐ হিসেবে প্রতি বছর নিয়মিতভাবে আসল টাকার কিস্তি ও সুদ আদায় করতে বাধ্য। চুক্তি সাধিত হয়েছিল ১৯৪৯ সালে কিন্তু যদি ১৯৫৫ সালে পৌঁছতে পৌঁছতে দ্রব্য মূল্য কমে গিয়ে আগের মূল্যের অর্ধেকে এসে ঠেকে তাহলে এর অর্থ দাঁড়াবে যতক্ষণ চুক্তি শুরুর সময়ের তুলনায় ঐ সময় দ্বিগুণ পণ্য বিক্রি সম্ভব না হয় ততক্ষণ আসলের কিস্তি ও সুদ আদায় করা সম্ভব হবে না। এর অনিবার্য পরিণতি স্বরূপ দেখা যাবে, ঐ চড়া মূল্যের যুগে এ ধরনের অধিকাংশ ঋণগ্রহীতা দেউলিয়া হয়ে গেছে। অথবা দেউলিয়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তারা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দূষিতকারী অবৈধ কাজ-কর্ম শুরু করেছে। এ ব্যাপারটি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করলে যে কোনো স্বাভাবিক বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি নিসন্দেহ হবেন যে, বিভিন্ন যুগে ওঠা-নামাকারী দ্রব্য মূল্যের মধ্যে ঋণদাতা পুঁজিপতির এমন কোনো মুনাফা যা সব যুগে সমান থাকে ন্যায়নীতি ও অর্থনীতির দৃষ্টিতে কোনোক্রমে যথার্থ হতে পারে না এবং তাকে সামগ্রিক সমৃদ্ধির সহায়কও প্রমাণ করা যেতে পারে না। দুনিয়ার কোথাও কি এমন কোনো কথা শুনা গেছে যে, কোনো কোম্পানী কোনো নিত্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহের ঠিকে নিয়ে এমন কোনো চুক্তি করেছে যাতে বলা হয়েছে ঃ আগামী তিরিশ বা বিশ বছর পর্যন্ত একই দামে সে ঐ দ্রব্যটি সরবরাহ করবে? কোনো দীর্ঘ মেয়াদী পণ্য ক্রয় চুক্তির ক্ষেত্রে যদি এটা সম্ভব না হয়ে থাকে তাহলে একমাত্র সুদী ঋণদাতা পুঁজিপতির স্বার্থে এটা সম্ভব হবে কেমন করে? কোন্ নীতির ভিত্তিতে ঐ পুঁজিপতি সুদীর্ঘ কয়েক বছরের জন্য নিজের ঋণের মূল্য পূর্বাহ্নে নির্ধারণ করবে এবং বছরের পর বছর ঐ একই মূল্য আদায় করে যেতে থাকবে?

রাষ্ট্রের বেসরকারী ঋণ

বিভিন্ন দেশের সরকার রাষ্ট্রের নিজস্ব প্রয়োজনে নিজের দেশের জনগণের নিকট থেকে যেসব ঋণ নেয় এবার তার আলোচনায় আসা যাক। এর মধ্যে এক ধরনের ঋণ অলাভজনক কাজে লাগানো হয়।

প্রথম ধরনের ঋণের সুদ অভাবী লোকদের নিজেদের ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য গৃহীত ঋণের সুদের সমপর্যায়ভুক্ত। বরং একে তার চেয়েও নিকৃষ্ট পর্যায়ভুক্ত বলা যেতে পারে। এ সুদের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, সমাজ যে ব্যক্তির জন্ম দিয়েছে, যাকে লালন-পালন করেছে, অর্থোপার্জনের যোগ্যতাসম্পন্ন করেছে, বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করেছে, ক্ষতির হাত থেকে বাঁচিয়েছে এবং নিজের তমদ্দুনিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় যার শান্তিতে বসবাস করার ও কাজ-কারবার চালাবার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করে নিরন্তর সেবা করে যাচ্ছে, সে ব্যক্তি এহেন সমাজের আর্থিক লাভ বিমুক্ত প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সবার সাথে সাথে তার নিজের স্বার্থও যেসব প্রয়োজন পূর্ণ হবার সাথে জড়িত —সুদ মুক্ত ঋণদান করতে প্রস্তুত হচ্ছে না। সে নিজেই তার প্রতিপালনকারী সমাজকে বলছে, তুমি ঐ অর্থের সাহায্যে মুনাফা অর্জন কর বা না কর আমি নিজের অর্থের এ বিশেষ পরিমাণ মুনাফা প্রতি বছর অবশ্যি নিতে থাকবো।

জাতি যখন যুদ্ধের সম্মুখীন হয় এবং সবার সাথে সাথে জাতির ঐ পুঁজিপতি ব্যক্তির ধন, প্রাণ ও মান-সম্মান সংরক্ষণের প্রশ্নও দেখা দেয় তখন এ বিষয়টি আরো বেশী জটিল আকার ধারণ করে। এ সময় জাতীয় অর্থ ভাণ্ডার থেকে যা কিছু ব্যয় করা হয় তা কোনো ব্যবসায়ে খাটানো হয় না বরং অগ্নিকুণ্ডেই নিক্ষেপ করা হয়। তাতে মুনাফার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। এমন একটি কাজে এ বিরাট ব্যয় সাধিত হয় যার সাফল্য ও অসাফল্যের উপর সমগ্র জাতির সাথে সাথে তার নিজের জীবন-মৃত্যুও নির্ভরশীল। এ কাজে জাতির অন্যান্য লোকেরা নিজেদের ধন-প্রাণ-সময়-শ্রম সবকিছুই ঢেলে দেয়। তাদের একজনও এ প্রশ্ন উঠায় না যে, জাতির প্রতিরক্ষায় সে যে বিরাট ভূমিকা পালন করেছে তাতে সে বার্ষিক শতকরা কত হারে মুনাফা পাবে ? কিন্তু সমগ্র জাতির মধ্যে একমাত্র ঐ পুঁজিপতিই নিজেদের ধন-সম্পদ দেয়ার পূর্বে এ শর্ত আরোপ করে যে, তাকে প্রতি বছর একটি নির্দিষ্ট হারে মুনাফা দিতে হবে এবং জাতির সমস্ত সদস্যরা মিলে যতদিন পর্যন্ত তার প্রদত্ত আসল অর্থ আদায় করতে না পারবে ততদিন পর্যন্ত তাকে এ মুনাফা আদায় করে যেতে হবে, তাতে একশো বছর লেগে গেলেও তার দাবীর একটুও নড়চড় হবে না। এ সংগে যেসব লোক দেশ, জাতি ও ঐ পুঁজিপতিকে রক্ষা করতে গিয়ে নিজেদের হাত-পা কাটিয়েছে অথবা নিজেদের বাপ, ভাই বা স্বামীকে হারিয়েছে তাদের পকেট থেকেও এ মুনাফার অংশ আসতে হবে।*—প্রশ্ন হচ্ছে, সমাজের একটি

* এ প্রসংগে উল্লেখ করা যায়, ইংল্যাণ্ডের বর্তমান অধিবাসীদের পূর্বপুরুষরা আজ থেকে সোয়াশো বছর পূর্বে নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ করেছিল এবং সে যুদ্ধে ইংরেজ পুঁজিপতিরা যে যুদ্ধঋণ দিয়েছিল আজও ইংরেজরা তার সুদ আদায় করে যাচ্ছে। ১৮৬১-৬৫ সালে আমেরিকার গৃহ যুদ্ধের ব্যয় বাবদ যে ঋণ গ্রহণ করা হয়েছিল আমেরিকানরা আজ পর্যন্ত তার চারগুণ অর্থ আদায় করেছে এবং এখানো তাদেরকে একশো কোটি ডলার সুদ হিসেবে আদায় করতে হবে।

শ্রেণীকে এভাবে সুদ খাইয়ে মোটা করার যৌক্তিকতা কোথায় ? তাদেরকে কি শেয়াল-কুকুরের ন্যায় বিষপান করিয়ে মেরে ফেলা উচিত নয় ?

দ্বিতীয় প্রকারের ঋণটি সাধারণ লোকেরা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে যে ঋণ নেয় তা থেকে আলাদা প্রকৃতির নয়। কাজেই ইতিপূর্বে ব্যবসায়িক ঋণের সুদের বিরুদ্ধে আমরা যে আপত্তি উত্থাপন করেছি তার সবগুলোই এখানে উত্থাপিত হয়। সাধারণত বিভিন্ন দেশের সরকার লাভজনক কাজে লাগাবার জন্য দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ নেয়। কিন্তু কোনো সরকার একটি নির্দিষ্ট হারে সুদে ঋণ নেয়ার সময় একথা জানতে পারে না যে, আগামী দশ-বিশ বছরে দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা কি রূপ পরিগ্রহ করবে ও আন্তজার্তিক অবস্থা কোন্ দিকে মোড় নেবে এবং এ সংগে যে কাজে ব্যয় করার জন্য এ সুদী ঋণ নেয়া হচ্ছে তাতে কি পরিমাণ মুনাফা অর্জিত হবে। সাধারণত দেখা গেছে এসব ক্ষেত্রে সরকারের অনুমান ভুল প্রমাণিত হয়েছে। সুদের হারের চেয়ে বেশী হওয়া তো দূরের কথা সমপরিমাণ মুনাফা অর্জনও সম্ভবপর হয় না। এটিই বিভিন্ন রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সংকটের অন্যতম কারণ এবং এরি কারণে বিভিন্ন লাভজনক পরিকল্পনায় অতিরিক্ত পুঁজি লাগানো দূরে থাক অতীতের ঋণের আসল টাকা ও তার সুদ আদায় করাও কঠিন হয়ে পড়ে।

উপরন্তু এখানেও সে একই অবস্থার সৃষ্টি হয় যেদিকে আমরা বার বার ইংগিত করেছি। অর্থাৎ বাজারের সুদের হার এমন একটি সীমা নির্ধারণ করে দেয় যার ফলে কোনো কম মুনাফাজনক কাজে জনগণের জন্য তা যতই ভালো ও প্রয়োজনীয় হোক না কেন পুঁজি খাটানো সম্ভবপর হয় না। অনাবাদী এলাকায় বসতি স্থাপন, অনাবাদী জমিকে কৃষি কাজের উপযোগী করা, অনুর্বর জমিকে উর্বর করা, শুষ্ক জমিতে পানি সেচের ব্যবস্থা করা, গ্রামীণ এলাকায় পথ, ঘাট, আলো ও স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা করা, স্বল্প বেতনভুক কর্মচারীদের জন্য স্বাস্থ্য রক্ষাকারী গৃহাদি নির্মাণ এবং এ ধরনের আরো বিভিন্ন কাজ যতই প্রয়োজনীয় হোক না কেন এবং সেগুলো না হলে জাতির যতই ক্ষতি হোক না কেন, যতক্ষণ না সেগুলো থেকে প্রচলিত সুদের হারের সমপরিমাণ বা তার চেয়ে বেশী মুনাফা অর্জিত হবার সম্ভাবনা থাকে ততক্ষণ কোনো সরকার সেসব প্রকল্পে অর্থ ব্যয় করতে প্রস্তুত হয় না।

উপরন্তু এ ধরনের যেসব কাজে সুদী ঋণ নিয়ে পুঁজি খাটানো হয় সেগুলোর ব্যাপারে আসল পরিস্থিতি হচ্ছে এই যে, সরকার এ পর্যায়ের সমস্ত সুদের বোঝা জনগণের মাথায় চাপিয়ে দেয়। ট্যাক্সের মাধ্যমে প্রত্যেক ব্যক্তির পকেট থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সুদের টাকা বের করা হয় এবং বছরের পর বছর লাখো লাখো টাকা জমিয়ে দীর্ঘকাল অবধি পুঁজিপতিদেরকে যোগান দেয়া হয়।

মনে করুন আজ পাঁচ কোটি টাকার একটি পানি সেচ প্রকল্প কার্যকরী করা হলো। বার্ষিক শতকরা ৬ টাকা সুদে এ পুঁজি সংগ্রহ করা হয়েছে। এ হিসেবে সরকারকে বছরে ৩০ লাখ টাকা সুদ আদায় করতে হবে। বলা বাহুল্য এ বিপুল পরিমাণ অর্থ সরকার কোথাও থেকে মাটি খুড়ে বের করে আনবে না। বরং যেসব চাষী ও কৃষি সেচ প্রকল্প থেকে লাভবান হবে সরকার তাদের মাথায় এ বোঝাটি চাপিয়ে দেবে। প্রত্যেক চাষীর উপর যেসব কর লাগানো হবে তার উপর এ সুদের অংশও থাকবে। চাষীও এ সুদ নিজের পকেট থেকে আদায় করবে না বরং সে উৎপাদিত ফসলের দাম থেকে এ সুদের অর্থ উসুল করবে। এভাবে পরোক্ষভাবে যেসব ব্যক্তি শস্য ব্যবহার করবে তাদের প্রত্যেকের নিকট থেকে এ সুদ আদায় করা হবে। প্রত্যেক দারিদ্র পীড়িত ও অনাহার ক্লিষ্ট ব্যক্তির ভাতের বাসন থেকে অন্ততঃপক্ষে এক মুটো ভাত কেড়ে নেয়া হবে এবং তা পুঁজিপতির বিরাট উদরে ঢেলে দেয়া হবে যেহেতু বার্ষিক ৩০ লাখ টাকা সুদের ভিত্তিতে সে এ প্রকল্প বাস্তবায়নে ঋণ দিয়েছিল। এ ঋণ আদায় করতে যদি সরকারের ৫০ বছর লেগে যায় তাহলেও সে গরীবদের নিকট থেকে চাঁদা সংগ্রহ করে ধনীদের পকেট ভারী করার এ দায়িত্ব অর্ধ শতাব্দীকাল ধরে পালন করে যেতে থাকবে। এ সমগ্র সময়কালে সরকার কেবল মহাজনের নায়েবের দায়িত্ব পালন করে যাবে।

এ কর্মপদ্ধতি সামাজিক অর্থব্যবস্থায় ধনের প্রবাহকে নির্ধনদের দিক থেকে ধনীদের দিকে ফিরিয়ে দেয়। অথচ সমাজের কল্যাণার্থে তাকে ধনীদের দিক থেকে নির্ধনদের দিকে ফিরিয়ে দেয়া উচিত ছিল। সরকার মুনাফাজনক ঋণে যে সুদ আদায় করে কেবল তার মধ্যে এ ক্ষতি নিহিত নেই বরং সাধারণ ব্যবসায়ী সমাজ সুদী ঋণের সাহায্যে যেসব ব্যবসায় চালায় তার প্রত্যেকটির মধ্যেও এ ক্ষতি রয়েছে। বলা বাহুল্য কোনো ব্যবসায়ী, শিল্পপতি বা কৃষক পুঁজিপতিকে দেয় সুদ নিজের পকেট থেকে আদায় করে না। তারা সবাই নিজেদের পণ্যের দামের উপর এ বোঝাটি চাপায়। এভাবে সাধারণ মানুষের নিকট থেকে এক পয়সা দু' পয়সা চাঁদা উঠিয়ে লাখপতি ও কোটিপতিদের ঝুলিতে ঢেলে দেয়। এ উল্টো ব্যবস্থায় দেশের সবচেয়ে বড় ধনাঢ্য মহাজনই সবচেয়ে বেশী 'সাহায্য' লাভের অধিকারী। আবার এ সাহায্য দানের দায়িত্ব যেসব ব্যক্তির উপর সবচেয়ে বেশী বর্তায় তারা হচ্ছে দেশের দরিদ্রতম শ্রেণী যারা সারাদিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যৎসামান্য রোজগার করে আনে কিন্তু দেশের সবচেয়ে বেশী 'করুণার পাত্র' কোটিপতির 'অধিকার' তা থেকে বের করে নেয়ার আগে তাদের সারাদিনের অভুক্ত সন্তানদের মুখে দু' মুঠো অন্ন তুলে দেয়া তাদের জন্য হারাম গণ্য হয়েছে।

বৈদেশিক ঋণ

দেশের বাইরের মহাজনদের নিকট থেকে রাষ্ট্রীয় সরকার যে ঋণ গ্রহণ করে সর্বশেষে তার আলোচনায় আসছি। এ ধরনের ঋণ সাধারণত বড় বড় অংকের হয়ে থাকে। অনেক সময় তা দশ বিশ কোটির মাত্রা পেরিয়ে একশো কোটি ও হাজার কোটির পর্যায়ে পৌঁছে যায়। দেশ কোনো অস্বাভাবিক সংকটাবর্তে নিপতিত হলে, দেশের নিজস্ব অর্থনৈতিক উপায়-উপাদান এ সংকট ও বিপদ থেকে উদ্ধারের ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রমাণিত না হলে দেশীয় সরকার এ ঋণ গ্রহণ করে। আবার কখনো অতিরিক্ত লোভের বশবর্তী হয়ে এ কৌশল অবলম্বন করা হয়। মনে করা হয় উন্নয়নমূলক প্রকল্পসমূহকে বড় অংকের পুঁজি বিনিয়োগ করলে স্বল্প সময়ে দেশের উপায়-উপকরণ বৃদ্ধি পাবে। এসব ঋণে সাধারণত সুদের হার শতকরা ৬/৭ থেকে ৯/১০ পর্যন্ত হয়। এ হারে একশো কোটি টাকার সুদ বছরে কয়েক কোটি টাকা হয়। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক বাজারের শেঠ ও মহাজনরা নিজেদের সরকারের মধ্যস্থাতায় এ পুঁজি ঋণ দেয় এবং এ জন্য জামানত হিসেবে ঋণগ্রহীতা দেশের কোনো একটি শুল্ক ; যেমন নগর শুল্ক, তামাক, চিনি, লবণ বা অন্য কোনো খাতের আয়কে বন্ধক রাখা হয়।

এ ধরনের সুদী ঋণ যেসব ক্ষতি সাধন করে পূর্ববর্তী আলোচনায় আমরা সেগুলোর উল্লেখ করেছি। ব্যক্তিগত ঋণ, ব্যবসায়িক ঋণ ও সরকারের আভ্যন্তরীণ ঋণের মধ্যে এমন কোনো ক্ষতিকর দিক নেই ঐসব আন্তর্জাতিক ঋণের সুদের মধ্যে যার কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যাবে না। কাজেই এখানে ঐসব ক্ষতির পুনরুল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ জাতীয় ঋণের মধ্যে ঐগুলো ছাড়া আর একটি ক্ষতিকর দিক রয়েছে। এ ক্ষতিটি পূর্বালোচিত ক্ষতিগুলোর চেয়ে অনেক বেশী ভয়াবহ। এ ক্ষতিটি হচ্ছে, এ আন্তর্জাতিক ঋণগুলোর কারণে সমগ্র জাতির আর্থিক মর্যাদা বিনষ্ট ও অর্থনৈতিক অবস্থা ধ্বংস হয়ে যায়। সারা দুনিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থার উপর এর অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। অতপর এর বদৌলতে বিভিন্ন জাতির মধ্যে শত্রুতার বীজ উপ্ত হয়। অবশেষে বিপদগ্রস্ত জাতির যুব সমাজ বিক্ষুব্ধ হয়ে চরমপন্থী রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক দর্শন গ্রহণ করতে থাকে এবং একটি রক্তাক্ত বিপ্লব ও ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের মধ্যে নিজের জাতির দুর্দশা ও বিপদ নিরসনের স্বপ্ন দেখতে থাকে।

বলা বাহুল্য নিজের সংকট নিরসন ও প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য যে জাতির অর্থনৈতিক উপকরণ পূর্বেই যথেষ্ট ছিল না সে কেমন করে প্রতি বছর আসলের কিস্তিসহ পঞ্চাশ ষাট লাখ বা এক কোটি দু' কোটি টাকা কেবলমাত্র সুদের খাতে আদায় করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে ? বিশেষ করে যখন তার

আয়ের উৎসগুলোর মধ্য থেকে কোনো একটি বড় ও অধিক মুনাফাদায়ক উৎসকে পূর্বেই জামানাত রাখা হয়েছে এবং তার চাদর আগের চেয়ে অনেক বেশী সংকীর্ণ হয়ে গেছে। এ কারণে এসব ক্ষেত্রে নিজের সংকট নিরসনের জন্য যেসব জাতি বড় বড় সুদী ঋণ গ্রহণ করেছে তাদের অতি অল্প সংখ্যকই সফলকাম হতে দেখা গেছে। বিপরীতপক্ষে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বরং দেখা গেছে, এ ঋণ তার সংকট বৃদ্ধিতে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে, ঋণের কিস্তি ও সুদ আদায় করার জন্য তাদের নিজেদের দেশবাসীর উপর অত্যধিক করভার চাপিয়ে দিতে হয়েছে এবং অনেক দিক দিয়ে ব্যয় কমাতে হয়েছে। এর ফলে একদিকে জাতির সাধারণ মানুষের মধ্যে অস্থিরতা বেড়ে যায়। কারণ তারা যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে তার বিনিময়ে যা পায় তা ঐ ব্যয়ের সমতুল্য হয় না। অন্য দিকে নিজের দেশের লোকদের মাথায় এতবড় বোঝা চাপিয়ে দিয়েও সরকারের পক্ষে ঋণের কিস্তি ও সুদ নিয়মিত আদায় করা কঠিন হয়ে পড়ে। অতপর ঋণগ্রহীতা দেশের পক্ষ থেকে ঋণ আদায়ে যখন অনবরত শৈথিল্য দেখা দেয় তখন বৈদেশিক ঋণদাতারা তার বিরুদ্ধে বেঈমানী, অসদুদ্দেশ্য ও ঋণের অর্থ ফাঁকি দেয়ার অসৎমনোভাব ও চক্রান্তের অভিযোগ আনে। তাদের ইংগিতে তাদের জাতীয় সংবাদপত্রগুলোতে এ দরিদ্র দেশের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালানো হয়, কটূক্তি করা হয়। পরিস্থিতি এ পর্যায়ে উপনীত হলে ঐ দেশের সরকার এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে এবং নিজের পুঁজিপতিদের পক্ষাবলম্বন করে ঋণগ্রহীতা দেশের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হয় না বরং তার সমস্যা ও সংকট থেকে অবৈধভাবে লাভবান হবার চেষ্টা করে। ঋণগ্রস্ত দেশের সরকার জনসাধারণের উপর করভার আরো অধিক বাড়িয়ে এবং অধিকতর ব্যয় সংকুলান করে কোনো প্রকারে দ্রুত এ ফাঁদ থেকে বের হবার চেষ্টা করে। কিন্তু দেশবাসীর উপর এর মারাত্মক প্রভাব পড়ে। অনবরত ও নিত্যকার অর্থনৈতিক বোঝা ও আর্থিক দুর্দশা তাদের মন-মেজাজ তিক্ত করে তোলে। বৈদেশিক ঋণদাতাদের কটূক্তি ও রাজনৈতিক চাপ এ তিক্ততা আরো বাড়িয়ে তোলে। নিজের দেশের ভারসাম্যপূর্ণ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তারা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং দূরদর্শী নেতাদেরকে ত্যাগ করে চরমপন্থী রাজনৈতিক জুয়াড়ীদের পিছনে সারিবদ্ধ হয়। এ চরমপন্থী জুয়াড়ীরা এক কথায় সমস্ত ঋণ অস্বীকার করে ময়দানে নেমে আসে এবং চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলতে থাকে ঃ আমরা কারোর ঋণের কোনো ধার ধারি না, কারো দাবী মানতে আমরা প্রস্তুত নই ক্ষমতা থাকলে আমাদের নিকট থেকে ঋণ আদায় করে নিয়ে যাও।

এ পর্যায়ে সুদের ধ্বংসকারিতা ও সর্বনাশা প্রভাব চরমে পৌঁছে যায়। এরপরও কি কোনো বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি সুদের চূড়ান্ত হারাম হবার

ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করতে পারে ? সুদের এ ধ্বংসকারিতা ও ভয়াবহ পরিণাম প্রত্যক্ষ করার পরও কি কোনো ব্যক্তি রসূলে করীম (স)-এর নিম্নোক্ত বক্তব্য সম্পর্কে কোনো প্রকার সন্দেহ পোষণ করতে পারে ঃ

الربا سبعون جزءا ايسرها ان ينكح الرجل امه -

"সুদ এমন একটি বিরাট গোনাহ যে, একে সত্তরটি ভাগে বিভক্ত করলে তার সবচেয়ে হালকা অংশটিও নিজের মায়ের সাথে যিনা করার সমান গোনাহের শামিল।"–(ইবনে মাজা, বায়হাকি)

আধুনিক ব্যাংকিং

সুদের বিভীষিকার আলোচনা এখনো শেষ হয়নি। বর্তমান যুগে সুদের আভ্যন্তরীণ ক্ষতিকর ক্ষমতা আগের তুলনায় কয়েকগুণ বেড়ে গেছে। এর মূলে রয়েছে আগের মহাজনী সুদের পদ্ধতির পরিবর্তে আধুনিক ব্যাংকিং পদ্ধতির অবতারণা। এ নতুন সংগঠনটি প্রাচীন মহাজনের গদিতে আধুনিক কালের ব্যাংকার ও ধনিক গোষ্ঠীকে বসিয়ে দিয়েছে। এদের সুযোগ্য হাতের স্পর্শে সুদের অস্ত্র সকল যুগের চেয়ে অধিকতর ধ্বংসকর ক্ষমতা লাভ করেছে।

প্রাথমিক ইতিহাস

সুদের এ আধুনিক পদ্ধতিটির অন্তর্নিহিত প্রকৃতি জানতে হলে এর প্রাথমিক ইতিহাস জানা একান্ত প্রয়োজন।

পাশ্চাত্য দেশে সুদের প্রারম্ভকাল সম্পর্কে নিম্নোক্ত তথ্যাদি জানা যায়। প্রথমদিকে দেশে কাগজের নোটের প্রচলন ছিল না। কাজেই অধিকাংশ লোক স্বর্ণের আকারে নিজেদের অর্থ সঞ্চয় করে রাখত। এ অর্থ গৃহে রাখার পরিবর্তে নিরাপত্তার খাতিরে স্বর্ণকারের নিকট গচ্ছিত রাখা হতো। স্বর্ণকার যে পরিমাণ অর্থ জমা নিতো প্রত্যেক ব্যক্তিকে সে পরিমাণ স্বর্ণের হিসেব করে রসিদ লিখে দিতো। রসিদে একথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতো যে, "এ রসিদ বাহকের এ পরিমাণ স্বর্ণ অমুক স্বর্ণকারের নিকট গচ্ছিত ও সংরক্ষিত রয়েছে।" ধীরে ধীরে এ রসিদগুলো ক্রয়-বিক্রয় ঋণ আদায় ও দেনা-পাওনা মীমাংসা করার ব্যাপারে একজনের থেকে অন্য জনের নিকট স্থানান্তরিত হতে থাকে। লোকেরা প্রতিটি লেনদেনের ক্ষেত্রে স্বর্ণকারের নিকট থেকে স্বর্ণ উঠিয়ে তার মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনা করার চেয়ে স্বর্ণের রসিদের আদান-প্রদানের মাধ্যমে ব্যবসায়িক লেনদেন করাটা অধিকতর সহজ মনে করতো। একজনের নিকট রসিদ সোপর্দ করা তাকে স্বর্ণ সোপর্দ করার অর্থ বুঝাতো। এভাবে সব রকমের ব্যবসায়িক লেনদেনে এ রসিদগুলো ধীরে ধীরে যথার্থ স্বর্ণের স্থলাভিষিক্ত হতে থাকে। একটি রসিদের স্থলে স্বর্ণকারের নিকট যে পরিমাণ স্বর্ণ সংরক্ষিত থাকে তা বের করে আনার প্রয়োজন কোনো রসিদ বাহকের অতি অল্পই দেখা দিতো। কোনো ব্যক্তির যখন কাঁচা স্বর্ণের প্রয়োজন দেখা দিতো একমাত্র তখনই স্বর্ণকারের নিকট থেকে ঐ স্বর্ণ বের করা হতো। নচেৎ বিনিময় মাধ্যম হিসেবে স্বর্ণের সাহায্যে যতগুলো কাজ চলা সম্ভব তা সবই ঐ রসিদের সাহায্যে চলতো। ঐ রসিদ কারোর নিকট থাকার অর্থই হচ্ছে সে তাতে উল্লিখিত পরিমাণ স্বর্ণের মালিক।

এ অভিজ্ঞতা থেকে স্বর্ণকাররা জানতে পারলো যে, তাদের নিকট যে স্বর্ণ জমা আছে তার বড় জোর এক-দশমাংশ মালিকেরা নিয়ে যায় অবশিষ্ট নয় ভাগ তাদের অর্থ ভাণ্ডারে অযথা পড়ে থাকে। তারা এ নয় ভাগ স্বর্ণ ব্যবহার করার কথা চিন্তা করলো। এজন্য তারা ঐ স্বর্ণগুলো থেকে লোকদেরকে ঋণ দিতে লাগলো এবং তার বিনিময়ে তাদের নিকট থেকে সুদ গ্রহণ করতে থাকলো। এগুলো তারা এমনভাবে ব্যবহার করতে লাগলো যেন মনে হচ্ছিল তারাই এগুলোর মালিক। অথচ তারা এর মালিক ছিল না, মালিক ছিল অন্যলোক। মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, তারা ঐ স্বর্ণ সংরক্ষণের বিনিময়ে একদিকে মালিকদের নিকট থেকে অর্থ আদায় করতো আবার অন্যদিকে ঐ স্বর্ণ ঋণ দিয়ে লোকদের নিকট থেকে সুদ উসুল করতো।

স্বর্ণকাররা এখানেই ক্ষান্ত হলো না। তাদের চালবাজী ও প্রতারণা আরো এগিয়ে চললো। তারা আসল স্বর্ণ ঋণ দেয়ার পরিবর্তে পরিমিতি পরিমাণ স্বর্ণ উল্লেখ করে ঋণদাতাদেরকে কাগজের রসিদ লিখে দিতে লাগলো। কারণ তারা দেখছিল তাদের কাগজী রসিদ বাজারে বিনিময় মাধ্যম হিসেবে স্বর্ণের সমস্ত কাজ করে যাচ্ছিল। উপরন্তু তারা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জানতে পেরেছিল যে, মালিকদের পক্ষ থেকে সাধারণত দশ ভাগের এক ভাগ স্বর্ণ ফেরত চাওয়া হচ্ছে এবং বাকি ৯ ভাগ তাদের হাতে অব্যবহৃত অবস্থায় থেকে যাচ্ছে। এ অবস্থায় তারা ৯ ভাগের উপর ভিত্তি করে কেবলমাত্র ৯ ভাগের নয় বরং ৯০ ভাগের জাল রসিদ তৈরী করে কাগজী মুদ্রা হিসেবে বাজারে ছাড়তে ও ঋণ দিতে লাগলো। একটা দৃষ্টান্ত দিলে ব্যাপারটা বুঝা আরো সহজ হবে। মনে করুন, এক ব্যক্তি একশো টাকার স্বর্ণ এক স্বর্ণকারের নিকট গচ্ছিত রাখলো। স্বর্ণকার একশো টাকার দশটি রসিদ তৈরী করলো এবং ঐ দশটি রসিদের প্রত্যেকটিতে লিখলো ঃ এ রসিদের স্থলে একশো টাকার স্বর্ণ আমার নিকট গচ্ছিত আছে। এ দশটি রসিদের একটি (যার স্থলে যথার্থই একশো টাকার স্বর্ণ গচ্ছিত রয়েছে) সে স্বর্ণ জমাকারীকে দিল এবং অবশিষ্ট ৯টি রসিদ (যেগুলোর স্থলে আসলে কোনো স্বর্ণ জমা ছিল না) অন্য লোকদেরকে ঋণ দিল এবং তা থেকে সুদ গ্রহণ করতে থাকলো।

নিসন্দেহে এটা ছিল একটা বড় রকমের প্রতারণা। এভাবে প্রবঞ্চনা ও জালিয়াতির মাধ্যমে তারা সম্পূর্ণ ভুয়া মুদ্রার আকারে শতকরা ৯০ ভাগ জাল টাকা তৈরী করে তার মালিক সেজে বসলো। উপরন্তু সমাজের মাথায় সেগুলোকে ঋণ হিসেবে চাপিয়ে দিয়ে সেগুলো থেকে সুদ উসুল করতে লাগলো। অথচ এ অর্থ তাদের উপার্জিত নয়। কোনো বৈধ পদ্ধতিতে তারা এগুলোর মালিকানা অধিকারও লাভ করেনি। এগুলো আসল মুদ্রাও ছিল না,

যার ফলে এগুলোকে বিনিময় মাধ্যম হিসেবে বাজারে চালানো এবং এর বিনিময়ে বস্তু ও সেবা লাভ করা নৈতিকতা, আইন ও অর্থনীতির দিক থেকে বৈধ হবার কোনো সঙ্গত কারণ ছিল না। কোনো সরল প্রাণ ব্যক্তি যখন তাদের কীর্তি-কলাপের এ বিশদ বিবরণী শোনে তখন তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে প্রতারণা, প্রবঞ্চনা ও জালিয়াতি সম্পর্কিত অপরাধ দণ্ডবিধির ধারা-উপধারা-গুলো একের পর এক। সে আশা করতে থাকে, বোধ হয় এরপর সে শুনবে ঐ প্রতারক স্বর্ণকারদের বিরুদ্ধে মামলা চালানো হয়েছে। কিন্তু না ব্যাপারটি তা হয়নি। অবস্থা বরং সেখানে একেবারে উল্টোটাই হয়েছে। এতদিনে ক্রমাগত জাল মুদ্রার ব্যবসা চালিয়ে এ স্বর্ণকারেরা দেশের শতকরা ৯০ ভাগ অর্থের মালিক হয়ে বসেছিল। দেশের রাজা, মন্ত্রী, আমীর-উমরাহ সবাই তাদের ঋণের জালে আটকে পড়েছিল। এমন কি যুদ্ধকালে এবং আভ্যন্তরীণ সংকট উত্তরণের জন্যে বিভিন্ন দেশের সরকার তাদের নিকট থেকে বড় বড় ঋণ নিয়েছিল। কাজেই এ অবস্থায় তারা এত বিপুল অর্থের মালিক হলো কিভাবে —একথা বলার মতো বুকের পাটা কারোর ছিল না। উপরন্তু ইতিপূর্বে আমার 'ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ' গ্রন্থেও আমি একথা বলেছিলাম যে, ইউরোপীয় রেনেসাঁর যুগে চিন্তার মুক্তি এবং স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের শক্তিশালী অস্ত্র নিয়ে পুরাতন জায়গীরদারীর মোকাবিলায় যে নতুন বুর্জোয়া সভ্যতার উদ্ভব হচ্ছিল তার নেতা ও অগ্রবাহিনী ছিল এ মহাজন ও বড় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়। তাদের পিছনে দর্শন, সাহিত্য ও শিল্পকলার বিপুল শক্তি কাজ করছিল। এ স্বর্ণকার সাহেবদের বিশাল ধন ভাণ্ডারের উৎস সন্ধান প্রয়াসী যে কোনো দুঃসাহসিক অভিযাত্রীর উপর তারা বাজপাখীর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য সর্বদা প্রস্তুত ছিল। এভাবে যে প্রতারণা ও জালিয়াতির মাধ্যমে তারা এ সম্পদ আহরণ করেছিল তা আইনের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেছে, এমন কি আইন তাকে সম্পূর্ণ বৈধ বলে স্বীকার করে নিয়েছে এবং বিভিন্ন দেশের সরকার বর্তমানে ব্যাংক মালিক ও ফাইন্যান্সিয়ারে পরিণত এ স্বর্ণকারদের নোট চালু করার অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে। তাদের কাগজের নোট ব্যবসায় জগতে চালু হয়ে গেছে।

দ্বিতীয় পর্যায়

যে মূলধনের ভিত্তিতে পুরাতন যুগের স্বর্ণকাররা আধুনিক পুঁজিপতি ও অর্থনৈতিক জগতের প্রতিপত্তিশালী প্রভুতে পরিণত হলো উপরের আলোচনায় তার আসল চেহারা তুলে ধরা হয়েছে। অতপর তারা আর এক পা অগ্রসর হলো, যা ছিল আগের চেয়েও মারাত্মক ক্ষতিকর। ভুয়া মূলধনের ভিত্তিতে

আধুনিক পুঁজিবাদের এ শক্তিশালী আত্মপ্রতিষ্ঠার যুগটি ছিল পাশ্চাত্য সভ্যতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

এ সময় পশ্চিম ইউরোপ থেকে একদিকে শিল্প ও বাণিজ্য বন্যার বেগে অগ্রসর হয়ে সমগ্র বিশ্ব জয় করতে উদ্যত হয়েছিল এবং অন্যদিকে সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি নতুন ভিত্ গড়ে উঠেছিল—বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিয়ে মিউনিসিপ্যালিটি পর্যন্ত জন জীবনের সর্বক্ষেত্রকে সে নতুন করে গঠন করার উদ্যোগ নিয়েছিল। এ সময় সব রকমের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কাজে অর্থের প্রয়োজন ছিল। নতুন নতুন শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান নিজেদের যাত্রা শুরু করার জন্য পুঁজি চাচ্ছিল। যেসব ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান আগে থেকেই প্রতিষ্ঠিত ছিল তারা নিজেদের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য বড় রকমের পুঁজির সন্ধানে ছিল। সাংস্কৃতিক ও তমদ্দুনিক উন্নতি বিষয়ক বিভিন্ন ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক পরিকল্পনার কাজ শুরু করার ও সাফল্যের সাথে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যও অর্থের প্রয়োজন ছিল। এসব কাজের সাথে যারা জড়িত ছিল তাদের নিজেদের পুঁজি ও অর্থ এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট ছিল না। কাজেই আধুনিক সভ্যতার এ নবজাত শিশুটিকে জীবন রসে সমৃদ্ধ করার জন্য মাত্র দু'টি উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভবপর ছিল ঃ প্রথমত পূর্বতন স্বর্ণকার ও আধুনিক পুঁজিপতিদের সংগৃহীত অর্থ থেকে এবং দ্বিতীয়ত সমাজের মধ্যবিত্ত ও সচ্ছল শ্রেণীর নিকট প্রয়োজনের অতিরিক্ত সঞ্চিত অর্থ থেকে।

এর মধ্যে প্রথম শ্রেণীর ধন-সম্পদগুলো একমাত্র পুঁজিপতিদেরই করতলগত ছিল। তারা আগে থেকেই সুদ গ্রহণে অভ্যস্ত ছিল। কাজেই অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে তাদের এ ধনের একটি পাই পয়সাও কোনো কাজে লাগার উপায় ছিল না। এ উৎস থেকে শিল্পকার ব্যবসায়ী এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কর্মরত ব্যক্তিবর্গ ঋণ বাবদই এ শর্তে অর্থ লাভ করে যে, তাদের লাভ-লোকসান যাই হোক না কেন অথবা লাভের অংক যত বেশী বা কম হোক না কেন পুঁজিপতিদেরকে অবশ্যি একটি নির্ধারিত হার অনুযায়ী সুদ দিতে হবে।

অতপর দ্বিতীয় উৎসটিই ছিল একমাত্র আশা-ভরসা। একমাত্র এখান থেকেই অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক কাজ-কারবারে যথার্থ নীতি সম্মত পদ্ধতিতে পুঁজি সরবরাহ হতে পারতো। কিন্তু পূর্বোল্লিখিত পুঁজিপতিগণ এমন কৌশল ও পদ্ধতি অবলম্বন করল যার ফলে পুঁজির এ উৎসটিও তাদের করায়ত্ব হলো। এখান থেকেও সুদের পথ ছাড়া অন্য সমস্ত পথ দিয়ে অর্থনৈতিক ও তমদ্দুনিক উন্নয়নমূলক কাজ-কারবারে পুঁজি সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলো। পুঁজিপতিদের কৌশলটি ছিল ঃ যারা প্রয়োজনের অতিরিক্ত আয় সঞ্চয় করতো অথবা প্রয়োজন

অপূর্ণ রেখে কিছুটা সঞ্চয় করতে অভ্যস্ত ছিল সুদের লোভ দেখিয়ে পুঁজিপতিদেরকে তাদের সঞ্চিত ধন নিজেদের দিকে টানতে লাগলো। আগেই আলোচিত হয়েছে যে, এ স্বর্ণকার পুঁজিপতিরা এ শ্রেণীর লোকদের সাথে পূর্ব থেকেই সম্পর্কিত ছিল এবং তাদের সঞ্চিত অর্থ এসব স্বর্ণকার পুঁজিপতিদের নিকট আমানত স্বরূপ জমা থাকতো। পুঁজিপতিরা যখন দেখলো এসব অর্থ তাদের নিকট আসার পরিবর্তে ব্যবসায়ে খাটতে শুরু হয়েছে এবং বিভিন্ন কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়ে ব্যবহৃত হচ্ছে তখন তারা প্রমাদ গুণলো। তারা এ শ্রেণীর লোকদেরকে বুঝাতে লাগলো, আপনারা টাকা দিয়ে বিপদ কিনে আনছেন কেন ? এভাবে তো আপনাদেরকে অনেক ঝামেলা পোহাতে হবে। শেয়ার সম্পর্কিত বিষয়াদি আপনাদের নিজেদের মীমাংসা করতে হবে, কোম্পানীর হিসেব রাখতে হবে এবং সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাপার হচ্ছে, এভাবে আপনাদের লোকসানের ঝুঁকিও নিতে হবে। আর মুনাফার জোয়ার-ভাটার প্রভাব আপনাদের আয়ের ওপর পড়তে বাধ্য হবে। এর চেয়ে ভালো ও সহজ পথ হচ্ছে, আপনাদের অর্থ আমাদের নিকট জমা রাখুন, আমরা তা সংরক্ষণ করবো এবং এজন্য কোনো পারিশ্রমিক নেবো না। আমরা বিনা পারিশ্রমিকেই অর্থের পূর্ণ হিসেব রাখবো। আপনাদের নিকট থেকে কিছু নেয়ার পরিবর্তে বরং আমরা আপনাদেরকে নিয়মিত সুদ দিতে থাকবো।

এ কৌশল অবলম্বিত হবার ফলে সঞ্চিত অর্থের শতকরা ৯০ ভাগ বরং এর চেয়েও বেশী অর্থ সরাসরি অর্থনৈতিক ও তমদ্দুনিক কাজে ব্যবহৃত হবার পরিবর্তে পুঁজিপতিদের হাতে চলে গেল। এভাবে সম্ভাব্য সকল প্রকার ব্যবসায়ে লগ্নিযোগ্য পুঁজি পুঁজিপতিদের হস্তগত হলো। অবস্থা এ পর্যায়ে এসে দাঁড়ালো যে, পুঁজিপতিরা পূর্ব থেকেই তাদের ভুয়া পুঁজি সুদী ব্যবসায়ে খাটিয়ে আসছিল, এখন অন্যদের পুঁজিও তারা সস্তা সুদে গ্রহণ করে চড়া সুদে ঋণ দিতে লাগলো। এর ফলে কোথাও কোনো কাজের জন্য তাদের নির্ধারিত সুদের হার ছাড়া অন্য কোনো হারে বা শর্তে পুঁজি সংগ্রহ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো। পুঁজিপতিদের মাধ্যম ও সহযোগিতা ছাড়াই সরাসরি ব্যবসায়ে পুঁজি খাটাতে আগ্রহী যে স্বল্প সংখ্যক লোক থেকে গিয়েছিল একটি নির্ধারিত হারে মুনাফা অর্জন করার স্বাদ তাদেরকেও পাগল করে তুলেছিল এবং তারা সরাসরি কোম্পানীর শেয়ার কেনার পরিবর্তে ঋণপত্র (DEBENTURES) কেনাকে অগ্রাধিকার দিতে লাগলো যেহেতু এর মধ্যে একটি নির্ধারিত হারে মুনাফা লাভের নিশ্চয়তা ছিল।

এ কর্মপদ্ধতি অবলম্বিত হবার ফলে সমাজ পরিপূর্ণরূপে দু ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদিকে থাকে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রসমূহে কর্মরত

সমাজের সমগ্র জনবসতি, যাদের পরিশ্রম, প্রচেষ্টা ও যোগ্যতার ওপর সমস্ত সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক উৎপাদন নির্ভরশীল। আর অন্যদিকে থাকে মুষ্টিমেয় জনবসতি যাদের উপর থাকে এ সমস্ত ক্ষেত্রে পানি সিঞ্চন করার কাজ। পানি সিঞ্চনকারীরা ক্ষেত মজুরদের সাথে ইনসাফ ভিত্তিক সহযোগিতা করতে অস্বীকার করে। তারা সমগ্র পানি সম্পদকে সামষ্টিক স্বার্থের পরিবর্তে কেবলমাত্র ব্যক্তিগত স্বার্থে এবং তাও আবার নিছক অর্থনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করার স্থায়ী নীতি গ্রহণ করে।

এ কর্মপদ্ধতি স্থিরীকৃত করে দেয় যে, সমগ্র দুনিয়ার ওপর ভাবী কর্তৃত্বশালী পাশ্চাত্যের এ নবজাত সভ্যতা হবে একটি নির্ভেজাল বস্তুবাদী সভ্যতা। সেখানে সুদের হার এমন একটি মৌলিক মানদণ্ড হিসেবে গণ্য হবে যার মাধ্যমে সমস্ত জিনিসের মূল্যমান নির্ধারিত হবে। কারণ ধন হচ্ছে সভ্যতার জীবনীশক্তি দানকারী পানির পর্যায়ভুক্ত এবং এ পানি ছাড়া সভ্যতার চাষ সম্ভব নয় কিন্তু সুদের হার অনুযায়ী এ পানির প্রতিটি বিন্দুর একটি আর্থিক মূল্য নির্ধারিত হয়েছে। কাজেই সভ্যতার সমগ্র ক্ষেত্রে যদি কোনো শস্য বীজ বপন করা হয় এবং কোনো উৎপন্ন ফসল মূল্যবান বিবেচিত হয় তাহলে তা হতে হবে এমন কোনো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অর্থনৈতিক লাভ, যা কমপক্ষে বুর্জোয়া সভ্যতার প্রধান পরিচালক পুঁজিপতি নির্ধারিত সুদের হারের সমপরিমাণ হবে।

এ কর্মপদ্ধতি লেখনী ও তরবারি উভয়ের কর্তৃত্বের অবসান ঘটিয়েছে এবং এর স্থলে প্রতিষ্ঠিত করেছে খাতার কর্তৃত্ব। দরিদ্র কৃষক-মজুর থেকে শুরু করে বড় বড় শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এবং বৃহত্তম ও শক্তিশালী রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্য পর্যন্ত সবার নাকের ছিদ্র দিয়ে একটি অদৃশ্য দড়ি চালিয়ে দেয়া হয়েছে। এ দড়ির প্রান্তভাগ এসে গেছে পুঁজিপতির হাতে।

তৃতীয় পর্যায়

অতপর এ দলটি তৃতীয় পদক্ষেপ উঠালো। এবার তারা এ ব্যবসায়কে আধুনিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করলো। প্রথমে তারা ব্যক্তিগত পর্যায়ে কাজ চালাচ্ছিল। অনেক পুঁজিপতি পরিবারের অর্থনৈতিক কাজ-কারবার বৃদ্ধি পেতে পেতে বিরাট প্রতিষ্ঠানের রূপ নিয়েছিল এবং বিভিন্ন দূরবর্তী এলাকায় এগুলোর শাখা-প্রশাখা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বড় বড় প্রতিষ্ঠান হলেও এগুলো ছিল পৃথক পৃথক পরিবারের এবং এরা নিজেদের নামে কাজ করছিল। তারপর তারা চিন্তা করলো, ব্যবসায়ে বিভিন্ন শাখার যেমন যৌথ পুঁজির ভিত্তিতে কোম্পানী গঠিত হচ্ছে অনুরূপভাবে ধন ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেও কোম্পানী গঠন করতে হবে এবং এজন্য বড় বড় সংগঠন কায়েম করতে হবে। এভাবেই

আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থার উৎপত্তি। এই ব্যাংক আজ সারা দুনিয়ার অর্থব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করছে।

এ আধুনিক সংগঠনটির গঠন পদ্ধতির পরিচয় সংক্ষেপে এভাবে দেয়া যায় যে, কয়েকজন পুঁজিপতি মিলে একটি সুদী প্রতিষ্ঠান কায়েম করে, তার নাম হচ্ছে ব্যাংক। এ প্রতিষ্ঠানে দু' ধরনের পুঁজি ব্যবহৃত হয়। এক, অংশীদারদের পুঁজি, এর সাহায্যে কাজের সূচনা করা হয়। দুই, আমানতকারীদের (DEPOSITOR) পুঁজি। ব্যাংকের কাজ বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে এ পুঁজির পরিমাণ বেড়ে যেতে থাকে এবং এরই কারণে ব্যাংকের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও শক্তি বেড়ে যেতে থাকে। একটি ব্যাংকের সাফল্যের যথার্থ মানদণ্ড হচ্ছে এই যে, তার নিকট তার নিজস্ব পুঁজি (অর্থাৎ অংশীদারদের পুঁজি) হবে সবচেয়ে কম কিন্তু আমানতকারীদের পুঁজি হবে সবচেয়ে বেশী। দৃষ্টান্তস্বরূপ পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের কথাই ধরুন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পূর্বে এ ব্যাংকটি সফল ব্যাংকগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল। এ ব্যাংকটির নিজের পুঁজি ছিল মাত্র এক কোটি টাকা। এর মধ্য থেকে ৮০ লাখের কিছু বেশী টাকা অংশীদাররা কার্যত আদায় করেছিল। কিন্তু ১৯৪৫ সালে এ ব্যাংকটি আমানতকারীদের সরবরাহকৃত যে পুঁজি ব্যবহার করছিল তার পরিমাণ ছিল প্রায় ৫২ কোটি টাকা।

মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, আমানতকারীদের টাকায় ব্যাংক তার সমস্ত কাজ চালায়, এ টাকার পরিমাণ ব্যাংকের সমুদয় পুঁজির শতকরা ৯০/৯৫ ভাগ বরং ৯৮ ভাগেও পৌঁছে যায় কিন্তু ব্যাংকের সংগঠন-শৃংখলা ও পরিচালনা ব্যবস্থায় এবং তার নীতি-পদ্ধতিতে এ আমানতকারীদের কোনো অংশ থাকে না। এ ব্যবস্থাপনা ও নীতি পদ্ধতি নির্ধারণের পরিপূর্ণ অধিকারী হয় ব্যাংক মালিকগণ—যাদের পুঁজি হয় সমগ্র পুঁজির মাত্র দু' থেকে পাঁচ ভাগ। আমানতকারীদের কাজ হচ্ছে, তারা কেবল নিজেদের টাকা ব্যাংকে জমা করে দেয় এবং তা থেকে একটি নির্দিষ্ট হারে সুদ গ্রহণ করে। তাদের জমাকৃত টাকা ব্যাংক কিভাবে কোথায় খাটাচ্ছে এসব দেখার কোনো অধিকার তাদের নেই। এ অধিকার আছে কেবল অংশীদারদের পরিচালকবৃন্দ নির্বাচন, নীতি ও পলিসি নির্ধারণ এবং সংগঠন, পরিচালনা ও হিসেব-নিকেশ তত্ত্বাবধান সবকিছুই তাদের হাতে ন্যস্ত। পুঁজি কোন্ দিকে যাবে এবং কোন্ দিকে যাবে না এ সিদ্ধান্তও তারাই করে। আবার অংশীদারদেরও সবার মর্যাদা সমান হয় না। ব্যাংক ব্যবস্থায় একাধিক ক্ষুদ্র অংশীদারদের প্রভাব হয় অতি সামান্য নামকা ওয়াস্তে। আসলে কতিপয় বৃহৎ অংশীদারই পুঁজির এ বিরাট সরোবরটি দখল করে রাখে এবং তারাই এর পানি ইচ্ছা মতো ব্যবহার করে।

ব্যাংক যদিও বড় ছোট অনেক কাজ করে, এর মধ্যে কোনো কোনোটা অবশ্যি কল্যাণকর, প্রয়োজনীয় ও বৈধ বলে বিবেচিতও হয়, কিন্তু এর আসল কাজ হচ্ছে সুদের ভিত্তিতে পুঁজি বিনিয়োগ। ব্যবসায়িক ব্যাংক, শিল্প ব্যাংক, কৃষি ব্যাংক বা অন্য যে কোনো ব্যাংক হোক না কেন, এরা নিজেরা কোনো ব্যবসায় শিল্প বা কৃষি করে না বরং ব্যবসায়ীদেরকে পুঁজির যোগান দেয় এবং তাদের নিকট থেকে সুদ আদায় করে। আমানতকারীদের নিকট থেকে কম সুদে পুঁজি নিয়ে ব্যবসায়ীদেরকে বেশী সুদে ঋণ দেয়াই হচ্ছে এ ব্যাংকগুলোর মুনাফার আসল ও বৃহত্তম উৎস। এভাবে যে লভ্যাংশ অর্জিত হয় তা অন্যান্য ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের অংশীদারদের মধ্যে লভ্যাংশ বণ্টনের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী যথাযথভাবে অংশীদারদের মধ্যে বণ্টিত হয়।

এ প্রসঙ্গে ব্যাংকগুলোর কর্মপদ্ধতির একটু বিস্তারিত বর্ণনা দিতে চাই। ব্যাংক ব্যবসায়ের যথার্থ চেহারা এতে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

ব্যাংকে যেসব আমানত রাখা হয় তাকে বড় বড় দুটো ভাগে বিভক্ত করা যায় ঃ মেয়াদী (FIXED) ও চলতি (CURRENT)। প্রথম শ্রেণীর আমানতটি কমপক্ষে তিন মাস বা এর ঊর্ধ সময়ের জন্য ব্যাংকে রাখা হয় এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর আমানতটি থেকে আমানতকারী সর্বদা টাকা উঠাতে থাকে এবং তাতে জমাও করতে থাকে। ব্যাংকের সাধারণ নিয়ম হচ্ছে, যতদীর্ঘ সময়ের জন্য আমানত ব্যাংকে রাখা হয় সুদের হার হয় ততবেশী, আর যত অল্প সময়ের জন্য রাখা হয় সুদের হার হয় তত অল্প। কোনো কোনো ব্যাংক চলতি হিসেবে (CURRENT ACCOUNT) নামকাওয়াস্তে সামান্য সুদ দেয়। কিন্তু বর্তমানে সাধারণভাবে এ হিসেবে কোনো সুদ দেয়ার নিয়ম নেই। বরং যারা চলতি হিসেব থেকে বারবার এবং বহুবার টাকা উঠায় তাদের নিকট থেকে ব্যাংক তাদের হিসেব রাখার পারিশ্রমিক আদায় করে অথবা তাদের অর্থের কিছু অংশ স্থায়ীভাবে ব্যাংকে জমা রাখার দাবী জানায়। এ স্থায়ী আমানতের সুদ থেকে ব্যাংক তার হিসেব রক্ষার ব্যয় উঠিয়ে নেয়।

প্রাত্যহিক লেনদেনের জন্য ব্যাংক নিজের পুঁজির একটি অংশ (শতকরা প্রায় ১০ থেকে ২৫ ভাগ) নগদ নিজের কাছে রেখে দেয়। আর একটি অংশ টাকার বাজারে (MONEY MARKET) ঋণ হিসেবে ছাড়ে। এ অর্থটি প্রায় নগদ, টাকার ন্যায় সর্বদা লভ্য ও ব্যবহারযোগ্য (LIQUID) থাকে। এর ওপর শতকরা $\frac{১}{২}$ থেকে ১ ভাগ সুদ পাওয়া যায়। অতপর একটি অংশ হুণ্ডির কারবারে এবং অন্যান্য স্বল্প মেয়াদী ঋণে ব্যবহৃত হয়। এগুলো যেহেতু স্বল্প সময়ের মধ্যে ফেরত দিতে হয় তাই এগুলোতেও সুদ কম। যেমন, শতকরা ২

থেকে ৪ ভাগ বা এর চেয়ে কম-বেশী থাকে। এরপর পুঁজির একটি অংশ এমন কাজে লাগানো হয় যেখানে একদিকে পুঁজির সংরক্ষণের সর্বাধিক নিশ্চয়তা থাকে এবং অন্যদিকে প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট বস্তুগুলো বিক্রি করেও পুঁজি উঠিয়ে নেয়া যেতে পারে। এ সাথে এর ওপর শতকরা দুই তিন ভাগ সুদও উসূল করা হয়। যেমন সরকারী জামানত (GOVERNMENT SECURITIES) এবং নির্ভরযোগ্য কোম্পানীর শেয়ার ও ঋণপত্র (DEBENTURES) সমূহে এ পুঁজি খাটানো হয়। প্রত্যেক ব্যাংক নগদ অর্থ রাখার পর এ তিনটি খাত আবশ্যিক রূপে নিজের কারবারের অন্তর্ভুক্ত করে। কারণ তার নিরাপত্তার জন্য এ তিনটি অপরিহার্য। এর ফলে ব্যাংকের কোমর শক্ত হয় এবং বিপদ বা প্রয়োজনকালে তার কাজে লাগে।

অতপর পুঁজির একটি বিরাট অংশ ব্যবসায়ী ও সম্পদশালী ব্যক্তিদেরকে এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ঋণ দেয়া হয়। এটিই হচ্ছে ব্যাংকের আয়ের বৃহত্তম উৎস। এখান থেকে সর্বাধিক হারে সুদ লাভ করা হয়। প্রত্যেক ব্যাংক তার সঞ্চিত পুঁজির বৃহত্তম অংশ এ খাতে ব্যবহার করার সুযোগ পেতে চায়। সাধারণভাবে ব্যাংকগুলো এ খাতে ৩০ থেকে ৬০ ভাগ পর্যন্ত পুঁজি খাটায় এবং প্রধানত দেশের ও বিশ্বের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে এর মধ্যে কমবেশী হতে থাকে।

এ বিস্তারিত আলোচনা থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ব্যাংক আমানতকারীদের ও নিজেদের পক্ষ থেকে প্রদত্ত পুঁজি বিভিন্ন সুদ গ্রহণকারী ঋণের খাতে খাটায়। এ সুদগুলো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমাজের সাধারণ মানুষদের মাথায় চাপিয়ে দেয়া হয়। অতপর আমানতকারীদেরকে 'মুনাফা' নামে যে বস্তুটি দেয়া হচ্ছে তা তাদেরই ঋণ বাবদ সমাজের পকেট থেকে আদায়কৃত সুদের একটি অংশ বৈ আর কিছুই নয়। নিসন্দেহে ব্যাংক বৈধ পর্যায়ে কিছু কাজও করে থাকে এবং এর মাধ্যমে যে পারিশ্রমিক বা কমিশন লাভ করা হয় তা তার আয়ের মাধ্যমগুলোর অন্যতম। কিন্তু এ পথে ব্যাংক যা আয় করে তা তার সমগ্র আয়ের বড় জোর ৫ ভাগ হতে পারে।

ফলাফল

এভাবে পুঁজিপতিদের সংগঠন কায়েম হবার পর প্রথম যুগের একক ও বিক্ষিপ্ত মহাজনদের তুলনায় বর্তমানের একত্রীভূত ও সংগঠিত পুঁজিপতিদের মর্যাদা, প্রভাব ও আস্থা কয়েকগুণ বেড়ে গেছে এবং এর ফলে সারা দেশের ধন-সম্পদ তাদের নিকট কেন্দ্রীভূত হয়ে গেছে। আজকের দিনে এক একটি ব্যাংকে শত শত কোটি টাকা জমা হয়। মুষ্টিমেয় কয়েকজন প্রভাবশালী

পুঁজিপতি এগুলো নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে। এ পদ্ধতিতে তারা কেবল নিজের দেশের নয় বরং সারা দুনিয়ার অর্থনৈতিক, তমদ্দুনিক ও রাজনৈতিক জীবনের উপর চরম স্বার্থন্ধতা সহকারে কর্তৃত্ব করতে থাকে।

এদের শক্তিমত্তা আন্দাজ করার জন্য কেবল এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ বিভাগের পূর্বে ভারতের বড় বড় ব্যাংকগুলোর অংশীদারদের সংগৃহীত পুঁজির পরিমাণ ছিল মাত্র ১৭ কোটি টাকা কিন্তু আমানতকারীদের গচ্ছিত পুঁজির পরিমাণ ছ'শ কোটি টাকায় পৌঁছে গিয়েছিল। এ ব্যাংকগুলোর সমগ্র শাসন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ছিল বড়জোর দেড় দু'শ পুঁজিপতির হাতে। কিন্তু একমাত্র সুদের লোভে দেশের লাখো লাখো লোক এ বিপুল পরিমাণ অর্থ তাদের হাতে তুলে দিয়েছিল এবং এ শক্তিশালী অস্ত্র তারা কখন কোথায় কিভাবে ব্যবহার করে, সে ব্যাপারে কারোর কোনো চিন্তাই ছিল না। যে কোনো ব্যক্তি অনুমান করতে পারে, যেসব পুঁজিপতির হাতে এত বিপুল পরিমাণ অর্থ জমা হয়ে গেছে তারা দেশের শিল্প, ব্যবসায়, অর্থনীতি, রাজনীতি ও সংস্কৃতি সভ্যতার উপর কত ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করছে। এ প্রভাব দেশ ও দেশবাসীর স্বার্থে কাজ করছে, না এসব স্বার্থান্ধ পুঁজিপতিদের নিজেদের স্বার্থোদ্ধারে ব্যয়িত হচ্ছে তাও সহজেই অনুমান করা যায়।

এ পর্যন্ত এমন এক দেশের অবস্থা বর্ণনা করলাম যেখানে পুঁজিপতিদের সংগঠন এখনো সম্পূর্ণ প্রাথমিক পর্যায়ে অবস্থান করছে এবং ব্যাংকগুলোর মোট আমানত সমগ্র জনসংখ্যার উপর মাথাপিছু মাত্র ৭ টাকা করে পড়ে। এখন এই প্রেক্ষিতে অন্যান্য দেশের কথা চিন্তা করুন যেখানে এ হার মাথাপিছু হাজার দু হাজার টাকা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। চিন্তা করুন সেখানে পুঁজি কেন্দ্রীয়করণের কি অবস্থা। ১৯৩৬ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী কেবলমাত্র ব্যবসায়িক ব্যাংকগুলোর আমানতের হার আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে মাথাপিছু ১৩১৭ পাউণ্ড, ইংল্যাণ্ডে ১৬৬৪ পাউণ্ড, সুইজারল্যাণ্ডে ২৭৫ পাউণ্ড, জার্মানীতে ২১২ পাউণ্ড, ও ফ্রান্সে ১৬৫ পাউণ্ড ছিল। এ দেশগুলোর অধিবাসীরা এত ব্যাপক হারে ও বিপুল পরিমাণে নিজেদের অতিরিক্ত আয় ও সঞ্চিত পুঁজি তাদের পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দিয়েছিল। প্রতিটি গৃহ থেকে সংগৃহীত এ বিপুল পরিমাণ অর্থ মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকটি হাতে কেন্দ্রীভূত হচ্ছিল। যাদের নিকট এগুলো কেন্দ্রীভূত হচ্ছে তাদেরকে কারো নিকট জবাবদিহি করতে হয় না, নিজেদের প্রবৃত্তি ছাড়া অন্য কারো নির্দেশও তারা গ্রহণ করে না এবং নিজেদের স্বার্থ ছাড়া আর কোনো দিকে তাদের দৃষ্টিও নেই। তারা কেবলমাত্র সামান্য সুদের আকারে এ বিরাট বিশাল ধনাগারের 'ভাড়া' আদায় করে যাচ্ছে এবং বাস্তবে তারাই এর মালিকে পরিণত হচ্ছে। অতপর এ শক্তির জোরে তারা

বিভিন্ন দেশের ও জাতির ভাগ্য নিয়ে খেলা করে, তারা ইচ্ছামতো যে কোনো দেশে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে। তারা ইচ্ছামতো দু দেশের মধ্যে যুদ্ধ বাধায় আবার ইচ্ছামতো যে কোনো সময় সন্ধি স্থাপন করায়। নিজেদের অর্থ লিপ্সার দৃষ্টিতে যে জিনিসটিকে তারা বাঞ্ছনীয় মনে করে তার প্রচলন বাড়ায় ও বিকাশ সাধন করে, আবার যেটিকে অবাঞ্ছনীয় মনে করে তার বিকাশ লাভের সমস্ত পথই বন্ধ করে দেয়। তাদের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা কেবল বাজারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, সাহিত্য ও জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র, বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার, সাংবাদিক প্রতিষ্ঠান, ধর্ম চর্চা কেন্দ্র ও রাষ্ট্রীয় পার্লামেন্ট—সর্বত্রই তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত। কারণ দেশের ও জাতির সমুদয় অর্থ তাদের 'পায়ের ভৃত্যে' পরিণত হয়েছে।

এ মহা বিপর্যয়ের ধ্বংসলীলা দেখে পাশ্চাত্য চিন্তাবিদগণই শিউরে উঠেছেন। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশ থেকে উচ্চ কলস্বরে ধ্বনি উত্থিত হচ্ছে ; একটি অতি ক্ষুদ্র দায়িত্বহীন স্বার্থান্ধ শ্রেণীর হাতে ধনের এ বিপুল শক্তি কেন্দ্রীভূত হওয়া সমগ্র সমাজ ও জাতীয় জীবনের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। কিন্তু আমাদের দেশে এখনো বলা হচ্ছে, সুদের কারবার তো ছিল পুরোনো আমলের আড়তদার মহাজনদের অপবিত্র ও হারাম কারবার। আজকের যুগের উন্নত, রুচিশীল ও সুসভ্য ব্যাংকারগণ অত্যন্ত পূত-পবিত্র কারবার করছেন। তাদের ব্যবসায়ে অর্থ খাটানো এবং তা থেকে নিজের অংশ নেয়া হারাম হবে কেন ? অথচ পুরনো মহাজন ও আজকের এ ব্যাংকারদের মধ্যে যদি সত্যিই কোনো পার্থক্য সূচিত হয়ে থাকে, তাহলে তো কেবল এতটুকু যে, তারা একা একা ডাকাতি করতো আর এরা দলবল জুটিয়ে ডাকাতদের বড় বড় দল গঠন করে, দলবদ্ধভাবে ডাকাতি করছে। এদের মধ্যে দ্বিতীয় পার্থক্যটি হচ্ছে, পুরোনো ডাকাতদের প্রত্যেকেই দরজা ও দেয়াল ভাঙ্গার যন্ত্রপাতি এবং মানুষ মারার অস্ত্র-শস্ত্র নিজেরাই আনতো কিন্তু আজ সমগ্র দেশবাসী নিজেদের নির্বুদ্ধিতা, মূর্খতা ও আইনের শৈথিল্যের কারণে অসংখ্য যন্ত্র ও অস্ত্র তৈরী করে, 'সামান্য ভাড়ায়' সংঘবদ্ধ ডাকাতদের হাতে তুলে দিচ্ছে। দিনের বেলায় তারা জনগণকে 'ভাড়া' আদায় করে আর রাতের আঁধারে ঐ জনগণের ওপর তাদের প্রদত্ত যন্ত্র ও অস্ত্রের সাহায্যে ডাকাতি করে।

এহেন 'ভাড়া'-কে হালাল ও পবিত্র গণ্য করার জন্য আমাকে বলা হচ্ছে।

সুদ সম্পর্কে ইসলামের বিধান

এ পর্যন্ত আমরা যুক্তি ও তথ্যের মধ্যে আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছিলাম। এবার কুরআন ও হাদীসের আলোকে সুদের পর্যালোচনা করতে চাই। সুদ কি? এর সীমানা কি ? সুদ হারাম হবার যেসব বিধান ইসলাম দিয়েছে সেগুলো কোন্ কোন্ ব্যাপারে ও কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ? সুদের বিলোপ সাধন করে মানব জীবনের অর্থনৈতিক বিষয়াবলীকে ইসলাম কিভাবে পরিচালনা করতে চায় ? এগুলোই হবে আমাদের পরবর্তী আলোচনার বিষয়বস্তু।

রিবার অর্থ

কুরআন মজীদে সুদের প্রতিশব্দ হিসেবে 'রিবা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এর মূলে আছে আরবী ভাষায় ر ب و তিনটি হরফ। এর অর্থের মধ্যে বেশী, বৃদ্ধি, বিকাশ, চড়া প্রভৃতি ভাব নিহিত। যেমন, ربا (রাবা) অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া ও বেশী হওয়া। ربا فلان الرابية অর্থ সে টিলায় চড়লো। ربا فلان السويق অর্থ সে ছাতুর মধ্যে পানি ঢাললো এবং ছাতু ফুলে উঠলো। ربا فی حجره অর্থ সে অমুকের কোলে লালিত পালিত হয়েছে। اربى الشئى অর্থ জিনিসটি বৃদ্ধি করেছে। ربوة (রাবওয়াতুন) অর্থ উচ্চতা। رابية অর্থ এমন স্থান বা জমি যা ধরাপৃষ্ঠে থেকে উঁচু। কুরআন মজীদে এ শব্দটির মূল থেকে নির্গত শব্দাবলী যেখানে ব্যবহৃত হয়েছে সেখানেই বৃদ্ধি, উচ্চতা ও বিকাশ অর্থ পাওয়া যায়। যেমন ঃ

فَإِذَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ـ(الحج : ٥)

"যখন আমি তার ওপর পানি বর্ষণ করলাম তখন তা সবুজ শ্যামল হয়ে উঠলো এবং শস্য ও ফল দান করতে লাগলো।"-(সূরা আল হাজ্জ ঃ ৫)

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِي الصَّدَقٰتِ ط ـ(البقرة : ٢٧٦)

"আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং সদকাকে বৃদ্ধি দান করেন।"
-(সূরা আল বাকারা ঃ ২৭৬)

فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا ط ـ(الرعد : ١٧)

"যে ফেনাপুঞ্জ উপরে উঠে এসেছিল বন্যা তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেলো।"
-(সূরা আর রাআদ ঃ ১৭)

فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً ۝(الحاقة : ١٠)

"সে তাদেরকে আরো শক্ত করে ধরলো।"−(সূরা আল হাক্কাহ ঃ ১০)

اَنْ تَكُونَ اُمَّةٌ هِىَ اَرْبٰى مِنْ اُمَّةٍ ط ـ(النحل :٩٢)

"যাতে এক জাতি অন্য জাতি থেকে অগ্রসর হয়ে যায়।"
−(সূরা আন নাহল ঃ ৯২)

اٰوَيْنٰهُمَا اِلٰى رَبْوَةٍ ـ(المؤمنون : ٥٠)

"আমি মরিয়ম ও ঈসাকে একটি উচ্চস্থানে আশ্রয় দান করলাম।"
−(সূরা আল মুমেনুন ঃ ৫০)

এ ধাতু থেকেই রিবা (ربوا) শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, ধন বৃদ্ধি হওয়া এবং আসল থেকে বেড়ে যাওয়া। কুরআনেও এ অর্থটি সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে ঃ

وَذَرُوْا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبٰوٓا .... وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ ج

"আর লোকদের নিকট তোমাদের যাকিছু সুদ অবশিষ্ট (পাওনা) রয়ে গেছে তা ছেড়ে দাও। ------ আর যদি তোমরা তাওবা করে নাও তাহলে তোমাদের মূলধনটাই (অর্থাৎ প্রদত্ত আসল অর্থ) ফেরত পাবার অধিকার তোমাদের আছে।"−(সূরা আল বাকারা ঃ ২৭৮-২৭৯)

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَاْ فِىْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ـ(الروم : ٣٩)

"যে সুদ তোমরা দিয়েছো এ উদ্দেশ্যে যে, মানুষের ধন বৃদ্ধি পাবে আল্লাহর নিকট তার সাহায্যে ধন বৃদ্ধি হয় না।"−(সূরা আর রূম ঃ ৩৯)

এ আয়াতগুলো থেকে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, আসল অর্থের উপর যাকিছু বাড়তি হবে তা 'রিবা' আখ্যা পাবে। কিন্তু কুরআন মজীদ ঢালাওভাবে সব রকমের বৃদ্ধিকে হারাম গণ্য করেনি। বৃদ্ধি ব্যবসায়েও হয়। কুরআনে একটি বিশেষ ধরনের বৃদ্ধিকে হারাম গণ্য করেছে এবং এ বৃদ্ধিকে 'রিবা' নামকরণ করেছে। ইসলাম পূর্ব যুগে আরবী ভাষায় এ বিশেষ পর্যায়ের লেনদেনটিকে ঐ একই নামে অভিহিত করা হতো। কিন্তু তৎকালে লোকেরা 'রিবা'-কে ব্যবসায়ের ন্যায় বৈধ মনে করতো যেমন আধুনিক জাহেলীয়াতে মনে করা হয়। ইসলাম এসে জানিয়ে দিল যে, ব্যবসায়ের ফলে মূলধনে যে বৃদ্ধি হয় তা 'রিবা'র মাধ্যমে বৃদ্ধি থেকে আলাদা। প্রথম ধরনের বৃদ্ধিটি হালাল এবং দ্বিতীয় ধরনের বৃদ্ধিটি হারাম।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ط

"সুদখোরদের এহেন পরিণতি হবার কারণ হচ্ছে এই যে, তারা বলেছে, ব্যবসা রিবা (সুদ) সদৃশ্য অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল এবং রিবাকে হারাম গণ্য করেছেন।"-(সূরা আল বাকারা ঃ ২৭৫)

যেহেতু রিবা ছিল একটি বিশেষ ধরনের বৃদ্ধির নাম এবং তা সর্বজন পরিচিত ও প্রসিদ্ধ ছিল তাই কুরআন মজীদে এর কোনো ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি। কুরআন এ ব্যাপারে কেবল এতটুকু বলাই যথেষ্ট মনে করেছে যে, আল্লাহ রিবাকে হারাম গণ্য করেছেন কাজেই তোমরা এটিই পরিহার করো।

জাহেলী যুগের রিবা

জাহেলী যুগে যে সমস্ত লেনদেনের ক্ষেত্রে 'রিবা' শব্দটির ব্যবহার হতো হাদীসে তার বিভিন্ন বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে।

কাতাদাহ বলেন, জাহেলী যুগের রিবা ছিল নিম্নরূপ ঃ এক ব্যক্তি অন্যজনের হাতে কোনো জিনিস বিক্রি করতো এবং মূল্য আদায় করার জন্য তাকে নির্দিষ্ট সময় দিতো। এ সময় অতিক্রান্তের পর যদি সে মূল্য আদায় না করতো তাহলে তাকে আরো সময় দিতো এবং মূল্য বাড়িয়ে দিতো।

মুজাহিদ বলেন, জাহেলী যুগের রিবা ছিল নিম্নরূপ ঃ এক ব্যক্তি অন্যের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করে তাকে বলতো, যদি তুমি আমাকে অমুক দিন থেকে অমুক দিন পর্যন্ত সময় দাও তাহলে আমি তোমাকে এ পরিমাণ বেশী দেবো।-(ইবনে জারীর, ৩য় খণ্ড, ৬২ পৃঃ)

আবু বকর জাস্সাস তার নিজস্ব অনুসন্ধানের ভিত্তিতে বলেন, জাহেলী যুগে লোকেরা ঋণ গ্রহণ করার সময় ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হতো। তাতে বলা হতো, একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আসল মূলধন থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বেশী অর্থ ঋণগ্রহীতাকে আদায় করতে হবে।-(আহকামুল কুরআন, ১ম খণ্ড)

এ ব্যাপারে ইমাম রাযীর অনুসন্ধান হচ্ছে, জাহেলী যুগে লোকদের মধ্যে একটি বিশেষ নিয়ম প্রচলিত ছিল। তারা এক ব্যক্তিকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অর্থ দিতো এবং তার নিকট থেকে প্রতি মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ সুদ আদায় করতো। মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেলে ঋণগ্রহীতার নিকট আসল মূলধন চাওয়া হয়। যদি সে আদায় করতে না পারতো তাহলে আরো একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাকে অবকাশ দেয়া হতো এবং সুদ বাড়িয়ে দেয়া হতো।-(তাফসীরে কবীর, ২য় খণ্ড, ৩৫১ পৃঃ)

তদানীন্তন আরবে প্রচলিত এ ধরনের ব্যবসায়কে আরববাসীরা নিজেদের ভাষায় 'রিবা' নাম দিয়েছিল এবং কুরআন মজীদ একেই হারাম ঘোষণা করেছিল।[১]

ব্যবসায় ও রিবার মধ্যে নীতিগত পার্থক্য

ব্যবসায় ও রিবার মধ্যে নীতিগত পার্থক্য কি ? রিবার বৈশিষ্ট্য কি, যে কারণে তার চেহারা ব্যবসায়ের থেকে ভিন্ন প্রকার দেখায় এবং ইসলাম কেনইবা তাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে—এ ব্যাপারগুলো এবার গভীরভাবে চিন্তা করুন।

ব্যবসা বলতে বুঝায়, সেখানে ক্রেতা ও বিক্রেতা দু'টি পক্ষ আছে। বিক্রেতা একটি বস্তু বিক্রির জন্য পেশ করে। ক্রেতা ও বিক্রেতা মিলে এ বস্তুটির একটি মূল্য স্থির করে। এ মূল্যের বিনিময়ে ক্রেতা বস্তুটি কিনে নিয়ে নেয়। এ ক্ষেত্রে বিক্রেতা নিজে পরিশ্রম করে এ অর্থ ব্যয় করে ঐ বস্তুটি তৈরী করেছে অথবা সে কোথাও থেকে বস্তুটি কিনে এনেছে—এ দুটোর যে কোনো একটি অবস্থার অবশ্যি সৃষ্টি হয়। এ উভয় অবস্থায়ই সে বস্তুটি কেনার বা সংগ্রহ করার ব্যাপারে নিজের যে মূলধন খাটিয়েছে তার সাথে নিজের পরিশ্রমের অধিকার সংযুক্ত করে এবং এটিই তার মুনাফা।

অন্যদিকে রিবা বলতে বুঝায়, এক ব্যক্তি নিজের মূলধন অন্য একজনকে ঋণ দেয়। এ সংগে শর্ত আরোপ করে যে, একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঋণ গ্রহীতাকে মূলধনের চেয়ে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বেশী অর্থ আদায় করতে হবে। এ ক্ষেত্রে মূলধনের বিনিময়ে মূলধন এবং নির্দিষ্ট সময়ের অবকাশের বিনিময়ে বাড়তি অর্থ লাভ করা হয়—পূর্বাহ্নে একটি শর্ত হিসেবে যেটিকে নির্দিষ্ট করা হয়ে থাকে। এ বাড়তি অর্থের নাম সুদ বা রিবা। এটি কোনো বিশেষ অর্থ বা বস্তুর বিনিময় নয় বরং নিছক অবকাশের বিনিময়। যদি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে মূল্য নির্ধারিত হবার পর ক্রেতার নিকট শর্ত পেশ করা হয় যে, মূল্য আদায় করতে (মনে করুন) এক মাস দেরী হলে মূল্য একটি নির্দিষ্ট হারে বেড়ে যাবে, তাহলে এ বৃদ্ধি সুদের পর্যায়ভুক্ত হবে।

কাজেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মোকাবেলায় শর্ত সাপেক্ষে মূলধনের উপর যে নির্দিষ্ট পরিমাণ বাড়তি অর্থ গ্রহণ করা হয় তাকেই সুদ বলা হয়। সুদের সংজ্ঞা এভাবেই নিরূপিত হয়। তিনটি অংশের একত্র সংযোজনই সুদের উদ্ভব। এক, মূলধন বৃদ্ধি। দুই, সময়ের অনুপাতে বৃদ্ধির সীমা নির্ধারণ। তিন, এগুলোকে

---

১. এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য এ গ্রন্থের পরিশিষ্ট দেখুন।

শর্ত হিসেবে গ্রহণ করা। ঋণ সংক্রান্ত যে কোনো লেনদেনের মধ্যে এ তিনটি অংশ পাওয়া গেলে তা সুদী লেনদেনে পরিণত হয়। কোনো সৃষ্টিশীল ও গঠনমূলক কাজে লাগাবার অথবা কোনো ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য এ ঋণ গৃহীত হলেও এবং ঋণগ্রহীতা দরিদ্র বা ধনী যাই হোক না কেন তাতে এর আসল চরিত্রের মধ্যে কোনো পার্থক্য সূচিত হয় না।

ব্যবসা ও সুদের মধ্যে নীতিগত পার্থক্য হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

এক ঃ ব্যবসায়ে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে মুনাফার বিনিময় হয় সমান পর্যায়ে। কারণ ক্রেতা বিক্রেতার নিকট থেকে যে বস্তুটি ক্রয় করে তা থেকে লাভবান হয়। অন্যদিকে বিক্রেতা ঐ বস্তুটি ক্রেতার জন্য সংগ্রহ করার ব্যাপারে যে পরিশ্রম, বুদ্ধি ও সময় ব্যয় করে তার পারিশ্রমিকই সে লাভ করে। বিপরীতপক্ষে সুদী লেনদেনে সমান পর্যায়ে মুনাফা বিনিময় হয় না। সুদগ্রহীতা ধনের একটি নির্ধারিত পরিমাণ লাভ করে, যা তার জন্যে অবশ্যি লাভজনক হয়। কিন্তু সুদদাতা কেবলমাত্র সাময়িক অবকাশ লাভ করে, এর লাভজনক হবার কোনো নিশ্চয়তা নেই। ঋণগ্রহীতা ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য ঋণ গ্রহণ করে থাকলে সাময়িক অবকাশ তার জন্য লাভজনক হয় না বরং নিশ্চিত ক্ষতিকর হয়। আর ব্যবসা, শিল্প, কারিগরী বা কৃষিতে খাটাবার উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণ করে থাকলে অবকাশ তার জন্য একদিকে যেমন লাভের সম্ভাবনা নিয়ে দেখা দেয় তেমনি অন্যদিকে ক্ষতির সম্ভাবনা নিয়েও উপস্থিত হয়। কিন্তু ব্যবসায়ে লাভ-লোকসান যাই হোক না কেন ঋণদাতা সর্বাবস্থায় তা থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ মুনাফা লাভ করে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, সুদী কারবারে এক পক্ষের লাভ ও অন্য পক্ষের লোকসান হয় অথবা এক পক্ষের নিশ্চিত ও নির্দিষ্ট লাভ অন্যপক্ষের অনিশ্চিত ও অনির্ধারিত লাভ হয়।

দুই ঃ ব্যবসায়ে বিক্রেতা ক্রেতার নিকট থেকে যতবেশী মুনাফা অর্জন করুক না কেন মাত্র একবারই সে তা অর্জন করে। কিন্তু সুদী কারবারে মূলধন দানকারী অনবরত নিজের ধনের বিনিময়ে মুনাফা অর্জন করতে থাকে এবং সময় অতিক্রান্তের সাথে সাথে এ মুনাফার পরিমাণ বেড়ে যেতেও থাকে। তার ধন থেকে ঋণগ্রহীতা যতই লাভবান হোক না কেন তা একটি বিশেষ সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকে। কিন্তু এ মূলধনের বিনিময়ে ঋণদাতা যে মুনাফা অর্জন করে তার কোনো সীমা নেই। তার এ সীমাহীন মুনাফা তার সমস্ত উপার্জন, সমস্ত উপায়-উপকরণ ও ধন-দৌলত এবং তার যাবতীয় প্রয়োজনকে ছাপিয়ে যাবার পরও শেষ নাও হতে পারে।

তিন ঃ ব্যবসায়ে পণ্য ও তার মূল্যের বিনিময় হবার সাথে সাথেই কারবার শেষ হয়ে যায়। এর পরে ক্রেতা কোনো পণ্য বা বস্তু বিক্রেতাকে ফেরত দেয়

না। কিন্তু সুদী কারবারে ঋণগ্রহীতা মূলধন গ্রহণ করার পর তা ব্যয় করে ফেলে অতপর এ ব্যয়িত বস্তু পুনর্ববার লাভ করে তার সাথে সুদের বাড়তি অংশ সংযুক্ত করে তাকে ফেরত পাঠাতে হয়।

চার ঃ ব্যবসা, শিল্প, কৃষি ও কারিগরীতে মানুষ পরিশ্রম করে ও বুদ্ধি খাটিয়ে তার ফল লাভ করে। কিন্তু সুদী কারবারে সে নিছক নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন খাটিয়ে কোনো প্রকার পরিশ্রম না করে, চিন্তা ও বুদ্ধি শক্তি ব্যবহার না করে অন্যের উপার্জনের সিংহভাগ দখল করে বসে। পারিভাষিক অর্থে যাকে অংশীদার বলা হয়, যে ব্যক্তি লাভ-লোকসান উভয়তেই অংশীদার থাকে এবং লাভের আনুপাতিক হারে তা থেকে অংশ নেয় সে তেমন ধরনের অংশীদার নয়। বরং সে হয় এমন একজন অংশীদার যে লাভ-লোকসান এবং লাভের আনুপাতিক হারের পরোয়া না করে নিজের নির্ধারিত ও শর্তাবদ্ধ মুনাফার দাবীদার হয়।

হারাম হবার কারণ

এ সমস্ত কারণে আল্লাহ ব্যবসা হালাল ও সুদ হারাম করেছেন। এ কারণগুলো ছাড়া সুদ হারাম হবার আরো অনেক কারণ আছে, ইতিপূর্বে আমরা সেগুলো আলোচনা করেছি। সুদ কার্পণ্য, স্বার্থান্ধতা, হৃদয়হীনতা, নিষ্ঠুরতা ও অর্থগৃধ্নুতার অসৎ গুণাবলী মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করে। বিভিন্ন জাতির মধ্যে শত্রুতার বীজ বপন করে। মানুষের মধ্যকার সহানুভূতি ও পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার সম্পর্ক ছিন্ন করে। মানুষের মধ্যে ধন সঞ্চয় করে নিছক নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার প্রবণতা সৃষ্টি করে। সমাজে ধনের অবাধ গতি ও আবর্তনে বাধা দেয়। বরং ধনের আবর্তনের গতি ঘুরিয়ে বিত্তহীনদের থেকে বিত্তবানদের দিকে ফিরিয়ে দেয়। তার কারণে সমগ্র দেশবাসীর ধন সমাজের একটি শ্রেণীর হাতে কেন্দ্রভূতি হয়ে যায়। এর ফলে সমগ্র সমাজ ধ্বংসের সম্মুখীন হয়। অর্থনীতি বিশেষজ্ঞগণের নিকট এ ব্যাপারটি মোটেই প্রচ্ছন্ন নেই। সুদের এ সকল প্রভাব অনস্বীকার্য। কাজেই এ সত্যটিও অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে, যে কাঠামোর ভিত্তিতে ইসলাম মানুষের নৈতিক প্রশিক্ষণ, তার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন সুসংহত ও তার অর্থনৈতিক জীবন সংগঠন করতে চায় সুদ তার প্রতিটি অংশের পূর্ণ পরিপন্থী। নগণ্যতম সুদী কারবার ও তার আপত সর্বাধিক নিষ্কলুষ অবস্থা ও ইসলামের সমগ্র কাঠামোটা নষ্ট করে দেয়। এ কারণেই আল্লাহ কুরআন মজীদে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় সুদ বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

اِتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ج (البقرة : ٢٧٨ - ٢٧٩)

"আল্লাহকে ভয় করো আর লোকদের নিকট তোমাদের যে সুদ পাওনা বাকি রয়ে গেছে সেগুলো ছেড়ে দাও, যদি তোমরা ঈমান রেখে থাকো। আর যদি তোমরা এমনটি না করো, তাহলে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা গ্রহণ করো।"-(সূরা আল বাকারা ঃ ২৭৮-২৭৯)

সুদ হারামের ব্যাপারে কঠোর নীতি

কুরআন মজীদে বহুবিধ গোনাহের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে এবং সেগুলোর জন্য কঠোর শাস্তি ও ভীতি প্রদর্শন করাও হয়েছে। কিন্তু সুদের ন্যায় এতো কঠোর ভাষায় অন্য কোনো গোনাহের প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়নি।[১] এজন্য ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বত্র সুদ বন্ধ করার জন্য রাসূলুল্লাহ (স) চরম প্রচেষ্টা চালান। তিনি নাজরানের খৃস্টানদের সাথে যে চুক্তি করেন তাতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লিখে পাঠান, যদি তোমরা সুদী কারবার করো, তাহলে তোমাদের সাথে চুক্তি ভেঙ্গে যাবে এবং আমাদেরকে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। বনু মুগীরার সুদী লেনদেন আরবে প্রসিদ্ধ ছিল। মক্কা বিজয়ের পর রসূলুল্লাহ (স) তাদের সমস্ত পাওনা সুদ বাতিল করে দেন এবং মক্কায় তাঁর নিযুক্ত তহশীলদারদেরকে লিখে পাঠালেন, যদি তারা (বনু মুগীরা) সুদ গ্রহণ করা বন্ধ না করে তাহলে তাদের সাথে যুদ্ধ করো। রসূলে করীম (স)-এর চাচা হযরত আব্বাস (রা)-ও একজন বড় মহাজন ছিলেন। বিদায় হজ্জে রসূলে করীম (স) ঘোষণা দিলেন ঃ জাহেলী যুগের সমস্ত সুদ বাতিল করে দেয়া হলো। সর্বপ্রথম আমি আমার চাচা আব্বাস (রা)-এর সুদ বাতিল করলাম। তিনি এতদূরও বললেন, সুদগ্রহীতা, সুদদাতা, সুদের চুক্তিপত্র লেখক এবং এর ওপর সাক্ষ্যদাতা সবার ওপর আল্লাহর লানত !

এ সমস্ত বিধানের উদ্দেশ্য কি ছিল ? নিছক একটি বিশেষ ধরনের সুদ অর্থাৎ (USURY) (মহাজনী সুদ) বন্ধ করে দিয়ে বাদবাকি সব রকমের সুদ চালু রাখা এ বিধানগুলোর উদ্দেশ্য ছিল না। বরং এর আসল উদ্দেশ্য ছিল, পুঁজিবাদী নৈতিকতা ও চরিত্র, পুঁজিবাদী মানসিকতা, পুঁজিবাদী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা এবং পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পূর্ণ উচ্ছেদ সাধন করে এমন একটি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে থাকবে কার্পণ্যের পরিবর্তে বদান্যতা,

১. এক হাদীসে বলা হয়েছে, সুদের গোনাহ নিজের মায়ের সাথে যিনা করার চেয়েও সত্তর গুণ বেশী।-(ইবনে মাজা)

স্বার্থান্ধতার পরিবর্তে সহানুভূতি ও পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা, সুদের পরিবর্তে যাকাত এবং ব্যাংকের পরিবর্তে থাকবে জাতীয় বায়তুলমাল। এ ক্ষেত্রে এমন অবস্থার সৃষ্টিই হবে না যার ফলে কো-অপারেটিভ সোসাইটির ইন্সুরেন্স কোম্পানী ও প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড প্রভৃতির প্রয়োজন দেখা দেয় এবং সর্বশেষে কমিউনিজমের প্রকৃতি বিরোধী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়।

আমাদের নিজেদের নির্বুদ্ধিতা, দুর্বলতা ও দুর্ভাগ্যের কারণে ইসলামের এ নৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা আমাদের ওপর চেপে বসেছে। যাকাত আদায় ও তা যথার্থ ব্যয় ক্ষেত্রে ব্যয় করার মতো প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব আজ বিলুপ্ত। আমাদের ধনিক সমাজ স্বার্থপর ও ইন্দ্রিয় লিপ্সু হয়ে পড়েছে। আমাদের অভাবী ও দরিদ্র সমাজ সহায়-সম্বলহীন। আমরা ইসলামী চরিত্র হারিয়ে ফেলেছি এবং তার সীমানাগুলো ভেঙে ফেলেছি। আমরা মদ পান, জুয়া খেলা ও ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছি। বিলাসীতা ও অমিতব্যয়ীতার দোষে আমরা দুষ্ট। অমিতব্যয়ীতার যাবতীয় অনুসঙ্গকে আমরা নিজেদের জীবনের অপরিহার্য অঙ্গে পরিণত করেছি। সুদী ঋণ ছাড়া বিবাহ, মোটর ক্রয়, গৃহ নির্মাণ এবং সৌন্দর্য, আয়েশ-আরাম ও বিলাস দ্রব্য সম্ভার ক্রয় করা আমাদের জন্য অকল্পনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। উপরন্তু পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার প্রবণতা ও বাস্তব সংগঠন আমাদের মধ্য থেকে উধাও হয়ে গেছে। ফলে আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থার ভিত্ নড়ে উঠেছে। আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন পুরোপুরি তার নিজের আর্থিক উপকরণাদির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে এবং ভবিষ্যতকে সংরক্ষিত করে তোলার জন্য সে ইসলামী নীতিসমূহ বর্জন করে পুঁজিবাদী নীতি অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছে। সে ব্যাংকে টাকা জমা রাখতে ইন্সুরেন্স কোম্পানীতে বীমা করাতে কোঅপারেটিভ সোসাইটির সদস্য হতে এবং প্রয়োজনের সময় পুঁজিপতিদের নিকট থেকে সুদে ঋণ নিয়ে নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করতে বাধ্য হয়েছে। নিসন্দেহে আজ এ সবকিছুই আমাদের জন্যে অরিহার্য হয়ে পড়েছে। কিন্তু এসব অবস্থা সৃষ্টি করার জন্য কি ইসলাম দায়ী ? যদি ইসলাম দায়ী না হয়ে থাকে এবং আমরা নিশ্চিত রূপে জানি ইসলাম দায়ী নয়, বরং আমাদের আজকের এ দুর্বিসহ অবস্থার জন্যে আমরা নিজেরাই দায়ী। ইসলাম আমাদেরকে এ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার শিক্ষা দিয়েছিল তার স্তম্ভগুলোকে আমরা ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিয়েছি, এ কারণে আমরা অনভিপ্রেত অবস্থার শিকারে পরিণত হয়েছি। এ ক্ষেত্রে ভেবে দেখবার বিষয়, ইসলামী আইনের বিরুদ্ধাচরণ করে আমরা নিজেদের জন্য যে সংকট সৃষ্টি করেছি, তা নিরসনের জন্যে ইসলামের আর একটি আইন ভংগ করার পথ অনুসন্ধান করা এবং এ আইনটি অমান্য

করার জন্য ইসলামেরই নিকট অনুমতি চাওয়া কতদূর ন্যায়সঙ্গত ও বৈধ বিবেচিত হতে পারে। প্রশ্ন হচ্ছে, যাকাত ব্যবস্থা গড়ে তোলার ব্যাপারে কে আমাদেরকে বাধা দিচ্ছে ? ইসলামী শিক্ষার মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার যে ক্ষেত্র রয়েছে তাকে পরিপুষ্ট করার পথে বাধা কোথায় : ইসলামের মীরাস আইন বাস্তবায়নের পথ কে রুদ্ধ করে দিয়েছে ? সরল, অনাড়ম্বর, অমিতব্যয়ী, প্রাচুর্যবিহীন স্বাবলম্বী ও আল্লাহভীরু মুসলমানদের জীবনযাপন করতে আমাদেরকে কে বাধা দিচ্ছে ? কে আমাদেরকে নিজের চাদরের চেয়ে পা-টা লম্বা করতে এবং পাশ্চাত্য সমাজ জীবনের ভোগবাদী নীতি অবলম্বনে বাধ্য করেছে ? অর্থ উপার্জনের বৈধ পদ্ধতি অবলম্বন না করে বিপুল ধন-ঐশ্বর্যের মালিক হবার স্বপ্নে বিভোর হয়ে হারাম উপার্জনের পথ অবলম্বন করতে কে আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করছে ? আমাদের ধনিক সমাজকে নিজেদের আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব এবং জাতির বিধবা, এতিম, অক্ষম, পঙ্গু ও অভাবীদেরকে সাহায্য ও সহায়তা দানে অগ্রসর না হয়ে ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপানের কারখানা মালিকদেরকে নিজেদের ধন-দৌলত উজাড় করে দিতে কে বাধ্য করছে ? আমাদের মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত সমাজের লোকদেরকে বিয়ে-শাদী ও আনন্দ-শোকানুষ্ঠানে সীমাতিরিক্ত ব্যয় করতে কে বাধ্য করেছে ? তাদেরকে ধনীদের সাথে প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে নিজেদের আর্থিক সামর্থের বাইরে ব্যয় বাহুল্য করে অর্থের জৌলুশ দেখাতে এবং নিজেদের এসব অযথা অপব্যয়ের জন্য সুদী ঋণ নিতে কে উদ্বুদ্ধ করেছে ? এসব কাজ আমরা স্বেচ্ছায় করেছি। ইসলামের দৃষ্টিতে এগুলো সুস্পষ্ট অপরাধ। যদি আজ আমরা এসব অপরাধমূলক কাজ থেকে বিরত থাকি এবং পুনর্বার ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত করি তাহলে যে সমস্ত অর্থনৈতিক সংকট আমাদেরকে সুদী লেনদেনের ন্যায় মারাত্মক অপরাধে জড়িত হতে বাধ্য করেছে সেগুলোর হাত থেকে আমরা মুক্তি পেতে পারি। কিন্তু যেহেতু এ অপরাধমূলক কাজগুলো থেকে আমরা বিরত থাকতে চাই না, সেহেতু এগুলোর কারণে যে সুদী লেনদেনের অপরাধে আমরা লিপ্ত হয়েছি তার সম্পর্কে আমাদের মনে সুস্পষ্ট অপরাধবোধ জাগ্রত থাকা উচিত নয় কি ? যে ব্যক্তি পবিত্র ও হালাল খাদ্য ত্যাগ করে নিজেকে এমন স্থানে পৌঁছিয়ে দিয়েছে যেখানে অপবিত্র ও হারাম খাদ্য ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না, সে পেট ভরে অপবিত্র ও হারাম খাদ্য খেতে পারে এবং অন্যকে খাওয়াতে পারে কিন্তু ঐ অপবিত্র ও হারাম খাদ্যকে পবিত্র ও হালাল বলে জোর গলায় প্রচার চালাতে পারে না।

ইতিপূর্বেই আমরা আলোচনা করেছি যে, সুদী লেনদেনের ব্যাপারটি হচ্ছে পরবর্তী পর্যায়ের ব্যাপার, তার পূর্বে ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও পুঁজিবাদী

ব্যবস্থার মধ্য থেকে কোন্‌টি আপনি গ্রহণ করবেন সে প্রশ্ন ওঠে। যদি আপনি ইসলামী অর্থব্যবস্থা গ্রহণ করেন তাহলে সেখানে সুদী লেনদেনের প্রয়োজন ও অবকাশ কোনোটিই নেই। কারণ সুদী লেনদেনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাহায্য-সহায়তা ছাড়াই ইসলামী অর্থব্যবস্থার সমস্ত কাজ-কারবার চলে। শুধু তাই নয়, বরং সুদী কারবার করে যারা ইসলামী অর্থব্যবস্থার সংগঠন ও শৃংখলায় ব্যাঘাত ঘটাতে চায় ইসলাম তাদেরকে অপরাধী গণ্য করে। বিপরীত পক্ষে যদি আপনি পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা গ্রহণ করতে চান, তাহলে সামগ্রিকভাবে তা ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ রূপেই গণ্য হবে। এ অবস্থায় আপনাকে পুঁজিবাদী নীতির বিরোধী ইসলামী অর্থব্যবস্থার যাবতীয় বিধান ও নীতি ভঙ্গ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে আপনি একদিকে ইসলামী আইনের বিরুদ্ধাচরণ করতে চান অন্যদিকে পুঁজিবাদের অনুগামী হতে চান, আবার এ সংগে ইসলামের দৃষ্টিতে গোনাহগার হতেও চান না—এ সবকিছু মিলিয়ে এ অর্থ দাঁড়ায় যে, আপনি নিজে ইসলামের অনুসারী না হয়ে ইসলামকে আপনার অনুসারী বানাতে চান। কেবলমাত্র আপনাকে ইসলামের গণ্ডীর মধ্যে ধরে রাখার জন্যে আপনি ইসলামকে তার নীতি পরিত্যাগ করে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য করতে চান।

সুদের আনুসঙ্গিক বিষয়াদি

ইতিপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে, ঋণদাতা নিজের মূলধনের অতিরিক্ত যে অর্থ বা লাভ ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে শর্ত সাপেক্ষে লাভ করে তাকেই বলা হয় রিবা। শরীয়াতের পরিভাষায় একে বলা হয় 'রিবা বিন নাসিয়া' অর্থাৎ ঋণ ব্যাপদেশে যে রিবা গ্রহণ বা প্রদান করা হয়। কুরআন মজীদে এ রিবাকেই হারাম গণ্য করা হয়েছে। এর হারাম হবার ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে সর্বসম্মত ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। কোনো সময় এর মধ্যে একটুও সংশয় দেখা দেয়নি।

কিন্তু ইসলামী শরীয়তের একটি রীতি হচ্ছে এই যে, যে বস্তুটিকে হারাম গণ্য করা হয় তার দিকে যাবার সম্ভাব্য সমস্ত পথই বন্ধ করে দেয়া হয়। এমন কি তার দিকে এগিয়ে যাবার জন্য যে স্থান থেকে প্রথম পদক্ষেপের সূচনা করা হয় সেখানেই বাধার প্রাচীর দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়, যাতে কেউ তার ধারে কাছেও পৌঁছতে না পারে। একটি সূক্ষ্ম দৃষ্টান্তের মাধ্যমে রসূলে করীম (স) এ রীতিটি বর্ণনা করেছেন। আরবের পরিভাষায় 'হিমা' বলা হয় এমন চারণক্ষেত্রকে যেটিকে কোনো ব্যক্তি নিজের পশুদের জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে নিয়েছে এবং অন্য কেউ সেখানে তার পশু চরাতে পারে না। রসূলে করীম (স) বলেছেন, প্রত্যেক বাদশাহর একটি 'হিমা' থাকে। আল্লাহর হিমা হচ্ছে, এমন কতগুলো হদ বা সীমানা যার বাইরে পা বাড়ানো ইসলাম হারাম ঘোষণা করেছে। যে পশুটি হিমার আশেপাশে চরে বেড়ায়, কোনো সময় চরতে চরতে সে হিমার মধ্যেও ঢুকে পড়তে পারে। এমনিভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহর 'হিমা' অর্থাৎ তাঁর নির্দেশিত সীমার আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়, যে কোনো সময় পা পিছলে যাবার এবং হারাম কাজে লিপ্ত হবার সম্ভাবনা থাকে। কাজেই হালাল ও হারামের মধ্যবর্তী বস্তুগলো থেকেও নিরাপদ থাকা প্রয়োজন। এভাবে দ্বীন ও ইসলামী জীবন ক্ষেত্র সংরক্ষিত থাকবে।

এ মহান উদ্দেশ্য সামনে রেখেই মহাজ্ঞানী শরীয়ত প্রণেতা প্রত্যেকটি নিষিদ্ধ বস্তুর চারপাশে হারাম ও অপসন্দের একটি শক্ত ও মজবুত বেড়া লাগিয়ে দিয়েছেন এবং নিষিদ্ধ কাজ করার যতগুলো উপায়-উপকরণ আছে নৈকট্য ও দূরত্বের অনুপাতে তাদের ওপর নরম বা শক্ত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন।

সুদ সম্পর্কিত প্রাথমিক বিধান কেবল ঋণের ব্যাপারে সুদী লেনদেন সম্পূর্ণ হারাম হবার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। উসামা ইবনে যায়েদ (রা) রসূলে করীম (সা)-এর যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাতে বলা হয়েছে ঃ

انما الربا فى النسية اوفى بعض الا لفاظ لاربا الا فى النسية -

"অর্থাৎ কেবলমাত্র ঋণের সাথে সুদী লেনদেন সম্পৃক্ত।[১] কিন্তু পরে রসূলে করীম (সা) আল্লাহর এ সীমার চারিদিকে বাঁধ দেয়ার প্রয়োজন মনে করেন, যাতে লোকেরা এর ধারে কাছেও ঘেঁষতে না পারে। সুদ গ্রহণ ও প্রদানের সাথে সাথে সুদের চুক্তিপত্র লেখা ও তার ওপর সাক্ষ্য প্রদান হারাম হবার ব্যাপারটি এ গোষ্ঠীভুক্ত। 'রিবা আল ফযল' হারাম হওয়া সম্পর্কিত হাদীসগুলোও একই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

রিবা আল ফযল এর অর্থ

একই জাতিভুক্ত দুটি জিনিসের হাতে হাতে লেনদেনের ক্ষেত্রে যে বৃদ্ধি হয় তাকে বলা হয় 'রিবা আল ফযল'। রসূলুল্লাহ (স) এ বৃদ্ধিকে হারাম গণ্য করেছেন। কারণ এর ফলে ন্যায়সঙ্গত পাওনার অধিক আদায় করার পথ খুলে যায় এবং মানুষের মধ্যে এমন এক মানসিকতা পরিপুষ্টি লাভ করে যার চূড়ান্ত পরিণতি হচ্ছে সুদ গ্রহণ। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসে রসূলুল্লাহ (স) এ গভীর তত্ত্বটিই পরিস্ফুট করে তুলেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

لاتبيعو الدرهم بالدرهمين فانى اخلف عليكم الرما -(والرما هو الربا)

"এক দিরহামকে দুই দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করো না। কারণ আমার ভয় হয়, এর ফলে তোমরা সুদী লেনদেনে লিপ্ত হয়ে পড়বে।"

রিবা আল ফযলের বিধান

এ ধরনের সুদ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (স) যে বিধান দিয়েছেন নীচে তা হুবহু উদ্ধৃত করা হলো ঃ

عن عبادة بن الصامت قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وَ سلم :

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر

بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد - فاذا اختلفت هذه

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) প্রথম দিকে এ হাদীসের ভিত্তিতে ফতোয়া দিয়েছিলেন যে, সুদ কেবল ঋণের সাথে সম্পৃক্ত, হাতে হাতে লেন-দেনের মধ্যে সুদ নেই। কিন্তু পরবর্তীকালে সহীহ ও নির্ভুলতর হাদীস থেকে যখন তিনি জানতে পারলেন যে, রসূলুল্লাহ (সা) নগদ লেনদেনের ব্যাপারেও অতিরিক্ত বস্তু গ্রহণ নিষেধ করেছেন তখন তিনি নিজের পূর্বের মত পাল্টান। তাই হযরত জাবের বলেছেন ঃ

رجع ابن عباس عن قوله فى الصرف وعن قوله فى المتعة -

"অর্থাৎ ইবনে আব্বাস তাঁর সুদ ও মুতা বিবাহ সম্পর্কিত মত পাল্টিয়ে নিয়েছেন। অনুরূপভাবে হাকেম বর্ণনা করেছেন যে, ইবনে আব্বাস পরবর্তী সময়ে ফতোয়া থেকে তওবা ও এস্তেগফার করেন এবং রিবা আল ফযলকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে থাকেন।

الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد ـ(احمد، مسلم وللنسائى وابن ماجة وابى داؤد نحوه فى اخره) وامرنا ان نبيع البر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا ـ

"ইবাদা ইবনে সামেত (রা) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ সোনার সাথে সোনার, রূপার সাথে রূপার, গমের সাথে গমের, যবের সাথে যব, খেজুরের সাথে খেজুর এবং লবণের সাথে লবণের যেমনকার তেমন, সমান সমান ও হাতে হাতে বিনিময় হওয়া উচিত। তবে যদি বিভিন্ন জাতের বস্তুর পরস্পরের সাথে বিনিময়ের ব্যাপার হয়, তাহলে যেভাবে ইচ্ছা বিক্রি করো কিন্তু এ ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে, লেনদেন হাতে হাতে হতে হবে।–(মুসনাদে আহমদ, মুসলিম শরীফ, নাসায়ী, ইবনে মাজা ও আবু দাউদেও এ হাদীসটি উদ্ধৃত হয়েছে এবং এর শেষে নিম্নোক্ত অংশটুকু বৃদ্ধি হয়েছেঃ) আর তিনি আমাদেরকে গমের সাথে যবের এবং যবের সাথে গমের হাতে হাতে যেভাবে আমরা চাই সেভাবে বিনিময় করার হুকুম দিয়েছেন।"

عن ابى سعيد الخدرى قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشيعر بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمنْ زاد او استزاد فقد اربى الاخذ والمعطى فيه سواء (بخارى واحمد ومسلم وفى لفظ) لاتبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق الا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء ـ(احمد ومسلم)

"আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ সোনার সাথে সোনার, রূপার সাথে রূপার, গমের সাথে গমের, যবের সাথে যবের, খেজুরের সাথে খেজুরের এবং লবণের সাথে লবণের যেমনকার তেমন ও হাতে হাতে বিনিময় হওয়া উচিত। যে ব্যক্তি বেশী দিয়েছে বা নিয়েছে সে সুদী কারবার করেছে। সুদগ্রহীতা ও দাতা উভয়ের গোনাহ সমান।–(বুখারী, আহমদ মুসলিম এবং অন্য একটি বর্ণনায় বলা হয়েছেঃ) সোনার বিনিময়ে সোনা এবং রূপার বিনিময়ে রূপা বিক্রি করো না, তবে ওজনে যদি সমান হয়, যেমনকার তেমন এবং সমান সমান হয় (তাহলে কোনো ক্ষতি নাই)।"–(আহমদ ও মুসলিম)

وعنه قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : لاتبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا

بمثل وتشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بحاضر ـ(بخارى ومسلم)

"আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ সোনার বিনিময়ে সোনা বিক্রি করো না, তবে যেমনকার তেমন (হলে ক্ষতি নেই) এবং কেউ কাউকে বেশী দেবে না। রূপার বদলে রূপা বিক্রি করো না, তবে যেমনকার তেমন (হলে ক্ষতি নেই) এবং কেউ কাউকে বেশী দেবে না। আর উপস্থিতের বিনিময়ে অনুপস্থিতকে বিক্রি করো না।"

–(বুখারী ও মুসলিম)

عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم : قال التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد اربى الا ما اختلفت الوانه ـ(مسلم)

"আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ খেজুরের সাথে খেজুরের, গমের সাথে গমের, যবের সাথে যবের এবং লবণের সাথে লবণের বিনিময় যেমনকার তেমন এবং হাতে হাতে হতে হবে। অতপর যে ব্যক্তি বেশী দেয় বা বেশী নেয় সে সুদী কারবার করে, তবে যদি ঐ বস্তুগুলোর মধ্যে রঙের পার্থক্য থাকে (তাহলে ক্ষতি নেই)।"

–(মুসলিম)

عن سعيد بن وقاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن شراء التمر بالرطب ـ فقال اينقص الرطب اذا يبس فقال نعم فنهاه عن ذالك ـ(مالك والترمذى وابو داؤد والنسائى وابن ماجة)

"সাঈদ ইবনে ওয়াক্কাস (রা) বর্ণনা করেছেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো ঃ শুকনা খেজুরের সাথে ভিজা খেজুরের বিনিময় কিভাবে করা হবে ? তিনি প্রশ্ন করলেন, ভিজা খেজুর কি শুকিয়ে যাবার পর কমে যায় ? প্রশ্নকারী জবাব দিল হ্যাঁ। তখন তিনি এ ধরনের বিনিময় করতে নিষেধ করলেন।"

–(মালিক, তিরমিযি, আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজা)

عن ابى سعيد قال كنا نرزق تمر الجمع وهو الخلط من التمر وكنا نبيع صاعين بصاع فقال النبى صلى الله عليه وسلم لاصاعين بصاع ولا درهمين بدرهم ـ(بخارى)

"আবু সাঈদ খুদীর (রা) বর্ণনা করেছেন, আমরা সাধারণত বেতন ও পারিশ্রমিক হিসেবে মিশ্রিত ধরনের খেজুর পেতাম, আমরা দুই দুই সা' মিশ্রিত খেজুরের বিনিময়ে এক সা' ভালো খেজুর নিতাম। নবী করীম (স) বললেন, দু' সা' এর বিনিময়ে এক সা' নিয়ো না এবং দু' দিরহামের বিনিময়ে এক দিরহাম নিয়ো না।"-(বুখারী)

عن ابی سعید وابی هریرة ان رسول اللّـه صلی اللّـه علیه وسلم استعمل رجلا علی خیبر فجاء ه بتمر جنیب فقال اکل تمر خیبر هکذا قال لاواللّـه یارسول اللّـه انا لناء خذ الصاع من هذا بالصاعین والصاعین بالثلاث ـ فقال لاتفعل بع الجمع بالدراهم ثم اتبع بالدراهم جنیبا وقال فی المیزان مثل ذالك ـ(بخاری ومسلم)

"আবু সাঈদ খুদরী (রা) ও আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (স) এক ব্যক্তিকে খায়বারের তহশীলদার নিযুক্ত করেছিলেন। সে সেখান থেকে (খাজনা বাবদ) উত্তম জাতের খেজুর নিয়ে আসলো। রসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞেস করলেন, খয়বারের সমস্ত খেজুরই কি এমন ধরনের হয় ? সে জবাব দিল, না, হে আল্লাহর রসূল ! আমরা যে মিশ্রিত খেজুর উসূল করতাম তা এ ভালো খেজুরের সাথে কখনো দু' সা'-এর বদলে এক সা' আবার কখনো তিন সা'-এর বদলে দু সা' হিসেবে বিনিময় করতাম। একথা শুনে রসূলুল্লাহ (স) বললেন, এমনটি করো না। প্রথমে এ মিশ্রিত খেজুরগুলো দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করো অতপর দিরহামের বিনিময়ে ভালো জাতের খেজুর কিনে নাও। ওজনের হিসেবে বিনিময় করার ক্ষেত্রেও তিনি একই কথা বলেন।"-(বুখারী ও মুসলিম)

عن ابی سعید قال جاء بلال الی النبی صلی اللّـه علیه وسلم بتمر برنی فقال له النبی صلی اللّـه علیه وسلم من این هذا قال کان عندنا تمر ردئ فبعث منه صاعین بصاع ـ فقال اوه، عین الربا، عین الربا لاتفعل ولکن اذا اردت ان تشتری فبع التمر ببیع اخر ثم اشتریه ـ(بخاری ومسلم)

"আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেছেন, একবার বেলাল (রা) বরণী খেজুর (উৎকৃষ্ট জাতের খেজুর) নিয়ে রসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে হাযির হলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এসব কোথা থেকে আনলে ? বেলাল জবাব দিলেন, আমাদের নিকট নিকৃষ্ট মানের খেজুর ছিল, তা থেকে দু' সা' দিয়ে আমি এই এক সা' কিনে নিয়েছি। রসূলুল্লাহ (স) বললেন,

ওহহো ! এতো নির্ভেজাল সুদ ! এতো নির্ভেজাল সুদ ! এমন কাজ কখনো করো না। যখন তোমরা ভালো খেজুর কিনতে চাও তখন দিরহাম বা অন্য কিছুর বিনিময়ে নিজের খেজুর বিক্রি করে দাও অতপর ঐ বিক্রিত অর্থ বা বস্তুর বিনিময়ে ভালো খেজুর কেনো।"–(বুখারী ও মুসলিম)

عن فضالة بن عبيد قال اشتريت قلادة يوم خيبر باثنى عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها اكثر من اثنى عشر دينارا فذكرت ذالك للنبى صلى اللّه عليه وسلم ـ فقال لايباع حتى يفصل ـ(مسلم نسائى، ابو داؤد، ترمذى)

"ফুযালাহ ইবনে উবাইদ (রা) বর্ণনা করেছেন, খায়বরের যুদ্ধের সময় আমি একটি জড়োয়া হার ১২ দিনারে কিনেছিলাম। তারপর হারটি ভেঙ্গে তার মধ্য থেকে মূল্যবান পাথর ও সোনাগুলোকে আলাদা করলাম। তা থেকে ১২দিনারেরও অধিক সোনা বের হলো।[১] আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে একথাটি বললাম। তিনি বললেন, ভবিষ্যতে আর সোনার তৈরী জড়োয়া গহনা সোনার বিনিময়ে বিক্রি করা যাবে না যতক্ষণ না তা থেকে মূল্যবান পাথর ও সোনাকে আলাদা আলাদা করে দেয়া হয়।"–(মুসলিম, নাসায়ী, আবু দাউদ ও তিরমিযি)

عن ابى بكرة قال نهى النبى صلى اللّه عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب الا سواء بسواء وامرنا ان نشترى الفضة بالذهب كيف شئنا ونشترى الذهب بالفضة كيف شئنا ـ(بخارى و مسلم)

"আবু বকরাহ (রা) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (স) রূপার সাথে রূপার এবং সোনার সাথে সোনার বিনিময় করতে নিষেধ করেছেন, তবে সমান সমান হলে বিনিময় চলতে পারে। উপরন্তু তিনি বলেছেন, রূপার সাথে সোনা ও সোনার সাথে রূপা যেভাবে ইচ্ছা বিনিময় করতে পারো।"
–(বুখারী ও মুসলিম)

আলোচিত বিধানসমূহের সংক্ষিপ্ত সার

উপরে যে হাদীসগুলো বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলোর শব্দাবলী, অর্থ. পটভূমি ও পরিপ্রেক্ষিত পর্যালোচনা করলে আমরা নিম্নোক্ত নীতি ও বিধানগুলো পাই।

---

১. উল্লেখ্য যে, সেকালে দিরহাম ও দিনার হতো খাঁটি রূপা ও সোনার তৈরী। যে পরিমাণ রূপা ও সোনা দিয়ে সেগুলো তৈরী হতো সে পরিমাণ অনুযায়ী সেগুলোর দাম নির্ধারিত হতো। কাজেই সে যুগে দিনারের বিনিময়ে সোনা ও দিরহামের বিনিময়ে রূপা কেনার অর্থই হতো সোনার বিনিময়ে সোনা ও রূপার বিনিময়ে রূপা কেনা।

এক ঃ একই জাতিভুক্ত দুটো দ্রব্যের বিনিময়ের প্রয়োজন কেবলমাত্র তখনই দেখা দেয়, যখন জাতিগত অভিন্নতা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে গুণগত পার্থক্য থাকে। যেমন একজাতের চাল ও গম এবং অন্য জাতের চাল ও গমের মধ্যে, উৎকৃষ্ট সোনা ও নিকৃষ্ট সোনা, খনিজ লবণ ও সামুদ্রিক লবণ প্রভৃতির মধ্যে পার্থক্য থাকে। এ বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্য থেকে সমজাতভুক্ত দ্রব্যগুলো পরস্পরের সাথে বিনিময় করা, এ বিনিময়ের ক্ষেত্রে বাজারের প্রচলিত মূল্যকে সামনে রাখা হলেও—এ ক্ষেত্রে বিনিময়ের সময় কম বেশী করার কারণে এমন একটি মানসিকতা জন্ম নেয় যা অবশেষে মানুষকে সুদ গ্রহণ ও অবৈধ মুনাফা অর্জনের দিকে ঠেলে দেয়। এজন্য ইসলামী শরীয়ত সমজাতের দ্রব্যসমূহ বিনিময়ের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত দুটো পদ্ধতির মধ্য থেকে যে কোনো একটি অবশ্যি গ্রহণ করার বিধান দিয়েছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, তাদের মধ্যে মূল্য ও মানের যে কম-বেশী পার্থক্য রয়েছে তা উপেক্ষা করে সমান সমান বিনিময় করতে হবে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, দ্রব্যের সাথে দ্রব্যের সরাসরি বিনিময়ের পরিবর্তে নিজের দ্রব্যটি একজনের নিকট বাজারের দরে অর্থের বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়ে অন্যের নিকট থেকে ঐ অর্থের বিনিময়ে বাজারের দরে তার দ্রব্যটি কিনে নিতে হবে।

দুই ঃ ইতিপূর্বে আমরা বলেছি যে, আগের যুগে সমস্ত মুদ্রা খাঁটি সোনা ও রূপার তৈরী হতো এবং ঐ সোনা ও রূপার মূল্য হতো মুদ্রাগুলোর মূল্য। সেযুগে দিরহামের সাথে দিরহামের এবং দিনারের সাথে দিনারের বিনিময় করার প্রয়োজন কোনো কোনো সময় দেখা দিতো। যেমন, ইরাকী দিরহামের বদলে কোনো ব্যক্তির প্রয়োজন হতো রুমী দিরহামের বা রুমী দিনারের পরিবর্তে ইরানী দিনারের। এ জাতীয় প্রয়োজনের সময় ইয়াহুদী মহাজন ও অন্যান্য অবৈধ মুনাফা অর্জনকারীরা দু' হাতে অবৈধভাবে মুনাফা লুটতো, অনেকটা আজকের যুগে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের সময় বাটা গ্রহণ অথবা নিজ দেশে টাকার রোজগারী চাওয়ার বা দশ টাকা পাঁচ টাকার নোট ভাঙাবার সময় কিছু পয়সা উসুল করার মতো। এর ফলে যেহেতু সুদখোরী মনোবৃত্তির পরিপোষণ হয় তাই রসূলুল্লাহ (স) কোনো প্রকার বৃদ্ধি বা ঘাটতি সহকারে সোনার সাথে সোনার ও রূপার সাথে রূপার বিনিময় করতে এবং এক দিরহামের বিনিময়ে দু' দিরহাম বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

তিন ঃ সমজাতের দ্রব্যাদির বিনিময়ের আর একটি পদ্ধতি হচ্ছে এক ব্যক্তির নিকট কোনো দ্রব্য কাঁচামালের আকারে বর্তমানে আছে এবং অন্য ব্যক্তির নিকট ঐ একই মাল থেকে প্রস্তুত শিল্প দ্রব্য রয়েছে, তারা উভয়ে এ

দুটো জিনিস বিনিময় করতে চায়, এ ক্ষেত্রে দেখতে হবে, শিল্পের কারণে ঐ দ্রব্যের মৌলিকত্ব সম্পূর্ণ রূপে পরিবর্তিত হয়ে গেছে, না শিল্পকারিতার প্রভাব সত্ত্বেও প্রাথমিক কাঁচামালের অবস্থার তুলনায় তার মধ্যে কোনো বড় রকমের পরিবর্তন সাধিত হয়নি। প্রথম অবস্থায় হ্রাস-বৃদ্ধি সহকারে বিনিময় করা যেতে পারে। কিন্তু দ্বিতীয় অবস্থাটিতে শরীয়ত বিনিময়ের অনুমতি দেয় না। আর যদি একান্ত বিনিময় করতেই হয় তাহলে সমান সমানভাবে করতে হবে, যাতে অতিরিক্ত গ্রহণের প্রবণতা পরিপুষ্টি লাভের সুযোগ না পায়। যেমন, সূতা থেকে কাপড় ও লোহা থেকে ইঞ্জিন তৈরী হবার ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয় এবং অন্যদিকে সোনা থেকে চুড়ি বা কংকন তৈরীর ক্ষেত্রে সামান্য মাত্র পরিবর্তন হয়। এ ক্ষেত্রে প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ বিপুল পরিমাণ সূতা দিয়ে স্বল্প পরিমাণ কাপড় এবং অনেক ওজনের লোহার বিনিময়ে একখানা ইঞ্জিন কেনা যেতে পারে। কিন্তু দ্বিতীয় অবস্থাটিতে অর্থাৎ সোনার কংকনের বিনিময় করতে হবে সম ওজনের সোনার সাথে।[১] অথবা সোনা বাজারে বিক্রি করে তার মূল্য বাবদ প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে কংকন কিনতে হবে।

চার ঃ বিভিন্ন জাতের জিনিস-পত্রের একটার সাথে আর একটার বিনিময় কম-বেশী সহকারে হতে পারে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে, ব্যাপারটি হাতে হাতে হতে হবে। এ শর্তের কারণ হচ্ছে এই যে, হাতে হাতে যে লেনদেন হবে তা নিসন্দেহে বাজারের প্রচলিত দর অনুযায়ী হবে। যেমন কোনো ব্যক্তি রূপা দিয়ে সোনা নেবে। নগদ সওদা করার কারণে প্রয়োজন পরিমাণ সোনা নিয়ে তার বিনিময়ে বাজারে তার মূল্য স্বরূপ যে পরিমাণ রূপা ধার্য আছে ঠিক সেই পরিমাণই তাকে দিতে হবে। কিন্তু ঋণের ক্ষেত্রে কম বেশী করলে তার সাথে সুদ মিশ্রিত হবার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন, আজ যে ব্যক্তি ৮০ তোলা রূপা ঋণ দিয়ে এক মাস পরে এর বিনিময়ে ২ তোলা সোনা নেয়ার সিদ্ধান্ত করে তার নিকট আসলে এক মাস পরে ৪০ তোলা রূপা ১ তোলা সোনার সমান হবে কিনা তা জানার কোনো মাধ্যম নেই, কাজেই সে ব্যক্তি সোনা ও রূপার বিনিময়ের ক্ষেত্রে পূর্বাহ্নেই এই যে মূল্যমান নির্ধারণ করে

১. এখানে এ ধরনের সন্দেহ প্রকাশের কোনো অবকাশই নেই যে, এভাবে স্বর্ণকারদের সমস্ত কাজ কারবারই বন্ধ হয়ে যাবে, কারণ সোনার তৈরী জিনিস-পত্র তাদেরকে সম ওজনের সোনার দরে বিক্রি করতে হবে এবং নিজেদের শিল্পকারিতার কোনো মজুরী তারা পাবে না। এ সন্দেহের ভ্রান্তি এ থেকেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, আসলে স্বর্ণকারের সাথে আমাদের বিনিময়ের কোনো কারবার নেই বরং তাদেরকে আমরা সোনা দিয়ে নিজেদের মন মতো কোনো জিনিস গড়িয়ে নেই। কাজেই তারা সেভাবেই নিজেদের কাজের মজুরী পাবার অধিকারী যেমন একজন দর্জী তার পোশাক তৈরীর মজুরী নেয় তবে কোনো গহনা ওয়ালার নিকট থেকে যখন আমরা সোনার গহনা কিনবো তখন অবশ্যি তার বিনিময়ে তাকে বেশী সোনা দেয়া বৈধ হবে না বরং অবশ্যি আমাদেরকে রূপা ও কাগজের মুদ্রায় তার দাম চুকিয়ে দিতে হবে।

নিয়েছে এটি তার সুদখোরী ও জুয়াড়ী মনোবৃত্তির পরিচায়ক। অন্যদিকে ঋণগ্রহীতাও এ সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে মূলত যেন জুয়া খেলাতেই অংশগ্রহণ করেছে। সেও মনে করেছে সম্ভবত এক মাস পরে সোনা ও রূপার মূল্যমান ৪০=১ এর পরিবর্তে ৩৫=১ হয়ে যাবে, এ কারণেই শরীয়ত প্রণেতা এ আইন প্রণয়ন করেছেন যে, বিভিন্ন জাতের দ্রব্যাদি বিনিময়ের ক্ষেত্রে কম-বেশী করতে হলে তা অবশ্যি হাতে হাতে হতে হবে। আর ঋণ অবশ্যি নিম্নোক্ত দুটো পদ্ধতির যে কোনো একটিতে হতে হবে। এক. যে বস্তু যে পরিমাণ ঋণ দেয়া হয়েছে তা ঠিক সেই একই পরিমাণ ফেরত দিতে হবে। দুই. দ্রব্যও বাস্তব আকারে লেনদেন না করে টাকার আকারে লেনদেন করতে হবে। যেমন, রহীম আজ করীমের নিকট থেকে ৮০ টাকা বা ৮০ টাকার গম ঋণ নিলো এবং এক মাস পরে সে করীমকে ৮০ টাকা বা ৮০ টাকার যব ফেরত দেবে। আবু দাউদের নিম্নোক্ত হাদীসটিতে এ আইনটি অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

ولاباس ببيع الذهب بالفضة والفضة اكثرهما يدا بيد واما النسية فلا - ولا باس ببيع البر بالشعير والشعير اكثر هما يدا بيد واما النسية فلا -

"সোনাকে রূপার বদলে বিক্রি করলে এবং রূপা বেশী হলে কোনো ক্ষতি নেই, তবে শর্ত হচ্ছে লেনদেন হাতে হাতে হতে হবে। কিন্তু ঋণের ক্ষেত্রে এটা বৈধ নয়। অনুরূপ গমকে যবের বিনিময়ে বিক্রি করলে এবং যব বেশী হলে কোনো ক্ষতি নেই, তবে শর্ত হচ্ছে লেনদেন হাতে হাতে হতে হবে। কিন্তু ঋণের ক্ষেত্রে এটা বৈধ নয়।"

হযরত উমর (রা)-এর উক্তি

রসূলুল্লাহ (স)-এর বিধানগুলো সংক্ষিপ্ত এবং লেনদেনের সমস্ত খুঁটিনাটি ব্যাপারের সুস্পষ্ট বিবরণ এখানে নেই। তাই এমন অনেক খুঁটিনাটি ব্যাপার পাওয়া যায় যেগুলো সুদের সংজ্ঞার আওতাভুক্ত হওয়া সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। হযরত উমর (রা) এদিকে ইংগিত করে বলেছেন ঃ

ان اية الربا من اٰخر ما نزل من القران وان النبى صلى اللّٰه عليه وسلم قبض قبل ان يبينه لنا فدعوا الربا والريبة -

"রিবা সম্পর্কিত আয়াতগুলো কুরআনের এমন সব আয়াতের অন্তর্ভুক্ত যেগুলো শেষের দিকে নাযিল হয় এবং এগুলো সম্পর্কিত যাবতীয় বিধান আমাদের ওপর সুস্পষ্ট করার আগেই রসূলুল্লাহ (স)-এর ইন্তেকাল হয়ে যায়। কাজেই যে বস্তুটি নিশ্চিত সুদ তোমরা সেটি পরিহার করো এবং যে বস্তুটি সম্পর্কে সুদ হবার সংশয় দেখা দেয় সেটিও পরিহার করো।"

ফকীহগণের মতবিরোধ

সুদ সম্পর্কিত বিধানাবলীর এ সংক্ষিপ্ত রূপের কারণেই পরবর্তীকালে ফকীহগণের মধ্যে সুদী দ্রব্যসমূহ চিহ্নিত করণ, তার মধ্যে হারামের কারণ নিরূপণ এবং হারাম সম্পর্কিত বিধানাবলীর বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয় স্থিরীকৃত করার ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দেয়।

ফকীহদের একটি দলের মত হচ্ছে, রসূলে করীম (স) যে ছয়টি দ্রব্যের নাম উল্লেখ করেছেন কেবলমাত্র সেগুলোর মধ্যে রিবা হয় অর্থাৎ সোনা, রূপা, গম, যব, খোরমা ও লবণ। এ দ্রব্যগুলো ছাড়া বাকি সমস্ত একই জাতের দ্রব্যের মধ্যে বৃদ্ধি সহকারে কোনো প্রকার শর্ত ছাড়াই লেনদেন হতে পারে। কাতাদাহ, তাউস, উসমানুল বাত্তী, ইবনে আকীল হাম্বলী ও যাহেরীয়া এ মত পোষণ করেন।

দ্বিতীয় দলের মত হচ্ছে, ওজন ও মাপের হিসেবে যেসব জিনিসের লেনদেন হয় সেসব জিনিসের ওপর রিবার বিধান জারী হবে। এটি হচ্ছে, আম্মারা ও ইমাম আবু হানীফার মত। একটি বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলও এ মত পোষণ করতেন।

তৃতীয় দলের মত হচ্ছে, এ বিধানটি সোনা, রূপা ও আহার্য বস্তু সামগ্রীর ওপর জারী হবে, ওজন ও পরিমাপের মাধ্যমে যেগুলোর লেনদেন হয়। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যেব এ মতের অনুসারী। এ মতটির সমর্থনে ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের একটি করে উক্তি পাওয়া যায়।

চতুর্থ দলের মত হচ্ছে, যেসব দ্রব্য সামগ্রী খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয় এবং গুদামজাত করে রাখা হয় কেবলমাত্র সেগুলোর ওপর এ বিধানটি জারী হবে। ইমাম মালিক এ মত পোষণ করেন।

দিরহাম ও দিনার সম্পর্কে ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মত হচ্ছে, তাদের ওজন আছে এবং এটিই হচ্ছে তাদের হারাম হবার কারণ। এ ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালেক এবং একটি বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম আহমদের মত হচ্ছে, তাদের মূল্যই তাদের হারাম হবার কারণ।

এ মত বৈষম্যের কারণে খুঁটিনাটি ব্যাপারে হারাম সম্পর্কিত বিধানের প্রচলনও বিভিন্ন হয়ে পড়েছে। একটি মাযহাবের দৃষ্টিতে একটি দ্রব্য আদতে সুদী দ্রব্যের অন্তর্ভুক্তই নয় আবার অন্য মাযহাবের দৃষ্টিতে ঐ একই দ্রব্য সুদী দ্রব্যের মধ্যে গণ্য হয়। এক মাযহাবের দৃষ্টিতে একটি দ্রব্যের হারাম হবার কারণ অন্য মযহাবের দৃষ্টিতে তার হারাম হবার কারণ থেকে বিভিন্ন। এ কারণে

এক মাযহাবের দৃষ্টিতে একটি দ্রব্য সুদী দ্রব্যের আওতাভুক্ত হয় কিন্তু অন্য মাযহাবের দৃষ্টিতে তা হয় না। এতদসত্ত্বেও কুরআন ও সুন্নাহর সুস্পষ্ট বিধানের দৃষ্টিতে যে সমস্ত দ্রব্য সুদের আওতাভুক্ত এ মতবিরোধগুলো তার অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং সংশয়িত বিষয়াদি এবং হালাল ও হারামের মধ্যবর্তী সীমান্তে অবস্থিত দ্রব্যাদির সাথে এগুলোর সম্পর্ক। এখন যদি কোনো ব্যক্তি এ বিরোধী মূলক বিষয়গুলোকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করে কুরআন ও সুন্নাহ যেসব লেনদেনকে সুদী লেনদেনের অন্তর্ভুক্ত করেছে সেগুলোর ক্ষেত্রে শরীয়তের বিধানকে সংশয়যুক্ত গণ্য করার চেষ্টা করে এবং সাথে সাথে প্রমাণ উপস্থাপনের এহেন পদ্ধতিতে রুখসাত ও হলো'র পথ উন্মুক্ত করে দেয় অতপর এ পথ দিয়ে আরো সামনে অগ্রসর হয়ে মুসলমানদেরকে পুঁজিবাদের পথে চলতে উদ্বুদ্ধ করে, তাহলে তাদের উদ্দেশ্য যতই সৎ এবং তারা যতই কল্যাণকামী হোক না কেন আসলে তারা এমন সব লোকের মধ্যে গণ্য হবে যারা কুরআন ও সুন্নাহকে ত্যাগ করে ধারণা ও অনুমানের আনুগত্য করেছে তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করেছে।[১]

পশু বিনিময়ের ক্ষেত্রে বৃদ্ধি

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, সমজাতের বস্তু বিনিময়ের ক্ষেত্রে বাড়তি বস্তু গ্রহণের বিরুদ্ধে যে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে পশু তার অন্তর্ভুক্ত নয়। সমজাতের পশুর পরস্পরের সাথে বৃদ্ধি সহকারে বিনিময় করা যেতে পারে। রসূলে করীম (স) নিজে এভাবে বিনিময় করেছেন এবং তার পর সাহাবাগণও করেছেন। এর কারণ হচ্ছে, পশুদের মধ্যে মূল্য ও মানের দিক দিয়ে বিরাট পার্থক্য রয়েছে, যেমন একটি সাধারণ পর্যায়ের ঘোড়া ও একটি উন্নত জাতের রেসের ঘোড়া এবং একটি সাধারণ কুকুর ও একটি উন্নত জাতের কুকুরের দামের মধ্যে এতবেশী পার্থক্য থাকে। এ ধরনের একটি পশুর বিনিময় কখনো কখনো একশোটি পশুর সাথেও করা যেতে পারে।

---

১. শরীয়তের বিধান পালনের ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে যে সাময়িক ছুটি দেয়া হয় তাকে বলা হয় রুখসাত। কোন মারাত্মক আপদ থেকে বাঁচার জন্য শরীয়তের বিধান যাতে নিজের ওপর প্রযোজ্য না হয় সে জন্য কোনো পথ অবলম্বন করাকে 'হীলা' বলা হয়।

অর্থনৈতিক বিধানের পুনর্বিন্যাস ও তার মূলনীতি

আমরা স্বীকার করি যুগের অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। দুনিয়ার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থায় বিরাট বিপ্লব সূচিত হয়েছে। এ বিপ্লব অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক লেনদেনের চেহারাই পালটে দিয়েছে। এ পরিস্থিতিতে ইসলামের প্রাথমিক যুগে হেজায, ইরাক, সিরিয়া ও মিসরের তদানীন্তন অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যে ইজতিহাদী আইন প্রণীত হয়েছিল মুসলমানদের বর্তমান প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে তা মোটেই যথেষ্ট নয়। ফকীহ্ তথা ইসলামী আইনবিদগণ সে যুগে শরীয়তের বিধান-সমূহের যে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তা তাদের চারপাশের দুনিয়ার লেনদেনের অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত ছিল। কিন্তু বর্তমানে ঐ সমস্ত অবস্থার অনেকগুলোই বিলুপ্ত হয়ে গেছে আবার অনেক নতুন অবস্থারও সৃষ্টি হয়েছে, যেগুলোর তখন কোনো অস্তিত্বই ছিল না। এজন্য ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতি সম্পর্কিত যে সমস্ত আইন আমাদের ফিকাহ্র প্রাচীন গ্রন্থগুলোয় লিপিবদ্ধ রয়েছে বর্তমানে তার মধ্যে নিসন্দেহে অনেক কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের প্রয়োজন। কাজেই অর্থনৈতিক লেনদেন সম্পর্কিত ইসলামী বিধানাবলীর পুনর্বিন্যাস হওয়া উচিত —এ ব্যাপারে কোনো মতানৈক্য নেই, বরং মতানৈক্য আছে এ পুনর্বিন্যাসের ধরন সম্পর্কে।

আধুনিকীকরণের পূর্বে চিন্তার প্রয়োজন

আমাদের আধুনিক পন্থী চিন্তাবিদগণ যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন যদি আমরা তার অনুসরণ করতে যাই এবং তাদের প্রবৃত্তি অনুযায়ী ইসলামী আইনের পুনর্বিন্যাসের কাজ শুরু হয়ে যায়, তাহলে এর ফলে আসলে ইসলামী শরীয়তের বিধানসমূহের পুনর্বিন্যাস হবে না। বরং তার বিকৃতি সাধনই হবে। অন্য কথায় বলা যায়, এর ফলে অর্থনৈতিক জীবনে আমরা ইসলাম থেকে মুরতাদ হয়ে যাবো। কারণ এরা যে পদ্ধতির দিকে আমাদেরকে এগিয়ে নিতে চাচ্ছেন তা উদ্দেশ্য, আদর্শ ও মূলনীতির দিক দিয়ে ইসলামী পদ্ধতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে নিছক ধন উপার্জন। অন্যদিকে ইসলামের উদ্দেশ্য হচ্ছে হালাল খাদ্য আহরণ। তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে, বৈধ-অবৈধ যে কোনো উপায় অবলম্বন করে হোক না কেন মানুষকে লাখপতি ও কোটিপতি হতে হবে। কিন্তু ইসলামের লক্ষ্য হচ্ছে, মানুষ লাখ বা কোটিপতি নাই বা হোল, তার যাবতীয় উপার্জন বৈধ পদ্ধতিতে হতে হবে এবং এজন্য অন্যের অধিকার হরণ করাও চলবে না। যারা ধন উপার্জন করেছে, অর্থ উপার্জনের

সর্বাধিক উপকরণাদি নিয়ন্ত্রণে সক্ষম হয়েছে এবং এসবের মাধ্যমে আরাম-আয়েশ, শক্তি, প্রতিপত্তি, সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হয়েছে তাদেরকেই তারা সফলকাম মনে করে। তাদের এ সাফল্যের মূলে যতই স্বার্থপরতা, যুলুম, অত্যাচার, নিষ্ঠুরতা, মিথ্যা, প্রতারণা ও নির্লজ্জতা নিহিত থাক না কেন, এজন্য তারা যত নিজেদের স্বজাতির অধিকার হরণ করুক না কেন এবং নিজেদের ব্যক্তি স্বার্থের জন্য দুনিয়ায় বিশৃংখলা, বিপর্যয় ও চারিত্রিক নৈরাজ্য সৃষ্টি করে মানবতাকে বস্তুগত, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিক না কেন তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে সফলকাম হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে সততা, বিশ্বস্ততা ও সদুদ্দেশ্য সহকারে অন্যের অধিকার ও স্বার্থ পুরোপুরি সংরক্ষণ করার সাথে সাথে ধন উপার্জনে প্রবৃত্ত হয়। এভাবে ধন উপার্জন করে যদি সে কোটিপতি হয়ে যায় তাহলে তা আল্লাহর দান হিসেবে বিবেচিত হবে। কিন্তু ধন উপার্জনের এ পথ অবলম্বন করে যদি তাকে সারা জীবন দু মুঠো অন্নের উপরই নির্ভর করতে হয়, তার পরিধানের জন্য তালি দেয়া পোশাক, বসবাসের জন্য একটি ভাঙা কুড়ে ঘরই ভাগ্যে জোটে তাহলেও ইসলামের দৃষ্টিতে সে ব্যর্থ নয়। দৃষ্টিভঙ্গীর এ বিভিন্নতার কারণে তারা ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী নির্ভেজাল পুঁজিবাদের পথে অগ্রসর হয়। এ পথে চলার জন্য তাদের যে ধরনের সুযোগ-সুবিধা অবকাশ ও বৈধতার প্রয়োজন ইসলামে তার কোনো সম্ভাবনা নেই। ইসলামের নীতি ও বিধানসমূহকে টেনে-হিঁচড়ে যতই লম্বা করা হোক না কেন, যে উদ্দেশ্যে এ নীতি ও বিধানসমূহ রচিত হয়নি তা পূর্ণ করার জন্য এ থেকে কোনো কর্মনীতি লাভ করা সম্ভব নয়। কাজেই যে ব্যক্তি এ পথে চলতে চায় তার নিজেকে ও দুনিয়াকে প্রতারিত করার কোনো সঙ্গত কারণ থাকতে পারে না। তাকে ভালোভাবে একথা বুঝে নিতে হবে যে, পুঁজিবাদের পথে চলার জন্য তাকে ইসলামের পরিবর্তে কেবলমাত্র পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, মূলনীতি ও বিধানসমূহের অনুসরণ করতে হবে।

তবে যারা মুসলমান হিসেবে পরিচিত এবং এ পরিচয় নিয়ে বেঁচে থাকতে চায়, যারা কুরআন ও রসূলে করীম (স)-এর পদ্ধতির ওপর ঈমান রাখে এবং বাস্তব জীবনে এরই আনুগত্য ও অনুসরণ করা অপরিহার্য মনে করে তাদের একটা নতুন বিধি-ব্যবস্থার প্রয়োজন। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে যাতে তারা লাভবান হতে পারে অথবা ইসলামী আইনে তাদের জন্য এমন ধরনের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা যার ফলে তারা কোটিপতি ব্যবসায়ী, পুঁজিপতি বা কারখানা মালিক হতে পারে, এজন্য এ নতুন বিধি-ব্যবস্থার প্রয়োজন নয়। বরং আধুনিক যুগের অর্থনৈতিক অবস্থা ও ব্যবসায়িক লেনদেনের ক্ষেত্রে নিজেদের

কর্মপদ্ধতিকে ইসলামের সঠিক নীতির ভিত্তিতে ঢেলে সাজাবার এবং লেনদেনের যে পদ্ধতি আল্লাহর নিকট পসন্দনীয় নয়, তা থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য এর প্রয়োজন। যেখানে অন্যান্য জাতির সাথে লেনদেন করার ক্ষেত্রে তারা যথার্থ অক্ষমতার সম্মুখীন হয় সেখানে ইসলামী শরীয়তের গণ্ডীর মধ্যে এ ধরনের অবস্থার জন্য যেসব রুখসাতের সুযোগ আছে তা থেকে লাভবান হবার জন্য এর প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যে অর্থনীতি সংক্রান্ত ইসলামী আইনের পুনর্বিন্যাস নিসন্দেহে অপরিহার্য। এ জাতীয় প্রয়োজনটি পূর্ণ করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো আলেম সমাজের কর্তব্য।

ইসলামী আইনের পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজন

ইসলামী আইন কোনো স্থবির, অনঢ় ও জমাটবদ্ধ আইন নয়। একটি বিশেষ যুগ ও বিশেষ অবস্থার জন্য যে কাঠামোয় এ আইন রচিত হয়েছিল তা চিরকাল অপরিবর্তিত থাকবে এবং স্থান, কাল ও অবস্থার পরিবর্তনের পরও তার কাঠামোয় কোনো প্রকার পরিবর্তন করা যাবে না, ইসলামী আইনের ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য নয়। যারা একথা মনে করে তারা ভ্রান্তির শিকার হয়েছেন। বরং আমি বলবো, তারা ইসলামী আইনের প্রাণসত্তা উপলব্ধি করতে অক্ষম। ইসলামে মূলত 'হিকমাত' ও আদল অর্থাৎ প্রজ্ঞা, গভীর বিচার বুদ্ধি, ন্যায়-নিষ্ঠা ও ভারসাম্যের ওপর শরীয়তের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে। আইন প্রণয়নের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও লেনদেনকে এমনভাবে সংগঠিত করা যার ফলে তাদের মধ্যে সংঘর্ষ ও প্রতিযোগিতার পরিবর্তে সহযোগিতা ও সহানুভূতিপূর্ণ কর্মধারার সৃষ্টি ও বিকাশ সাধিত হয়। তাদের পারস্পরিক দায়িত্ব ও অধিকার যথাযথ ইনসাফ ও ভারসাম্য সহকারে নির্দিষ্ট করে দিতে হবে। সমাজ জীবনে প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজের ক্ষমতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী উন্নতি করার পরিপূর্ণ সুযোগ দিতে হবে। এই সাথে সে যেন অন্যের ব্যক্তিত্বের বিকাশে সহায়ক হয় অথবা কমপক্ষে তার উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক হয়ে বিশৃংখলা ও বিপর্যয় সৃষ্টির পথ উন্মুক্ত না করে। এ উদ্দেশ্যে মানব প্রকৃতি ও দ্রব্যগুণ সম্পর্কিত যে জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া আর কারোর আয়ত্বাধীন নয় তারই ভিত্তিতে তিনি মানব জীবনের প্রতিটি বিভাগে তাকে কতিপয় নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর রসূল তাঁরই প্রদত্ত ঐ জ্ঞানের ভিত্তিতে এ নির্দেশগুলো বাস্তব জীবনে প্রতিফলিত ও প্রতিষ্ঠিত করে আমাদের সামনে একটি আদর্শ পেশ করেছেন। এ নির্দেশগুলো একটি বিশেষ অবস্থায় ও বিশেষ যুগে প্রদত্ত হয়েছিল এবং একটি বিশেষ সমাজে এগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এতদসত্ত্বেও এগুলোর শব্দাবলী এবং এগুলো কার্যকর করার জন্য রসূলুল্লাহ (স) যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন তা থেকে আইনের এমন কতিপয় ব্যাপক

ও সর্বব্যাপী নীতি পাওয়া যায়, যা সর্বযুগে ও সর্বাবস্থায় ন্যায় ও ভারসাম্যপূর্ণ নীতির ভিত্তিতে মানব সমাজের সংগঠন করার জন্য সমভাবে কল্যাণকর ও কার্যকর। ইসলামের এ মূলনীতিগুলোই হচ্ছে অটল, অপরিবর্তনীয় ও অসংশোধনযোগ্য। প্রত্যেক যুগের মুজতাহিদগণের দায়িত্ব হচ্ছে, বাস্তব জীবনের অবস্থা ও ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে শরীয়তের এ মূলনীতি থেকে বিধান নির্ণয় করতে থাকা এবং পারস্পরিক লেনদেনের ক্ষেত্রে সেগুলোকে এমনভাবে প্রবর্তিত করা যার ফলে শরীয়ত প্রণেতার আসল উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়। শরীয়তের মূলনীতি থেকে মানুষ যেসব আইন রচনা করেছে সেগুলো ঐ মূলনীতির ন্যায় অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ মূলনীতির প্রণেতা হচ্ছেন আল্লাহ স্বয়ং আর এ আইনগুলো রচনা করেছে মানুষেরা সবাই মিলে। আবার ঐ মূলনীতিগুলো হচ্ছে সর্বকালের, সর্বযুগের ও সর্বাবস্থার জন্যে আর এ আইনগুলো হচ্ছে বিশেষ কালের ও বিশেষ অবস্থার জন্যে।

পুনর্বিন্যাসের জন্য অপরিহার্য শর্তাবলী

কাজেই অবস্থার পরিবর্তন ও ঘটনাবলীর বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে শরীয়তের মূলনীতির আওতাধীনে তার বিধানসমূহের মধ্যে পরিবর্তন সাধন করার এবং যখনই আবশ্যক দেখা দেবে সে অনুযায়ী আইন রচনা করার পূর্ণ অবকাশ ইসলামে আছে। এ ব্যাপারে প্রত্যেক যুগের প্রত্যেক দেশের মুজতাহিদগণকে স্থান-কালের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিধান রচনা ও জীবন ক্ষেত্রের বিভিন্ন বিষয়াদি নির্ণয় করার পূর্ণ অধিকার দেয়া হয়েছে। কোনো বিশেষ যুগের আলেমগণকে কিয়ামত অবধি সমস্ত যুগের ও সমস্ত জাতির জন্য আইন প্রণয়নের চার্টার দান করে অন্য সবার অধিকার ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে এমনটি ধারণা করার কোনো অবকাশই ইসলামে নেই। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজের ইচ্ছা প্রবৃত্তি অনুযায়ী সেই বিধানসমূহ পরিবর্তন করার ও মূলনীতিগুলো ভেঙ্গে বা বিকৃত করে তাদের উল্টা-পাল্টা ব্যাখ্যা দেয়ার এবং শরীয়ত প্রণেতার যথার্থ উদ্দেশ্যের বিপরীত দিকে আইনসমূহকে ঠেলে দেয়ার স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। এজন্যও কতিপয় শর্ত সম্বলিত একটি নীতি নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রথম শর্ত

খুঁটিনাটি আইন রচনার জন্য সর্বপ্রথম শরীয়তের অন্তর্নিহিত প্রকৃতিকে গভীরভাবে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। কুরআন মজীদের শিক্ষা ও নবী করীম (স)-এর সীরাত সম্পর্কে নিবিষ্ট চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমেই এ উপলব্ধি ও

গভীর জ্ঞান অর্জিত হতে পারে।[১] এ দুটি বিষয়ের ওপর যে ব্যক্তির দৃষ্টি ব্যাপক, প্রসারিত ও গভীরতর হবে সে হবে শরীয়তের প্রকৃত সচেতন ব্যক্তি। বিভিন্ন সময় তার গভীর জ্ঞান ও উপলব্ধি তাকে একথা জানিয়ে দেবে যে, বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্য থেকে কোন্ পদ্ধতিটি শরীয়তের প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল এবং কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করলে তার প্রকৃতিতে ভারসাম্যহীনতা দেখা দেবে। এ গভীর জ্ঞান সহকারে শরীয়তের বিধানের মধ্যে যে পরিবর্তন করা হবে তা কেবল সঙ্গত ও ভারসাম্যপূর্ণ হবে না বরং শরীয়ত প্রণেতার আসল উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য তাঁর নিজের নির্দেশের অনুরূপই হবে। এর দৃষ্টান্ত স্বরূপ বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করা যেতে পারে। যেমন, হযরত উমর (রা)-এর নির্দেশ, যুদ্ধকালে কোনো মুসলমানের ওপর শরীয়াতের দণ্ডবিধি জারী করা যাবে না এবং এ প্রসঙ্গে হযরত সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস কর্তৃক মদ্যপান করার জন্য আবু মেহজান সাকাফীকে ক্ষমা করে দেয়া উল্লেখযোগ্য। হযরত উমর (রা)-এর এ সিদ্ধান্তও উল্লেখযোগ্য যে, দুর্ভিক্ষের সময় কোনো চোরের হাত কাটা যাবে না। এ বিষয়গুলো আপাত দৃষ্টিতে শরীয়ত প্রণেতার সুস্পষ্ট বিধানের পরিপন্থী মনে হলেও শরীয়তের প্রকৃতি সচেতন ব্যক্তি মাত্রই জানেন যে, এসব বিশেষ অবস্থায় সাধারণ নির্দেশের কার্যকারিতা মূলতবী রাখা শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্যের যথার্থই অনুকূল। হাতেব ইবনে আবী বালতাআর গোলামদের ঘটনাও এ একই শ্রেণীভুক্ত। মুযাইনা গোত্রের এক ব্যক্তি হযরত উমর (রা)-এর নিকট অভিযোগ করেন যে, হাতেবের গোলামরা তার উট চুরি করেছে। হযরত উমর (রা) প্রথমে তাদের হাত কাটাবার হুকুম দেন কিন্তু পর মুহূর্তেই তিনি সচেতন হয়ে ওঠেন এবং বলেন, তুমি ঐ গরীবদেরকে খাটিয়ে নিয়েছো। কিন্তু তাদেরকে অনাহারে শুকিয়ে মেরেছো। এবং তাদেরকে এমন অবস্থায় পৌছিয়ে দিয়েছো যার ফলে তারা যদি কোনো হারাম বস্তু খেয়ে ফেলে তাও তাদের জন্য বৈধ হয়ে যাবে। একথা বলে তিনি ঐ গোলামদেরকে ক্ষমা করে দেন এবং তাদের মালিকের নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করে উট ওয়ালাকে দান করেন। অনুরূপভাবে তিন তালাকের ব্যাপারেও হযরত উমর (রা) যে

---

১. এখানে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, আজকের যুগে ইজতিহাদের দুয়ার বন্ধ হবার আসল কারণ হচ্ছে কুরআন ও রসূল (স)-এর সীরাত অধ্যয়নের বিষয়সূচী আমাদের দীনি শিক্ষা সিলেবাস থেকে বাদ পড়ে গেছে এবং ফিকাহর কোনো একটি মযহাবের শিক্ষা সেই স্থানে জুড়ে বসেছে। এ শিক্ষাও এমনভাবে দেয়া হয় যার ফলে প্রথম থেকে আল্লাহ ও রসূল (স)-এর নির্দেশিত সুস্পষ্ট বিধান ও মুজতাহিদগণের ইজতিহাদের মধ্যে যথার্থ পার্থক্য ছাত্রদের সামনে তুলে ধরা হয় না। অথচ কোনো ব্যক্তি বুদ্ধি বৃত্তিক পদ্ধতিতে কুরআনের গভীর জ্ঞান অর্জনে সক্ষম না হলে এবং রসূলুল্লাহ (স)-এর কর্মপদ্ধতি ও কর্মনীতিকে গভীরভাবে অধ্যয়ন না করলে ইসলামের অন্তঃপ্রকৃতি ও ইসলামী আইনের মূলনীতি অনুধাবনে সক্ষম হতে পারে না। এটি ইজতিহাদের জন্য অপরিহার্য এবং সারা জীবন ফিকাহর কিতাব পড়লেও এ বস্তুটি অর্জিত হতে পারে না।

নির্দেশ দেন তাও রসূলুল্লাহ (স)-এর যুগের কার্যধারা থেকে বিভিন্ন ছিল। কিন্তু যেহেতু শরীয়তের প্রকৃতি অনুধাবন করার পর শরীয়তের বিধানের মধ্যে এসব পরিবর্তন সাধন করা হয়েছিল, তাই এগুলোকে কেউ অসঙ্গত বলতে পারেন না। বিপরীত পক্ষে এ উপলব্ধি ও গভীর জ্ঞান ছাড়াই যে পরিবর্তন করা হয় তা শরীয়াতের প্রকৃতিতে ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করে এবং এর ফলে বিপর্যয় দেখা দেয়।

দ্বিতীয় শর্ত

শরীয়তের প্রকৃতি অনুধাবন করার পর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হচ্ছে, জীবনের যে বিভাগে আইন প্রণয়নের প্রয়োজন দেখা দেয় সে বিভাগ সম্পর্কিত শরীয়ত প্রণেতার যাবতীয় বিধান দৃষ্টি সমক্ষে রাখতে হবে এবং সে সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করে একথা জানতে হবে যে, শরীয়ত প্রণেতা অর্থাৎ রসূলুল্লাহ (স) এ বিভাগটিকে কিভাবে সংগঠিত করতে চান, ইসলামী জীবনের ব্যাপকতর পরিকল্পনায় এ বিশেষ বিভাগটির স্থান কোথায় এবং এ স্থানের প্রেক্ষিতে শরীয়ত প্রণেতা এ বিভাগে কি কার্যকর নীতি অবলম্বন করেছেন, এ বিষয়টি অনুধাবন না করে যে আইন প্রণীত হবে অথবা পূর্ববর্তী আইনে যে পরিবর্তন-পরিবর্ধন সাধন করা হবে তা শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্যের অনুসারী হবে না এবং এর ফলে আইনের গতিধারা কেন্দ্র থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়বে।

ইসলামী আইনে কোনো বিধানের বাইরের আবরণের ততটা গুরুত্ব নেই যতটা গুরুত্ব আছে তার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের। ফকীহ্ ও ইসলামী আইনবিদের প্রধান কাজই হচ্ছে শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্য এবং তাঁর বিধানের অন্তর্নিহিত গভীর জ্ঞানের প্রতি দৃষ্টি রাখা, এমন অনেক বিশেষ ক্ষেত্র আসে যখন বিধানের বহিরঙ্গকে (সাধারণ অবস্থাকে সামনে রেখে যা প্রণীত হয়েছিল) কার্যকর করতে গেলে তার আসল উদ্দেশ্যই খতম হয়ে যায়। এহেন অবস্থায় বহিরঙ্গকে বাদ দিয়ে এমনভাবে তাকে কার্যকর করতে হবে যার ফলে শরীয়ত প্রণেতার আসল উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়। কুরআন মজীদে সৎকর্মের আদেশ ও অসৎ কর্মের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য জোর তাকীদ করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ (স) এর উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তিনি যালেম ও নিপীড়ক শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঝাণ্ডা বুলন্দ করতে নিষেধ করেছেন। কারণ শরীয়ত প্রণেতার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে বিপর্যয় ও বিশৃংখলাকে সংশোধন ও সুকৃতিতে বদলে দেয়া। যখন কোনো কাজে আরো অধিক বিপর্যয় ও বিশৃংখলা সৃষ্টি হবার আশংকা থাকে এবং সংশোধনের কোনো আশাই না থাকে তখন তা থেকে সরে আসাই উত্তম। ইমাম ইবনে তাইমিয়ার জীবনেতিহাসে দেখা যায়, তাতারী ফিতনার যুগে তিনি একটি স্থান অতিক্রম করার সময়

দেখেন তাতারীদের একটি দল মদ্যপানে মত্ত। ইমামের সাথীরা তাদেরকে মদ্য পান থেকে বিরত রাখতে চাইলেন। কিন্তু ইমাম তাদেরকে বাধা দিয়ে বললেন, ফিতনা-ফাসাদ ও বিপর্যয় বিশৃংখলার পথ রোধ করার জন্য আল্লাহ মদ হারাম করেছেন, কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে মদ এ যালেমদেরকে একটি বড় ফিতনা অর্থাৎ নরহত্যা ও সম্পদ লুণ্ঠন থেকে বিরত রেখেছে। কাজেই এ অবস্থায় তাদেরকে মদ্যপানে বিরত রাখার চেষ্টা করা শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। এ থেকে জানা যায়, অবস্থা ও ঘটনাবলীর বিশেষত্বের কারণে শরীয়তের বিধানের মধ্যে পরিবর্তন সাধন করা যেতে পারে। কিন্তু পরিবর্তন এমন হতে হবে যার ফলে শরীয়ত প্রণেতার আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ না হয়ে যেন তা সফল হয়।

অনুরূপভাবে কোনো কোনো বিধান বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে বিশেষ শব্দাবলীর মাধ্যমে দেয়া হয়েছিল। অবস্থার পরিবর্তন সত্ত্বেও ঐ বিশেষ শব্দাবলীর মধ্যে আটকে থাকা কোনো ফকীহর কাজ নয়। বরং তাঁকে ঐ শব্দগুলোর মধ্যে নিহিত শরীয়ত প্রণেতার আসল উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে হবে এবং ঐ উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যথোপযোগী বিধান রচনা করতে হবে। যেমন সাদকায়ে ফিতর হিসেবে রসূলুল্লাহ (স) এক সা' খেজুর বা এক সা' যব অথবা এক সা' কিসমিস দেয়ার হুকুম দিয়েছিলেন। এর অর্থ এ নয় যে, সেকালে মদীনায় যে (সা')-এর প্রচলন ছিল এবং রসূলুল্লাহ (স) যে শস্য দ্রব্যগুলোর কথা বলেছেন হুবহু এগুলোই এখানে উদ্দেশ্য। শরীয়ত প্রণেতার আসল উদ্দেশ্য কেবল এতটুকু যে, ঈদের দিন প্রত্যেক সক্ষম ব্যক্তিকে এতখানি সাদকা দিতে হবে যার ফলে তার একজন অভাবী ভাই কমপক্ষে তার ঈদের সময়টা সানন্দে অতিবাহিত করতে পারে। শরীয়ত প্রণেতার নির্ধারিত পদ্ধতির নিকটবর্তী অন্য কোনো পদ্ধতিতেও এ উদ্দেশ্যটি পূর্ণ করা যেতে পারে।

তৃতীয় শর্ত

এই সাথে শরীয়ত প্রণেতার আইন প্রণয়ন নীতিও যথাযথভাবে অনুধাবন করতে হবে। এভাবে স্থান-কালের চাহিদা অনুযায়ী বিধান প্রণয়ন করার ক্ষেত্রে তাঁর নির্ধারিত নীতি ও পদ্ধতির অনুসরণ করা সম্ভবপর হবে। এটা ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব নয় যতক্ষণ না সামগ্রিকভাবে প্রথমে শরীয়তের কাঠামো অতপর এককভাবে তার প্রত্যেকটি বিধানের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা হবে। শরীয়ত প্রণেতা কিভাবে বিধানসমূহের মধ্যে ভারসাম্য ও ন্যায়নীতি কায়েম করেছেন, কিভাবে তিনি মানব প্রকৃতির দুর্বলতার জন্য তাকে সুবিধা দান

করেছেন, বিপর্যয় ও বিশৃংখলা রোধ করার এবং সুকৃতির পথ উন্মুক্ত করার জন্য তিনি কি পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, কিভাবে তিনি মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও লেনদেনের সংগঠন করতে এবং তাদের মধ্যে সুব্যবস্থা কায়েম করতে চান, কোন্ পদ্ধতিতে তিনি মানুষকে তার উন্নততর উদ্দেশ্যের দিকে নিয়ে যান এবং এই সাথে তার প্রাকৃতিক দুর্বলতাগুলো সামনে রেখে যথাযথ সুযোগ-সুবিধা দান করে তার পথকে সহজতর করেন—এসব বিষয়ে যথেষ্ট চিন্তা-গবেষণার প্রয়োজন দেখা দেয় এবং এজন্য কুরআনের আয়াতের শাব্দিক ও অর্থগত প্রতিপাদ্য এবং রসূলুল্লাহ (স)-এর কথা ও কর্মের গভীর তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। যে ব্যক্তি এ ধরনের বিদ্যাবত্তা ও গভীর তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হন তিনি স্থান-কাল অনুযায়ী শরীয়তের বিধানসমূহের মধ্যে আংশিক পরিবর্তনও করতে পারেন এবং যেসব বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট নির্দেশ নেই সেসব বিষয়ে নতুন বিধানও রচনা করতে পারেন। কারণ এহেন ব্যক্তি ইজতিহাদের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতির অবলম্বন করবেন তা ইসলামের আইন প্রণয়ন নীতি থেকে বিচ্যুত হবে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, কুরআন মজীদে কেবল আহলে কিতাবদের নিকট থেকে জিযিয়া গ্রহণ করার নির্দেশ পাওয়া যায়। কিন্তু সাহাবাগণ ইজতিহাদের মাধ্যমে এ নির্দেশটিকে আজমের অগ্নিপূজারী, হিন্দুস্তানের পৌত্তলিক ও আফ্রিকার বারবার অধিবাসীদের মধ্যেও বিস্তৃত করেন। অনুরূপভাবে খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে বিভিন্ন দেশ বিজিত হবার পর অন্যান্য জাতিদের সাথে এমন অসংখ্য ঘটনা ঘটে যেগুলোর ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নায় কোনো সুস্পষ্ট বিধান ছিল না। সাহাবাগণ নিজেরাই সেসব ব্যাপারে আইন প্রণয়ন করেন। ইসলামী শরীয়তের প্রাণসত্তা ও তার মূলনীতির সাথে সেগুলো পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল ছিল।

চতুর্থ শর্ত

অবস্থা ও ঘটনাবলীর যে পরিবর্তন শরীয়তের বিধানের মধ্যে পরিবর্তন অথবা নতুন বিধান প্রণয়নের দাবীদার হয় তাকে দুটো পর্যায়ে যাঁচাই করা প্রয়োজন। এক, ঐ ঘটনাগুলো কোন্ শ্রেণীভুক্ত, তাদের বৈশিষ্ট্য কি এবং তাদের মধ্যে কোন্ ধরনের শক্তি কাজ করছে। দুই, ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে তাদের মধ্যে কোন্ ধরনের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং প্রত্যেকটি পরিবর্তন শরীয়তের বিধানের মধ্যে কোন্ ধরনের পরিবর্তনের প্রত্যাশী।

দৃষ্টান্ত হিসেবে আমাদের বর্তমানে আলোচ্য সুদের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। আধুনিক ইসলামী অর্থনৈতিক বিধান রচনার জন্যে আমাদেরকে সর্বপ্রথম বর্তমান অর্থনৈতিক জগতের পর্যালোচনা করতে হবে। গভীর অন্তর্দৃষ্টি সহকারে

আমাদেরকে অধ্যয়ন করতে হবে অর্থনীতি, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও লেনদেনের আধুনিক পদ্ধতিগুলো। অর্থনৈতিক জীবনের অভ্যন্তরে যেসব শক্তি কর্মতৎপর সেগুলো অনুধাবন করতে হবে। তাদের আদর্শ ও মূলনীতির সাথে পরিচিত হতে হবে এবং যেসব বাস্তব আকৃতির মধ্যে ঐ সমস্ত আদর্শ ও মূলনীতির প্রকাশ ঘটবে সেগুলো সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। অতপর আমাদেরকে দেখতে হবে পূর্ববর্তী যুগের তুলনায় ঐসব ব্যাপারে যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে তাদেরকে কোন্ কোন্ শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে এবং প্রত্যেক শ্রেণীর ওপর শরীয়তের প্রকৃতি, তার উদ্দেশ্যাবলী ও আইন প্রণয়ন নীতির সাথে সামঞ্জস্যশীল করে কোন্ ধরনের বিধান প্রচলিত হওয়া উচিত।

খুঁটিনাটি বিষয়গুলো বাদ দিয়েও এ পরিবর্তনগুলোকে আমরা নীতিগতভাবে মোটামুটি দুটো শ্রেণীতে বিভক্ত করতে পারি।

এক ঃ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার পরিবর্তনের কারণে যেসব পরিবর্তন দেখা দিয়েছে, সে পরিবর্তনগুলো আসলে মানুষের তাত্ত্বিক, বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ও অগ্রগতি, আল্লাহর গোপন ধনভাণ্ডারের ব্যাপক আবিষ্কার, বস্তুগত উপকরণাদির উন্নতি, যোগাযোগ ব্যবস্থার অগ্রগতি উৎপাদন উপকরণের পরিবর্তন এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ব্যাপক বিস্তৃতির স্বাভাবিক ফলশ্রুতি। ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে এ ধরনের পরিবর্তন হচ্ছে স্বাভাবিক ও যথার্থ। এ পরিবর্তনের বিলুপ্তি সম্ভব নয় এবং এ বিলুপ্তি আকাঙ্ক্ষিত নয়। বরং এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন শুধু এতটুকুন যে, এ পরিবর্তনের প্রভাবে অর্থনৈতিক অবস্থা ও বিষয়াবলী এবং ব্যবসায়িক লেনদেনের যে নতুন নতুন চেহারা দেখা দিয়েছে তাদের জন্য শরীয়তের মূলনীতির ভিত্তিতে নবতর বিধান রচনা করতে হবে। এভাবে পরিবর্তিত অবস্থায় মুসলমানরা যথার্থ ইসলামী পদ্ধতিতে নিজেদের কাজ চালিয়ে যেতে পারবে।

দুই ঃ যে পরিবর্তনগুলো আসলে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির স্বাভাবিক ফলশ্রুতি নয় বরং বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ও আর্থিক লেনদেন সম্পর্কিত বিষয়াবলীতে যালেম পুঁজিপতিদের নিরঙ্কুশ আধিপত্যের ফলে উদ্ভূত। জাহেলী যুগে যে যুলুমভিত্তিক পুঁজিবাদের প্রসার ছিল[১] এবং শত শত বছর ধরে ইসলাম

১. এখানে পুঁজিবাদ শব্দটিকে আমরা সীমিত অর্থে ব্যবহার করিনি, যেমন আজকাল পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে। বরং যথার্থ পুঁজিবাদের মধ্যেই যে ব্যাপক অর্থ লুকিয়ে রয়েছে সে অর্থে আমরা একে ব্যবহার করেছি। পারিভাষিক পুঁজিবাদ ইউরোপের শিল্প বিপ্লব থেকে সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু আসল পুঁজিবাদ একটি অতি প্রাচীন বস্তু। যখন থেকে মানব নিজের সমাজ-সভ্যতা-সংস্কৃতির নেতৃত্ব শয়তানের হাতে তুলে দিয়েছে তখন থেকেই এই পুঁজিবাদ বিভিন্ন আকারে সেখানে প্রতিপত্তি বিস্তার করে আসছে।

যাকে মাথা তুলতে দেয়নি সে আজ পুনর্বার অর্থনৈতিক জগতের উপরে প্রতিপত্তি বিস্তার করেছে। সে আজ সভ্যতা ও সংস্কৃতির উন্নততর উপকরণাদির সহায়তায় নিজের পুরাতন মতাদর্শকে নতুন আদলে অর্থনৈতিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দিয়েছে। পুঁজিবাদের এ প্রতিপত্তির কারণে যেসব পরিবর্তন সাধিত হয়েছে ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে সেগুলো আসল ও স্বাভাবিক পরিবর্তন নয় বরং সেগুলো হচ্ছে কৃত্রিম পরিবর্তন। শক্তি প্রয়োগ করে সেগুলোকে খতম করা যেতে পারে এবং মানবজাতির কল্যাণার্থে সেগুলো খতম করা একান্ত প্রয়োজন। সেগুলো নিশ্চিহ্ন করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করা এবং ইসলামী নীতির ভিত্তিতে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা করা মুসলমানের প্রধান কর্তব্য। পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার দায়িত্ব একজন কমিউনিষ্টের তুলনায় মুসলমানের উপর অধিক পরিমাণে বর্তায়। কমিউনিষ্টের সম্মুখে আছে নিছক রুটির প্রশ্ন। কিন্তু মুসলমানের নিকট প্রধান প্রশ্ন হচ্ছে দ্বীন—জীবন বিধান ও নৈতিকতার, কমিউনিষ্ট নিছক প্রলেতারিয়েতের জন্য সংগ্রাম করতে চায় কিন্তু মুসলমান পুঁজিপতি সহ সমগ্র মানব জাতির যথার্থ কল্যাণার্থে সংগ্রাম করে। কমিউনিষ্টের সংগ্রামের ভিত্তি হচ্ছে স্বার্থ চিন্তা। আর মুসলমানের সংগ্রাম হয় আল্লাহর জন্যে। কাজেই আধুনিক যুলুমভিত্তিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সাথে মুসলমান কোনো দিন আপোষ করতে পারে না। ইসলামের পূর্ণ অনুসারী প্রকৃত ও যথার্থ মুসলমান এই যুলুম ব্যবস্থা নিশ্চিহ্ন করার জন্য হামেশা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে এবং এ প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের সম্ভাব্য সকল প্রকার ক্ষতির পুরুষোচিত মুকাবিলা করবে, এটা তার আল্লাহর পক্ষ থেকে তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব। অর্থনৈতিক জীবনের এ বিভাগে ইসলাম যে আইন প্রণয়ন করবে তার উদ্দেশ্য মুসলমানের জন্য পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়া, তার বিভিন্ন সংস্থায় অংশগ্রহণ করা ও তার সাফল্যের উপকরণাদি সংগ্রহের ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করে দেয়া নয় বরং তার একমাত্র উদ্দেশ্য হবে যুলুম-ভিত্তিক ও অবৈধ পুঁজিবাদের পরিপোষণকারী দুর্গন্ধময় আবর্জনা থেকে মুসলমানকে ও সমগ্র বিশ্ব মানবতাকে সংরক্ষিত রাখা।

কঠোরতা হ্রাসের সাধারণ নীতি

অবস্থা ও প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে শরীয়তের বিভিন্ন বিধানের কঠোরতাকে নরম করার যথেষ্ট অবকাশ ইসলামী আইনে রাখা হয়েছে। এজন্য ফিকাহর একটি অন্যতম নীতি হচ্ছে ঃ الضرورات تبيح المحظورات এবং والمشقة تجلب التيسير (অর্থাৎ 'প্রয়োজন অনেক অবৈধ বস্তুকে বৈধ বানিয়ে দেয়' এবং 'যেখানে শরীয়াতের কোনো নির্দেশ কার্যকর করা কঠিন হয় সেখানে কঠোরতা

হ্রাস করা হয়'।) কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন স্থানে শরীয়তের এই নীতিটির প্রতি ইংগিত করা হয়েছে ঃ

لَايُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا ط (البقرة : ٢٨٦)

"আল্লাহ্ কাউকে তার শক্তি-সামর্থের বেশী কষ্ট দেন না।"
–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৮৬)

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ز (البقرة : ١٨٥)

"আল্লাহ তোমাদের কাজকে সহজ করতে চান, কঠিন করতে চান না।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ১৮৫)

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ط (الحج : ٧٨)

"তিনি তোমাদের ওপর দীনের ব্যাপারে কোনো কড়াকড়ি করেননি।"
–(সূরা আল হাজ্জ ঃ ৭৮)

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে ঃ

احب الدين الى اللّٰه تعالى الحنيفية السمحة ولا ضرر ولا ضرار فى الاسلام -

"সাদাসিধে ও নরম দীনই হচ্ছে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় ইসলামে কোনো ক্ষতি ও ক্ষতিকারক নেই।"

কাজেই ইসলামে এ নীতি স্বীকৃতি লাভ করেছে যে শরীয়তের বিধানে কোথাও কষ্ট ও ক্ষতি দেখা গেলে সেখানে বিধানটি নরম ও সহজ করে দিতে হবে। এর অর্থ প্রত্যেকটি কল্পিত প্রয়োজনে শরীয়তের বিধান ও খোদার নির্দেশিত সীমানাকে শিকেয় তুলে রাখা নয়, শরীয়তের কঠোরতা হ্রাসের নীতি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে সহজেই বুঝা যায় যে, এজন্য কতিপয় নীতি-নিয়ম রয়েছে।

এক ঃ দেখতে হবে কষ্টটি কোন্ পর্যায়ের। প্রতিটি সাধারণ কষ্টের জন্যে শরীয়ত আরোপিত দায়িত্ব খতম করা যেতে পারে না। এভাবে চলতে থাকলে অবশেষে আর কোনো আইনই বাকি থাকবে না। শীতে অযু করার কষ্ট, গরমে রোযা রাখার কষ্ট, সফরে হজ্জ ও জিহাদ করার কষ্ট। এ সমস্ত কষ্ট নিসন্দেহে কষ্টের শ্রেণীভুক্ত। কিন্তু এগুলো এমন কোনো কষ্ট নয়—যার জন্যে শরীয়ত আরোপিত দায়িত্বগুলো খতম করে দিতে হবে। আইনের কঠোরতা হ্রাস বা আইনটির প্রয়োগ রহিত হবার জন্যে অন্তত কষ্টটি ক্ষতিকারক পর্যায়ের হতে

হবে। যেমন, সফরের অনিবার্য সংকট, রোগের কষ্টকর অবস্থায়, কোনো যালেমের নির্যাতন ও নিষ্পেষণ, চরম অভাব-অনটন, কোনো অস্বাভাবিক বিপদ, সাধারণ বিপর্যয় অথবা কোনো শারীরিক ত্রুটি। এ ধরনের বিশেষ অবস্থায় শরীয়ত তার বহুতর বিধানের কঠোরতা হ্রাস করেছে এবং এগুলোর ওপর অন্যান্য কঠোরতাহ্রাসের বিষয়গুলোও কিয়াস করা যেতে পারে।

দুই : কষ্ট ও অক্ষমতা যে পর্যায়ভুক্ত হয় কঠোরতা হ্রাসও ঐ একই পর্যায়ভুক্ত হতে হবে। যেমন, যে ব্যক্তি রুগ্নাবস্থায় বসে নামায পড়তে পারে তার জন্য শুয়ে শুয়ে নামায পড়া জায়েয নয়। যে রোগের কারণে রমযানের দশটি রোযা কাযা করা যথেষ্ট তার জন্য সারা রমযান মাস রোযা না রেখে খেয়ে দেয়ে কাটিয়ে দেয়া নাজায়েয। এক ঢোক মদ্যপান বা এক-দুই লোকমা হারাম খেয়ে যে ব্যক্তির প্রাণ বাঁচতে পারে এই যথার্থ প্রয়োজনের চেয়ে বেশী পান বা আহার করার অধিকার তার নেই। অনুরূপভাবে শরীরের গুপ্ত অংশের মধ্য থেকে যতটুকুন ডাক্তারের নিকট উন্মুক্ত করা একান্ত অপরিহার্য তার অধিক উন্মুক্ত করার অধিকার কোনো ব্যক্তির নেই। এ নীতির ভিত্তিতে কষ্ট ও প্রয়োজনের পরিমাণ অনুযায়ী সকল প্রকার কঠোরতাহ্রাসের পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে।

তিন : কোনো ক্ষতিকারক বস্তু বা বিষয় দূর করার জন্যে এমন কোনো উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে না যা সমপরিমাণ বা অধিক ক্ষতিকারক। বরং এ ক্ষেত্রে কেবল এমন সব উপায় অবলম্বনের অনুমতি দেয়া যেতে পারে যেগুলোর ক্ষতিকর প্রভাব তুলনামূলকভাবে কম। এর কাছাকাছি আর একটা নীতি হচ্ছে এই যে, কোনো বিপর্যয় সৃষ্টিকারী বিষয় থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য তার চেয়ে বড় একটি বিপর্যয় সৃষ্টিকারী বিষয়ে জড়িয়ে পড়া জায়েয নয়। তবে দুটো বিপর্যয় সৃষ্টিকারী বিষয়ের মুখোমুখি হয়ে যখন কোনো ব্যক্তির জন্যে তার মধ্য থেকে একটির সাথে জড়িয়ে পড়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে, এ ক্ষেত্রে বড় বিপর্যয় সৃষ্টিকারী বিষয়টিকে খতম করার জন্যে ছোট বিপর্যয় সৃষ্টিকারী বিষয়টি গ্রহণ করা জায়েয।

চার : সৎকাজ করার চেয়ে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কাজ নির্মূল করে দেয়া অগ্রাধিকার লাভ করে। শরীয়তের দৃষ্টিতে সৎকাজের নীতি মেনে চলা এবং ফরয ও ওয়াজিব কাজসমূহ সম্পাদন করার তুলনায় অসৎ বৃত্তিসমূহ দূর করা এবং হারাম থেকে আত্মরক্ষা করা ও বিপর্যয়-বিশৃংখলা দূর করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য কষ্টের সময় শরীয়ত যে পরিমাণ ঔদার্য সহকারে ফরযগুলো কঠোরতাহ্রাস করে অনুরূপ ঔদার্য সহকারে নিষিদ্ধ কাজগুলোর অনুমতি দেয়

না। সফর ও পীড়িত অবস্থায় নামায, রোযা ও অন্যান্য ওয়াজিব কাজসমূহের কঠোরতা যে পরিমাণ হ্রাস করা হয়েছে, নাপাক ও হারাম বস্তুগুলো ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনুরূপ কঠোরতা হ্রাস করা হয়নি।

কষ্ট ও ক্ষতির অপনোদনের সাথে সাথেই কঠোরতা হ্রাসের নীতিও রহিত হয়ে যায়। যেমন, রোগ নিরাময়ের পর তায়াম্মুমের অনুমতি খতম হয়ে যায়।

সুদের ক্ষেত্রে শরীয়তের কঠোরতা হ্রাসের পর্যায়

ওপরে বর্ণিত নীতিগুলো সামনে রেখে চিন্তা করুন, বর্তমান অবস্থায় সুদের ব্যাপারে শরীয়তের বিধানসমূহের মধ্যে কি পরিমাণ কঠোরতা হ্রাস করা যেতে পারে।

এক ঃ সুদ দেয়া ও সুদ নেয়া দুটো একই ধরনের অবস্থা বা কাজ নয়। অনেক সময় মানুষ সুদী ঋণ নিতে বাধ্য হয়। কিন্তু সুদ খেতে বাধ্য হওয়ার কোনো যথার্থ কারণ থাকতে পারে না। ধনী ব্যক্তিই সুদ নিয়ে থাকে, অথচ সে এমন কি অক্ষমতার সম্মুখীন হয় যার ফলে তার জন্য হারাম হালালে পরিণত হয়?

দুই ঃ সুদী ঋণ নেয়ার জন্য প্রত্যেকটি প্রয়োজনকেই অক্ষমতার আওতাভুক্ত করা যায় না। বিয়ে-শাদী ও সুখ-দুঃখের অনুষ্ঠানে অযথা অর্থ ব্যয় করা কোনো যথার্থ প্রয়োজনের তাগিদ নয়। গাড়ী কেনা বা পাকা বাড়ী তৈরী করা কোনো যথার্থ অক্ষমতার অবস্থা সৃষ্টি করে না। বিলাস দ্রব্য সংগ্রহ করা বা ব্যবসায়িক উন্নতির জন্য অর্থ সংগ্রহ করা কোনো প্রয়োজনীয় কাজ নয়। এ সমস্ত কাজ এবং এ ধরনের আরো বিভিন্ন কাজকে প্রয়োজন ও অক্ষমতা হিসেবে উল্লেখ করা হয়। এসব কাজের জন্যে পুঁজিপতিদের নিকট থেকে হাজার হাজার লাখো লাখো টাকা ঋণ নেয়া হয়। শরীয়তের দৃষ্টিতে এ প্রয়োজন ও অক্ষমতাগুলোর কানাকড়িও গুরুত্ব নেই এবং এসব উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্যে যারা সুদ দেয় তারা মারাত্মক গোনাহগার। যে ধরনের অক্ষমতায় হারাম ও হালালে পরিণত হয়, একমাত্র সে ধরনের অক্ষমতার ক্ষেত্রে শরীয়ত সুদী ঋণ নেয়ার অনুমতি দিতে পারে। অর্থাৎ এমন কোনো কঠিন বিপদ যে ক্ষেত্রে সুদী ঋণ নেয়া ছাড়া উপায় নেই। যেমন, প্রাণ ও মান-সম্মান বিপদের সম্মুখীন হয়েছে অথবা কোনো অসহনীয় কষ্ট বা ক্ষতির যথার্থ আশংকা দেখা দিয়েছে। এ অবস্থায় একজন অক্ষম ও নাচার মুসলমানের জন্য সুদী ঋণ নেয়া জায়েয বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু এ অবস্থায় যেসব সচ্ছল ও সমর্থ মুসলমান তাদের এক ভাইয়ের এহেন বিপদের দিনে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি এবং এর ফলে সে একটি হারাম কাজ করতে বাধ্য হয়েছে, তারা সবাই গোনাহগার হবে। বরং আমি বলবো, এ

ক্ষেত্রে সমগ্র মুসলমান সমাজই গোনাহগার হবে। কারণ এ সমাজ যাকাত, সাদকা ও আওকাফের সম্পত্তির যথার্থ সংগঠন করার ক্ষেত্রে অবহেলা ও গাফলতি দেখিয়েছে, যার ফলে তার সদস্যবর্গ অসহায় হয়ে পড়েছে এবং নিজেদের প্রয়োজনের ক্ষেত্রে পুঁজিপতিদের কাছে হাত পাতা ছাড়া তাদের গত্যন্তর থাকেনি।

তিন ঃ চরম অপারগ অবস্থায় কেবলমাত্র প্রয়োজন অনুযায়ী সুদী ঋণ নেয়া যেতে পারে এবং তাও সামর্থ ও সক্ষমতা ফিরে আসার সাথে সাথে প্রথম সুযোগেই পরিশোধ করে দিতে হবে। কারণ প্রয়োজন পূর্ণ হয়ে সক্ষমতা ফিরে আসার পর এক পয়সা সুদ আদায় করাও হারাম। প্রশ্ন হচ্ছে, প্রয়োজন অপরিহার্য কিনা আর অপরিহার্য হলে তা কোন্ পর্যায়ভুক্ত এবং কখন সক্ষমতা ফিরে এসেছে—এসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার দায়িত্ব অক্ষম অবস্থায় নিপতিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বুদ্ধি-জ্ঞান ও দীনি অনুভূতির ওপর ছেড়ে দেয়া হবে। সে যত বেশী দীনদার ও খোদাভীরু হবে এবং তার ঈমান যত বেশী শক্তিশালী হবে ততবেশী সে এ ব্যাপারে সতর্ক ও সংযমী হবে।

চার ঃ যারা ব্যবসায়িক অক্ষমতা বা নিজের সম্পদ সংরক্ষণ অথবা বর্তমান জাতীয় নৈরাজ্যের কারণে নিজের ভবিষ্যত নিশ্চিন্ততা ও নিশ্চয়তার জন্যে ব্যাংকে অর্থ জমা রাখে বা ইন্সুরেন্স কোম্পানীতে বীমা করায় অথবা কোনো নিয়মের আওতাধীনে প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডে অংশগ্রহণ করে, তাদের অবশ্যি কেবলমাত্র নিজের আসল পুঁজি বা মূলধনকেই নিজের সম্পদ মনে করতে হবে এবং এ মূলধন থেকে বছরে শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত দিতে হবে। কারণ এভাবে যাকাত না দিলে সঞ্চিত অর্থ তাদের জন্যে অপবিত্র হয়ে যাবে তবে এজন্য শর্ত হচ্ছে, তাদের খোদাপরস্ত হতে হবে, অর্থ পূজারী হলে চলবে না।

পাঁচ ঃ ব্যাংক ইন্সুরেন্স কোম্পানী বা প্রভিডেন্ট ফাণ্ড থেকে তাদের খাতে যে সুদ জমা হয় তা পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেয়া জায়েয নয়। কারণ এগুলো ঐ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের হাতকে আরো শক্তিশালী করবে। এজন্য এক্ষেত্রে সঠিক পথ হচ্ছে, যেসব দরিদ্র পীড়িত ও অনশন ক্লিষ্ট ব্যক্তিদের দূরবস্থা তাদের জন্যে হারাম খাওয়া জায়েয করে দিয়েছে সুদ বাবদ প্রাপ্ত অর্থগুলো তাদের মধ্যে বণ্টন করা উচিত।[১]

---

১. আমার এ প্রস্তাবটি যথার্থ বিচারের আর একটি মাপকাঠি হচ্ছে এই যে, মূলত সুদ আসে গরীবদের পকেট থেকে। সরকারী ট্রেজারী, ব্যাংক বা ইন্সুরেন্স কোম্পানী সবখানেই সুদের মূল উৎস হচ্ছে গরীবের পকেট।

ছয় ঃ অর্থনৈতিক লেনদেন ও ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে যেসব মুনাফা সুদের আওতাভুক্ত হয় অথবা যেগুলোর সুদ হবার ব্যাপারে সন্দেহ থাকে, সেগুলোকে যথাসাধ্য এড়িয়ে চলা সম্ভব না হলে এ ক্ষেত্রে আমাদের পাঁচ নম্বরে বর্ণিত পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত। এসব ব্যাপারে একজন ঈমানদার মুসলমানের দৃষ্টি থাকতে হবে, মুনাফা অর্জনের পরিবর্তে ক্ষতি ও বিপর্যয় দূরীকরণের প্রতি। যদি সে আল্লাহকে ভয় করে ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে, তাহলে ব্যবসায়ে উন্নতি ও আর্থিক মুনাফা অর্জনের চেয়ে হারাম থেকে দূরে থাকা ও আল্লাহর নিকট জবাবদিহি থেকে নিষ্কৃতি লাভের চিন্তাই তার নিকট অধিকতর প্রিয় হওয়া উচিত।

কেবলমাত্র ব্যক্তির জন্যে এ কঠোরতা হ্রাসের অবকাশ রয়েছে। তবে এ নিয়ম জাতির জন্যেও প্রযোজ্য হতে পারে, যদি সমগ্র জাতি অন্যের অধীনতা শৃংখলে আবদ্ধ থাকার দরুন নিজের স্বতন্ত্র অর্থব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষমতা না রাখে। কিন্তু কোনো স্বাধীন স্বতন্ত্র মুসলমান গোষ্ঠী, সম্প্রদায় বা জাতি, নিজের সমস্যা সমাধান করার ক্ষমতা যার করতলগত, সে সুদের ব্যাপারে নিজের জন্যে এ কঠোরতা হ্রাসের দাবী করতে পারে না, যতক্ষণ না একথা প্রমাণ হয়ে যায় যে, সুদ ছাড়া অর্থব্যবস্থা, ব্যাংকিং, ব্যবসায়, শিল্প কোনো কিছুই চলতে পারে না এবং এর কোনো বিকল্পও নেই। তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যদি একথার ভ্রান্তি প্রমাণিত হয়ে থাকে এবং বাস্তবে একটি সুদ বিহীন অর্থব্যবস্থা সাফল্যের সাথে রচনা ও পরিচালনা করা সম্ভব হয়ে থাকে, তাহলে এরপরও পশ্চিমী পুঁজিবাদের নিকট ঘনিষ্ঠ আত্মনিবেদন এবং তাকে কার্যকর করার জন্যে নিজেদের সমস্ত শক্তি সামর্থ ব্যয় করতে থাকা আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা ছাড়া আর কিছুই নয়।

সংশোধনের কার্যকর পদ্ধতি

বর্তমান যুগের একটি উন্নতিশীল সমাজ ও রাষ্ট্রের সার্বিক প্রয়োজন পূরণে সক্ষম এমন একটি সুদ বিহীন অর্থব্যবস্থা বাস্তবে গড়ে তোলা সম্ভব কিনা, এ প্রশ্নটিই এখন আমাদের আলোচ্য বিষয়।

কয়েকটি বিভ্রান্তি

এ ব্যাপারে বরং বাস্তব সংশোধনের প্রত্যেকটি ব্যাপারে যেসব বিভ্রান্তিকর প্রশ্ন মানুষের মনকে আলোড়িত করে এ প্রসঙ্গে আলোচনার পূর্বে সেগুলোর জবাব দেয়া প্রয়োজন।

এ ব্যাপারে প্রথম ও প্রধান বিভ্রান্তিটি থেকেই আমাদের পূর্বোল্লেখিত প্রশ্নটি দেখা দিয়েছে। এ বইতে আমাদের ইতিপূর্বেকার যুক্তিভিত্তিক আলোচনায় সুদের ভ্রান্তি ও ক্ষতিকারক দিকটি সুস্পষ্ট করা হয়েছে। অন্যদিকে কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতি থেকে একথা প্রমাণ করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল সব রকমের সুদকে হারাম ঘোষণা করেছেন। এ দুটো কথা স্বীকার করে নেয়ার পর—"সুদ ছাড়া অর্থনৈতিক কাজ-কারবার পরিচালনা করা কি সম্ভব ?" এবং "সুদ বিহীন অর্থব্যবস্থা কি বাস্তবে গড়ে তোলা যায় ?"—এ জাতীয় প্রশ্ন একেবারেই অবান্তর। এ থেকে তো পরোক্ষভাবে একথা বলারই চেষ্টা করা হয় যে, আল্লাহর উলুহিয়াতের মধ্যে ভুল হওয়া একটি অনিবার্য ব্যাপার এবং এমন সত্যও আছে, যা কার্যকর ও বাস্তবায়িত হওয়া সম্ভবপর নয়। এভাবে আসলে প্রকৃতি ও তার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশ করা হয়। এর অর্থ দাঁড়ায়, আমরা এমন একটি পচনশীল বিশ্বব্যবস্থার মধ্যে বাস করছি যেখানে আমাদের অনেক প্রকৃত প্রয়োজনকে জুড়ে দেয়া হয়েছে ভুল ও দুষ্কর্মের সাথে এবং অনেক কল্যাণের দরজা জেনে বুঝেই বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। অথবা এর চেয়েও আরো এক ধাপ অগ্রসর হয়ে আমরা এর এ অর্থ গ্রহণ করতে পারি যে, প্রকৃতির বক্রতা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যার ফলে প্রকৃতির নিজের বিধান যাকে ভুল বলে তার প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থায় তা কল্যাণকর অপরিহার্য ও কার্যকর হয় এবং তার বিধান যাকে নির্ভুল বলে তার প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থায় তা অকল্যাণকর ও অকার্যকর হয়।

সত্যই কি আমরা নিজেদের বুদ্ধি, জ্ঞান ও ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার আলোকে প্রকৃতির স্বভাব ও মেযাজ সম্পর্কে এ ধরনের কুধারণা সৃষ্টির কোনো অবকাশ পাই ? প্রকৃতি ভাঙার সহায় ও গড়ার শত্রু, একথা কি সত্য ? একথা

সত্য হলে বস্তুর ভালো ও মন্দ, কল্যাণকর ও অকল্যাণকর এবং ভুল ও নির্ভুলের সমস্ত আলোচনা শিকেয় তুলে দিতে হবে। সোজা কথায় আমাদের জীবন ক্ষেত্র থেকে সরে দাঁড়াতে হবে। কারণ এরপর এ দুনিয়ায় আমাদের জন্য আর কোনো আশার আলো থাকে না। কিন্তু আমাদের এবং এ বিশ্বজগতের প্রকৃতি যদি এ কুধারণার শিকার হতে না চায়, তাহলে আমাদের অবশ্যি এ বিশেষ চিন্তা-পদ্ধতি পরিহার করতে হবে যে, "অমুক বস্তুটি খারাপ হলেও তার সাহায্যেই কার্যোদ্ধার হয় এবং অমুক বস্তুটি সত্য ও ন্যায়সঙ্গত হলেও তা কার্যকর হওয়া সম্ভব নয়।"

আসলে দুনিয়ায় যে পদ্ধতি একবার প্রচলিত হয়ে যায় মানুষের সমস্ত কাজ-কারবার লেনদেন তার সাথে জড়িত হয়ে পড়ে এবং ঐ পদ্ধতি পরিবর্তন করে অন্য পদ্ধতি প্রচলন করা কঠিন বলে মনে হতে থাকে। ভালো-মন্দ, ভুল-নির্ভুল যাই হোক না কেন প্রত্যেকটি প্রচলিত পদ্ধতির এ একই অবস্থা। প্রচলিত পদ্ধতিটি প্রচলিত বলেই সহজ মনে হয়। অন্যদিকে অপ্রচলিত পদ্ধতিটি অপ্রচলিত এবং প্রচলিত পদ্ধতি পরিবর্তন করে তাকে প্রচলিত করতে হবে বলেই তা কঠিন মনে হয়। কিন্তু অবুঝ লোকেরা এটা না বুঝে মনে করে, প্রচলিত ভুলটাই সহজ ও স্বাভাবিক, মানুষের যাবতীয় কাজ-কারবার এরই ভিত্তিতে সহজে চলতে পারে এবং এছাড়া অন্য কোনো পদ্ধতির বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।

এ ব্যাপারে দ্বিতীয় বিভ্রান্তিটি হচ্ছে, পরিবর্তন কঠিন হবার আসল কারণগুলো লোকেরা বুঝে না। ফলে তারা পরিবর্তনের পরিকল্পনা অবাস্তব ও কার্যকর যোগ্য নয় বলে উড়িয়ে দেয়। প্রচলিত কোনো ব্যবস্থা পরিবর্তনের পরিকল্পনাকে অবাস্তব ও কার্যকরযোগ্য নয় বলে উড়িয়ে দেয়া আসলে মানবিক প্রচেষ্টাবলীর সম্ভাবনাসমূহ সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণেরই ফলশ্রুতি এ দুনিয়ারই কোনো কোনো এলাকায় ব্যক্তিগত মালিকানা খতম করে রাষ্ট্রীয় মালিকানা কায়েম করার ন্যায় চরম বিপ্লবাত্মক পরিকল্পনাও কার্যকর করা হয়েছে। কাজেই এ ক্ষেত্রে সুদ রহিত করে যাকাতের সংগঠন কায়েম করার ন্যায় ভারসাম্যপূর্ণ পরিকল্পনার বাস্তবায়ন সম্ভব নয়, একথা বলা কোনো ক্রমেই শোভা পায় না। তবে একথা ঠিক প্রচলিত ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করে নতুন ব্যবস্থায় জীবন গড়ে তোলা রহিম করিমের ন্যায় যে কোনো সাধারণ লোকের কাজ নয়। এ কাজ কেবল তারাই করতে পারে যাদের মধ্যে দুটো শর্ত পাওয়া যায়ঃ

এক ঃ যারা যথার্থই পুরাতন ব্যবস্থা পরিহার করেছে এবং যে পরিকল্পনা অনুযায়ী জীবনের সমগ্র ব্যবস্থায় পরিবর্তন সাধন করার লক্ষ্য গৃহীত হয়েছে তার ওপর আন্তরিকভাবে বিশ্বাস স্থাপন করেছে।

দুই ঃ যারা অনুকরণ প্রবৃত্তির পরিবর্তে ইজতিহাদী প্রবৃত্তির অধিকারী। যারা নিছক প্রয়োজনীয় বুদ্ধির বৃত্তিটুকুর অধিকারী নয়, যা পুরাতন ব্যবস্থাকে তার পূর্বের পরিচালকদের ন্যায় দক্ষতা সহকারে পরিচালনা করার জন্য যথেষ্ট, বরং এমন বিশেষ পর্যায়ের বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী যা বিধ্বস্ত পথরেখাগুলো পরিহার করে নতুন পথরেখা তৈরী করার জন্য প্রয়োজন।

এ দুটো শর্ত যাদের মধ্যে পাওয়া যায় তারা কমিউনিজম, নাৎসীবাদ ও ফ্যাসীবাদের ন্যায় চরম বিপ্লবাত্মক মতবাদগুলোর একদেশদর্শী পরিকল্পনাসমূহও কার্যকর করতে পারে। আর যাদের মধ্যে এই শর্ত দুটো পাওয়া যায় না তারা ইসলামের একান্ত ভারসাম্যপূর্ণ পরিকল্পনাও কার্যকর করতে পারে না।

এ ব্যাপারে আরো একটি ছোটখাটো বিভ্রান্তির অপনোদন হওয়া উচিত। গঠনমূলক সমালোচনা ও সংস্কারমূলক পরিকল্পনার জবাবে যখন কাজের নীল নক্শা চাওয়া হয় তখন অবস্থা দেখে মনে হয় যেন কাগজের পিঠেই পরিকল্পনা সীমাবদ্ধ এবং লোকেরা খাতার পাতাকেই কাজের ক্ষেত্র বলে মনে করে। অথচ কাজের আসল ক্ষেত্র হচ্ছে জমিন। কাগজের ওপর করার মতো কাজ নিতান্ত সীমাবদ্ধ। তা হচ্ছে, কেবল যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে প্রচলিত ব্যবস্থার গলদ, ক্ষতি ও অকল্যাণসমূহ দ্ব্যর্থহীনভাবে তুলে ধরা এবং এর স্থলে যে ব্যবস্থা আমরা কার্যকর করতে চাই তার যৌক্তিকতা বলিষ্ঠভাবে সপ্রমাণ করা। এরপর কাজের সাথে যেসব বিষয়ের সম্পর্ক, কাগজের পিঠে সেগুলো সম্পর্কে বড়জোর এতটুকুন করা যেতে পারে যে, পুরনো ব্যবস্থার ভুল পদ্ধতিগুলো কিভাবে নির্মূল করা যেতে পারে এবং সে স্থলে নতুন পরিকল্পনাগুলো কিভাবে কার্যকর করা যেতে পারে, সে সম্পর্কে মানুষের সামনে একটা সাধারণ চিন্তা ও ধারণা তুলে ধরা যেতে পারে। তবে এ ব্যাপারটির বিস্তারিত রূপ কি হবে, এর ছোটখাটো ও খুঁটিনাটি পর্যায়গুলো কি হবে এবং প্রত্যেক পর্যায়ে উদ্ভূত সমস্যাবলী সমাধানের উপায় কি হবে—এসব বিষয় কোনো ব্যক্তি পূর্বাহ্নে অবহিত হতে পারে না এবং এ প্রশ্নগুলোর জবাব দেয়াও কারোর পক্ষে সম্ভব নয়। বর্তমান ব্যবস্থার ভ্রান্তি সম্পর্কে যদি আপনি সম্পূর্ণ নিঃশংশয় হয়ে থাকেন এবং মনে করে থাকেন যে, সংশোধনের প্রস্তাব যথার্থই ন্যায়সঙ্গত তাহলে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণে এগিয়ে আসুন এবং এমন সব লোকের হাতে কাজের দায়িত্বভার অর্পণ করুন যারা ঈমানী শক্তি ও ইজতিহাদী বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী। তারপর বাস্তব ক্ষেত্রে যেখানে যে সমস্যা দেখা দেবে সেখানেই তার সমাধানও হয়ে যাবে। যে কাজ কার্যক্ষেত্রে হাতে কলমে করার মতো তা কাগজের পিঠে আঁচড় কেটে কেমন করে করা যেতে পারে ?

এ বিস্তারিত আলোচনার পর একথা বলার কোনো প্রয়োজন থাকে না যে, এ অধ্যায়ে আমি যাকিছু পেশ করবো তা সুদবিহীন অর্থনীতির কোনো বিস্তারিত রূপরেখা হবে না বরং তা হবে সুদকে সামগ্রিক অর্থনীতি থেকে রহিত করার বাস্তব কাঠামো কি হতে পারে এবং সুদ রহিত করার চিন্তার উদয়ের সাথে সাথে আপাত দৃষ্টিতে মানুষের সামনে যেসব বড় বড় সমস্যা দেখা দেয় সেগুলো কিভাবে সমাধান করা যেতে পারে তার একটা সাধারণ চিন্তা।

সংস্কারের পথে প্রথম পদক্ষেপ

আগের অধ্যায়গুলোয় সুদ সম্পর্কে যে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, তা থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সুদের প্রচলন আইনগতভাবে বৈধ হবার কারণেই সামগ্রিক অর্থনীতি ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যাবতীয় গলদ ও অনিষ্টকারিতা সৃষ্টি হয়েছে। সুদের দুয়ার উন্মুক্ত থাকার পর কোনো ব্যক্তি তার প্রতিবেশীকে কর্জে হাসানা বা সুদমুক্ত ঋণ দেবে কেন ? সে একজন ব্যবসায়ীর সাথে লাভ-লোকসানে শরীক হতে যাবে কেন ? সে তার জাতির প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য আন্তরিক সাহায্যের হাত প্রসারিত করতে যাবে কোন্ স্বার্থে ? কেনই বা সে নিজের সঞ্চিত পুঁজি মহাজন ও পুঁজিপতির নিকট সোপর্দ করবে না—যেখান থেকে ঘরে বসে বসেই সে একটি নির্দিষ্ট হারে মুনাফা লাভের আশা রাখে ? মানুষের অসৎ প্রবৃত্তি ও প্রবণতাগুলোকে উদ্দীপিত ও উদগ্র করার পথ উন্মুক্ত করে দেবার পর নিছক বক্তৃতা, উপদেশ ও নৈতিক আবেদনের মাধ্যমে সে সবের অগ্রগতি ও অনিষ্টকারিতা বন্ধ করার আশা করা যেতে পারে না। আবার এখানে কেবল একটি অসৎ প্রবণতাকে অবাধ স্বাধীনতা দেয়ার মধ্যেই ব্যাপারটি সীমাবদ্ধ নয়। বরং এর থেকেও অগ্রসর হয়ে আমাদের প্রচলিত আইন তার সাহায্যকারীর দায়িত্ব নিয়েছে এবং আমাদের রাষ্ট্র ও সরকার স্বয়ং এ অসৎ প্রবণতাটির ভিত্তিতে সমগ্র অর্থব্যবস্থা পরিচালনা করেছে। এ অবস্থায় কিছু আংশিক পরিবর্তন ও ছোটখাটো সংশোধনের মাধ্যমে এর যাবতীয় অনিষ্টকারিতার গতিরোধ কেমন করে সম্ভবপর হতে পারে ? একটি মাত্র পথেই এর গতি রোধ করা যেতে পারে, তা হচ্ছে, যে পথে অনিষ্টকারিতা আসছে প্রথমে সে পথটিই বন্ধ করতে হবে।

যারা মনে করে প্রথমে একটি সুদ বিহীন অর্থব্যবস্থা তৈরী হয়ে যাবে তারপর সুদ আপনা আপনি বন্ধ হয়ে যাবে অথবা আইন করে বন্ধ করা হবে, তারা আসলে ঘোড়ার আগে গাড়ী জুড়ে দিতে চায়। যতদিন আইনগতভাবে সুদের প্রচলন থাকবে, দেশের আদালতগুলো সুদী চুক্তিপত্রের স্বীকৃতি দিয়ে বলপূর্বক সেগুলো প্রবর্তন করবে এবং পুঁজিপতিদের জন্য সুদের লোভ দেখিয়ে —প্রতি গৃহ থেকে অর্থ সঞ্চিত করার, অতপর সুদের ভিত্তিতে তা ব্যবসায়ে

খাটাবার পথ উন্মুক্ত থাকবে, ততদিন কোনো সুদবিহীন অর্থব্যবস্থার অস্তিত্ব লাভ ও অগ্রগতি কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। কাজেই সুদ রহিত হবার ব্যাপারটি যদি প্রথমে একটি অর্থব্যবস্থা তৈরী হয়ে যথেষ্ট উন্নত, শক্তিশালী ও সংগঠিত হয়ে যাবার এবং বর্তমান সুদী অর্থব্যবস্থার স্থলাভিষিক্ত হবার যোগ্যতা অর্জন করার শর্ত সাপেক্ষ হয়, তাহলে নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে যে, কিয়ামত পর্যন্ত সুদ রহিত হবার কোনো উপায়ই দেখা দেবে না। এ কাজ করতে গেলে প্রথম পদক্ষেপেই আইনগতভাবে সুদ রহিত করতে হবে। অতপর স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে সুদ বিহীন অর্থব্যবস্থার সৃষ্টি হয়ে যাবে এবং যেহেতু আবশ্যকতা আবিষ্কারের জননী সেহেতু স্বতঃস্ফূর্তভাবে এর জন্যে সবদিকে ও সবক্ষেত্রে অগ্রসর হবার ও ছড়িয়ে পড়ার পথ প্রশস্ত হতে থাকবে।

মানব প্রকৃতির যেসব অসৎ প্রবণতা সুদের জন্ম দিয়েছে সেগুলোর শিকড় এত গভীরে প্রবেশ করে আছে এবং তাদের দাবী এতই শক্তিশালী যে অসম্পূর্ণ ও খাপছাড়া কার্যক্রম এবং সাদামাটা কৌশল অবলম্বন করে কোনো সমাজ থেকে এ আপদটি দূর করা সম্ভব হয় না। এজন্য ইসলাম যে সমস্ত কৌশল ও উপায় অবলম্বন করার পরামর্শ দিয়েছে সেসব পুরোপুরি অবলম্বন করতে হবে এবং যে ধরনের তৎপরতা সহকারে এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম মুখর হতে বলেছে সে ধরনের তৎপরতা অবলম্বন করতে হবে। ইসলাম সুদী ব্যবসায়ের কেবলমাত্র নৈতিক নিন্দাবাদ করেই ক্ষান্ত থাকেনি বরং এই সাথে একদিকে ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী তাকে হারাম গণ্য করে তার বিরুদ্ধে চরম ঘৃণা সৃষ্টি করে এবং অন্যদিকে যেখানে ইসলামের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব, ক্ষমতা ও প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয় সেখানে দেশীয় আইনের সাহায্যে তাকে নিষিদ্ধ করে, সমস্ত সুদের চুক্তি বাতিল করে, সুদ দেয়া-নেয়া, সুদের দলিল লেখা ও তাতে সাক্ষী হওয়াকে ফৌজদারী অপরাধ ও পুলিশের হস্তক্ষেপযোগ্য গণ্য করে এবং কোথাও সামান্য শাস্তির মাধ্যমে এ কারবার বন্ধ না হলে অপরাধীকে হত্যা ও তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করারও শাস্তি দেয়। তৃতীয় দিকে ইসলাম যাকাতকে ফরয তথা অবশ্যি পালনীয় কর্তব্য হিসেবে গণ্য করে এবং সরকারী পরিচালনাধীনে তা উসুল ও বণ্টনের ব্যবস্থা করে একটি নতুন অর্থ ব্যবস্থার ভিত্ গড়ে তোলে। এসব উপায় অবলম্বন করার সাথে সাথে সে শিক্ষা, অনুশীলন ও প্রচার-প্রপাগাণ্ডার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের চিন্তা ও কর্মের সংশোধনও করে। এর ফলে তাদের মনের সুদখোরী প্রবণতা স্তিমিত হয়ে যায় এবং এর পরিবর্তে এমন সব প্রবণতা ও গুণাবলী সে স্থান অধিকার করে, যেগুলোর মাধ্যমে সমাজের অভ্যন্তরে সহানুভূতি ও বদান্যতাপূর্ণ সহযোগিতার প্রবণতা অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার ন্যায় প্রবাহিত হতে থাকে।

সুদ রহিত করার সুফল

যথার্থ গুরুত্ব ও আন্তরিকতা সহকারে সুদকে রহিত করতে চাইলে এ পথে এবং এভাবেই সবকিছু করতে হবে। সুদকে আইনগতভাবে রহিত করে দিলে এবং এই সাথে যাকাত উসুল ও বন্টনের সামগ্রিক ব্যবস্থা গৃহীত হলে অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তিনটি বড় বড় সুফল দেখা দেবে।

এর প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুফল হবে, ধন সংগৃহীত হবার বর্তমান বিপর্যয়মূলক অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে একটি সঠিক, সুস্থ ও কল্যাণকর অবস্থার সৃষ্টি হবে।

বর্তমান অবস্থায় নিম্নোক্তভাবে ধন সংগৃহীত হয় ঃ আমাদের সমাজ ব্যবস্থা প্রত্যেক মানুষের স্বভাবজাত কার্পণ্য ও ধন সঞ্চয় প্রবণতাকে কৃত্রিম উপায়ে চরম পর্যায়ে বাড়িয়ে দেয়। অতপর ভীতি ও লোভের অস্ত্র ব্যবহার করে তাদের আয়ের স্বল্পতম অংশ ব্যয় করতে ও সর্বাধিক অংশ সঞ্চয় করতে উদ্বুদ্ধ করে। তাদেরকে এই বলে ভয় দেখায় যে, যদি তোমরা এখন সঞ্চয় না করো তাহলে দুর্দিনে সমগ্র সমাজে তোমাদের সাহায্যকারী কেউ থাকবে না, তখন এ সঞ্চিত ধন তোমাদের কাজে লাগবে। তাদেরকে এই বলে লোভ দেখায় যে, ধন সঞ্চয় করলে এর বিনিময়ে তোমরা সুদ পাবে। এ দ্বিমুখী আন্দোলনের মুখে সমাজের প্রায় সকল ব্যক্তিই যারা নিজেদের প্রয়োজনের চেয়ে সামান্য পরিমাণ বেশী আয় করে তারা ব্যয় কমিয়ে সঞ্চয় বাড়াতে ভীষণভাবে উদ্যোগী হয়ে ওঠে। ফলে বাজারে পণ্য দ্রব্যাদীর বিক্রয় ও চাহিদা সম্ভাব্য পরিমাণ থেকে অনেক কমে যায়। পণ্য দ্রব্যের আমদানী যে পরিমাণ কমে যায় শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির সম্ভাবনাও ঠিক সেই পরিমাণ কমে যায় এবং ধন ও পুঁজি সংগৃহীত হবার সুযোগও কমে যেতে থাকে। এভাবে কয়েক ব্যক্তির সঞ্চয় বেড়ে যাবার কারণে সামগ্রিক ধনের পরিমাণে কমে যায়। এক ব্যক্তি এমন পদ্ধতিতে নিজের সঞ্চিত ধনের পরিমাণ বাড়াতে থাকে যার ফলে হাজার হাজার লোকের ধন উপার্জনের যোগ্যতাই খতম হয়ে যায়, এ ক্ষেত্রে তাদের সঞ্চয়ের প্রশ্নই ওঠে না।

বিপরীত পক্ষে যখন সুদ রহিত করা হবে এবং যাকাত সংগঠন কায়েম করে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে এ মর্মে নিশ্চয়তা দান করা হবে যে, দুর্দিনে তার সাহায্যের যথাযোগ্য ব্যবস্থা রয়েছে, তখন কার্পণ্য ও ধন সঞ্চয়ের প্রকৃতি বিরোধী কারণ, প্রবণতা ও উদ্যম খতম হয়ে যাবে। লোকেরা নিজেরা মুক্ত হস্তে ব্যয় করবে এবং অভাবীদেরকে যাকাতের মাধ্যমে দান করে তাদের ক্রয় ক্ষমতা এমন পর্যায়ে পৌঁছাবে যার ফলে তারা অর্থ ব্যয় করতে সক্ষম হবে। ফলে শিল্প-বাণিজ্য বেড়ে যাবে, কাজ-কর্ম ও উপার্জন বেড়ে যাবে

এবং কাজ-কর্ম ও উপার্জন বেড়ে গেলে আয় বেড়ে যাবে। এ পরিবেশে শিল্প ও ব্যবসায়ের নিজস্ব মুনাফা এতবেশী বেড়ে যাবে যার ফলে আজকের ন্যায় তাদের বাইরের পুঁজির এতবেশী মুখাপেক্ষী হতে হবে না। উপরন্তু তারা যে পরিমাণ পুঁজির অভাব অনুভব করবে বর্তমান অবস্থার তুলনায় তা অনেক বেশী সহজে সংগৃহীত হতে পারবে। কারণ তখন সঞ্চয়ের কাজ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাবে না, যেমন কেউ কেউ মনে করে থাকেন। বরং তখনো কিছু সংখ্যক লোক নিজেদের জন্মগত স্বভাবসিদ্ধ কারণে অর্থ সঞ্চয় করে যেতে থাকবে। আবার অনেক লোক বরং বেশীর ভাগ লোক আয় বৃদ্ধি ও সমাজের সাধারণ সমৃদ্ধির কারণে উদ্বৃত্ত অর্থ সঞ্চয় করতে বাধ্য হবে। তখন এ সঞ্চয়ের পেছনে কোনো প্রকার কার্পণ্য, লোভ বা ভয় কার্যকর থাকবে না বরং তার একমাত্র কারণ হবে এই যে, লোকেরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ উপার্জন করবে। ইসলামের বিভিন্ন বৈধ ব্যয় ক্ষেত্রে মুক্ত হস্তে ব্যয় করার পরও তাদের নিকট বিপুল পরিমাণ অর্থ উদ্বৃত্ত থাকবে। এ উদ্বৃত্ত অর্থ গ্রহণ করার মতো কোনো অভাবী লোকও থাকবে না। কাজেই এ অবস্থায় তারা ওগুলো ঘরে ফেলে রাখবে এবং ভালো ও উপযুক্ত শর্তে নিজেদের রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন ও প্রকল্পে দেশের শিল্পে ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে এবং প্রতিবেশী দেশেও বিনিয়োগ করতে প্রস্তুত হবে।

এর দ্বিতীয় সুফল এই দেখা দেবে যে, সঞ্চিত ধন জমাটবদ্ধ হবার পরিবর্তে আবর্তিত হতে থাকবে এবং সামাজিক অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুযায়ী অনবরত সাহায্য পৌঁছাতে থাকবে। বর্তমান ব্যবস্থায় ব্যবসায়ে পুঁজি বিনিয়োগের পেছনে একমাত্র সুদের লোভই কার্যকর থাকে। কিন্তু এ জিনিসটিই আবার তার জমাটবদ্ধ হবার কারণেও পরিণত হয়। কারণ ধন সাধারণত সুদের হার অধিক হবার অপেক্ষায় বসে থাকে। উপরন্তু এ জিনিসটিই আবার ধনের প্রকৃতি ও মেযাজকে কারবারের প্রকৃতি ও মেযাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। যখন কারবার পুঁজির চাহিদা পেশ করে, তখন পুঁজি অসম্মতি প্রকাশ করে, আর বিপরীত অবস্থায় পুঁজি কারবারের পেছনে দৌড়াতে থাকে এবং নিম্নতম শর্তে যে কোনো ভালো-মন্দ কাজে লাগতে প্রস্তুত হয়। কিন্তু তখন আইনগতভাবে সুদের দুয়ার বন্ধ হয়ে যাবে বরং উলটো সমস্ত সঞ্চিত ধনের ওপর বছরে শতকরা আড়াই ভাগ হিসেবে যাকাত আদায় করা হবে, তখন ধনের এ অপ্রকৃতিস্থতার অবসান ঘটবে। সে নিজেই কোনো যুক্তিসঙ্গত শর্তে দ্রুত কোনো কারবারে লাগবার এবং জমাটবদ্ধ হয়ে থাকার পরিবর্তে হামেশা কোনো না কোনো কারবারে লাগার ইচ্ছা প্রকাশ করবে।

এর তৃতীয় সুফলটি হবে এই যে, ব্যবসায়িক অর্থ ও ঋণ বাবত অর্থ উভয়ের খাত সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যাবে। বর্তমান ব্যবস্থায় পুঁজির অধিকাংশ

বরং প্রায় সমগ্র অংশই সংগৃহীত হয় ঋণের আকারে। অর্থ গ্রহণকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কোনো মুনাফাজনক কাজের জন্যে বা অমুনাফাজনক কাজের জন্যে এবং কোনো সাময়িক প্রয়োজনে বা দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্পে অর্থ গ্রহণ করুক না কেন, সর্বাবস্থায় একটি নির্ধারিত সুদভিত্তিক ঋণের শর্তেই তা লাভ করা সম্ভব হয়। কিন্তু সুদ নিষিদ্ধ হয়ে যাবার পর ঋণের খাত কেবলমাত্র অমুনাফাজনক কাজ বা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে নিছক সাময়িক প্রয়োজনের জন্যে নির্দিষ্ট থাকবে। এ অবস্থায় কর্জে হাসানার নীতির ভিত্তিতে এর ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হবে। আর অন্যান্য খাত যেমন শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতি বা সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান-সমূহের লাভজনক প্রকল্পগুলোতে ঋণের পরিবর্তে মুযারিবাত বা লাভ ভিত্তিক অংশীদারীত্বের (PROFIT SHARING) নীতির ভিত্তিতে পুঁজি বিনিয়োগ করা হবে।

সুদ বিহীন অর্থব্যবস্থায় এ দুটো বিভাগ কিভাবে কাজ করবে এখন আমি সংক্ষেপে এ আলোচনা করবো।

সুদ বিহীন অর্থ ব্যবস্থায় ঋণ সংগ্রহের উপায়

প্রথমে ঋণের ব্যাপারে আসা যাক। কারণ লোকেরা সবচেয়ে বেশী ভয় করছে যে, সুদ নিষিদ্ধ হয়ে গেলে ঋণ পাওয়া যাবে না। কাজেই আমরা প্রথমে একথা প্রমাণ করবো যে, এ অপবিত্র প্রতিবন্ধকতাটি (সুদ) দূর হয়ে যাবার পর ঋণ লাভের পথ কেবল অনিরুদ্ধই থাকবে না বরং বর্তমানের তুলনায় তা অধিকতর সহজ ও উন্নততর হবে।

ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ

বর্তমান ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণের একটিই মাত্র পথ আছে। যে পথটি হচ্ছে, দরিদ্র ব্যক্তি, পুঁজিপতি ও মহাজনের নিকট থেকে এবং সম্পদশালী ব্যক্তি ব্যাংক থেকে সুদী ঋণ গ্রহণ করতে পারে। এ অবস্থায় তারা যে কোনো উদ্দেশ্যে যে কোনো পরিমাণ ঋণ পেতে পারে। তবে মহাজন ও ব্যাংকারকে নিয়মিত সুদ আদায় ও আসল প্রত্যর্পণের গ্যারান্টি দিতে হবে। সে কোনো পাপ কাজ করার জন্যে, কোনো অপ্রয়োজনীয় কাজে অথবা বিপুল ব্যয়ের জন্যে বা যথার্থই কোনো প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে ঋণ নিয়ে থাক না কেন। বিপরীতপক্ষে কোনো ব্যক্তির গৃহে যদি অর্থাভাবে কোনো মৃতের দাফন-কাফনও আটকে থাকে, তাহলেও পুঁজিপতি ও ব্যাংকারকে নিয়মিত সুদ আদায় ও আসল প্রত্যর্পণের নিশ্চয়তা বিধান না করা পর্যন্ত সে কোথা থেকেও একটি পয়সা ঋণ লাভ করতে পারবে না। উপরন্তু বর্তমান ব্যবস্থায় দরিদ্রের বিপদ ও ধনী পুত্রদের বখাটেপনা উভয়টাই পুঁজিপতিদের আয়ের উত্তম সুযোগ সৃষ্টি করে

দেয়। এ ক্ষেত্রে স্বার্থপরতার সাথে সাথে এমন চরম হৃদয়হীনতার পরিচয় দেয়া হয় যার ফলে সুদী ঋণের জালে আটকা পড়া ব্যক্তি সুদ পরিশোধ বা আসল প্রত্যর্পণের ব্যাপারে সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। যার কাছ থেকে সুদ ও আসল আদায় করার দাবী জানানো হচ্ছে, সে প্রকৃতপক্ষে কোন্ বিপদের মধ্যে অবস্থান করছে, তা তলিয়ে দেখার মতো মানসিকতা কারোর নেই। ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ঋণ লাভ করার জন্যে বর্তমান ব্যবস্থা যে সুযোগ-সুবিধা দান করেছে, এ হচ্ছে তার আসল রূপ। এবার ইসলাম সুদ বিহীন যাকাত ব্যবস্থার মাধ্যমে কিভাবে এ প্রয়োজন পূর্ণ করার ব্যবস্থা করবে তা অনুধাবন করা যায়।

প্রথম এ ব্যবস্থায় অমিতব্যয়িতা ও পাপবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্যে ঋণ গ্রহণের দুয়ার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকবে। কারণ এখানে সুদের লোভে অপ্রয়োজনীয় ঋণ দানকারীর কোনো অস্তিত্বই থাকবে না। এ অবস্থায় ঋণ সম্পর্কিত যাবতীয় লেনদেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে কেবলমাত্র সঙ্গত প্রয়োজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে এবং বিভিন্ন সময় ব্যক্তিগত প্রয়োজনের ক্ষেত্রে যে পরিমাণ অর্থ গ্রহণ সঙ্গত মনে হবে, কেবল সেই পরিমাণই দেয়া-নেয়া হবে।

উপরন্তু এ ব্যবস্থায় যেহেতু ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে ঋণদাতার কোনো প্রকার লাভ বা সুবিধা গ্রহণের অবকাশ থাকবে না। তাই ঋণ বাবদ গৃহীত অর্থ প্রত্যর্পণের পথও অধিকতর সহজ হবে। সর্বনিম্ন আয়ের অধিকারী লোকেরাও ছোট ছোট কিস্তিতে অতি সহজে ও দ্রুত ঋণ পরিশোধ করতে সক্ষম হবে। যে ব্যক্তি কোনো জমি, গৃহ বা সহায় সম্পত্তি বন্ধক রাখবে, তার এ বন্ধকী সম্পত্তি ছাড়িয়ে নেয়া অধিকতর সহজ ও দ্রুত হবে। কারণ তার এ সম্পত্তির খাতে লব্ধ আয় সুদের খাতে জমা না হয়ে ঋণ বাবদ গৃহীত অর্থ পরিশোধের খাতে জমা হবে। এভাবে অতি দ্রুত ও সহজে তার ঋণ পরিশোধ হয়ে যাবে। এতগুলো সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও যদি ঘটনাক্রমে কারোর ঋণ পরিশোধ সম্ভব না হয় তাহলে রাষ্ট্রের বায়তুলমাল তার সাহায্যে এগিয়ে আসবে এবং বায়তুলমাল থেকে তার ঋণ পরিশোধ করে দেয়া হবে। এমন কি কোনো ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যদি নিজের কোনো সহায়-সম্পত্তি না রেখেই মারা যায় তাহলেও তার ঋণ পরিশোধ করার দায়িত্ব বায়তুলমালের ওপর বর্তাবে। এসব কারণে সচ্ছল ও ধনী লোকদের জন্যে নিজের অভাবী প্রতিবেশীদেরকে সাহায্য করা বর্তমান ব্যবস্থার ন্যায় এতটা কঠিন ও বিরক্তিকর ঠেকবে না।

এরপরও কোনো ব্যক্তি তার পাড়া-প্রতিবেশীদের নিকট থেকে ঋণ লাভে সক্ষম না হলে বায়তুলমালের দুয়ার তার জন্যে অবশ্যি খোলা থাকবে। সেখান

থেকে সে সহজে ঋণ লাভ করতে সক্ষম হবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, বায়তুলমালের সাহায্য গ্রহণ করা যেতে পারে সর্বশেষ উপায় হিসেবে। ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যক্তিগত প্রয়োজনের ক্ষেত্রে পরস্পরকে ঋণ দেয়া ইসলামী সমাজে ব্যক্তিবর্গের জন্যে অপরিহার্য কর্তব্য রূপে চিহ্নিত। কোনো সমাজের ব্যক্তিবর্গের নিজেদের এ ধরনের নৈতিক দায়িত্বসমূহ নিজেরাই উপলব্ধি করা ও তা পালন করতে উদ্যোগী হওয়ায় সংশ্লিষ্ট সমাজের সুস্থতারই লক্ষণ। যদি দেখা যায়, কোনো গ্রাম, পল্লী বা জনবসতির কোনো অধিবাসী তার প্রতিবেশীদের নিকট থেকে ঋণ পাচ্ছে না বলে বাধ্য হয়ে বায়তুলমালের স্মরণাপন্ন হয়েছে, তাহলে বুঝতে হবে সেখানকার নৈতিক পরিবেশ বিকৃত হয়ে গেছে। কাজেই এ ধরনের কোনো কেস বায়তুলমালে পৌঁছার পর কেবলমাত্র ঋণ গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তির প্রয়োজন পূর্ণ করলেই চলবে না বরং সাথে সাথেই নৈতিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণ বিভাগকে এ ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করতে হবে এবং কাল বিলম্ব না করে ঐ জরাগ্রস্ত জনবসতিকে রোগমুক্ত করার প্রতি নজর দিতে হবে, যেখানকার অধিবাসীরা প্রয়োজনের সময় তাদের এক প্রতিবেশী ভাইকে কোনো প্রকার সাহায্য করতে সক্ষম হয়নি। এ ধরনের কোনো ঘটনার খবর একটি সৎ সুস্থ নৈতিক ব্যবস্থায় এমন আলোড়ন ও অস্থিরতা সৃষ্টি করে, যেমন একটি বস্তুবাদী ব্যবস্থায় কলেরা বা মহামারীর ঘটনা অস্থিরতা ও আলোড়ন সৃষ্টি করে।

ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ঋণ সংগ্রহ করার জন্যে ইসলামী ব্যবস্থায় আর একটি পদ্ধতি অবলম্বিত হতে পারে। তা হচ্ছে, সমস্ত ব্যবসায়ী কোম্পানী ও প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিদের জন্যে যেসব আইনগত অধিকার নির্ধারিত থাকবে, অপরিহার্য প্রয়োজনের সময় তাদেরকে ঋণ দেয়ার অধিকারটিও তার অন্তর্ভুক্ত হবে। উপরন্তু সরকার নিজেও নিজের ওপর এ অধিকারটি চাপিয়ে নেবেন এবং উন্মুক্ত হৃদয়ে তাদের এ অধিকার আদায়ের চেষ্টাও করবেন। এ ব্যাপারটির কেবল নৈতিক চরিত্রটাই মূখ্য নয় বরং এর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চরিত্রও সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। নিজের কর্মচারী ও শ্রমিকদের জন্যে সুদবিহীন ঋণের ব্যবস্থা করলে কেবলমাত্র যে একটি নেকী অর্জিত হলো তা নয় বরং যেসব কারণে কর্মচারীরা দুশ্চিন্তা, পেরেশানী, দুরবস্থা, শারীরিক কষ্ট ও বস্তুগত ক্ষতি ও ধ্বংসের সম্মুখীন হয় সে গুলোর মধ্য থেকে একটি বড় কারণ দূরীভূত হয়। এসব বিপদ থেকে তাদেরকে রক্ষা করতে পারলে তারা নিশ্চিন্ত হবে। এর ফলে তাদের কর্মক্ষমতা বেড়ে যাবে। তাদের নিশ্চিন্ততা তাদেরকে অনিষ্টকর ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী জীবন দর্শন থেকেও বাঁচাবে। স্থূল দৃষ্টিতে হয়তো এর ফল কিছুই নাও দেখা যেতে পারে। কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিচার করলে যে কেউ অতি সহজেই অনুধাবন

করতে পারবে যে, সামগ্রীকভাবে কেবল সমগ্র সমাজই নয় বরং ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক পুঁজিমালিক ও কারখানামালিক এবং প্রত্যেকটি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান যে পরিমাণ লাভবান হবে তা সুদের চেয়ে অনেক বেশী মূল্যবান হবে, যা আজকের বস্তুবাদী ব্যবস্থায় নিছক নির্বুদ্ধিতাজনিত সংকীর্ণমনতার কারণে গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

বাণিজ্যিক প্রয়োজনে

এরপর ব্যবসায়ীদের নিত্যকার প্রয়োজন মেটাবার জন্যে যেসব ঋণের প্রয়োজন হয় তার আলোচনায় আসা যাক। বর্তমানে এ উদ্দেশ্যে ব্যাংক থেকে সরাসরি স্বল্প মেয়াদী ঋণ (SHORT TERMS LOAN) নেয়া হয় অথবা হুণ্ডী (BILLS OF EXCHANGE) ভাঙানো হয়।[১] উভয় অবস্থায় ব্যাংক তার ওপর সামান্য পরিমাণ সুদ নিয়ে থাকে। এটি ব্যবসায়ের এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন যাকে বাদ দিয়ে আজ কোনো কাজই চলতে পারে না। তাই ব্যবসায়ীরা সুদ রহিত করার কথা শুনে সর্বপ্রথম যে দুশ্চিন্তা কবলিত হয়, তা হচ্ছে এ অবস্থায় নিত্যকার প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য ঋণ পাবো কোথা থেকে ? সুদের লোভ না দেখালে ব্যাংক আমাদেরকে ঋণ দেবে কেন আর আমাদের হুণ্ডিই বা ভাঙিয়ে দেবে কেন ?

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে, ব্যাংকে সমস্ত আমানত (DEPOSITS) বিনা সুদেই জমা থাকে এবং যেখানে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরাও তাদের লাখ লাখ টাকা বিনা সুদেই জমা রাখে সে তাদেরকে বিনা সুদে ঋণ দেবে না কেন এবং তাদের হুণ্ডিই বা ভাঙিয়ে দেবে না কেন ? সে যদি সোজা পথে এতে সম্মত না হয়, তাহলে ব্যবসা আইনের সাহায্যে তার নিজের গ্রাহকদেরকে (CUSTOMERS) এ সুবিধা দেবার জন্যে তাকে বাধ্য করা হবে। এটি তার দায়িত্ব ও কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।

আসলে এ কাজের জন্যে কেবলমাত্র ব্যবসায়ীদের নিজেদের গচ্ছিত রাখা অর্থই যথেষ্ট হতে পারে। তবুও প্রয়োজন হলে অন্য খাত থেকেও ব্যাংক এজন্য

১. ইসলামী ফিকাহে এ বস্তুটির জন্য 'সাফাতাজ' শব্দ ব্যবহার করা হয়। এটি একটি পারিভাষিক শব্দ। এর পদ্ধতি হচ্ছে, যেসব ব্যবসায়ী পরস্পরের মধ্যে লেনদেন করে এবং ব্যাংকের সাথেও কারবার করে তারা নগদ অর্থ আদায় না করেও বিপুল পরিমাণ পণ্য পরস্পর থেকে ঋণ হিসেবে গ্রহণ করে এবং এক মাস, দু মাস বা চার মাসের জন্যে দ্বিতীয় পক্ষকে হুণ্ডী লিখে দেয়। যদি দ্বিতীয় পক্ষ নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারে, তাহলে অপেক্ষা করে এবং যথাসময়ে ঋণ আদায় হয়ে যায়। কিন্তু মেয়াদকালের মধ্যে যদি তার অর্থের প্রয়োজন হয়ে পড়ে, তাহলে ঐ হুণ্ডিটি ব্যাংকে জমা দেয়, যে ব্যাংকের সাথে তাদের উভয়ের লেনদেন আছে। ব্যাংক থেকে অর্থ উঠিয়ে সে নিজের কাজ সমাধা করে। একে হুণ্ডি ভাঙানো বলা হয়।

কিছু অর্থ ব্যবহার করতে পারে। মোটকথা নীতিগতভাবে একথা স্বীকার করে নিতেই হবে যে, যে ব্যক্তি সুদ নিচ্ছে না, সে সুদ দেবে না। তাছাড়া নিত্যকার প্রয়োজনের ক্ষেত্রে বিনা সুদে ঋণ পেতে থাকা সামগ্রিক অর্থনীতির দৃষ্টিতে ব্যবসায়ীদের জন্যে লাভজনকও বটে।

তবে এ লেনদেনের বিনিময়ে সুদ না পেলে ব্যাংক তার খরচপত্র চালাবে কিভাবে ? এ প্রশ্নের জবাবে বলা যায়, চলতি হিসেবের (CURRENT ACCOUNT) সমস্ত অর্থই যে ক্ষেত্রে ব্যাংকের নিকট বিনা সুদে জমা থাকবে, সে ক্ষেত্রে ঐ অর্থের একটা অংশ বিনা সুদে দেয়া মোটেই ক্ষতিকর হবে না। কারণ এ অবস্থায় হিসেব-নিকেশে ও খাতাপত্র ঘাঁটাঘাটির জন্যে ব্যাংককে যে সামান্য খরচপত্র বহন করতে হবে তা তার নিকট যে পরিমাণ অর্থ জমা হবে তা থেকে গৃহীত লাভের তুলনায় বহুলাংশে কম। তবুও যদি ধরে নেয়া যায় এ পদ্ধতি কার্যকর করা সম্ভব নয়, তাহলে ব্যাংক নিজের পক্ষ থেকে এ ধরনের কাজের পারিশ্রমিক হিসেবে তার সকল ব্যবসায়ী গ্রাহকদের নিকট থেকে একটি মাসিক বা ষান্মাসিক ফী আদায় করতে পারে, যা দিয়ে তার খরচপত্র চালানো সম্ভব। সুদের পরিবর্তে এ ফী হবে তাদের জন্যে অনেক সস্তা। কাজেই তারা সানন্দে এটা আদায় করে দেবে।

সরকারের অলাভজনক প্রয়োজনের ক্ষেত্রে

ঋণের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ খাতটি সরকারের সাথে সংশ্লিষ্ট। সরকারকে সাময়িক দুর্ঘটনার জন্যে কখনো অমুনাফাজনক রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে আবার কখনো যুদ্ধের জন্যে ঋণ গ্রহণ করতে হয়। বর্তমান অর্থব্যবস্থায় এসব উদ্দেশ্যে প্রায় সব ক্ষেত্রে ঋণ এবং তাও আবার সুদী ঋণের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু ইসলামী অর্থব্যবস্থায় এর সম্পূর্ণ উল্টোটাই সম্ভব হবে। সেখানে সরকারের পক্ষ থেকে এ ধরনের প্রয়োজনের কথা প্রকাশ করার সাথে সাথেই দেশের জনসাধারণ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের অর্থ ও সম্পদরাশি চাঁদা স্বরূপ এনে সরকারের তহবিলে জমা করে দেবে। কারণ সুদ রহিত করে যাকাত পদ্ধতির প্রচলনের কারণে তারা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এতবেশী সমৃদ্ধ ও দুশ্চিন্তা মুক্ত হয়ে যাবে যে, নিজেদের উদ্বৃত্তের একটি অংশ সরকারকে দান করার ব্যাপারে তারা মোটেই ইতস্তত করবে না। এরপরও প্রয়োজন পরিমাণ অর্থ না পাওয়া গেলে সরকার ঋণ চাইবে এবং লোকেরা ব্যাপক হারে সরকারকে সুদমুক্ত ঋণ দেবে। কিন্তু এতেও যদি প্রয়োজন পূর্ণ না হয়, তাহলে নিজের কাজ সমাধা করার জন্যে ইসলামী রাষ্ট্র নিম্নোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারে ঃ

এক ঃ যাকাত ও খুমুসের (যুদ্ধ ক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের নিকট থেকে সংগৃহীত মালে গনীমতের পঞ্চমাংশ) অর্থ ব্যবহার করবে।

দুই ঃ সরকারী নির্দেশের মাধ্যমে সমস্ত ব্যাংক থেকে তাদের আমানত লব্ধ অর্থের একটি নির্দিষ্ট অংশ ঋণ হিসেবে গ্রহণ করবে। এভাবে জবরদস্তি ঋণ গ্রহণ করার অধিকার অবশ্যি সরকারের আছে, যেমন প্রয়োজনের সময় সরকার জনগণকে বাধ্যতামূলকভাবে সেনাদলে ভর্তি করার (CONSCRIPTIONS) এবং তাদের বাড়ী, গাড়ী ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস জোরপূর্বক লাভ করার (REQUISITION) অধিকার রাখে।

তিন ঃ সর্বশেষ উপায় হিসেবে নিজের প্রয়োজন অনুপাতে নোট ছাপিয়েও সরকার কাজ চালাতে পারে। এটি আসলে জনগণের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণেরই নামান্তর হবে। তবে এটি হবে অবশ্যি সর্বশেষ উপায়। সমস্ত উপায় ও পথ বন্ধ হয়ে গেলে অগত্যা এ পথ অবলম্বন করা যেতে পারে। কারণ এ পথে ক্ষতির ফিরিস্তি দীর্ঘতর।

আন্তর্জাতিক প্রয়োজনের ক্ষেত্রে

আন্তর্জাতিক ঋণের ক্ষেত্রে একথা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, বর্তমান সুদভিত্তিক অর্থনীতির দুনিয়ায় নিজেদের জাতীয় প্রয়োজনের ক্ষেত্রে কোথাও থেকে আমরা বিনা সুদে ঋণ পাবো না। এ ক্ষেত্রে আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে, যাতে বাইরে থেকে আমাদের কোনো ঋণ গ্রহণ করতে না হয়। অন্তত ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের কোনো বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ না করা উচিত, যতক্ষণ না আমরা নিজেদের প্রতিবেশীদেরকে বিনা সুদে ঋণ দিয়ে দুনিয়ার সামনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারি। আর ঋণ দেয়ার ব্যাপারে বলা যেতে পারে, ইতিপূর্বে আমরা যে আলোচনা করে এসেছি তারপর সম্ভবত কোনো বিচক্ষণ ব্যক্তি একথা স্বীকার করতে ইতস্তত করবেন না যে, একবার যদি আমরা সাহস করে নিজেদের দেশে সুদমুক্ত ও যাকাতভিত্তিক সুস্থ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হই তাহলে নিসন্দেহে অতি অল্প দিনের মধ্যে আমাদের আর্থিক অবস্থা এতই সচ্ছল হবে এবং আমরা এতই সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠবো, যার ফলে আমাদের কেবল বৈদেশিক ঋণের প্রয়োজনই হবে না বরং চারপাশের অভাবী দেশগুলোকে বিনা সুদে ঋণ দিতেও আমরা সক্ষম হবো। যেদিন আমরা দুনিয়ায় এ আদর্শ স্থাপন করতে সক্ষম হবো সেদিনটি আধুনিক যুগের ইতিহাসে কেবল অর্থনৈতিক দিক দিয়েই নয় বরং রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক দিক দিয়েও হবে একটি বৈপ্লবিক দিন। সেদিন অন্য জাতির সাথে আমাদের সমস্ত লেনদেন হবে সুদ বিহীন অর্থব্যবস্থার ভিত্তিতে। এমনকি সম্ভবত অন্যান্য দেশও একের পর

এক নিজেদের মধ্যে সুদ না নেয়ার জন্য চুক্তি সম্পাদন করতে থাকবে। এমনও হতে পারে, বিশ্ব জনমত সুদখোরীর বিরুদ্ধে এক বাক্যে ঘৃণা প্রকাশ করবে, যেমন ১৯৪৫ সালে ব্রিটেন উড্রসের ব্যাপারে ইংল্যাণ্ডের জনগণ করেছিল। এটা নিছক কোনো আকাশ কুসুম কল্পনা নয়। বরং আজো দুনিয়ার চিন্তাশীল লোকদের মতে আন্তর্জাতিক ঋণের ওপর সুদ চাপিয়ে দেয়ার কারণে দুনিয়ায় রাজনীতি ও অর্থনীতি উভয় ক্ষেত্রে অত্যন্ত মন্দ ও ক্ষতিকর প্রভাব পড়েছে। এ পথ পরিহার করে সমৃদ্ধিশালী দেশগুলো যদি নিজেদের উদ্বৃত্ত অর্থ অনুন্নত ও দুর্দশাগ্রস্ত দেশগুলোকে আত্মনির্ভরশীল করার জন্যে ব্যয় করে এবং এজন্য আন্তরিক ও সহানুভূতিপূর্ণ প্রচেষ্টা চালায়, তাহলে এর দ্বিবিধ ফল পাওয়া যাবে। রাজনৈতিক ও তমদ্দুনিক দিক দিয়ে আন্তর্জাতিক তিক্ততা বৃদ্ধি পাবার পরিবর্তে প্রীতি ও বন্ধুত্ব বৃদ্ধি পাবে এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে একটি দুর্দশাগ্রস্ত ও দেউলিয়া দেশের রক্ত শোষণ করার তুলনায় একটি ধনী দেশের সাথে ব্যবসা করা অনেক বেশী লাভজনক প্রমাণিত হবে। চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এ জ্ঞান ও বুদ্ধি-বিবেচনার কথা চিন্তা করছেন এবং যাদের বলার ক্ষমতা আছে তারা বলেও যাচ্ছেন। কিন্তু কেবল চিন্তা ও বলাতেই কাজ হবে না। এজন্য এমন একটি প্রজ্ঞা সম্পন্ন জাতির প্রয়োজন, যে প্রথমে নিজের ঘরে সুদের অস্তিত্ব বিলোপ করে দেবে, অতপর সামনে অগ্রসর হয়ে আন্তর্জাতিক লেনদেনকেও এ অভিশাপের হাত থেকে মুক্ত করার জন্যে নিজের প্রচেষ্টা শুরু করবে।

লাভজনক কাজে পুঁজি বিনিয়োগ

ঋণের পর আর একটি বিষয়ের পর্যালোচনা প্রয়োজন। সে বিষয়টি হচ্ছে, আমাদের অভিপ্রেত অর্থব্যবস্থায় ব্যবসায়িক অর্থনীতির স্বরূপ কি দাঁড়াবে। এ ব্যাপারে আমি পূর্বেই কিছুটা ইঙ্গিত দিয়েছি। তা হচ্ছে, সুদ রহিত করার কারণে লোকদের জন্যে পরিশ্রম ও ঝুঁকি উভয়টিকে এড়িয়ে নিরাপত্তা ও নির্দিষ্ট মুনাফার গ্যারান্টি সহকারে কোনো কাজে নিজেদের পুঁজি বিনিয়োগ করার পথ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে যাকাত প্রবর্তনের কারণে তাদের জন্যে নিজেদের ধন-সম্পদ কোনো কাজে না লাগিয়ে সিন্দুকে আবদ্ধ রাখার এবং যক্ষের ন্যায় তা আগলে বসে থাকারও পথ বন্ধ হয়ে যাবে। উপরন্তু একটি যথার্থ ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকার বর্তমান থাকার কারণে লোকদের বিলাসিতা ও অমিতব্যয়িতার কোনো সুযোগ থাকবে না। তাদের উদ্বৃত্ত আয় তারা এভাবে নষ্ট করতে পারবে না। অতপর যারা প্রয়োজনের অতিরিক্ত আয় করে তাদেরকে অবশ্যি নিম্নোক্ত তিনটি পথের মধ্যে থেকে যে কোনো একটি বেছে নিতে হবে।

এক ঃ যদি সে আরো বেশী অর্থ উপার্জনের প্রত্যাশী না হয় তাহলে তার আয়ের উদ্বৃত্তাংশ কোনো জনকল্যাণমূলক কাজে নিয়োগ করবে। এজন্য সে নিজে কোনো জনকল্যাণমূলক কাজে ঐ অর্থ ওয়াকফ করবে, অথবা জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে চাঁদা দেবে বা কোনো প্রকার স্বার্থোদ্ধারের প্রত্যাশা না করে ইসলামী সরকারের হাতে তুলে দেবে। ইসলামী সরকার উন্নয়নমূলক বা জনসেবা ও জাতীয় চরিত্র পুনর্গঠনের কাজে তা ব্যয় করবে। বিশেষ করে রাষ্ট্রের পরিচালক ও প্রশাসকগণের আমানতদারী, বিশ্বস্ততা ও বুদ্ধিমত্তার ওপর যদি জনগণের আস্থা থাকে, তাহলে শেষোক্ত পন্থাটিকে অবিশ্য অগ্রাধিকার দিতে হবে। এভাবে সমাজ সংস্কার ও জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য সরকার ও অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো বিনা চেষ্টায় ও বিনা অর্থ ব্যয়ে হামেশা বিপুল পরিমাণ অর্থ-সম্পদ লাভ করতে থাকবে। এজন্য তাদের কোনো সুদ বা মুনাফা আদায় তো দূরের কথা আসল আদায় করার জন্যেও জনগণের ঘাড়ে ট্যাক্সের বোঝা চাপিয়ে দিতে হবে না।

দুই ঃ সে আরো বেশী অর্থ উপার্জনের প্রত্যাশী নয় ঠিকই কিন্তু নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ সে নিজের জন্যে সংরক্ষিত রাখতে চায়। এ অবস্থায় ঐ অর্থ সে ব্যাংকে আমানত রাখবে। ব্যাংক তা আমানত রাখার পরিবর্তে নিজের ওপর ঋণ হিসেবে গণ্য করবে। ব্যাংক তার গচ্ছিত অর্থ যখন সে চাইবে বা চুক্তিতে উল্লেখিত সময়ে ফেরত দেয়ার জামানত দেবে। এ সাথে ঋণ হিসেবে গৃহীত এ অর্থ ব্যবসায়ে খাটিয়ে তা থেকে মুনাফা অর্জন করার অধিকারও তার থাকবে। এ মুনাফার কোনো অংশ অবশ্যি আমানতদারদেরকে দিতে হবে না বরং তা পুরোপুরি ব্যাংকের নিজস্ব সম্পত্তি হবে। ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহ আলাইহের ব্যবসায় মূলত এ ইসলামী নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হতো। তাঁর আমানতদারী, বিশ্বস্ততা ও অস্বাভাবিক সুনামের কারণে লোকেরা নিজেদের অর্থের নিরাপত্তা বিধানের জন্যে তা তাঁর নিকট জমা রাখতো। ইমাম সাহেব এ অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ করার পরিবর্তে ঋণ হিসেবে গ্রহণ করতেন এবং তা নিজের ব্যবসায় খাটাতেন। তাঁর জীবনীকারদের বর্ণনা মতে তাঁর ইন্তেকালের সময় হিসেব করে দেখা গেছে, তাঁর ফার্মে পাঁচ কোটি দেরহাম পরিমাণ অর্থ এভাবেই অন্য লোকদের ঋণ বাবদ রক্ষিত অর্থ হিসেবে জমা ছিল। ইসলামের নীতি হচ্ছে, কোনো ব্যক্তি কারো নিকট কিছু আমানত রাখলে আমানত রক্ষাকারী তা ব্যবহার করতে পারবে না। কিন্তু আমানত নষ্ট হয়ে গেলে তার ওপর কোনো খেসারতও আরোপিত হয় না।

বিপরীত পক্ষে ঐ অর্থ যদি ঋণ হিসেবে দেয়া হয় তাহলে ঋণগ্রহীতা তা ব্যবহার করতে ও তা থেকে লাভবান হবার অধিকার রাখে এবং যথা সময়ে

ঋণ আদায় করার দায়িত্বও তার ওপর আরোপিত হয়। এ নিয়ম অনুসারে আজো ব্যাংক পরিচালিত হতে পারে।

তিন ঃ যদি সে নিজের উদ্বৃত্ত অর্থ কোনো মুনাফা অর্জনকারী কাজে খাটাতে চায়, তাহলে তা করার একটি মাত্র পথ আছে। তা হচ্ছে, তার উদ্বৃত্ত অর্থ মুযারিবাত (অর্থাৎ লাভ ও লোকসানে সমানভাবে অংশ গ্রহণ) ভিত্তিক মুনাফাজনক কাজে খাটানো। সরকার বা ব্যাংক যে কারোর তত্ত্বাবধানে এ কাজ বা ব্যবসায় চলতে পারে।

সে নিজে যদি এ অর্থ খাটাতে চায়, তাহলে তাকে কোনো ব্যবসায়ে অংশ গ্রহণের শর্তাবলী স্থির করতে হবে। সে ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের মধ্যে লাভ ও লোকসান কি হারে বণ্টিত হবে আইনগতভাবে তা নির্ধারণ করতে হবে। এভাবেই যৌথ মূলধন ভিত্তিক কোম্পানীতে (JOINT STOCK COMPANY) অংশ গ্রহণেও এর একটি মাত্র পথ রয়েছে, অর্থাৎ সোজাসুজি সেখানে কোম্পানীর শেয়ার কিনতে হবে। বণ্ড, ডিবেঞ্চার ও এ ধরনের অন্যান্য বস্তু— যেগুলোর ক্রেতা কোম্পানী থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পেতে থাকে— সেগুলোর আসলে কোনো অস্তিত্বই থাকবে না।

সরকারের মাধ্যমে অর্থ খাটাতে চাইলে তাকে সরকারের কোনো মুনাফাজনক স্কীমে অংশীদার হতে হবে। উদাহরণস্বরূপ মনে করুন সরকার কোনো পানি বিদুৎ পরিকল্পনা কার্যকর করতে চায়। সরকার তার এ পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করে জনগণকে তাতে অংশ গ্রহণের জন্যে আহ্বান জানাবে। যেসব লোক, প্রতিষ্ঠান বা ব্যাংক এতে পুঁজি সরবরাহ করবে তারা সরকারের সাথে এতে অংশীদার হয়ে যাবে এবং একটি নির্ধারিত ও স্থিরকৃত হারে এতে লব্ধ ব্যবসায়িক মুনাফার অংশ পেতে থাকবে। লোকসান হলে তার অংশও স্থীরকৃত হার অনুযায়ী সরকার ও অন্যান্য অংশীদারদের মধ্যে বণ্টিত হবে। একটি ধারাবাহিকতা বজায় রেখে সরকার ক্রমান্বয়ে লোকদের অংশ নিজে কিনে নেয়ার অধিকারও রাখবে। এমন কি চল্লিশ-পঞ্চাশ বছরের মধ্যে পানি বিদ্যুতের সমস্ত কাজ পুরোপুরি সরকারী মালিকানাধীন এসে যাবে।

কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থার ন্যায় এ ব্যবস্থায়ও সবচেয়ে বাস্তবানুগ ও উপযোগী হবে তৃতীয় পথটি। অর্থাৎ লোকেরা ব্যাংকের মাধ্যমে নিজেদের পুঁজি মুনাফাজনক কাজে বিনিয়োগ করবে। তাই এ সম্পর্কে আমি একটু বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই। এর ফলে সুদ রহিত করার পর ব্যাংকিং-এর কারবার কিভাবে চলবে এবং মুনাফা প্রত্যাশী লোকেরা তার থেকে কিভাবে লাভবান হবে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

ব্যাংকিং-এর ইসলামী পদ্ধতি

ইতিপূর্বে আমি ব্যাংকিং সম্পর্কে যে আলোচনা করেছি তাতে ব্যাংকিং ব্যবস্থাটি সম্পূর্ণ অবৈধ ও ক্রটিপূর্ণ একথা বলা আমার উদ্দেশ্য ছিল না এবং উদ্দেশ্য হতেও পারে না। আসলে ব্যাংকিংও আধুনিক সভ্যতা লালিত বহুবিধ বস্তুর মধ্যে একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী বস্তু। এর মধ্যে কেবলমাত্র একটি অনিষ্টকর শয়তানী বস্তুর অনুপ্রবেশের কারণে এ সমগ্র ব্যবস্থাটিই পূতিগন্ধময় হয়ে উঠেছে। এতদসত্ত্বেও এ ব্যবস্থাটি বর্তমান যুগে বৈধ পথে মানবতার বহুবিধ সেবা করে যাচ্ছে। বর্তমান বিশ্বে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে এবং ব্যবসায়িক প্রয়োজনের ক্ষেত্রে এর উপকারিতা ও অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। যেমন, অর্থ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পাঠানো ও তা আদায়ের ব্যবস্থা করা, বিদেশের সাথে লেনদেনের সুযোগ-সুবিধা দান করা, মূল্যবান বস্তু সংরক্ষণ করা, আস্থাপত্র (LETTERS OF CREDIT), ট্রাভেলারস চেক, ড্রাফট প্রভৃতি জারী করা, কোম্পানীর অংশ বিক্রির ব্যবস্থা করা এবং বহুবিধ এজেন্সি সার্ভিস চালু করা, যার ফলে ব্যাংকে সামান্যতম কমিশন দেয়ার ব্যবস্থা করে আজকের যুগের একজন অতি ব্যস্ত ব্যক্তি বহু রকমের ঝামেলা থেকে মুক্তি পায়। এসব কাজ অবশ্যি অব্যাহত থাকতে হবে এবং এজন্য একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব থাকতে হবে। উপরন্তু সমাজের উদ্বৃত্ত অর্থ-সম্পদ চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকার পরিবর্তে একটি কেন্দ্রীয় রক্ষণাগারে (RESERVOIR) সঞ্চিত থাকা এবং সেখান থেকে জীবনের সব ক্ষেত্রে, সর্বত্র সবসময় সহজভাবে পৌঁছে যাওয়া ব্যবসা, শিল্প, কৃষি এবং তমদ্দুন ও অর্থনীতির জন্যে অত্যন্ত কল্যাণকর ও আজকের অবস্থার প্রেক্ষিতে একান্ত অপরিহার্য বিবেচিত হবে। এই সাথে সাধারণ লোকদের জন্যেও এটাই সহজতর ব্যবস্থা বলে মনে হয়। তাদের প্রয়োজন পূর্ণ হবার পরও যে সামান্য পরিমাণ অর্থ উদ্বৃত্ত থাকবে তাকে কোনো মুনাফাজনক কাজে খাটাবার জন্যে তারা নিজেরা পৃথক পৃথকভাবে সুযোগ অনুসন্ধান করার পরিবর্তে এসব অর্থ একটি কেন্দ্রীয় ভাণ্ডারে জমা করে দেবে এবং সেখানে একটি সন্তোষজনক পদ্ধতিতে সামগ্রিকভাবে তাদের সবার অর্থ কাজে লাগাবার এবং তা থেকে লব্ধ মুনাফা যথাযথভাবে বণ্টন করার ব্যবস্থা হবে। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই যে, এক নাগাড়ে এবং স্থায়ীভাবে অর্থনৈতিক কাজে ব্যাপৃত থাকার কারণে ব্যাংকের ব্যবস্থাপক ও কর্মীবৃন্দ এ বিভাগে এমন একটি দক্ষতা ও সূক্ষ্মদর্শীতা লাভ করে, যা ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সাথে জড়িত অন্যান্য কর্মীরা লাভ করতে সক্ষম হয় না। এ দক্ষতাপূর্ণ সূক্ষ্মদর্শীতা অবশ্যি একটি অতি মূল্যবান সম্পদ। যদি তা নিছক পুঁজিপতির স্বার্থ সিদ্ধির অস্ত্রে পরিণত না হয়ে

ব্যবসায়ীদের সাহায্য-সহযোগিতায় ব্যবহৃত হয় তাহলে অত্যন্ত উপকারী ও কল্যাণকর প্রমাণিত হতে পারে। কিন্তু ব্যাংকিং-এর এ সমস্ত কল্যাণ ও সুফলকে বিশ্ব মানবতার জন্যে অকল্যাণ, অন্যায়, অনিষ্ট ও বিপর্যয়ে পরিণত করছে যে বস্তুটি, তা হচ্ছে সুদ। এই সাথে আর একটি অনিষ্টকর বস্তু এর সাথে মিশে এ বিপর্যয় ও অনিষ্টকে ভয়াবহ রূপ দিয়েছে। তা হচ্ছে, সুদের চুম্বক আকর্ষণে যেসব পুঁজি বিভিন্ন স্থান থেকে এসে ব্যাংকে কেন্দ্রীভূত হয়, তা কার্যত কতিপয় স্বার্থ শিকারী পুঁজিপতির সম্পদে পরিণত হয়ে যায় এবং তারা অত্যন্ত গর্হিত মানবতা বৈরী ও সমাজ বিরোধী পদ্ধতিতে সেগুলো ব্যবহার করে। ব্যাংকিংকে এ দুটো দোষ মুক্ত করতে পারলে তা একটি পবিত্র কাজে পরিণত হয়ে যাবে এবং মানব সমাজ ও সভ্যতার জন্যে বর্তমান অবস্থার তুলনায় অনেক বেশী উপকারী ও কল্যাণকর হবে। সুদখোরীর পরিবর্তে এ পবিত্র পদ্ধতিটি যদি পুঁজিপতি ও সুদখোর মহাজনদের জন্যেও আর্থিক দিক দিয়ে অধিকতর লাভজনক প্রমাণিত হয় তাহলেও আশ্চর্যের কিছু নেই।

যারা মনে করে সুদ রহিত হবার পর ব্যাংকের অর্থ সংগ্রহ বন্ধ হয়ে যাবে, তারা বিরাট ভুলের শিকারে পরিণত হয়েছে। তারা মনে করে সুদ পাবার আশা যখন নেই তখন লোকেরা তাদের আয়ের উদ্বৃতাংশ ব্যাংকে জমা রাখবে কেন ? অথচ তখন সুদ না পেলে কি হবে, মুনাফা পাবার আশা তো থাকবে। আর যেহেতু মুনাফার অংশ অনির্ধারিত ও সীমাহীন থাকবে, তাই সাধারণ সুদের হারের তুলনায় কম মুনাফা পাবার সম্ভাবনা যে পরিমাণ থাকবে ঠিক সে পরিমাণ সম্ভাবনা থাকবে বেশী এবং যথেষ্ট মোটা অংকের মুনাফা পাবার আশাও। এই সাথে ব্যাংক তার সাধারণ কাজগুলো করে যাবে, যেগুলোর জন্যে বর্তমানে লোকেরা তার শরণাপন্ন হয়ে থাকে। কাজেই নিশ্চিত বলা যায় যে, বর্তমানে যে পরিমাণ ধন ব্যাংকের নিকট আমানত রাখা হয়, সুদ রহিত হবার পরও একই পরিমাণ ধন আমানত রাখা হবে। বরং সে সময় সব রকম ব্যবসায়ের ব্যাপক প্রসারের কারণে মানুষের কাজ-কারবার বেড়ে যাবে, আমদানী আরও বেড়ে যাবে। কাজেই বর্তমান অবস্থার তুলনায় আরো অনেক বেশী পরিমাণ আয়ের উদ্বৃত্তাংশ ব্যাংকে জমা হবে।

এ পুঁজির যে পরিমাণ অংশ কারেন্ট একাউন্ট বা চলতি হিসেবের খাতায় জমা হবে, তাকে ব্যাংক কোনো মুনাফাজনক কাজে লাগাতে পারবে না, যেমন বর্তমানেও পারে না। তাই এ পুঁজির মূলত দুটো বড় বড় কাজে ব্যবহৃত হবে। এক. প্রতিদিনকার নগদ লেনদেন এবং দুই, ব্যবসায়ীদেরকে বিনা সুদে স্বল্প মেয়াদী ঋণ দান এবং বিনা সুদে হুণ্ডী ভাঙানো।

ব্যাংকে যেসব দীর্ঘ মেয়াদী আমানত রাখা হবে, তা অবশ্যি দু ধরনেরই হবে। এক ধরনের আমানতের মালিকের উদ্দেশ্য কেবল নিজের অর্থের সংরক্ষণ। এ ধরনের লোকদের অর্থ ঋণ হিসেবে গ্রহণ করে ব্যাংক নিজেই ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করবে, যেমন ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় ধরনের মালিকেরা তাদের অর্থ ব্যাংকের মাধ্যমে ব্যবসায়ে খাটাতে চায়। তাদের অর্থ আমানত হিসেবে রাখার পরিবর্তে ব্যাংক-কে তাদের সাথে একটি সাধারণ অংশীদারীত্বের চুক্তিনামা সম্পাদন করতে হবে। অতপর ব্যাংক এ পুঁজিকে তার অন্যান্য পুঁজিসহ মুযারিবাত (লাভ-লোকসানে সমভাবে অংশ গ্রহণ ভিত্তিক) নীতির ভিত্তিতে ব্যবসায়ে, শিল্প প্রকল্পে, কৃষি ফার্মে, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে ও সরকারের বিভিন্ন মুনাফাজনক কাজে খাটাতে পারবে। এর থেকে সামগ্রিকভাবে দুটো বড় বড় উপকার সাধিত হবে। প্রথমত, পুঁজিপতি ও পুঁজি বিনিয়োগকারীর স্বার্থে ব্যবসায়ের স্বার্থের সাথে একাকার হয়ে যাবে। কাজেই ব্যবসায়ের প্রয়োজন অনুযায়ী পুঁজি তার পৃষ্ঠপোষকতা করতে থাকবে এবং যেসব কারণে বর্তমান দুনিয়ার সুদ ভিত্তিক অর্থব্যবস্থায় দ্রব্য মূল্যের উর্ধগতি ও চড়ামূল্যের উত্তাল তরঙ্গ সৃষ্টি হয় তা প্রায় সবই খতম হয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত, পুঁজিপতির অর্থনৈতিক দূরদৃষ্টি ও ব্যবসায়ীর ব্যবসায়িক ও শৈল্পিক বিচক্ষণতা যা বর্তমান বিশ্বে পারস্পরিক সংঘর্ষ ও বিরোধে মত্ত রয়েছে। সে সময় অবশ্যি তা পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার মাধ্যমে এগিয়ে চলবে এবং তাতে সবারই উপকার হবে। অতপর এ পদ্ধতিতে ব্যাংক যে মুনাফা অর্জন করবে, তা দিয়ে নিজের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা ব্যয় নির্বাহের পর যা অবশিষ্ট থাকবে তা নির্দিষ্ট অনুপাতে নিজের অংশীদার ও আমানতদারীদের মধ্যে বন্টন করবে। এ ব্যাপারে পার্থক্য কেবল এতটুকুন হবে যে, বর্তমান অবস্থায় অংশীদারদের মধ্যে মুনাফা (DIVIDENDS) বন্টন হয় এবং আমানতকারীদেরকে সুদ দেয়া হয়, আর তখন উভয়কেই মুনাফার অংশ দেয়া হয়। বর্তমানে আমানতকারীরা একটি নির্ধারিত হারে সুদ পেয়ে থাকে আর তখন কোনো নির্দিষ্ট হার থাকবে না। বরং কমবেশী যে পরিমাণ মুনাফা অর্জিত হবে সবই একই অনুপাতে বণ্টিত হবে। বর্তমানে যে পরিমাণ লোকসান ও দেউলিয়া হবার ভয় রয়েছে তখনও তাই থাকবে। বর্তমানে বিপদ এবং এর মোকাবিলায় সীমাহীন মুনাফার সম্ভাবনা উভয়টিই কেবলমাত্র ব্যাংকের অংশীদারের জন্যে নির্দিষ্ট। কিন্তু তখন এ দুটো সম্ভাবনা আমানতকারী ও অংশীদার উভয়ের জন্যে সমভাবে বর্তমান থাকবে।

ব্যাংকিং পদ্ধতির আর একটি ক্ষতি নিরসনের জন্যে আমাদেরকে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। মুনাফার আকর্ষণে যে অর্থ ব্যাংকে সঞ্চিত হয়,

তার সুসংবদ্ধ শক্তির কর্তৃত্ব কার্যত মাত্র গুটিকয়েক ব্যাংকারের হাতে চলে যায়। এ ক্ষতির হাত থেকে বাঁচার জন্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং (CENTRAL BANKING-এর সমস্ত কাজ বায়তুলমাল বা ষ্টেট ব্যাংকের হাতে সোপর্দ করতে হবে। অন্যদিকে আইনের মাধ্যমে সমস্ত প্রাইভেট ব্যাংকের ওপর সরকারী দখল ও কর্তৃত্ব এমনভাবে সুদৃঢ় করতে হবে যার ফলে ব্যাংকাররা নিজেদের অর্থনৈতিক শক্তির অপ্রিয় ব্যবহারের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।

সুদ বিহীন অর্থনীতির যে সংক্ষিপ্ত নকশাটি আমি পেশ করলাম, তা পর্যালোচনা করার পর সুদ রহিত করে সুদমুক্ত অর্থনীতির ভিত্তিতে কোনো অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার ব্যাপারটি আদৌ বাস্তবানুগ নয়, একথা বলার কোনো অবকাশই থাকে না।

পরিশিষ্ট ঃ এক

বাণিজ্যিক ঋণ বৈধ কিনা ?

(পাকিস্তান সরকারের ভূতপূর্ব অডিটর জেনারেল জনাব সাইয়েদ ইয়াকুব শাহ এবং গ্রন্থকারের মধ্যে এ সম্পর্কে পত্র বিনিময়ের বিবরণ।)

প্রথম পত্র

প্রশ্ন ঃ আমি আপনার সুদ গ্রন্থখানি মনোযোগ সহকারে পড়েছি। পড়ার পর আমার মনে কিছু প্রশ্ন জেগেছে এবং বহু চেষ্টা করেও তার কোনো সন্তোষজনক জবাব খুঁজে পাইনি, তাই আপনাকে বিরক্ত করছি। আশাকরি দয়া করে আপনি আমার প্রশ্নগুলো সমাধান করে দেবেন।

এক ঃ আপনি আপনার গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে (উর্দূ ৩য় সংস্করণ পৃঃ ৩৫) প্রাক ইসলামী যুগের সুদের যে দৃষ্টান্তগুলো দিয়েছেন, তা থেকে সে যুগে ব্যবসার জন্যে ঋণ গ্রহণ করা হতো কিনা, একথা সুস্পষ্ট হয় না। আমি যতটা জানতে পেরেছি অন্তত ইউরোপে ব্যবসার জন্যে ঋণ গ্রহণের রীতি অনেক পরে শুরু হয়েছে। এর পূর্বে ব্যবসা করা হতো ব্যক্তিগত পুঁজি দিয়ে অথবা কার্যকরী অংশীদার (WORKING PARTNER) হিসেবে। আপনি কি এমন কোনো প্রামাণ্য গ্রন্থের নাম উল্লেখ করতে পারেন, যার থেকে আরবে তৎকালে ব্যবসা সংক্রান্ত সুদ প্রচলিত ছিল কিনা তা জানা যেতে পারে ?

দুই ঃ এ খণ্ডেরই উর্দূ ১৬৯ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে যে, ربوا الفضل -এর হাদীসগুলো সুদ নিষিদ্ধকারী কুরআনের আয়াত (সূরা আল বাকারা) নাযিল হওয়ার পূর্বে বর্ণিত। এ থেকে এ সিদ্ধান্ত করা কি সংগত হবে যে, ربوا الفضل। কুরআনে বর্ণিত হারাম ও শাস্তির লক্ষ্য নয় ? অথবা স্যার সাইয়েদ আহমদের ভাষায় এই যে, প্রকৃতপক্ষে অবৈধ ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপার এবং এটা ঐ সুদের ব্যাখ্যার মধ্যে শামিল নয়, যার উল্লেখ উপরোক্ত আয়াতে রয়েছে ?

আশাকরি এ সবের জবাব দানে কৃতার্থ করবেন।

জবাব

অবশ্য একথা কোনো গ্রন্থে বিশদভাবে তো বলা হয়নি যে, আরবের প্রাগ ইসলামী যুগে ব্যবসায়ে সুদ প্রচলিত ছিল। কিন্তু একথা উল্লেখিত অবশ্যিই আছে যে, মদীনার কৃষিজীবী লোক ইয়াহুদী পুঁজিপতিদের নিকট থেকে সুদী ঋণ গ্রহণ করতো। ইয়াহুদীদের মধ্যেও পারস্পরিক সুদী লেনদেন প্রচলিত ছিল। উপরন্তু কুরাইশগণ—যাদের পেশা ছিল প্রধানত ব্যবসা-বাণিজ্য-সুদী–

লেনদেন করতো শুধুমাত্র অভাবী লোকদেরই প্রয়োজন পূরণের জন্যে অনিবার্যরূপে ঋণ গ্রহণের প্রয়োজন হতো না, বরঞ্চ কৃষিজীবী লোকদেরকেও তাদের কৃষি কাজের জন্যে এবং ব্যবসায়ীগণের ব্যবসার জন্যে এর প্রয়োজন হতো। আর এটা কোনো নতুন পদ্ধতি নয়, বরঞ্চ আবহমানকাল থেকে এ চলে আসছে। এ প্রথাটি ক্রমোন্নতির ভেতর দিয়ে বর্তমান রূপ ধারণ করেছে। প্রাচীন প্রথা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত লেনদেনের মধ্যে ছিল সীমিত। আধুনিক প্রথার পার্থক্য এই হয়েছে যে, ঋণ দ্বারা বৃহৎ আকারে মূলধন জমা করে তা ব্যবসায় বিনিয়োগ করার প্রথা প্রবর্তিত হয়েছে।

ربوا الفضل সংক্রান্ত হাদীসসমূহ সূরা আল বাকারায় সুদ নিষিদ্ধকারী আয়াত নাযিল হবার পূর্বেকার তা বটেই। কিন্তু তা সূরা আলে ইমরানের আয়াতের পরবর্তীকালের। সূরা আলে ইমরানের আয়াতে কুরআনের এ উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট করে দেয় যে, সুদ একটি অন্যায়-অনাচার যার উচ্ছেদ বাঞ্ছনীয়। নবী করীম (স) এজন্য পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক ব্যাপারে এমন সব সংস্কার সাধন করেছিলেন, যার নামকরণ করা হয় ربوا الفضل। এসব হাদীসে সুস্পষ্টরূপে 'রিবা' (সুদ) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এবং নিষিদ্ধকরণের শব্দাবলী স্বয়ং হারাম ঘোষণা করার কথাই বুঝায়। অবশ্যি এটা ঠিক যে, কুরআনে যে সুদ হারাম করার কথা বলা হয়েছে, তা হচ্ছে ঋণ সংক্রান্ত সুদ, হাতে হাতে লেনদেনের সুদ নয়। ফকীহগণ এ ব্যাখ্যাও করেছেন যে, ربوا الفضل ঠিকই সুদ নয় যা কুরআনে হারাম করা হয়েছে। বরঞ্চ প্রকৃতপক্ষে এ হচ্ছে সুদের মূলোচ্ছেদ করার জন্যে পূর্ব প্রস্তুতি মাত্র।

দ্বিতীয় পত্র

প্রশ্ন ঃ আপনি যেমন বিশদভাবে আমার প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন, তাতে পুনর্বার আপনাকে বিরক্ত করার সাহস পাচ্ছি।

কুরআন মজীদে সুদ সম্পর্কে যেমন কঠোর শাস্তির কথা বলা হয়েছে, এমনটি সম্ভবত অন্য কোনো পাপ কাজের জন্যে বলা হয়নি। এজন্য আমার ক্ষুদ্র ধারণামতে আলেমদের উচিত এ ব্যাপারে কিয়াস করে কোনো সিদ্ধান্ত না করা এবং সুদের কোনো প্রকার সম্পর্কে যতক্ষণ না তারা নিশ্চিত হয়েছেন যে, নবীর যমানায় তা প্রচলিত ছিল, ততক্ষণ তাকে রিবার মধ্যে শামিল না করা। আপনার পত্রে একথা জানতে পারা যায় যে, আপনি ব্যবসায় ক্ষেত্রে সুদের বিদ্যমান থাকার কিয়াস নিম্নের কারণগুলোর ভিত্তিতে করেছেন ঃ

এক ঃ মদীনায় কৃষিজীবী লোকেরা ইয়াহুদী পুঁজিপতিদের নিকট থেকে সুদে ঋণ গ্রহণ করতো। আমার বিনীত নিবেদন এই যে, এ ধরনের ঋণকে

বাণিজ্যিক ঋণ বলা ঠিক হবে না। এ ধরনের ঋণ অভাবগ্রস্ত লোকেরাই গ্রহণ করতো। কৃষির জন্যে বাণিজ্যিক ঋণ আধুনিক যুগের উদ্ভাবন। যখন থেকে বৃহৎ আকারে কৃষি এবং তার জন্যে যন্ত্রপাতির ব্যবহার শুরু হয়, তখন থেকে বড় বড় জমির মালিকগণ বাণিজ্যিক ঋণ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। প্রাচীনযুগে কৃষিজীবী লোকদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে ঋণ গ্রহণ করতে হতো এবং তা গ্রহণ করতো প্রয়োজন পূরণের জন্যে।

দুই ঃ স্বয়ং ইয়াহুদীদের মধ্যেও পারস্পরিক সুদী লেনদেন হতো, তা থেকে একথা বলা যায় না যে, তাদের এ ঋণ ব্যবসার জন্যে নেয়া হতো। আরবের ইয়াহুদীরা ছিল অধিকাংশ কৃষিজীবী অথবা সুদী মহাজন। যেমন, ইউরোপেও বহুকাল যাবৎ তাই ছিল। সম্ভবত আরবের ইয়াহুদী সুদী মহাজনেরা গরীব-ধনী নির্বিশেষে উভয় শ্রেণীর লোকের ব্যক্তিগত প্রয়োজনের কারণে টাকা ঋণ দিয়ে তাদের সুদী ব্যবসা চালাতো।

তিন ঃ কুরাইশগণ অধিকাংশ ব্যবসাজীবী ছিল এবং তারাও পরস্পর সুদী লেনদেন করতো। এ ব্যাপারে আমার বক্তব্য এই যে, কুরাইশদের মধ্যে সুদী লেনদেনের যে দৃষ্টান্ত আমার নজরে পড়েছে, তার থেকে একথা সুস্পষ্ট করে বলা যায় না যে, আলোচ্য ঋণ তারা ব্যবসার জন্যে গ্রহণ করতো। এমন কোনো দৃষ্টান্ত যদি আপনার জানা থাকে, তাহলে দয়া করে আমাকে অবহিত করবেন। তৎকালে ব্যবসা ব্যক্তিগত পুঁজিতে অথবা কার্যকরী অংশীদার হিসেবে করা হতো। কুরাইশরা যে ব্যবসায়ী কাফেলা বাইরে পাঠাতো তাতে সব রকম লোক অংশ গ্রহণ করতে পারতো। বলা হয় যে, এক দীনার, অর্ধ দীনার দিয়েও শামিল হওয়া যেতো, বলাবাহুল্য এ ধরনের ব্যবসার জন্যে ঋণ করার কোনো দরকারই হবার কথা নয়। যেমন আমি বলেছি যে, ব্যবসা সংক্রান্ত ঋণ ইউরোপে বহু পরে প্রচলিত হয় এবং পঞ্চম ও দশম শতাব্দীর মধ্যে এর প্রচলন সেখানে ছিল না। অবশ্যি এ অবস্থা যে আরবেও ছিল তা এর থেকে বলা যায় না। কিন্তু আমি প্রয়োজন বোধ করছি যে, আরবে বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে সুদ বিদ্যমান ছিল—একথা মেনে নেয়ার পূর্বে এ বিষয়ে ভালো করেই যাঁচাই করা দরকার। আরব এবং অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ নবীর যমানার অবস্থার বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। ব্যবসা সংক্রান্ত সুদ সম্পর্কে তাদের নীরবতার দ্বারা এটা কি অনুমান করা যায় না যে, সে সময়ে এ ধরনের সুদের মোটেই প্রচলন ছিল না ? বিশেষ করে ব্যবসা পদ্ধতি যখন এরূপ ছিল যে, তাতে সর্ব শ্রেণীর আর্থিক সঙ্গতি সম্পন্ন লোক শামিল হতে পারতো।

মাওলানা আবুল কালাম আজাদের সূরা আল বাকারা ১৭৬-১৭৭ আয়াতের ব্যাখ্যা হয়তো আপনার দৃষ্টিগোচর হয়েছে। তিনি 'রিবা' অর্থে সেই

সুদ বুঝিয়েছেন যা কোনো অভাবগ্রস্ত লোকের নিকট থেকে নেয়া হয়। আলেমগণ এবং মুফাস্‌সিরগণের আর কেউ কি এ অর্থ গ্রহণ করেছেন ? যদি এ অর্থের সাথে অন্যান্য বুজর্গানে দ্বীন একমত হন তাহলে একটি বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সমাধানই হয়ে যায়।

জবাব

আমি আপনার এ ধারণার সাথে একমত যে, কুরআনে যে বিষয়ের হারাম হওয়া সুস্পষ্টরূপে ঘোষণা করা হয়নি, তাকে ঠিক ঐ বিষয়ের পর্যায়ভুক্ত করা উচিত হবে না, যার হারাম হওয়া সম্পর্কে কুরআনে সুস্পষ্ট ঘোষণা আছে। কিন্তু সুদের ব্যাপারে আপনি এ নীতির প্রয়োগ যেভাবে করছেন, তা আমার মতে সঠিক নয়। আপনার প্রমাণের বুনিয়াদ দুটো জিনিসের উপর। প্রথম হচ্ছে এই যে, ঋণ সম্পর্কিত সুদের অর্থ তাই গ্রহণ করতে হবে যা নবীর যমানায় প্রচলিত ছিল। দ্বিতীয়, বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে সুদ যেহেতু তখন প্রচলিত ছিল না এবং দরিদ্র অভাবগ্রস্ত লোকেই সুদে ঋণ গ্রহণ করতো, সে জন্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর সুদই কুরআনে বর্ণিত হারাম সুদের পর্যায়ে পড়ে এবং প্রথমটি হারাম বহির্ভূত। আপনার এ দুটো সিদ্ধান্ত ঠিক নয়। প্রথমটি ভুল হবার কারণ এই যে, কুরআন শুধুমাত্র ঐসব বিষয়েরই নির্দেশ দিতে আসেনি, যা কুরআন নাযিলের সময় আরবে তথা বিশ্বের অন্যান্য স্থানে প্রচলিত ছিল। বরঞ্চ কুরআন এসেছিল এমন সব মূলনীতি বর্ণনা করার জন্যে, যা কিয়ামত পর্যন্ত সম্ভাব্য সকল ব্যাপারে বৈধ-অবৈধ সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে। যদি একথা স্বীকার করা না হয়, তাহলে কুরআনের শাশ্বত ও বিশ্বজনীন পথ প্রদর্শক হবার কোনো অর্থই হয় না। অধিকন্তু ব্যাপার শুধু সুদ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে না। এক ব্যক্তি এহেন অবস্থায় বলতে পারে, কুরআন যে পানীয় হারাম ঘোষণা করে, তার থেকে পানীয় বস্তুর শুধু সেই প্রকারই বুঝতে হবে, যা সে সময়ে আরবে তৈরী হতো। কুরআন যে চুরি হারাম ঘোষণা করে তাহলো ঠিক ঐ পন্থায় চুরি করা যা তখন আরবে ব্যবহৃত হতো। প্রকৃতপক্ষে যা হারাম করা হয়েছে তাহলো পানীয় (শরাব) এবং চুরি কার্যের মূল বিষয়টি তৎকালে প্রচলিত, তার প্রকার ও পদ্ধতি নয়। এভাবে মূলবস্তু সুদ হারাম করা হয়েছে এবং তা হচ্ছে এই যে, ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার নিকট হতে আসলের উপরে অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করার শর্ত আরোপ করে। এ অতিরিক্ত গ্রহণের শর্তটি যে কোনো প্রকার ঋণের সাথে থাকুক না কেনো, তার উপরে কুরআনের নিষিদ্ধকরণ নির্দেশ প্রযোজ্য হবে। কুরআন মূল সুদ বস্তুটিকে হারাম করেছে এবং কোথাও একথা বলা হয়নি যে, কোনো ব্যক্তি দারিদ্র ও অভাবের জন্যে ব্যক্তিগত প্রয়োজনের উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণ করলে তার নিকট সুদ গ্রহণ করা হারাম।

আপনার দ্বিতীয় যুক্তিটি এজন্য ঠিক নয় যে, প্রথমত, বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সুদের শুধু এ ধরনটাই আধুনিক যে, ব্যবসার জন্যে প্রাথমিক পুঁজি ঋণের মাধ্যমে জমা করা হয়। নতুবা ব্যবসা চলাকালীন ব্যবসায়ীদের পারস্পরিক ঋণের লেনদেন অথবা সুদী মহাজনের কাছ থেকে ঋণ করে কোনো ব্যবসা সংক্রান্ত প্রয়োজন পূরণ করার প্রচলন তো আবহমান কাল থেকে সারা দুনিয়ায় ছিল এবং তা যে আধুনিক উদ্ভাবন বলে কোনো নজীর খুঁজে পাওয়া যাবে না। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিগত প্রয়োজনের জন্যে অব্যবসায়সুলভ ঋণ গ্রহণের এ একটি মাত্র পন্থাই ছিল যে, কেউ চিকিৎসার জন্যে ঔষধ-পত্রের প্রয়োজনবোধ করলো অথবা ক্ষুধানিবৃত্তির জন্যে তার চাল-ডালের দরকার হলো এবং এর জন্যে কোনো অবস্থাপন্ন লোকের নিকট থেকে কিছু টাকা ঋণ করলো, এছাড়া আরও অনেক পরিস্থিতি এমন দেখা যায় যে, অভাব না থাকা সত্ত্বেও মানুষ ঋণ করে নিজের প্রয়োজন মিটায়। যেমন ধরুন ছেলে-মেয়ের বিয়ে-শাদীতে খরচ করবে অথবা বাড়ীঘর তৈরী করবে। এ ধরনের ঋণ গ্রহণ সব দেশে সব যুগেই হয়ে থাকে। ঋণ গ্রহণের এরূপ বিভিন্ন পন্থার মধ্যে আপনি কোন্ কোন্‌টিকে সুদ হারাম করার আওতাবহির্ভূত রাখবেন এবং কোন্ কোন্‌টিকে হারামের মধ্যে শামিল করবেন ? এর জন্যে কোন্ মূলনীতিইবা অবলম্বন করবেন ? আর কুরআনের কোন্ শব্দাবলীর দ্বারা এ মূলনীতি নির্ধারণ করবেন ?

জাহেলিয়াতের যুগ অথবা ইসলামের প্রাথমিক যুগের ব্যবসা সংক্রান্ত রীতি-পদ্ধতিতে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সুদ এবং বাণিজ্যের বাইরের সুদের বিশদ বর্ণনা পাওয়া না যাবার কারণ হচ্ছে এই যে, ঐ সময়ে এ পার্থক্য করণের কোনো ধারণাই বিদ্যমান ছিল না এবং এ ধরনের কোনো পরিভাষাও সৃষ্টি হয়নি। সে সময়ের লোকের দৃষ্টিতে ঋণ বলতে সব ধরনের ঋণই বুঝাতো। তা সে ঋণ অভাবগ্রস্ত গ্রহণ করুক অথবা ধনী, ব্যক্তিগত প্রয়োজন অথবা ব্যবসার জন্যে। এজন্য তারা শুধুমাত্র ঋণের ব্যাপারটি এবং তার জন্যে সুদের লেনদেনের কথাই বলতো। তার বিশদ ব্যাখ্যায় তারা যেতো না।

মাওলানা আজাদের আসল উদ্দেশ্য তা ছিল না, যা আপনি বুঝে নিয়েছেন। তিনি তাঁর ব্যাখ্যায় একথাই সুস্পষ্ট করার চেষ্টা করেছেন যে, নৈতিক দিক দিয়ে সুদ কতখানি মারাত্মক। কিন্তু তাঁর কথার অভিপ্রায়ের ধারা একথা প্রকাশ পায় না যে, সুদ বলতে শুধুমাত্র সেই সুদ যা আদায় করা হয় কোনো অভাবী ব্যক্তিকে তার অভাব পূরণের জন্যে টাকা ঋণ দিয়ে।

মাওলানা আজাদের ব্যাখ্যার যে মর্ম আপনি গ্রহণ করছেন, তা কুরআনের বক্তব্যেও অতিরিক্ত এবং সুদ নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্ত কুরআনের এ নির্দেশ

অভাবগ্রস্তের জন্যে প্রযোজ্য। একথা মুফাসসির ও ফকীহগণের মধ্যে কেউ বলেননি।

এ ব্যাপারে ভালো হতো, যদি আপনি আমার তাফসীর 'তাফহীমুল কুরআন' (সূরা আল বাকারার টীকা ৩১৫-৩২৪) পড়ে দেখতেন।-(তর্জুমানুল কুরআন জমাদিউল উখ্‌রা ঃ ১৩৭৬ হিঃ, মার্চ ১৯৫৭)

তৃতীয় পত্র

প্রশ্ন ঃ আপনি বলেছেন যে, আমার প্রমাণের ভিত্তি দুটো। প্রথম এই যে, 'রিবা' বলতে ঋণের সেই পন্থা বুঝতে হবে, যা ছিল নবীর যমানায় প্রচলিত। দ্বিতীয় হচ্ছে এই যে, বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সুদের প্রচলন যেহেতু সে সময়ে ছিল না সে জন্যে এ ধরনের 'রিবা' (সুদ) কুরআনের নিষিদ্ধকরণের (হারাম) আওতায় পড়ে না। আপনি আমার এ দুটো যুক্তি সঠিক মনে করেন না। কিন্তু একথা আসে আপনার সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং (উর্দূ) গ্রন্থের ৩৪-৩৫ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আলোচনা থেকে। আপনি বলেছেন, "কুরআন যে বাড়তি প্রাপ্য হারাম বলে, তা এক বিশেষ ধরনের বাড়তি। এজন্য কুরআন তাকে 'রিবা' বলে অভিহিত করেছে। আরববাসীদের ভাষায় ইসলামের পূর্বেও লেনদেনের একটা বিশেষ ধরনকেও এ পারিভাষিক নামে স্মরণ করা হতো। -------------- এবং যেহেতু 'রিবা' একটা বিশেষ ধরনের বাড়তির (অতিরিক্ত প্রাপ্য) নাম ছিল এবং তা ছিল সর্বজন পরিচিত, সে জন্যে কুরআন মজীদে তার কোনো বিশদ ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি।----------"

তারপর কিছু ঐতিহ্যের উল্লেখ করে জাহেলিয়াতের যুগের সুদের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। তারপর লিখেছেন, "ব্যবসা-বাণিজ্যের এসব পদ্ধতি আরবে প্রচলিত ছিল। এসবকে আরববাসী তাদের ভাষায় বলতো 'রিবা' এ হলো সেই বস্তু যা কুরআনে হারাম করা হয়েছে।"

আমি আগেই বলেছি যে, আপনার গ্রন্থে এবং অন্যান্য গ্রন্থে 'রিবার' যে দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে, তার থেকে একথা প্রমাণিত হয় না যে, আরববাসী ব্যবসার জন্যে ঋণ গ্রহণ করতো এবং আরবে যদি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সুদের প্রচলন না থেকে থাকে, তাহলে আপনার নিজের যুক্তি অনুযায়ী তা 'রিবার' পর্যায়ে পড়ে না। এ সিদ্ধান্ত গ্রহণে আমার যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে তাহলে মেহেরবানী করে আমাকে অবহিত করবেন। ওলামায়ে কেরামও স্বীকার করেছেন যে, 'রিবা' সেই বাড়তি প্রাপ্যকে বলা হতো, যা তখনকার দিনে আরবে প্রচলিত ছিল এবং 'রিবা' নামে অভিহিত করা হতো।

এখন কথা হলো এই যে, আরব জাহেলিয়াতের যুগে সত্যিকারভাবে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সুদ মোটেই প্রচলিত ছিল কিনা। এ বিষয়ে আপনি বলেছেন যে, একথা বিশদভাবে কোনো বই-কেতাবে লিখা নেই। তাই আমি আরজ করেছিলাম এমন এক সাংঘাতিক বিষয়ে, যার জন্যে আল্লাহ্ তায়ালা কঠোর শাস্তির বিধান করে রেখেছেন, কোনো কিয়াস অনুমানের ভিত্তিতে কাজ করা ঠিক হবে না। বরঞ্চ যথাসম্ভব প্রকৃত ব্যাপার জানতে হবে। আমি আরও আরজ করেছিলাম এ এক ঐতিহাসিক সত্য যে, পঞ্চম এবং দশম শতাব্দীর মধ্যে ইউরোপে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সুদের প্রচলন ছিল না। এ বিষয়ে আমি বিভিন্ন গ্রন্থের উল্লেখ করতে পারি। উপরন্তু যেসব বই-পুস্তক আমার দেখা সম্ভব হয়েছে, তার থেকে জানতে পেরেছি যে, ঐ সময়ে আরবে ব্যক্তিগত মূলধনে অথবা কার্যকরী অংশীদার হিসেবে ব্যবসা করা হতো। ব্যবসা সম্পর্কে যতই আলোচনা আমার নজরে পড়েছে, তাতে কোথাও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সুদের উল্লেখ নেই। আমি আশা করেছিলাম যে, আপনি আপনার গভীর জ্ঞান ও ব্যাপক অধ্যয়নের দ্বারা আমাকে এমন কোনো গ্রন্থের সন্ধান দেবেন, যার থেকে এ বিষয়ে আমি সঠিক অবস্থা জানতে পারি। কিন্তু আমার এ আশা পূর্ণ হয়নি। যেমন আমি পূর্বে বলেছি, গ্রন্থকারগণ নবীর যমানার অবস্থা বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু কোথাও একথার উল্লেখ নেই যে, লোকেরা ঋণ করে ব্যবসা করতো। কুরাইশগণ ছিল ব্যবসায়ী। হযরত আব্বাস (রা) সুদের উপর টাকা ঋণ দেবেন। কিন্তু কাকে ? খেজুর উৎপন্নকারীদেরকে। ব্যবসায়ীদের কোনো শ্রেণী সুদের উপরে কাউকে ঋণ দিয়ে থাকলে, তা দিয়েছেন কৃষিজীবীকে। এর থেকে কি এ ধারণা করা যায় না যে, ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সুদ তখন বিদ্যমান ছিল না।

আপনি প্রশ্ন করেছেন যে, ঋণের বিভিন্ন প্রকারের মধ্যে কোন্ কোন্‌টিকে সুদ নিষিদ্ধকরণের হুকুম থেকে বাদ দেয়া যাবে এবং কোন্ কোন্‌টিকে শামিল করা যাবে। যে যে ধরনের সুদ জাহেলিয়াতের যুগে প্রচলিত ছিল, তা সবই হারাম হবে। যতদূর আমি বুঝতে পেরেছি, সে সময়ে মানুষ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে এবং নিরুপায় হয়ে ঋণ করতো। মহাজনগণ এরূপ ঋণ গ্রহণকারীদেরকে সর্বস্বান্ত করতো এবং তাদেরকে রক্ষা করা প্রয়োজন ছিল বলে 'রিবা' হারাম করা হয়েছে। এ ধরনের সুদের যতই কঠোর ভাষায় নিন্দা করা হোক, তা হবে ন্যায়সংগত এবং সুদখোরদের কঠোর শাস্তি দেয়া হলে তাও হবে যথার্থ। পক্ষান্তরে যেসব ঋণগ্রহণকারী তাদের গৃহীত ঋণ লাভজনক কাজে বিনিয়োগ করে তাদের ঋণের উপর সুদ জায়েয হওয়া উচিত। এ ধরনের সুদদাতা ও গ্রহীতা উভয়েই লাভবান হয়। আপনি দেখতে পাবেন যে, অনেক ক্ষেত্রে

কার্যকরী অংশীদার হিসেবে ব্যবসা করার চেয়ে, ঋণ করে ব্যবসা করা লোকে পসন্দ করে। আমি বুঝতে পারি না যে, ওলামায়ে কেরাম এ ধরনের সুদকে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মতো কঠোর শাস্তিমূলক অপরাধ বলেন কেন ? ইসলামী ফিকাহ অনুযায়ী অপরাধ এবং তার শাস্তির মধ্যে কি সামঞ্জস্য থাকা উচিত নয় ? এ ধরনের সুদের বিরুদ্ধে যা কিছু বলা হয়, তাহলো এই যে, এর দ্বারা এমন এক শ্রেণীর লোক মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, যারা উপার্জন করে বিনা পরিশ্রমে। একথা তো তাদের বিরুদ্ধেও বলা যেতে পারে যারা বড় বড় জমিদারী ও গাড়ী-বাড়ীর মালিক। তারা বিনা পরিশ্রমে শুধু জীবীকা নির্বাহই করে না, বরঞ্চ বিলাসিতাপূর্ণ জীবন যাপন করে। ইসলাম যদি এ ধরনের অমিতচারী ভোগবিলাসীদেরকে প্রশ্রয় দেয়, তাহলে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সুদগ্রহণকারী কেনই বা শাস্তির যোগ্য হবে ?

বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সুদের বিরুদ্ধে আরও বলা হয় যে, সুদে ঋণগ্রহীতা তার কারবারে যতই ক্ষতিগ্রস্ত হোক না কেন, ঋণদাতা লাভবানই হবে, একথা বহুলাংশে সত্য। কিন্তু একথা ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, ব্যবসার জন্যে সুদে টাকা এজন্য নেয়া হয় যে, ঋণগ্রহীতা এ সুদের হার থেকে কয়েকগুণ বেশী মুনাফার আশা করে এবং অধিকাংশ সময়ে তা পূর্ণ হয়। নতুবা বাণিজ্যিক ঋণের এতোটা প্রসার হতো না। এ ধরনের ঋণদাতা বছরে অল্প পরিমাণ কিছু পেয়ে থাকে এবং তার বিনিময়ে ঋণগ্রহীতা তার চেয়ে কয়েকগুণ বেশী মুনাফা করে। অবশ্যি কখনো কখনো তার লোকসানও হয়। এ ধরনের ঝুঁকি (RISK) নিয়ে কাজ করাতো ব্যবসা-বাণিজ্যের সাধারণ নীতি। এ এমন কিছু নয় এবং এমন কোনো অমংগলও আনয়ন করে না যার জন্যে 'রিবার' মতো অপরাধের শাস্তি আরোপিত হতে পারে। আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানমতে সুদের লাভজনক ও অলাভজনক বিষয়ের মধ্যে তারতম্য হওয়া উচিত এবং প্রথমটি জায়েয ও দ্বিতীয়টি নাজায়েয হওয়া উচিত।

আপনি একথাও বলেছেন, "সে যুগের লোকের দৃষ্টিতে ঋণ বলতে প্রত্যেক প্রকারের ঋণই ছিল। তা সে ঋণ অভাবগ্রস্ত করুক অথবা অবস্থাপন্ন। ব্যক্তিগত প্রয়োজনে নেয়া হোক অথবা ব্যবসার জন্যে।" এর জন্যে কি কোনো প্রামাণ্য গ্রন্থের নাম উল্লেখ করতে পারেন ? বিগত কয়েক শতাব্দী থেকে বাণিজ্যিক সুদের প্রচলন দুনিয়ায় হয়েছে এবং লোক এতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। তাই তাদের জন্যে মুশকিল হয়ে পড়েছে। এ ধারণা পোষণ করার যে এমন এক সময় ছিল যখন বাণিজ্যিক সুদ ছিল না। অথচ ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, ব্যবসা সংক্রান্ত সুদের লেনদেন অন্তত পাশ্চাত্য দেশগুলোতে নবীর আগমনের সময় প্রচলিত ছিল না।–(এর জবাব পরিশিষ্ট ঃ দুই দ্রঃ)

আমি আপনাকে আরও একটু বিরক্ত করতে চাই। তার তিনটি কারণ। এক হচ্ছে এই যে, লাখো লাখো মুসলমান বাণিজ্যিক সুদের লেনদেন করছে। কারণ এ প্রতিযোগিতার যুগে ব্যবসা ক্ষেত্রে যদি তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ঠিক রাখতে হয়, তাহলে তাদের জন্যে এ ছাড়া গত্যন্তর নেই। আমি জানি যে, আপনি একথা স্বীকার করেন না। আপনি এর বিকল্প পন্থার প্রস্তাব দিয়েছেন। কিন্তু আমি সবিনয় নিবেদন করব যে, আমাদের বর্তমানকালের মানসিক ও নৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে তা কার্যকর করা যাবে না। যে নৈতিক মান আমরা আমাদের স্বধর্মীদের কাছে আশা করি তার জন্যে প্রয়োজন একজন নবীর। কিন্তু ইসলামে আর কোন নবীর আগমনের সম্ভাবনা নেই। তাই আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান মতে শ্রদ্ধেয় আলেম সমাজের উচিত ধর্মের তামাদ্দুনিক ও সামাজিক ব্যাপারে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কঠোরতা না করা এবং আল্লাহ তায়ালার একথা ঃ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ - স্মরণ করা। উপরন্তু এ এক সর্বজনস্বীকৃত মূলনীতি যে, যে জিনিস আইনত নিষিদ্ধ তার অমংগল মংগল থেকে অধিক। যেমন আল্লাহ তায়ালা শরাব এবং জুয়ার ব্যাপারে এরশাদ করেছেন وَاِثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا বাণিজ্যিক সুদ কতিপয় লোকের জন্যে কোনো কোনো সময়ে ক্ষতিকারক হয়। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে, অধিকাংশ সময়ে তা লাভজনক হয় এবং তার লাভ ক্ষতি থেকে অনেক বেশী হয়। তাই এটা নিষিদ্ধ না হওয়া উচিত।

দ্বিতীয়ত, আজকাল সামরিক প্রয়োজনে এত পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয় যে, যুদ্ধের সময় ঋণ করা ব্যতীত উপায় থাকে না। এ সত্য অস্বীকার করা যায় না।

তৃতীয় কারণটি আমার ব্যক্তিগত। আমি সরকারী চাকুরী করা কালে জেনারেল প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে স্বেচ্ছায় আমার বেতন থেকে টাকা কেটে রাখতাম। তার থেকে একটা মোটা অংকের সুদ আমার নামে জমা হয়েছে যা আমি আলাদা করে রেখেছি। আমি জানতে চাই এ সুদ জায়েয, না জায়েয। এ বিষয়ে আপনি আমাকে দয়া করে জানাবেন। যদি নাজায়েয হয় তাহলে এ টাকা কোন্ কাজে ব্যয় করবো ? অভাবগ্রস্তদের অভাব মোচনে তা ব্যয় করা যাবে কি ? আমার এ টাকাটা হালাল কি হারাম তা জানার জন্যে অশেষ চেষ্টার ফলে বহু বই-পুস্তকও পড়েছি। কিন্তু কয়েকটি বিষয় আমার কাছে পরিষ্কার হয়নি। সমাধানের জন্যে তা আপনার কাছে পেশ করার সাহস করছি। এ ব্যাপারে আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে মাফ চাইছি। মনের দিক দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাই। কিন্তু এ পত্রের জবাবের পর আপনাকে আর বিরক্ত করব না।

জবাব

আমি আগেও বলেছি এবং এখনো বলছি যে ঋণ দেবার পর আসলের উপরে যে বাড়তি বা অতিরিক্ত গ্রহণকে আরবে 'রিবা' বলা হতো, কুরআন তাকেই হারাম করেছে। কিন্তু একে আপনি যে অর্থে নিচ্ছেন তা হচ্ছে এই যে, ঋণ দেয়ার যে প্রকার পদ্ধতি সে সময়ে আরবে প্রচলিত ছিল, কুরআন শুধুমাত্র তার মধ্যেই আসল থেকে অতিরিক্ত নেয়া হারাম করেছে। অথচ সকল ফকীহগণের সাথে একমত হয়ে আমি ঋণদানের প্রকার পদ্ধতির নয়, বরঞ্চ অতিরিক্ত গ্রহণের প্রকার পদ্ধতি থেকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছি।

এটাকে একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে সুস্পষ্ট করতে চাই। কুরআন নাযিলের সময় আরবে পরিভাষা হিসেবে 'খমর' (خمر) শব্দটি আঙুর থেকে নিঃসৃত শরাবের জন্যে ব্যবহৃত হতো। সে সময়ে অন্য পন্থায় যেসব শরাব তৈরী হতো তাকেও পরোক্ষভাবে এ শব্দ দ্বারা বুঝানো হতো। যা হোক, যখন কুরআনে তার হারাম হবার নির্দেশ এলো, তখন কেউ তার এ অর্থ গ্রহণ করেনি যে, এ হারামের নির্দেশ শুধুমাত্র ঐ ধরনের শরাবের জন্যে নির্দিষ্ট ছিল, যা তখন আরবে প্রচলিত ছিল। বরঞ্চ এ অর্থই গ্রহণ করা হতো যে, এসব বস্তুর মধ্যে যে গুণটি ছিল সকলের মধ্যে সাধারণ (COMMON) অর্থাৎ মাদকতার গুণ, হারাম করার নির্দেশটি ছিল তারই উপর প্রযোজ্য। আর এ গুণটি (মাদকতা) যে ধরনের পানীয় অথবা খাদ্যের মধ্যে পাওয়া যাবে, তা হারামের আওতায় পড়বে।

অনুরূপভাবে আরবে ঋণেরও কয়েকটি প্রকার পদ্ধতি ছিল। এ সবের মধ্যে যে বিষয়টি ছিল সাধারণ (COMMON) তাহলো এই যে, লেনদেনের শর্তে একথার উল্লেখ থাকা যে, আসলের উপরে অতিরিক্ত কিছু আদায় যোগ্য হবে। আরববাসী একেই বলতো 'রিবা'। কুরআনে যখন 'রিবা' হারাম হবার হুকুম এলো, তখন কেউ তার এ অর্থ গ্রহণ করেনি যে, এ হুকুম শুধুমাত্র ঐ ধরনের ঋণ সম্পর্কে, যা তখন আরবে প্রচলিত ছিল। বরঞ্চ প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত সকল ফকীহগণ এ অর্থই গ্রহণ করেছেন যে, আসলের অতিরিক্ত যা দাবী করা হবে তাই হারাম—ঋণের ধরন বা প্রকার পদ্ধতি যাই হোক না কেন। এ দিকেই কুরআন ইংগিত করেছে ঃ

وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ اَمْوَالِكُمْ ـ(البقرة : ٢٧٩)

"যদি তোমরা তওবা কর, তাহলে তোমাদের আসল মাল ফিরে পাবার হকদার হবে।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৭৯)

এর থেকে বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, আসলের উপরে অতিরিক্ত নেয়াটাই 'রিবা'। আর এটাকে কুরআন হারাম করেছে। যদি ঋণের কোনো প্রকার

পদ্ধতিতে অতিরিক্ত গ্রহণকে হারাম করার উদ্দেশ্য থাকতো, তাহলে কোনো না কোনো প্রকারে সে উদ্দেশ্য প্রকাশ করে দেয়া হতো। যেমন, একথা বলা হতো, অভাবগ্রস্তদেরকে ঋণ দিয়ে অতিরিক্ত নিও না।

আপনি অভাবগ্রস্তের উল্লেখ কুরআনে কোথাও পাচ্ছেন না, তা আমদানী করছেন বাহির থেকে এবং এ শর্ত বাড়াবার জন্যে যে যুক্তি পেশ করছেন তাতে সাংঘাতিক নীতিগত ক্রটি এই হচ্ছে যে, শুধু সুদই নয়, কুরআনের যাবতীয় নির্দেশাবলী ঐসব অবস্থা ও লেনদেনের জন্যে নির্দিষ্ট হয়ে যাচ্ছে, যা তখন আরবে প্রচলিত ছিল। উপরন্তু এ যুক্তির দ্বারা আপনি একটা বিরাট ঝুঁকিও (RISK) টেনে আনছেন। আপনি এমন কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ পেশ করতে পারছেন না যে, ঐ সময়ে লোকে ঋণ করে ব্যবসা করতো না। আর একথারও কোনো প্রমাণ নেই যে, ব্যবসা করা কালীন কোনো ব্যবসায়ী অন্য কোনো ব্যবসায়ী অথবা সুদী মহাজনের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করতো না। এ দুটো ধারণা আপনার সৃষ্টি হয়েছে মধ্যযুগীয় ইউরোপ সম্পর্কে সাধারণ ঐতিহাসিক বর্ণনা থেকে। তা হচ্ছে এই যে, সে সময়ে ব্যবসা চলতো ব্যক্তিগত পুঁজি দিয়ে অথবা কার্যকরী অংশীদার হিসেবে। বাণিজ্যিক সুদের প্রচলন অনেক পরে হয়েছে। এ ধরনের ঐতিহাসিক বর্ণনা যার দ্বারা একটা সাধারণ অবস্থার চিত্র পেশ করা হয়েছে—একথা প্রমাণ করা যায় না যে, ঐ সময়ে আর কোনো পন্থার প্রচলন মোটেও ছিল না।

আমি পূর্বে বলেছি যে, লোক প্রত্যেক ধরনের ঋণকে ঋণই বলতো, তা সে ঋণ অভাবগ্রস্ত নিক অথবা অবস্থাপন্ন, ব্যক্তিগত প্রয়োজনে অথবা ব্যবসার জন্যে। এ হচ্ছে আমার ধারণা এবং এর বুনিয়াদ হচ্ছে এই যে, আমার দৃষ্টিতে অতীতের কোনো ঐতিহাসিক বর্ণনায় ঋণের প্রকারভেদ বর্ণনা করা হয়নি, ঋণগ্রহণকারীর অবস্থা ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে, মানুষ সকল যুগেই বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ঋণগ্রহণ করে থাকতো। আর ঋণগ্রহণ শুধু অভাবীদের মধ্যেই সীমিত থাকতো না।

এখানে এ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন যে, মুনাফা এবং স্বার্থের জন্যে ঋণে সুদ গ্রহণ কেন হারাম হওয়া উচিত। এ বিষয়ে পূর্বে যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে।

আমার মতে প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের উপরে সুদের যে অংক আপনার জমা হয়েছে, তা আপনি নিজের জন্যে ব্যয় করবেন না। এর হারাম হওয়া সম্পর্কে যদি নিশ্চিত নাও হন, তবুও এ-তো সন্দেহযুক্ত বটেই। যার পবিত্র হবার কোনো নিশ্চয়তা নেই। আপনার মতো একজন ভালো মানুষের তার থেকে লাভবান হওয়া উচিত নয়। বিশেষ করে আপনি যখন এ টাকার মুখাপেক্ষী নন। বরঞ্চ উত্তম কাজ এই হবে যে, এর দ্বারা আপনি একটি তহবিল গঠন করে

বিনা সুদে অভাবগ্রস্তদেরকে ঋণ দেবেন। আমার মনে হয়, অন্যান্য লোকের মধ্যে যাদের এ ধরনের সুদী অংক জমা হয়েছে, ভবিষ্যতে হবে, তারাও সন্তুষ্টচিত্তে আপনার এ তহবিলে তাদের উপরোক্ত টাকা জমা দেবে। এভাবে উপরোক্ত উদ্দেশ্যে একটা মোটা রকমের পুঁজি জমা হবে।-(তর্জুমানুল কুরআন, শাবান-রমযান ঃ ১৩৭৬ হিঃ জুন ঃ ১৮৫৭)

চতুর্থ পত্র

প্রশ্ন ঃ জুন সংখ্যার তর্জুমানুল কুরআনে বাণিজ্যিক সুদ সম্পর্কে আমার এবং আপনার উত্তরের নকল ছাপিয়েছে। আপনাকে আর বিরক্ত করবো না বলে ওয়াদা করা সত্ত্বেও আর একটু বিশদ ব্যাখ্যার জন্যে অনুরোধ করছি।

এক ঃ আপনি লিখেছেন এভাবে আরবে ঋণের লেনদেনের বিভিন্ন পন্থা প্রচলিত ছিল। এসবের মধ্যে এ ছিল একটি সাধারণ বস্তু যে, লেনদেনের বিবরণীতে আসলের উপরে অতিরিক্ত দেয় একটি অংক শামিল থাকতো। আর এটাকেই আরববাসী 'রিবা' নামে অভিহিত করতো। এর থেকে একথা প্রকাশ পায় যে, আপনি প্রচলিত প্রকার ঋণ থেকে অতিরিক্ত গ্রহণেয় প্রকার নির্ধারিত করেছেন এবং আমার চেষ্টাও তাই ছিল। এর জন্যে প্রয়োজন আরব জাহেলিয়াতের যুগে প্রচলিত ঋণের সকল প্রকার একত্র করা এবং দেখা যে, এদের সকলের মধ্যে বিদ্যমান সাধারণ বস্তু কোন্‌টি। আপনার নিকটে সে বস্তুটি লেনদেনের বিবরণীতে আসলের উপরে অতিরিক্ত কিছু আদায়ের শর্ত শামিল থাকা। আমার নিবেদন এই যে, আর একটি বস্তু ছিল সাধারণ (COMMON) এবং তা হচ্ছে ঋণগ্রহীতার অভাব-অনটনের জন্যে তার উপর নাজায়েয শর্ত আরোপ করা অথবা অন্য কথায় তার উপর অন্যায়-অত্যাচারের সম্ভাবনা, ঋণের যত প্রকার দৃষ্টান্ত আপনি আপনার 'সুদ' গ্রন্থে পেশ করেছেন তার সবগুলোর মধ্যে এ সম্ভাবনা বিদ্যমান। অতএব সবের মধ্যে বিদ্যমান এই সাধারণ বিষয়টি (অন্যায়-অত্যাচার) 'রিবার' সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। নতুবা 'রিবা' শব্দের সংজ্ঞা পূর্ণ হয় না। এ জবরদস্তিমূলক অত্যাচারের সম্ভাবনা সকল অলাভজনক (NON-PRODUCTIVE) ও ভোগ্য (CONSUMPTION) ঋণের বৈশিষ্ট্য এবং সম্ভবত সুদ হারাম হবার এটাই কারণ। কিন্তু যদি একথার প্রমাণ পাওয়া যায় যে, সেই যুগে আরববাসী লাভজনক কাজেও সুদে টাকা ঋণ করতো তাহলে আমার ধারণা হবে ভুল। যেহেতু আরব জাহেলিয়াতের যুগে এ ধরনের ঋণ প্রথার অনুসন্ধান করেও ব্যর্থ হয়েছি। সে জন্যে আমি আপনাকে বিরক্ত করছি এবং আশা করি আপনাদের অনুসন্ধানের ভিত্তিতে আমাকে জানাবেন, সে যুগে লাভজনক ঋণগ্রহণের প্রথা প্রচলিত ছিল কিনা। আপনি যত প্রকার ঋণ গ্রহণের দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন তার মধ্যে একটি মাত্র এমন যা

ব্যবসার সাথে কিছুটা সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ কাতাদার সেই বর্ণনা যাতে বলা হয়েছে ঃ "কোনো ব্যক্তি কারো কাছে কোনো জিনিস বিক্রি করলো এবং মূল্য পরিশোধ করার জন্যে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাকে অবকাশ দিল। সময় উত্তীর্ণ হলো কিন্তু ক্রেতা মূল্য পরিশোধ করলো না। তখন বিক্রেতা পুনরায় কিছু সময় পর্যন্ত অবকাশ দিল এবং মূল্য বাড়িয়ে দিল।"

চিন্তা করে দেখুন এ অতিরিক্ত মূল্য কখন চাপানো হতো। যখন সে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিশোধ করতে অক্ষম হতো এবং ঋণদাতা ইচ্ছামতো শর্ত ঋণগ্রহীতার দ্বারা স্বীকার করিয়ে নিতে পারতো। অর্থাৎ এতে জবরদস্তি ও যুলুম অত্যাচারের সম্ভাবনা থাকতো।[১]

দুই ঃ আপনি শরাবের (خمر) দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন যে, তার নিষিদ্ধকরণ আদেশের কেউ এর অর্থ গ্রহণ করেনি যে, সে সময়ে আরবে যে ধরনের শরাব প্রচলিত ছিল শুধু তাই হারাম করা হয়েছে। বরঞ্চ সকলে এটাই বুঝতো যে, এ সবের মধ্যে যে বস্তু বা গুণটি সাধারণ অর্থাৎ মাদকতার গুণ, তাই আসলে হারাম। আমার কথা এই যে, এরূপ রিবার ক্ষতিকারক হবার গুণটি সকলের মধ্যে সাধারণ মনে করতে হবে এবং তাই হবে হারাম। এখন সুদের যেসব প্রকার ক্ষতিকারক নয়, তা রিবার মধ্যে শামিল করা ঠিক হবে না।

তিন ঃ সূরা আল বাকারার আয়াত ঃ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ থেকে আপনি যুক্তি দেখাচ্ছেন যে, আসলের উপর অতিরিক্ত গ্রহণ করছি 'রিবা'। কারণ ঋণের কিছু শ্রেণী বিশেষে যদি এ অতিরিক্ত গ্রহণ হারাম করা উদ্দেশ্য হতো, তাহলে আকারে-ইংগিতে তা বলে দেয়া হতো। যেমন বলা হতো, 'অভাবগ্রস্তকে ঋণ দিয়ে অতিরিক্ত কিছু নিও না।' এ আয়াতকে যদি তার পূর্ব থেকে পড়েন তাহলে গোটা নির্দেশ হচ্ছে ঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ○ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ۚ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ○ (البقرة : ٢٧٨ ـ ٢٧٩)

১. একথা নিসন্দেহে ভুল। পাইকারী ব্যবসায় এ কোনো অসাধারণ ব্যাপার নয় যে, একজন পাইকারী বিক্রেতা কোন খুচরা বিক্রেতা পুরাতন গ্রাহককে কিছু মাল বাকী দিল এবং মূল্য পরিশোধের জন্যে বিনা সুদে দু এক মাসের অবকাশ দিল। এ সময়ের মধ্যে মূল্য পরিশোধ করতে অপারগ হলে সুদের উপর আরও কিছু কালের অবকাশ দেয়। এ অবস্থায় সময়মতো মূল্য পরিশোধ না করলে খুচরা বিক্রেতা অনিবার্যরূপে অনাহারে থাকে না যে, তার উপর সুদ আরোপ করলে বিশেষ ধরনের যুলুম হয়, যা শাহ্ সাহেব মনে করেন।

"যারা ঈমান এনেছো তারা জেনে রেখে দাও : তোমরা ভয় কর আল্লাহকে এবং সুদের যাকিছু অবশিষ্ট আছে (আদায় করার) তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা সত্যি-সত্যি ঈমান এনে থাক। যদি তোমরা তা না কর, অর্থাৎ সুদের বকেয়া ছেড়ে না দাও, তাহলে তৈরী থাক, আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হচ্ছে। এখনো যদি তওবা কর (এবং সুদ ছেড়ে দাও) তাহলে আসল ফেরত পাবার হকদার হবে। যুলুম তোমরা করো না, তাহলে তোমাদের উপরও যুলুম করা হবে না।"

–(সূরা আল বাকারা : ২৭৮-২৭৯)

এ নির্দেশাবলী ঐ অতিরিক্তটুকু ছেড়ে দেয়ার জন্যে, যা সে সময়ে ঋণ-দাতাগণ খাতকের কাছে পাওনা ছিল। এজন্য তার সম্পর্ক অনিবার্যভাবে সেই ধরনের ঋণের সাথেই ছিল।

চার : আপনি ঠিকই বলেছেন যে, আপনার নিকটে এমন কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই যে, সে সময়ে কোনো ব্যক্তি ঋণ নিয়ে ব্যবসা করতো। অথবা ব্যবসাকালীন কোনো ব্যবসায়ী অন্য ব্যবসায়ীর কাছে কিংবা কোনো সুদী মহাজনের কাছে ঋণ যে করতো না তারও কোনো প্রমাণ নেই। কিন্তু আমি আমার পূর্বের পত্রগুলোতে যেসব সুত্রের উল্লেখ করেছি তার থেকে স্পষ্টই এ ধারণা জন্মে যে, সে সময়ে এ ধরনের ঋণের প্রচলন ছিল না। আমার দৃষ্টিভংগী এই যে, সুদগ্রহণকারীর জন্যে যেরূপ কঠোর শাস্তি নির্ধারিত করা হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে অতিরিক্ত গ্রহণের কোনো প্রকারকে 'রিবার' মধ্যে শামিল করা উচিত হবে না, যতক্ষণ না এ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, নবী করীম (স)-এর যমানায় তা 'রিবার' মধ্যে শামিল ছিল। পক্ষান্তরে আপনার দৃষ্টিভংগী মনে হয় এই যে, ধারণার ভিত্তিতে একে 'রিবার' মধ্যে গণ্য মনে করা উচিত। আর যতক্ষণ পর্যন্ত না একথার প্রমাণ পাওয়া যায় যে, এ ধরনের অতিরিক্ত গ্রহণের প্রচলন তখন ছিল না, ততক্ষণ তাকে 'রিবার' বহির্ভূত মনে করা চলবে না। সতর্কতা ও ধর্মভীরুতার জন্যে আপনি এ দৃষ্টিভংগী পোষণ করেন। কিন্তু আমার ভয় হয়, আপনার এ সতর্কতা পার্থিব ক্ষতির পরেও পারলৌকিক ক্ষতির কারণ না হয়। বর্তমান দুনিয়ায় বাণিজ্যিক সুদ ব্যতীত চলবার উপায় নেই। যে জাতি এর থেকে দূরে সরে থাকবে, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সে জাতি অন্যান্য জাতির তুলনায় হীন দুর্বল হয়ে পড়বে। আর এ ধরনের হীনতার প্রভাব যে তার আজাদীর উপরও পড়তে পারে তা আপনার অজানা থাকার কথা নয়। আল্লাহ তায়ালা নিশ্চয় এটা চান না যে, মুসলমান পদানত হয়ে থাক। সূরা আল মায়েদার لَاتُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ط এ আয়াতের

ব্যাখ্যায় আপনি আপনার তাফহীমুল কুরআনে বলেছেন ঃ "এ আয়াতে দুটো বিষয়ে এরশাদ করা হয়েছে। এক হচ্ছে এই যে, তোমরা স্বয়ং হালাল-হারাম নির্ধারণের মালিক-মোক্তার হয়ে যেয়ো না। হালাল ঐ বস্তু যা আল্লাহ হালাল করেছেন এবং হারাম উহাই যা তিনি হারাম করেছেন।" উপরন্তু আপনি ১০৪নং টীকায় বলেছেন যে, রসূলে করীম (স) প্রত্যেক মুসলমানকে তার নিজের উপরে কঠোরতা আরোপ করতে নিষেধ করেছেন। এজন্য এটা কি সংগত হবে না যে, যতক্ষণ না প্রমাণ পাওয়া যায় যে, বাণিজ্যিক সুদও (PRODUCTIVE INTEREST) 'রিবার' মধ্যে শামিল, তা শুধু ধারণার বশীভূত হয়ে হারাম বলে গণ্য করা চলবে না?

পাঁচ ঃ প্রভিডেন্ট ফাণ্ড থেকে যে সুদের টাকা আমি পেয়েছিলাম, অল্পদিন পরেই তা আমার এক বন্ধু ঋণ হিসেবে নিয়েছেন এবং এখনো ফেরত দেননি। ফেরত পাবার পর তা ইনশাআল্লাহ আপনার পরামর্শ অনুযায়ী নিজের জন্যে ব্যয় করবো না।

ছয় ঃ একটি অপ্রাসংগিক কথা আপনাকে বলতে চাই। আল্লাহ তায়ালা মদ ও জুয়া সম্পর্কে এরশাদ করেছেন ঃ اثمهما اكبر من نفعهما -এর অর্থ আপনি করেছেন "তার ক্ষতি লাভ থেকে অনেক বেশী।" অভিধান গ্রন্থগুলোতে اثم শব্দের অর্থ 'ক্ষতি' কোথাও দেখতে পাইনি। আমার অনুরোধ আপনার এ অর্থের সপক্ষে কোনো প্রমাণ গ্রন্থের উল্লেখ করলে কৃতার্থ হবো।

জবাব

আপনি যে বিষয়গুলোর দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সে সম্পর্কে কিছু বলার পূর্বে আমি বলতে চাই যে, আপনি আর একবার নতুন করে আসল প্রশ্নটি বুঝবার চেষ্টা করুন। আসল প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, কুরআন যে 'রিবা' হারাম করেছে, তার তাৎপর্য কি অথবা অন্য কথায় বলতে গেলে তার হারাম হবার কারণ কি। তা কি এই যে, একজন তার আসলের উপরে অতিরিক্ত করে অথবা তা কি এই যে, সে অপরের অভাব-অনটনের সুযোগে অবৈধভাবে লাভবান হয়? আমি প্রথমটিকে 'রিবার' তাৎপর্য ও হারাম হবার কারণ মনে করি। তার প্রমাণ সংক্ষেপে এই ঃ

এক ঃ কুরআন যে বস্তুকে হারাম ঘোষণা করছে, তার জন্যে যে পরিপূর্ণ শব্দ 'আর রিবা' (الربوا) ব্যবহার করছে। আরবী অভিধান অনুযায়ী তার অর্থ শুধু আধিক্য। অভাবগ্রস্তের নিকট থেকে অধিক নেয়া এ শব্দের অর্থের অন্তর্ভুক্ত নয়। অভাবহীন সচ্ছল ব্যক্তিকে ঋণ দিয়ে অথবা কোনো লাভজনক উদ্দেশ্যে

ঋণ দিয়ে অধিক ফেরত নিলেও আভিধানিক দিক দিয়ে এ আধিক্যের উপর 'আর রিবা' (الربوا) শব্দটি প্রযোজ্য হবে।

দুই ঃ কুরআন স্বয়ং 'রিবার' শব্দকে এমন কোনো বাধাধরা সংজ্ঞার দ্বারা সীমিত করে না। যার থেকে বুঝা যায় যে, সে ঐ 'রিবাকে' হারাম করতে চায়, যা কোনো অভাবগ্রস্তকে ঋণ দিয়ে আদায় করা হয় এবং ঐ 'রিবাকে' হারামের আওতার বাইরে রাখতে চায়, যা অভাবহীন লোককে অথবা লাভজনক কাজে ঋণ দিয়ে ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে আদায় করা হয়।

তিন ঃ আরববাসী ঋণের উপর মুনাফা এবং ব্যবসার মুনাফাকে সমান মনে করতো। তারা বলতো انما البيع مثل الربوا 'ব্যবসাতো সুদের মতোই'। কুরআন উভয় প্রকার মুনাফার পার্থক্য নির্ণয় করে পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, ব্যবসার মুনাফা হালাল এবং ঋণের মুনাফা হারাম। এর থেকে একথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, মুনাফা লাভের জন্যে ব্যবসা ও ব্যবসায় অংশীদার হওয়ার পথ উন্মুক্ত আছে। কিন্তু ঋণের আকারে টাকা খাটিয়ে মুনাফা করার পথ বন্ধ।

চার ঃ কুরআন لكم رءوس اموالكم (তোমাদের আসলটুকু ফেরত পাবার অধিকার আছে) বলে, একথাও পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, ঋণদাতা শুধু অতটুকু পাবার হকদার, যতটুকু সে দিয়েছে। তার অতিরিক্ত নেয়ার হকদার সে নয়। এখানে এ ব্যাপারেও কোন ইংগিত নেই যে, যাকে কোনো লাভজনক কাজে মাল বা টাকা দেয়া হবে, তার কাছ থেকে আসলের উপরে কিছু অতিরিক্ত নেয়ার অধিকার দাতার থাকবে।

পাঁচ ঃ অভিধান এবং কুরআনের পর প্রমাণের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলো সুন্নাহ, যার থেকে আল্লাহ তায়ালার হুকুমের অভিপ্রায় জানা যায়। এখানেও আমরা দেখছি যে, শুধু আধিক্যকে নিষিদ্ধকরণ আদেশের কারণ বলা হয়েছে। সে আধিক্য নয় যা আদায় করা হয় কোনো অভাবগ্রস্তকে ঋণ দিয়ে। হাদীসে পরিষ্কার বলা হয়েছে ঃ

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِّنْ وُّجُوْهِ الرِّبٰوا -(البيهقى)

"যে সকল ঋণ মুনাফা আকর্ষণ তা সুদের কারণগুলোর মধ্যে একটি (বায়হাকি) এবং كُلُّ قَرْضٍ جَرَّبِهٖ نَفْعًا فَهُوَ رِبٰوا "প্রত্যেক ঋণ দ্বারা যে মুনাফা লাভ করা হয় তা রিবা বা সুদ (মুসনাদে হারিস বিন উসামা।)"[১]

---

১. কেউ কেউ এ হাদীসটির সত্যতার প্রতি সন্দেহ পোষণ করেন। তাদের যুক্তি এই যে, তার সনদ (রাবী পরম্পরা) দুর্বল। কিন্তু যে মূলনীতি এ হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে, সকল ফকীহগণ সর্বসম্মতিক্রমে তা মেনে নিয়েছেন। বর্ণনার দিক দিয়ে তার সনদ দুর্বল হলেও এ সর্বস্বীকৃত হাদীসের বিষয়বস্তুকে জোরদার করে দেয়।

ছয় ঃ ঋণের উপরে গৃহীত সুদ হারাম করেই নবী (স) ক্ষান্ত হননি। বরঞ্চ নগদ আদান-প্রদানের ব্যাপারেও একই প্রকার বস্তুর বিনিময়ে অতিরিক্ত গ্রহণ হারাম করেছেন। আর এ সত্য কথা যে, এতে অভাবগ্রস্ততার কোনো প্রশ্নই থাকতে পারে না। এর থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় যে, নবী (স) আল্লাহ্ তায়ালার আদেশের যে অভিপ্রায় উপলব্ধি করেছিলেন—তা নিশ্চতরূপে এই ছিল যে, ঋণ দিয়ে অতিরিক্ত গ্রহণকে তিনি হারাম করতে চান। উক্ত প্রবণতা বন্ধ করার জন্যে নবী (স) নগদ লেনদেনের মধ্যেও অতিরিক্ত গ্রহণ নিষিদ্ধ করেছেন।

সাত ঃ মুসলিম জাতির সকল ফকীহ্গণ সর্বসম্মতিক্রমে এ আদেশের অভিপ্রায় এই বুঝেছিলেন যে, ঋণের ব্যাপারে আসলের উপরে অতিরিক্ত যা কিছুই নেয়া হোক না কেন, তা হারাম। ঋণগ্রহণকারী তার ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূরণের জন্যে সে ঋণগ্রহণ করুক অথবা কোনো লাভজনক কাজে তা বিনিয়োগ করুক তাতে কিছু আসে যায় না।

هو فى الشرع الزيادة على اصل المال من غير عقد تبايع -

"শরীয়তের পরিভাষায় 'রিবা'র (সুদ) অর্থ হচ্ছে উভয় পক্ষের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় ব্যতীত আসলের উপর অতিরিক্ত গ্রহণ।"–(নেহায়া, ইবনে কাছির)

এ সংজ্ঞা অনুযায়ী সকল ফকীহ্গণ ঐ ধরনের মুনাফা গ্রহণকে হারাম বলে অভিহিত করেন, যা ঋণদাতা গ্রহীতার নিকট থেকে গ্রহণ করে।

এ কারণগুলোকে উপেক্ষা করে আপনি বলছেন যে, শুধুমাত্র ঐসব ঋণের উপরে সুদ হারাম হবে যা কোনো অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি তার অভাব পূরণের জন্যে নিয়ে থাকে এবং লাভজনক কাজে খাটাবার জন্যে যে ঋণ নেয়া হয় তার উপর সুদ হারাম হবে না। যার উপর ভিত্তি করে আপনি এসব কথা বলছেন, তাহলো এই যে, আপনার মতে কুরআন নাযিল হবার সময় আরবে শুধু প্রথম প্রকারের ঋণেরই প্রচলন ছিল এবং দ্বিতীয় প্রকারের ঋণের প্রচলন দুনিয়ায় অনেক পরে হয়েছে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর বিশদ ও সন্তোষজনক জবাব দিয়েছেন, ততক্ষণ আপনার এ অভিমত মেনে নেয়া যেতে পারে না।

এক ঃ আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রসূল ঋণসমূহের মধ্যে লাভজনক ও অলাভজনক ঋণের পার্থক্য নির্ণয় করে সুস্পষ্টভাবে অথবা আকারে-ইংগিতেও কি সুদের অবৈধতা প্রথম প্রকারের মধ্যে সীমিত করেছেন এবং দ্বিতীয় প্রকারকে অবৈধতা বা হারামের বহির্ভূত করে রেখেছেন ? যদি তা করে থাকেন, তাহলে

তার প্রমাণ থাকতে হবে। কারণ হারামের নির্দেশ যিনি দিয়েছেন, হারাম বহির্ভূত করার অধিকারও তাঁর। তাঁর কোনোরূপ ইংগিত ব্যতিরেকে হালাল-হারামের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার কোনো অধিকার আমাদের অথবা আপনার নেই। এ ব্যাপারে আপনি সম্ভবত এ যুক্তিই দেখাবেন যে, যেহেতু সে সময়ে শুধুমাত্র অলাভজনক ঋণের উপরে সুদ গ্রহণ করার প্রচলন ছিল সে জন্যে আল্লাহ তায়ালার হারাম করার নির্দেশ তার সাথেই সম্পর্কিত বুঝতে হবে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না একথা ধরে নেয়া যায় যে, মানবীয় ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের জ্ঞান শুধু কুরআন নাযিলের সময়ে প্রচলিত ব্যাপার পর্যন্তই সীমিত ছিল এবং ভবিষ্যতে কি কি ঘটবে সে সম্পর্কে তাঁদের কোনো জ্ঞান ছিল না, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার এ যুক্তি চলতে পারে না। উপরন্তু বলতে হয় যে, ইসলাম শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট সময়-কাল পর্যন্তই পথপ্রদর্শন করতে পারে। শাশ্বত পথপ্রদর্শক নয়। আপনার যুক্তির মূলে যদি এরূপ ধারণা করা না হয়ে থাকে, তাহলে আপনাকে স্বীকার করতেই হবে যে, লেনদেন ও কায়কারবারের সে সব প্রকার পদ্ধতিও আল্লাহ তায়ালার দৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত ছিল যা পরবর্তীকালে সংঘটিত হবে। আপনি যখন একথা মেনে নেবেন, তখন তার সাথে একথাও স্বীকার করে নিতে হবে যে, আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা যদি এই হতো যে, তিনি সুদের অবৈধতা শুধুমাত্র অলাভজনক ঋণের উপরেই সীমাবদ্ধ রাখবেন। তাহলে তিনি কোনো না কোনোভাবে নিশ্চয়ই তাঁর সে ইচ্ছা প্রকাশ করতেন এবং তাঁর রসূলও এ ইচ্ছাকে এতটা সুস্পষ্ট করে বলে দিতেন যে, সুদের অবৈধতার নির্দেশ সকল প্রকার ঋণের উপর প্রযোজ্য হতে পারতো না।

দুই ঃ দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, আরবে শুধু যে অভাবগ্রস্ত লোকই ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ করতো এবং কেউ ব্যবসার জন্যে অথবা কোনো লাভজনক কাজে খাটাবার জন্যে ঋণ নিত না এর কোনো প্রমাণ কি আপনার কাছে আছে? পৃথিবীতে লাভজনক কাজের জন্যে ঋণ করে পুঁজি সংগ্রহ করার রীতি অনেক পরে প্রচলিত হয়েছে—শুধু একথা এমন সিদ্ধান্ত করার জন্যে যথেষ্ট প্রমাণ নয় যে, প্রথমে কোনো ব্যক্তি ব্যবসা করার পূর্বে অথবা ব্যবসা চলাকালীন অবস্থায় কখনো ব্যবসার উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণ করতো না। আপনি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মীমাংসা করতে বসেছেন। আল্লাহ তায়ালার একটি নির্দেশ থেকে কোনো কিছুকে বহির্ভূত করে রাখা সহজ কাজ নয়। এর জন্যে আপনি যে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন তার চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী যুক্তির প্রয়োজন। একথা প্রমাণ করার দায়িত্ব আমাদের নয় যে, আরবের লোক সে সময়ে ব্যবসার জন্যে ঋণ গ্রহণ করতো। বরঞ্চ একথা প্রমাণ করার দায়িত্ব আপনার যে, সে সময়ে ব্যবসার জন্যে কেউ ঋণ গ্রহণ করতো না। এটা এজন্য যে, ব্যতিক্রমের দাবী

আপনি করছেন। তার জন্যে আপনি আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের কোনো ইংগিত অথবা ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করছেন না। বরঞ্চ আপনার যুক্তির ভিত্তি হচ্ছে এই যে, আরবে সে সময়ে 'রিবা' বা সুদ শুধু অলাভজনক কাজের উদ্দেশ্যে গৃহীত ঋণের উপরেই প্রযোজ্য হতো।

এখন আমি আপনার উত্থাপিত বিষয়গুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দিচ্ছি। 'রিবা'র মর্ম নির্ধারণ করতে এবং তা হারাম করার কারণ অবগত হবার জন্যে আমরা শুধু সেসব কায়কারবারের প্রকার পদ্ধতির উপরেই নির্ভর করছি না যা তখন আরবে প্রচলিত ছিল। বরঞ্চ ভাষাতত্ত্ব, কুরআনের বর্ণনা, হাদীস, মুসলিম ফকীহগণের ব্যাখ্যা হচ্ছে তার প্রকৃত উৎস। উপরন্তু আর একটি জিনিস এ ব্যাপারে সাহায্য করে এবং তা হচ্ছে এই যে, সে সময়ে যেসব ব্যাপারে 'রিবা' প্রযোজ্য হতো, তার মধ্যে সর্ব সাধারণের কল্যাণের জন্যে কিছু আছে কিনা তা অবগত হওয়া যাক।

আপনি বলছেন যে, তাদের মধ্যে সাধারণ বস্তু শুধু আসলের উপরে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করাই ছিল না, বরঞ্চ এই সাধারণ বস্তুটি ছিল এই যে, এ অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা হতো অভাবগ্রস্তদেরকে তাদের প্রয়োজনে ঋণদান করে। কিন্তু প্রথমত খোদার নির্দেশের কারণ নির্ধারণ করার জন্যে এটাকে নির্ভরযোগ্য বলে গ্রহণ করা যেতে পারে না যে, না কুরআন এর দিকে কোনো ইংগিত করেছে আর না সুন্নাতে এমন কোনো বস্তু পাওয়া যায়, যার উপর নির্ভর করে এরূপ ধরে নেয়া যেতে পারে যে, শুধু অভাবগ্রস্তদের নিকট থেকে অতিরিক্ত নেয়াটাই হারাম হবার কারণ। দ্বিতীয়ত আমরা স্বীকার করি না যে, সে সময়ে ঋণ গ্রহণের ব্যাপার শুধু ঐ ধরনেই সীমাবদ্ধ ছিল। আরবদের ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়াদি সম্পর্কে আমাদের বিশদভাবে জানা নেই যে, ঋণের পুঁজিতে তখন ব্যবসা চলতো, না ব্যবসায়ে মোটেই ঋণের কোনো লেশমাত্র ছিল না। এজন্য কোনো বিবরণের উপর আমরা এবং আপনি আমাদের আলোচনার ভিত্তিস্থাপন করতে পারি না। কিন্তু এ এক সাধারণ জ্ঞানের কথা এবং দুনিয়ার সাধারণ ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে অভিজ্ঞ কোনো ব্যক্তিই একথা অস্বীকার করতে পারে না যে, ব্যবসায় ঋণের পুঁজিকে ভিত্তিরূপে ব্যবহার করার প্রথা পরবর্তীকালে শুরু হলেও ব্যবসায়ীদের কারবার চলাকালে একে অপরের নিকট থেকে এবং মহাজনের নিকট থেকে ঋণ নেয়ার প্রয়োজন পূর্বেও হতো। তাছাড়া খুচরা ব্যবসায়ী পাইকারী ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে বাকীতে মাল পূর্বেও নিতো। আরববাসীদের সম্পর্কে এ ধরনের কোনো লিখিত বিবরণ বিদ্যমান না থাকলেও, দুনিয়ার অন্যান্য দেশ সম্পর্কে এ ধরনের বিবরণ কুরআন নাযিলের

শত শত, হাজার হাজার বছর পূর্বেরও পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক দিক দিয়ে এ দাবী করা যেতে পারে না যে, পূর্বের যুগে ব্যবসা সংক্রান্ত কারবার ঋণের উপাদান থেকে একেবারে মুক্ত থাকতো।[১]

আপনার ধারণা এই যে, সুদের ব্যাপারে ক্ষতিকর সাধারণ গুণ শুধু অভাবগ্রস্ত লোককে তার ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূরণের জন্যে ঋণ দিয়ে তাদের কাছ থেকে উৎপীড়নমূলক হারে সুদ নির্ধারণ করা। কিন্তু আমাদের কাছে এই একটি মাত্র ক্ষতিকারক সাধারণ গুণ এতে নেই। কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান শুধু টাকা ঋণ দিয়ে নিজেদের জন্যে একটি নির্দিষ্ট লাভের নিশ্চয়তা লাভ করবে—এটাও একটি ক্ষতিকারক গুণ। আর যেসব লোক এ টাকার সাহায্যে নিজের শ্রম, যোগ্যতা ও মস্তিষ্ক খাটিয়ে মুনাফা লাভের চেষ্টা করবে, তাদের জন্যে নির্দিষ্ট মুনাফা তো দূরের কথা, কোনো মুনাফা লাভেরই নিশ্চয়তা থাকবে না। কুরআন মজীদ যে নিয়ম বলে দেয় তা হচ্ছে এই যে, ঋণ হিসেবে যদি তুমি কাউকে কিছু মাল দাও, তাহলে আসলের উপরে অতিরিক্ত কিছু নেয়ার অধিকার তোমার নেই, আর যদি ব্যবসায়ে মুনাফা লাভ করতে চাও, তাহলে সোজাসোজিভাবে স্বয়ং সরাসরি ব্যবসা কর, অথবা ব্যবসায় অংশীদার হয়ে যাও। কুরআনের এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই ইসলামে অংশীদারিত্ব জায়েয এবং সুদ নাজায়েয করা হয়েছে।

ذروا مابقى من الربوا (সুদের যার কিছু বাকী আছে তা ছেড়ে দাও) এর দ্বারা আপনি যে যুক্তি দিয়েছেন, তা ঠিক নয়। এ শুধু সে সময়ের জন্যে একটি সাময়িক নির্দেশ ছিল না। বরঞ্চ কুরআনের অন্যান্য নির্দেশাবলীর ন্যায় এ ছিল একটি চিরন্তন বিধান। যখন এবং যেখানেই কোনো ব্যক্তি ঈমান আনবে, তার উপরে এ বিধান প্রযোজ্য হবে। কারো কাছে তার প্রদত্ত ঋণের যদি সুদ পাওনা থাকে, তাহলে তার দাবী ছেড়ে দিতে হবে এবং নিজের দেয়া মূলধন ফেরত পাবার উপরেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। উপরন্তু এ আয়াতের দ্বারা আপনার যুক্তি প্রদর্শন আপনার এ দাবীর উপর প্রতিষ্ঠিত যে, সে সময়ের সকল প্রকারের ঋণ ব্যবসায় সংক্রান্ত সুদ থেকে মুক্ত ছিল। এ দাবী স্বয়ং প্রমাণ সাপেক্ষ। একে কি করে প্রমাণ রূপে উপস্থাপিত করা যেতে পারে? যে ধরনের ঋণের কথা আপনি বার বার উল্লেখ করছেন, তা শুধু ব্যক্তিগত ধরনের ঋণই হতে পারতো। তার মধ্যে এ সম্ভাবনাও আছে যে, একজন ছোট ব্যবসায়ী কোনো বড় ব্যবসায়ীর নিকট থেকে ধারে মাল নিয়ে যেতো এবং বড় ব্যবসায়ী তার মালের আসল মূল্যের উপরে সুদও নির্ধারিত করে দিত। তারপর সে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে

১. বিশদ বিবরণের জন্যে পরিশিষ্ট দুই দ্রষ্টব্য।

মূল্য পরিশোধ করতে না পারলে, সে (বড় ব্যবসায়ী) মাল গ্রহীতাকে অধিক অবকাশ দিয়ে সুদের মাত্রাও বাড়িয়ে দিতো। এ ধরনের সুদের বকেয়া ذروا مابقي من الربوا -এর হুকুমের আওতায় পড়ে। আপনার কাছে এমন কি প্রমাণ আছে যে, ঐ বকেয়াগুলোর মধ্যে এ ধরনের বকেয়া শামিল ছিল না?

আমার মতে বাণিজ্যিক সুদের হুকুম 'রিবা'র অধীনে আনা না আনার ভিত্তি যদি শুধু ধারণার উপরেই হয় (যদিও প্রকৃত তা নয়) তথাপি ধারণার উপরে ভিত্তি করে একটি সম্ভাব্য হারামকে হালাল করে দেয়া, তাকে হারাম বলে স্বীকার করে নিয়ে তার থেকে দূরে সরে থাকার চেয়ে অধিকতর বিপজ্জনক। হাদীসের নির্দেশ অতি সুস্পষ্ট যে, دعوا الربوا والريبه –সুদ ছেড়ে দাও এবং সে বস্তুও ছেড়ে দাও, যার মধ্যে সুদ আছে বলে সন্দেহ হয়। একথা আমি শুধু আপনার ঐ কথার উত্তরে বলছি যে, বাণিজ্যিক সুদ হারাম করার ভিত্তি শুধু ধারণা মাত্র। নতুবা এই যে, অকাট্য হারাম এবং এর হারাম হবার ভিত্তি শুধুমাত্র যে ধারণা নয়, বরঞ্চ কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট নির্দেশ, তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই।

আমি একথা জানতে পেরে আনন্দিত হয়েছি যে, আপনি নিজে আপনার প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের সুদের ব্যাপারে আমার পরামর্শ মেনে নিয়েছেন। আশা করা যায় যে, অন্ততপক্ষে আপনি সন্দেহজনক মাল দ্বারা উপকৃত হওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করবেন। খোদা করুন, আপনি অপরের জন্যে একে হালাল করার চিন্তা পরিত্যাগ করবেন এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রে আপনার যে অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতা লাভ হয়েছে, তাকে একটি সুদহীন অর্থনীতি গঠন করার জন্যে ব্যবহার করবেন।

আপনার শেষ প্রশ্নের জবাব এই যে, আমি (اثم) শব্দের অর্থ نفع (লাভ) শব্দের মুকাবিলায় গোনাহের পরিবর্তে ক্ষতি অর্থ করেছি। ভাষার দিক দিয়ে এটা ভুলও নয়। কারণ اثم শব্দের প্রকৃত অর্থ বাঞ্ছিত মংগল লাভে অক্ষম হওয়া। এ অর্থের দিক দিয়ে আরববাসীগণ বলে থাকে اثمت الناقة -উটনী মন্থর গতি হয়েছে। যে দ্রুতগতি তার থেকে আশা করা হয়েছিল তাতে সে অক্ষমতা দেখিয়েছে।–(তর্জুমানুল কুরআন–মহররম-সফর, ১৩৭৭ হিঃ অক্টোবর নভেম্বর, ১৯৫৭ খৃঃ)

পরিশিষ্ট ঃ দুই

ইসলামী সংস্কৃতি সংস্থার প্রশ্নমালা ও তার জবাব

(১৯৬০ সালের প্রথম দিকে লাহোরের ইসলামী সংস্কৃতি সংস্থা একটি আলোচনা সভার আয়োজন করে। এতে সুদ সম্পর্কিত কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আলোচিত হয়। এ উদ্দেশ্যে সংস্থা একটি প্রশ্নমালা প্রণয়ন করে, যার মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সন্নিবেশিত ছিল। এ প্রশ্নমালা এবং গ্রন্থকার কর্তৃক প্রদত্ত জবাব এখানে লিপিবদ্ধ করা হলো।)

প্রশ্নমালা

এক ঃ আরবে নবী (স)-এর যমানায় ঋণের আদান-প্রদান কিভাবে হতো?

দুই ঃ 'রিবা' (ربوا) শব্দের অর্থ কি ?

তিন ঃ 'রিবা' এবং রাবাহ (লাভ)-এর মধ্যে পার্থক্য।

চার ঃ 'রিবা'তে ঋণদাতা শর্ত নির্ধারিত করে এবং ব্যাংকের সুদে (BANK INTEREST) ঋণগ্রহীতা শর্ত পেশ করে।

পাঁচ ঃ বায়-এ-সালাম (بيع سلم) ও ব্যবসায় সংক্রান্ত সুদের (COMMERCIAL INTEREST) মধ্যে পার্থক্য কি ? এক ব্যক্তি দশ সের দুগ্ধ প্রদানকারিণী একটি মহিষ অপর এক ব্যক্তিকে দিয়ে বলল, এর দুধের মধ্যে পাঁচ সের করে আমাকে দিতে থাকবে। এ যদি জায়েয হয়, তাহলে এর এবং লাভের উপর টাকা ঋণ দেয়ার মধ্যে পার্থক্য কি ?

ছয় ঃ সমশ্রেণীর বস্তুর বিনিময় সমশ্রেণীর আধিক্যসহ কেন নাজায়েয, যখন আধিক্যসহ অসমশ্রেণীর বস্তুর বিনিময় জায়েয ?

সাত ঃ ব্যবসায়ে উভয় পক্ষের সম্মতি অপরিহার্য কিনা ? কারো কারো মতে উভয় পক্ষের সম্মতির অভাবই সুদ সৃষ্টি করে। ক্ষতির কোনো প্রশ্নই ওঠে না। সুদ হারাম হবার ভিত্তি কি এই যে, এতে এক পক্ষের উপর যুলুম করা হয় ? ব্যবসায় সংক্রান্ত সুদে কোনো পক্ষের উপরই যুলুম হয় না। যদি একথা ঠিক হয় যে, কোনো পক্ষের উপরই যুলুম হয় না, তাহলে ব্যাংকের সুদ 'রিবা'র আওতায় কিভাবে পড়ে ?

আট ঃ (ক) শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাধারণ অংশ

(খ) তার অগ্রগণ্য অংশ (PREFERENCE SHARES)

(গ) ব্যাংকের ফিকস্‌ট ডিপোজিট।

(ঘ) ব্যাংকের দায়পত্র (LETTER OF CREDIT) খোলা, তার বিভিন্নতা। যদি লেটার অব ক্রেডিটের ভিত্তিতে ব্যবসায়ের জন্যে ঋণ গ্রহণ অবৈধ হয়, তাহলে এর জন্যে বৈধ পন্থা কি হতে পারে, যাতে করে ব্যবসার ব্যবস্থাপনায় কোনো অসুবিধা বা ক্ষতি না হয়?

(ঙ) হাউজ বিল্ডিং, ফিনান্স কর্পোরেশন এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন।

(চ) সরকারের ঋণ-আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক, যদি এসব অবৈধ হয় তাহলে দেশের শাসনতন্ত্র পরিচালনার বিকল্প ব্যবস্থা কি হতে পারে?

জবাব ঃ প্রথম প্রশ্ন

প্রথম প্রশ্নে কতকগুলো ব্যাখ্যামূলক বিষয় রয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ

এক ঃ কুরআন নাযিলের সময় ব্যবসা, শিল্প, কৃষি ও রাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্যে ঋণের আদান-প্রদান দুনিয়ায় প্রচলিত ছিল কিনা?

দুই ঃ এসব ঋণের উপরে সুদ গ্রহণ করা হতো কিনা?

তিন ঃ এসব উদ্দেশ্যে ঋণের আদান-প্রদান ছিল একথা আরববাসীদের পুরোপুরি জানা ছিল কিনা?

চার ঃ এ ধরনের ঋণ আসলের উপরে অতিরিক্ত যাকিছু নেয়া হতো তার জন্যে কি 'রিবা'র পরিভাষা ব্যবহৃত হতো, না তার জন্যে অন্য কোনো শব্দ ব্যবহার করা হতো?

এ ব্যাখ্যামূলক বিষয়াদির আলোচনা করার পূর্বে প্রাক-ইসলামী যুগের আরবের অর্থনৈতিক ইতিহাস এবং বহির্জগতের সাথে তার সম্পর্ক কি ছিল তা আমাদেরকে দেখতে হবে, যাতে করে এ ভুল ধারণা রয়ে না যায় যে, আরব পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন একটি দেশমাত্র ছিল, যার অধিবাসীবৃন্দ তাদের উপত্যকা ও মরুভূমির বাইরের জগত সম্পর্কে কোনো আভাসই রাখতো না।

প্রাচীন ইতিহাসের যেসব উপাদান বর্তমান বিশ্বে বিদ্যমান আছে, তার থেকে একথা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, সে যুগে চীন, ভারত, প্রাচ্যের অন্যান্য দেশগুলোর এবং অনুরূপভাবে পূর্ব আফ্রিকার যত ব্যবসা-বাণিজ্য মিসর, সিরিয়া, এশিয়া মাইনর, রোম ও গ্রীসের সাথে চলতো তার সবই আরবের মধ্যস্থতায়ই হতো, এসব ব্যবসা-বাণিজ্যের তিনটি বড় বড় পথ ছিল, এক ঃ ইরান থেকে স্থল পথে ইরান ও সিরিয়া হয়ে, দুই ঃ পারস্য উপসাগর থেকে সমুদ্র পথে। এ পথের সমুদয় পণ্যদ্রব্য আরবের পূর্ব উপকূলে অবতরণ

করতো। এবং দুমাতুল জন্দল অথবা তাদমুর (PALMYRA) হয়ে অগ্রসর হতো। তিন ঃ তৃতীয় পথ ছিল ভারত মহাসাগর দিয়ে। এ পথে যাতায়াতকারী যাবতীয় পণ্যদ্রব্য হাদারামাওত ও ইয়ামান হয়ে অতিক্রম করতো। এ তিনটি পথেই আরবগণ বসবাস করতো। স্বয়ং আরববাসীগণ এক দিক থেকে পণ্য খরিদ করে অন্যদিকে গিয়ে বিক্রি করতো। পরিবহনের কাজও সমাধা করতো তারাই। উপরন্তু নিজেদের এলাকা দিয়ে অতিক্রমকারী বাণিজ্য বহর বা কাফেলার নিকট থেকে মোটা কর আদায় করে তাদের নিরাপদে যাতায়াতের দায়িত্বও তারা গ্রহণ করতো। এ তিন উপায়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাথে সর্বদা তাদের গভীর সম্পর্ক বিরাজমান ছিল। খৃস্টপূর্ব ২৭০০ সাল থেকে ইয়ামান ও মিসরের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্কের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। খৃস্টপূর্ব ১৭০০ সালে বনী ইসরাঈলের বাণিজ্য বহরের তৎপরতার বিবরণ তওরাতে পাওয়া যায়। উত্তর হেজাজে মাদ্য়ান এবং দেদানের ব্যবসা-বাণিজ্য খৃস্টের দেড় হাজার বছর পূর্ব থেকে কয়েক শতাব্দী পর পর্যন্ত চলতো বলে জানা যায়। হযরত সুলায়মান (আ) এবং হযরত দাউদ (আ)-এর যমানা (খৃঃ পূঃ ১০০০) থেকে ইয়ামানের সাবায়ী গোত্র এবং তাদের পরে হোমায়রী গোত্র খৃস্টীয় প্রথম কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত ক্রমাগতভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়ে আসছিল। হযরত ঈসা (আ)-এর নিকটবর্তী সময়কালে ফিলিস্তিনের ইয়াহুদীগণ আরবদেশে এসে ইয়াস্‌রিব, খয়বর, ওয়াদিউল কুরা (বর্তমান আলউলা), তাইমা এবং তবুকে বসবাস শুরু করে, তাদের স্থায়ী সম্পর্ক ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক—সিরিয়া, ফিলিস্তিন ও মিসরের সাথে অক্ষুণ্ন থাকে। সিরিয়া ও মিসর থেকে খাদ্যশস্য এবং মদ আরবে আমদানীর কাজ ইয়াহুদীগণই করতো। পঞ্চম খৃস্টীয় শতাব্দী থেকে কুরাইশগণ আরবের বৈদেশিক বাণিজ্যে অধিকতর অংশ গ্রহণ শুরু করে এবং নবী (স)-এর যমানা পর্যন্ত একদিকে ইয়ামান ও আবিসিনিয়ার সাথে এবং অপরদিকে ইরাক, মিসর ও সিরিয়ার সাথে তাদের বিরাট আকারে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। পূর্ব আরবে ইরানের যত ব্যবসা-বাণিজ্য ইয়ামানের সাথে চলতো, তার বৃহত্তর অংশ হীরা থেকে ইয়ামামা (বর্তমান রিয়াদ) এবং অতপর বনী তামীমের এলাকা অতিক্রম করে নাজরান এবং ইয়ামান পর্যন্ত পৌঁছাতো। শত শত বৎসরের এ ধরনের বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকার পর একথা মনে করা সম্পূর্ণ অসংগত হবে যে, বহির্বিশ্বের এসব দেশে যে আর্থিক লেনদেন ও বাণিজ্যিক প্রথা প্রচলিত ছিল সে সম্পর্কে আরববাসীগণ অজ্ঞ ছিল।

এসব বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছাড়াও রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়েও চতুষ্পার্শ্বস্থ সুসভ্য জগতের সাথে আরববাসীদের গভীর সম্পর্ক ছিল। খৃস্টপূর্ব

ষষ্ঠ শতাব্দীতে উত্তর হেজাজে তাইমা নামক স্থানটিকে বাবেলের বাদশাহ নেবুনিদুস (NABONIDUS) তাঁর গ্রীষ্মাবাসে পরিণত করেন। এটা কি করে সম্ভব যে, বাবেলে যে অর্থনৈতিক আইন-কানুন ও রীতিনীতি প্রচলিত ছিল, সে সম্পর্কে হেজাজের লোক অভিহিত ছিল না ? খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী থেকে আরম্ভ করে নবী করীম (স)-এর সময়-কাল পর্যন্ত প্রথমত পেট্রার (PETRA) নাবতী রাষ্ট্র, তারপর তাদমুরের সিরীয় রাষ্ট্র এবং পরবর্তীকালে হীরা ও গাস্সানের রাষ্ট্রদ্বয় ইরাক থেকে মিসর সীমান্ত পর্যন্ত এবং হেজায ও নজদ সিমান্ত থেকে আলজিরিয়া ও সিরিয়ার সিমান্ত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিল। এসব রাষ্ট্রের একদিকে গ্রীস ও রোমের সাথে এবং অপরদিকে ইরানের সাথে ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক, তামাদ্দুনিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিল। তারপর বংশগত সম্পর্কের ভিত্তিতে আরবের আভ্যন্তরীণ গোত্রগুলোও তাদের সাথে ব্যাপক সম্পর্ক রাখতো। মদীনার আনসারগণ এবং গাস্সানের শাসক একই বংশভুক্ত এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল। নবী করীম (স)-এর সময়ে স্বয়ং তাঁর কবি হাসান বিন সাবিত গাস্সানের শাসনকর্তাদের নিকটে যাতায়াত করতেন। হীরার শাসকদের সাথে কুরাইশদের অতি ঘনিষ্ঠতা ছিল। এমন কি কুরাইশদের লোকেরা তাদের কাছেই লেখা-পড়া শিক্ষা করে। হীরা থেকেই তারা আরবী লিখন পদ্ধতি শিক্ষা করেছিল যা পরবর্তীকালে কুফী লিখন পদ্ধতি নামে পরিচিত। এখন কিভাবে একথা বিশ্বাস করা যায় যে, এসব সম্পর্ক সম্বন্ধ থাকা সত্ত্বেও এরা গ্রীস, রোম, মিসর, সিরিয়া, ইরাক ও ইরানের আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিষয়াদি সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল।

উপরন্তু আরবের সকল এলাকায় শায়খ, সম্ভ্রান্ত ও বড় বড় ব্যবসায়ীদের নিকটে বহুসংখ্যক রোমীয়, গ্রীক এবং ইরানী ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী থাকতো। ইরান ও রোমীয়দের মধ্যে যুদ্ধে উভয় পক্ষের যুদ্ধবন্দীকে গোলামে পরিণত করা হতো। এদের মধ্যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত বহুসংখ্যক ক্রীতদাসকে খোলা বাজারে বিক্রি করা হতো এবং আরব এ দাসব্যবসায়ের বিরাট বাজারগুলোর অন্যতম বাজার ছিল। এসব ক্রীতদাসের মধ্যে অনেক উচ্চশিক্ষিত সুসভ্য লোকও থাকতো। তাদের মধ্যে ব্যবসায়ী এবং শিল্প ব্যবসায়ীও থাকতো। আরবের শায়খ এবং ব্যবসায়ীগণ এদের দ্বারা বহু কাজ করিয়ে নিতো। মক্কা, তায়েফ, ইয়াসরিব এবং অন্যান্য কেন্দ্রগুলোতে এ ধরনের বহু ক্রীতদাস বসবাস করতো। তারা কারীগর হিসেবে এবং ব্যবসা ক্ষেত্রে কর্মী হিসেবে তাদের প্রভুদের সেবা করতো। অতএব এ কি করে সম্ভব যে, এসব অধীন কর্মচারীদের মাধ্যমে আরব ব্যবসায়ীর কানে একথা কখনো পৌঁছায়নি যে, পার্শ্ববর্তী দুনিয়ার অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে কোনো রীতি-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল ?

এর সাথে আরবদের অর্থনৈতিক ইতিহাসের আর একটি দিকও লক্ষ্য করা প্রয়োজন। আরব কোনো কালেই খাদ্যের দিক দিয়ে স্বয়ং সম্পূর্ণ ছিল না এবং সেখানে এমন কোনো শিল্প-কারখানাও গড়ে ওঠেনি, যার দ্বারা সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দেশের মধ্যে থেকেই সংগ্রহ করা যেতো। এ দেশে খাদ্য এবং শিল্পজাত দ্রব্যাদি সর্বদা বহির্দেশ থেকে আমদানী করা হতো। এমন কি পরিধানের বস্ত্রাদি পর্যন্ত বাইরে থেকে আনা হতো। নবী করীম (স)-এর নিকটবর্তী কালে এ আমদানী ব্যবসায় দু শ্রেণীর লোকের হাতে ছিল। এক. কুরাইশ ও সাকীফ এবং দুই. ইয়াহুদী। কিন্তু এরা মাল আমদানী করে কেবলমাত্র পাইকারী বিক্রি করতো। দেশের অভ্যন্তরে ছোট ছোট পল্লী ও গোত্রগুলোর মধ্যে খুচরা বিক্রির কাজ তাদের ছিল না। তা সম্ভবও ছিল না। আর গোত্রগুলো কখনোও এটা পছন্দ করতো না যে, ব্যবসায় যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা শুধু তারাই ভোগ করবে এবং তাদের আপন লোকদের এ ব্যবসায় ইজারাদারীতে প্রবেশ করার কোনোই পথ থাকবে না। এজন্য পাইকারী বিক্রেতা হিসেবে তারা দেশের অভ্যন্তরে খুচরা বিক্রেতা ব্যবসায়ীদের কাছে লাখো লাখো টাকার মাল বিক্রি করতো। এসবের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ধারেও বিক্রি করা হতো। সম্ভবত দুনিয়ার কোথাও পাইকারী বিক্রেতা ও খুচরা বিক্রেতার মধ্যে নগদ লেনদেনের প্রথা প্রচলিত ছিল না। এ লেনদেনে ধার দেয়া-নেয়া ছিল একেবারে অপরিহার্য যার থেকে গত্যন্তর ছিল না। যদি এরূপ দাবী করা হয় যে, শুধু আরবেই লেনদেন নগদ নগদ প্রদানের শর্তেই হতো এবং বাকী বা ঋণের কোনো রীতিই ছিল না, তাহলে জ্ঞান-বিবেকের দিক দিয়ে তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। ইতিহাসের নিরিখেও তা হবে ভুল, যে বিষয়ে আমি সামনে আলোচনা করবো।

এখন আমি পূর্বের উল্লিখিত ব্যাখ্যায় আসছি।

একথা ইতিহাস থেকে প্রমাণিত আছে যে, প্রাচীন কালে ঋণ শুধু ব্যক্তিগত প্রয়োজনেই নেয়া হতো না। বরঞ্চ ব্যবসা, শিল্প ও কৃষির উদ্দেশ্যেও এ ঋণের প্রথা প্রচলিত ছিল। রাষ্ট্রগুলোও তাদের রাষ্ট্রীয় স্বার্থে ঋণ গ্রহণ করতো। এ দাবী ভিত্তিহীন যে, প্রাচীন জগতে ঋণের লেনদেন শুধুমাত্র ব্যক্তিগত প্রয়োজনেই হতো। একথাও প্রমাণিত আছে যে, ঋণের উপরে আসল থেকে অতিরিক্ত একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ অথবা মাল গ্রহণের প্রথাও ছিল। ব্যক্তিগত প্রয়োজনে অথবা ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে গৃহীত ঋণের মধ্যে কোনো তারতম্য না করে এ অতিরিক্ত গ্রহণের প্রথা সকল ব্যাপারে প্রচলিত ছিল।

ইনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটেনিকার (১৯৪৬) 'ব্যাংক' প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে, বাবেল এবং মিসরের মন্দিরগুলো শুধুমাত্র উপাসনালয়ই ছিল না, ব্যাংকও ছিল। বাবেলের পুরাতাত্মিক কীর্তির মধ্যে যেসব মাটির তক্তি বা টাইল·পাওয়া

গেছে, তার থেকে জানা যায় যে, জমির মালিক তার চাষের পূর্বে কৃষি কাজের জন্যে এসব মন্দির থেকে টাকা ঋণ নিতো এবং ফসল কাটার পর সুদসহ এ ঋণ পরিশোধ করতো। এ মহাজনী সুদী ব্যবস্থা খৃষ্টপূর্ব ২০০০ সালেও বিদ্যমান ছিল। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে বাবেলে প্রাইভেট ব্যাংকও কাজ করতো বলে জানা যায়। খৃষ্টপূর্ব ৫৭৫ সালে বাবেলে ইজিবি (IGIBI) নামক ব্যাংকের অস্তিত্ব ছিল জানা যায়। এ ব্যাংক জমির মালিকদেরকে কৃষির উদ্দেশ্যে ঋণ দান করতো। এ ব্যাংক লোকের কাছ থেকে টাকা জমা রেখে তার সুদ দিত। মনে রাখতে হবে এ সে সময়ের কথা যখন হেজাজের তাইমা শহর বাবেল সরকারের গ্রীষ্মবাস ছিল। দ্যল্ দুরান্ত তাঁর (A STORY OF CIVILIZATION) গ্রন্থে বাবেল সম্পর্কে বলেন, "দেশের আইন অনুযায়ী নগদ টাকার ঋণের উপরে শতকরা বিশ টাকা হারে এবং শতকরা ৩৩ ভাগ বার্ষিক দ্রব্য হিসেবে ঋণের সুদ নির্ধারিত ছিল। কোনো কোনো শক্তিশালী বংশ বংশানুক্রমে সুদী মহাজনী কারবার করতো। তারা শিল্পজীবী লোকদেরকেও সুদে ঋণ দিত। তাছাড়া মন্দিরের পুরোহিতগণ ফসল প্রস্তুতির জন্যে জমির মালিকদেরকে ঋণ দিত।"

এ গ্রন্থকার আরও বলেন ঃ

"একটি মহামারীর মতো বিস্তারলাভকারী সুদখোরী ব্যবস্থা আমাদের শিল্পের মতো, বাবেলের শিল্প প্রতিষ্ঠানকেও জটিল ঋণ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পুষ্টি সাধনের পরিবর্তে নিঃশেষিত করে ফেলতো। বাবেলের সভ্যতা ছিল আসলে একটি বাণিজ্যিক সভ্যতা। সেসব প্রাচীন কীর্তিসমূহ থেকে যত প্রকার তথ্য বর্তমানে পাওয়া গেছে তার অধিকাংশই ছিল ব্যবসা সংক্রান্ত ধরনের যথা, বিক্রি, ঋণ, ঠিকা, অংশীদারী, দালালী, বিনিময়, একরার নামা, তমসুক এবং এ জাতীয় আরও অনেক কিছু।"[১]

আসিরিয়ার অবস্থাও ভিন্নতর ছিল না। খৃষ্টস্টূর্ব ৭ম শতাব্দীতে সিনাকারীবের সময়ের অবস্থা বর্ণনা করে দ্যল দুরান্ত বলেন ঃ

"ব্যক্তিগত কারবারকারী মহাজনগণ শিল্প ও ব্যবসায়কে কিছু পরিমাণ পুঁজি সংগ্রহ করে দিত এবং এর জন্যে বার্ষিক শতকরা ২৫ টাকা হারে সুদ আদায় করতো।[২]

গ্রীস সম্পর্কে ইনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটেনিকার ব্যাংক শীর্ষক প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে, খৃষ্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দী থেকে যেখানে ব্যাংক প্রথার যথারীতি ব্যবস্থাপনা চালু ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। এ ব্যবস্থাপনায় এমনও এক

১. ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২৮-২২৯)
২. প্রথম খণ্ড পৃঃ ২৭৪

ধরনের ব্যাংক ছিল যা লোকের কাছ থেকে আমানত স্বরূপ সম্পদ গচ্ছিত রাখতো এবং তার জন্যে সুদ প্রদান করতো।

দ্যল্ দুরান্ত বলেন যে, খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে ডেলফির অ্যাপোলো মন্দির সমগ্র গ্রীক সাম্রাজ্যের আন্তর্জাতিক ব্যাংক ছিল। তার থেকে লোকজন এবং রাষ্ট্রসমূহ একটা পরিমিতি হারে সুদসহ ঋণ গ্রহণ করতো। এভাবে বেসরকারী পোদ্দার শতকরা বার থেকে ত্রিশ পর্যন্ত হারে সুদে ব্যবসায়ীদেরকে ঋণ দিতো। গ্রীকগণ এ প্রথা নিকট প্রাচ্যের (বাবেল, মিসর ও ইরাক) নিকট থেকে শিক্ষা করে এবং পরবর্তীকালে গ্রীস থেকে রোম এ প্রথা শিক্ষা করে। পঞ্চম শতাব্দীর শেষ ভাগে কতকগুলো বড় বড় বেসরকারী ব্যাংক গ্রীসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তার মাধ্যমে এথেন্সের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসার লাভ করে।[১]

তারপর রোমীয় যুগ শুরু হয়। দ্যল্ দুরান্ত বলেন ঃ

"খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী রোমের ব্যাংক ব্যবস্থা উন্নতির শীর্ষস্থানে উপনীত হয়েছিল। মহাজন লোকের আমানত গ্রহণ করতো এবং তার জন্যে সুদ দিত। কারবারে নিজের মূলধনের সাথে অন্যের মূলধনও বিনিয়োগ করা হতো।[২] খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রোম সাম্রাজ্যের প্রত্যেক অংশে ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যাংকিং-এর অন্যান্য কাজের সাথে লোকের আমানত রেখে সুদ দেয়া হতো এবং অর্থ ঋণ দিয়ে সুদ আদায় করা হতো। এ কারবার অধিকাংশ গ্রীক এবং সিরিয়দের হাতে ছিল। গলে (GALL) তো সিরিয়াবাসী ও মহাজন সমার্থবোধক শব্দ হয়ে পড়েছিল। সে সময়ে সরকারী ধনাগারও জমির মালিকদেরকে ফসল জামিনের উপরে সুদে ঋণ দিত। আগষ্টাসের সময় সুদের হার শতকরা চার টাকা হারে নেমে আসে। তার মৃত্যুর পর সুদের হার শতকরা ছয় টাকা এবং কনষ্ট্যানটাইনের সময় শতকরা বার টাকা পর্যন্ত বর্ধিত হয়।"[৩]

এ প্রথম শতাব্দী সম্পর্কে ব্যারন (BARON) তার A RELIGOUS AND SOCIAL HISTORY OF THE JEWS নামক গ্রন্থে বলেন যে, আলেকজান্দ্রিয়ার ইয়াহুদী ব্যাংক মালিক আলেকজাণ্ডার এবং ডিমষ্ট্রীউস ইয়াহুদীয়ার বাদশাহ প্রথম এগ্রিপাকে দু লাখ দিরহাম (প্রায় ত্রিশ হাজার ডলার) ঋণ দিয়েছিল।[৪]

---

১. ঐ পৃঃ ২৬২-৬৩
২. তৃতীয় খণ্ড পৃঃ ৮৮
৩. তৃতীয় খণ্ড পৃঃ ২৩১-৩৬
৪. ব্যারণ ১ম খণ্ড পৃঃ ২৬১

নবী মুহাম্মদ (স)-এর নিকটতম সময়ে অর্থাৎ তাঁর জন্মের পাঁচ বছর পূর্বে রোম সম্রাট জাষ্টিনিয়ানের মৃত্যু হয়। এ সম্রাটের রাজত্বকালে সমগ্র বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যে আইন করে জমির মালিক ও কৃষকদের গৃহীত ঋণে শতকরা চার, ব্যক্তিগত প্রয়োজনে গৃহীত ঋণে শতকরা ছয়, ব্যবসা ও শিল্প সংক্রান্ত ঋণে আট এবং সামুদ্রিক বাণিজ্য সংক্রান্ত ঋণে বারো টাকা হারে সুদ নির্ধারিত করা হয়। এ আইন জাষ্টিনিয়ানের মৃত্যুর পরও কিছুকাল পর্যন্ত বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যে বলবৎ ছিল।[১] একথা ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, যে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যে এ সুদ প্রথা চালু ছিল, তার সীমান্ত উত্তর হেজাজের সাথে মিলিত হয়েছিল। সিরিয়া, ফিলিস্তিন ও মিসরের সমগ্র এলাকা ছিল এ সাম্রাজ্যের অধীন। কুরাইশ বণিকগণ সেসব এলাকার ব্যবসা কেন্দ্রে সর্বদা আনাগোনা করতো। স্বয়ং নবী মুহাম্মদ (স) বাল্যকাল থেকে নবুওয়াত পর্যন্ত সময়-কাল বাণিজ্যিক কাফেলার সাথে এসব ব্যবসা কেন্দ্রে যাতায়াত করতেন। একথা কি করে মনে করা যেতে পারে যে, কুরাইশ বণিকগণ এবং স্বয়ং নবী মুহাম্মদ (স) এসব বাজারের সাথে বাণিজ্যিক লেনদেন করা কালে কিছুতেই জানতে পারেননি যে, বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যে ব্যবসা, কৃষি এবং শিল্পের জন্যে ঋণ আদান-প্রদানের প্রথা প্রচলিত আছে এবং আইনগতভাবে তার জন্যে সুদের হার নির্ধারিত আছে।[২]

ঠিক নবী মুহাম্মদ (স)-এর সময়ে রোম এবং ইরানের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়েছিল, যার উল্লেখ কুরআন মজীদের সূরা রোমে রয়েছে। এ যুদ্ধে যখন হিরাক্লিয়াস খসরু পারভেজের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক অভিযান চালান, তখন তার সামরিক প্রয়োজনের জন্যে তাঁকে গীর্জাসমূহের সঞ্চিত অর্থ সুদে ঋণ নিতে হয়েছিল।[৩] যে মহাযুদ্ধ ইরাক থেকে মিসর পর্যন্ত আরবের সমগ্র উত্তরাঞ্চল লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছিল, যাতে ইরানের জয়-জয়কার চারদিকে আলোচনার বস্তু হয়ে পড়েছিল এবং যে যুদ্ধে রোমের পতনোন্মুখ প্রাসাদকে

১. দ্যল্ দুরান্ত ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ১২০, ৩৩৬, গীবন DECLINE AND FALL OF THE ROMAN EMPIRE ২য় খণ্ড পৃঃ ৭১৬

২. হেজাজ থেকে কুরাইশদের যে কাফেলা ফিলিস্তিন ও সিরিয়ায় যেতো তাদের জারীজুরী ও জাঁকজমকের ধরন এর থেকে বুঝা যায় যে, বদর যুদ্ধের সময় আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে যে কাফেলা সিরিয়া থেকে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করছিল, তার সাথে আড়াই হাজার উট ছিল। মনে রাখতে হবে যে, এত বড় কাফেলা নিয়ে যারা গিয়েছিল তাদের সংখ্যা অন্ততপক্ষে দু' আড়াই হাজারের কম হতে পারে না। এখন এ কি ধারণা করা যেতে পারে যে, যেখানে একটি শহরের এত সংখ্যক লোক অন্য দেশে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে গমন করে তারা এ বিষয়ে মোটেই ওয়াকিবহাল থাকবে না যে, সে দেশে অর্থনৈতিক লেনদেনের কি নিয়ম-নীতি প্রচলিত ছিল?

৩. Cambridge Economic History of Europe-Vol, 2, P. 90 (Gibbon Decline and Fall of the Roman Emprie Vol. 2, P. 791).

ধ্বংসের মুখ থেকে রক্ষা করার পর রোম সম্রাট হঠাৎ খসরুর বিরুদ্ধে বিস্ময়কর অভিযান পরিচালনা করেন। যার ফলে সাসানীর রাজধানী মাদায়েন ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছিল, সে যুদ্ধের কথা আরববাসীদের কাছে গোপন থাকবে এবং রোম সম্রাট যে গীর্জাসমূহের কাছ থেকে পুঁজি সংগ্রহ করেছিলেন, তাও তাদের অজানা থাকবে—একথা কি করে বিশ্বাস করা যায় ? অগ্নি উপাসকদের হাত থেকে খৃস্ট ধর্মকে রক্ষা করার জন্যে এবং শুধু বায়তুল মাকদাসই নয়, পবিত্র ক্রুসকে মুশরিকদের খপ্পর থেকে উদ্ধার করার জন্যে যুদ্ধ করতে হবে ; আর গীর্জার পাদরীগণ এ মহৎ কাজের জন্যে সুদে অর্থ ঋণ দেবে, এমন অদ্ভুত ঘটনা লোকের অগোচরে কি করে থাকতে পারে ? অথচ তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে ছিল দুটো সাম্রাজ্যের যুদ্ধের ফলাফলের উপর। বিশেষ করে কুরাইশগণ তো এ ব্যাপারে অনবহিত থাকতেই পারে না। কারণ সূরা আর রূম নাযিল হবার পর এ রোম-ইরান যুদ্ধের ব্যাপারে হযরত আবু বকর ও কুরাইশ সরদারদের মধ্যে বাজী ধরা হয়েছিল।

এ পর্যন্ত আমি যা কিছু বলেছি তার থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, মধ্য প্রাচ্যের অর্থনৈতিক, তামাদ্দুনিক ও রাজনৈতিক জীবনের সাথে অতি প্রাচীনকাল থেকে আরববাসীদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। এ ভূখণ্ডে আড়াই হাজার বছর থেকে ব্যবসা, শিল্প, কৃষি ও রাষ্ট্রের প্রয়োজনে যে ঋণের লেনদেন এবং তার জন্যে সুদ আদায় করার যে রীতি প্রচলিত ছিল, এ সম্পর্কে আরববাসীদের অনবহিত থাকা এবং কোনোরূপ প্রভাবিত না হবার ধারণাই করা যেতে পারে না।

এখন নবী (স)-এর সময়ের অর্থনৈতিক কারবারের প্রতি লক্ষ্য করুন। আমি পূর্বে বলেছি যে, আরব দেশে খাদ্য এবং মদ প্রধানত ইয়াহুদীগণ আমদানী করতো। অন্যান্য দ্রব্যাদির অধিকাংশ মক্কা ও তায়েফের ব্যবসায়ীগণ বহির্দেশ থেকে আমদানী করতো। আমি একথাও বলেছি যে, কুরাইশ সাকিফ এবং ইয়াহুদদের ব্যবসা ছিল পাইকারী। দেশের অভ্যন্তরে খুচরা ব্যবসা করতো অন্য লোক। তারা পাইকারী বিক্রেতাদের কাছ থেকে মাল খরিদ করে নিয়ে যেতো। আমি একথাও বলেছি যে, পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ীদের মধ্যে নগদ মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় দুনিয়ার কোথাও ছিল না। আরবেও তা ছিল না। তারপর নবী করীম (স)-এর নিকটবর্তী সময়ে তফসীরকারগণ 'রিবার' আয়াতের যে তফসীর করেছেন, তার প্রতিও লক্ষ্য করুন।

ذَرُوْا مَابَقِيَ مِنَ الرِّبٰوا -এ আয়াতের তফসীরে যাহ্হাক বলেন ঃ

كان ربا يتبايعون به فى الجاهلية ـ

এটা ছিল সেই সুদ যার মাধ্যমে লোক জাহেলিয়াতের যুগে কেনা-বেচা করতো।

কাতাদা বলেন ঃ

ان ربا اهل الجاهلية يبيع الرجل البيع الى اجل مسمى فاذا حل الاجل ولم يكن عنده صاحبه قضاء زاده واخر عنه -

"জাহেলিয়াতের যুগে সুদ এই ছিল যে, একজন অন্য জনের কাছে মাত্র বিক্রি করতো এবং মূল্য পরিশোধের একটি তারিখ নির্ধারিত করতো। সময় অতিক্রম করলো কিন্তু ক্রেতার মূল্য পরিশোধ করার মতো টাকা হলো না। তখন বিক্রেতা তার উপরে অতিরিক্ত টাকা চাপিয়ে দিত এবং সময় আরও বাড়িয়ে দিত।"[১]–ইবনে জারীর

সুদ্দী বলেন ঃ

نزلت هذه الاية فى العباس بن عبد المطلب ورجل من بنى المغيرة كانا شريكين فى الجاهلية سلفا فى الربا الى اناس من ثقيف من بنى عمرو فجاء الاسلام ولهما اموال عظيمة فى الربوا -

এ আয়াতটি আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব এবং বনী মুগীরার জনৈক ব্যক্তি সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল। এরা উভয়ে জাহেলিয়াতের যুগে ব্যবসার অংশীদার ছিলেন। তারা সাকীফ গোত্রের বনী আমরের লোকের মধ্যে সুদী ঋণে মাল দিয়ে রেখেছিলেন। ইসলাম গ্রহণের সময় তাদের বিরাট পুঁজি সুদে লাগানো ছিল।[২]

এসব বর্ণনা থেকে জানতে পারা যায় যে, খুচরা বিক্রেতাদেরকে মাল ধারে বিক্রি করে তার উপর সুদ আরোপ করা হতো। আরও জানা যায় যে, এ বাণিজ্যিক সুদের জন্যে 'রিবার' পরিভাষাই ব্যবহার করা হতো। অন্য এমন কোনো শব্দ ছিল না যা বাণিজ্যিক ঋণের জন্যে ব্যবহৃত হতো এবং 'রিবা' শুধুমাত্র সেই ঋণের সুদের জন্যে ব্যবহৃত হতো, যা নিরেট ব্যক্তিগত প্রয়োজনের জন্যে নেয়া হতো।

---

১. এর থেকে একথাও জানতে পারা যায় যে, মূল্য আদায়ের প্রথম যে অবকাশ দেয়া হয় তার জন্যে কোনো সুদ আরোপ করা হতো না। অবশ্যি প্রথম মিয়াদ শেষ হবার পর মূল্য পরিশোধ না করলে দ্বিতীয়বার অবকাশ দিয়ে মূল্যের উপর সুদ চাপিয়ে দেয়া হতো। সমাজে সাধারণত বড় ব্যবসায়ী ছোট ব্যবসায়ীদেরকে তার গ্রাহক করে রাখার উদ্দেশ্যে এ ধরনের সুযোগ দিয়ে থাকতো। ক্ষুধার্ত খরিদদারকে এ ধরনের সুযোগ-সুবিধা কোথাও দেয়া হতো না।

২. ইবনে জরীর পৃঃ ৭১।

অতপর বুখারীতে সাতটি স্থানে[১] এবং নাসায়ীর[২] একস্থানে নির্ভরযোগ্য সূত্রে এ বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে যে, নবী (স) বলেন ঃ বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির নিকট থেকে ব্যবসার জন্যে এক হাজার দীনার ঋণ গ্রহণ করে।[৩] তারপর বলে আমার ও তোমার মধ্যে আল্লাহ্ সাক্ষী এবং তিনিই জামিন।

অতপর সে সমুদ্র যাত্রায় বেরিয়ে পড়লো। সেখানে ব্যবসা-বাণিজ্য শেষ করার পর জাহাজের অভাবে প্রত্যাবর্তন করতে পারে না এবং ঋণ পরিশোধের মুদ্দত শেষ হয়ে যায়। তখন সে এক খণ্ড কাঠের মধ্যে একটা ছিদ্র করে তার মধ্যে এক হাজার দীনার রাখলো। ঋণদাতার নামে একখানি পত্র লিখে কাষ্ঠখণ্ডের মধ্যে দিয়ে মুখ বন্ধ করলো। অতপর তা সমুদ্রে নিক্ষেপ করে এই বলে খোদার কাছে দোয়া করলো ঃ হে খোদা আমি তোমাকেই সাক্ষী এবং জামিন রেখে সেই ব্যক্তির নিকট থেকে দীনার ঋণ নিয়েছিলাম। তুমিই এখন এ অর্থ তার কাছে পৌঁছিয়ে দাও।

আল্লাহর কুদরত এই ছিল যে, একদিন ঋণদাতা সমুদ্র তীরে দণ্ডায়মান অবস্থায় এক খণ্ড কাষ্ঠ ভেসে তার কাছে আসতে দেখলো। সে তা উঠিয়ে তার জন্যে ঋণগ্রহীতার পত্র এবং এক হাজার দীনার পেয়ে গেল।

পরে ঋণগ্রহীতা বাড়ী পৌঁছে আবার এক হাজার দীনার নিয়ে ঋণদাতার নিকট উপস্থিত হলো। কিন্তু ঋণদাতা সে এক হাজার দীনার নিতে অস্বীকার করে বললো—আমার পাওনা আমি পেয়ে গেছি।

এ বর্ণনা একথারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে, ব্যবসার জন্যে ঋণ গ্রহণের ধারণা সে সময়ে আরববাসীদের কাছে অপরিজ্ঞাত ছিল না।

---

১. বুখারী-কিতাবুয যাকাত, কিতাবুশ শুরুত, কিতাবুল ইস্তিকরায, কিতাবুল কিফালা, কিতাবুল লুকতা, কিতাবুল ইস্তিযান এবং কিতাবুল বুয়ু, (বাবু ত্তিজারাতি ফিল বাহর)।

২. নাসায়ী-কিতাবুল লুকতা।

৩. এখানে প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, রেওয়ায়েতে 'ব্যবসার জন্যে' কথাটি নেই। কিন্তু এ প্রশ্নটি কয়েকটি কারণে ভুল। প্রথম কথা এই যে, রেওয়ায়েতে ঋণের জন্যে اسلف يسلف ক্রিয়া শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এ হচ্ছে টাকা অগ্রিম দাদনের সম অর্থবোধক। এ অর্থ অধিকাংশই ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। তারপর ঋণ সে এক হাজার দীনার (প্রায় দশ হাজার টাকা) নিয়েছিল। এটা সত্য কথা যে, এত টাকা অনাহার দূর করার জন্যে নেয়া হয়নি। অথবা কাফনের অভাবে মুর্দা দাফন করা হচ্ছে না। অতএব তার জন্যে এক হাজার দীনার ঋণ নেয়া হচ্ছে, ব্যাপার তাও নয়। তাছাড়া এ টাকা নিয়ে সে সমুদ্র যাত্রা করেছিল। সেখানে সে এত টাকা রোজগার করলো যে, কাঠের মধ্যে ছিদ্র করে এক হাজার দীনার ঋণদাতার উদ্দেশ্যে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলো। অতপর বাড়ী পৌঁছে অতিরিক্ত এক হাজার দীনার নিয়ে ঋণদাতার কাছে উপস্থিত হলো। এর থেকে একথাই কি প্রমাণিত হয় না যে, সে বিলাসিতার জন্যে নয়, বরঞ্চ ব্যবসার জন্যেই ঋণ গ্রহণ করেছিল ?

ইবনে মাজাহ[১] এবং নাসায়ীতে[২] বর্ণিত আছে যে, হুনাইন যুদ্ধের সময় নবী (স) আবদুল্লাহ বিন রাবিয়া মাখযুমীর নিকট থেকে ত্রিশ অথবা চল্লিশ হাজার দিরহাম ঋণ নিয়েছিলেন এবং যুদ্ধের পর সে ঋণ পরিশোধ করেন। রাষ্ট্রীয় স্বার্থে ঋণ গ্রহণের এ এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

জনৈক বন্ধু আরও দুটো ঘটনার প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর নিকট আমি কৃতজ্ঞ। প্রথম ঘটনা এই যে, হিন্দ বিন ওতবা একবার হযরত ওমর (রা)-এর নিকট থেকে বায়তুলমালের চার হাজার টাকা (সম্ভবত দিরহাম) ব্যবসার জন্যে ঋণ নিয়েছিলেন।[৩]

দ্বিতীয় ঘটনাটিও হযরত ওমর (রা)-এর খেলাফত কালের। তা হচ্ছে এই যে, বসরার গভর্নর হযরত আবু মূসা আশয়ারী হযরত ওমর (রা)-এর দু পুত্র আবদুল্লাহ এবং ওয়াবায়দুল্লাহকে ব্যবসা করার জন্যে বায়তুলমাল থেকে টাকা ঋণ দিয়েছিলেন। অতপর হযরত ওমর (রা) তা জানতে পেরে এটাকে আপত্তিজনক বলে ঘোষণা করেন এবং আসলসহ গোটা মুনাফা ছেলেদের নিকটে দাবী করেন। অবশেষে লোকের পরামর্শে এ ঋণকে ঋণের পরিবর্তে কিরাজ (অংশীদারিত্ব) ঘোষণা করে মুনাফার অর্ধেক আদায় করা হয়।[৪]

এ দুটো ঘটনাই জাহেলিয়াতের যুগের অতি নিকটবর্তী সময়ের। আরবে নবম হিজরী পর্যন্ত সুদী কারবার চালু ছিল। সুদ বন্ধ হবার দশ বারো বছর পরের এ ঘটনাগুলো। এটা ঠিক যে এত অল্প সময়ের মধ্যে ধারণা বদলে যেতে পারে না। অতএব এসব ঘটনা থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, ঋণের মাধ্যমে পুঁজি সংগ্রহ করে ব্যবসা করার ধারণা জাহেলিয়াতের যুগেও বিদ্যমান ছিল।[৫]

---

১. আবওয়াবু ত্তিজারাত, বাবু হুসনুল কাযা।

২. কিতাবুল বুয়ু বাবুল ইস্তিকরায।

৩. তারিখে তাবারী-হি ২৩ সনের ঘটনা। শিরোনাম-"তার চরিত্র সম্পর্কে পূর্বে বলা হয়নি এমন কতকগুলো ঘটনা।"

৪. ঘটনাটি বিবৃত হয়েছে মুয়াত্তায় কিতাবুল খিরাজে ওমর বিন খাত্তাবের চরিত্র শীর্ষক অধ্যায়ে।

৫. এ সম্পর্কে একথা বলা যেতে পারে না, "এমন অনেক ধারণা আছে যা ইসলামের আগমনের পর সৃষ্টি হয়েছে এবং তা জাহেলিয়াতের সময় বিদ্যমান ছিল না। এভাবে এ নতুন ধারণাটিও ইসলামের পরবর্তী কালের।" যদি এমন কথা কেউ বলে, তাহলে আমরা তাকে বলবো, বেশ ভালো কথা। এটা ইসলামোত্তর কালেরই সৃষ্টি। তর্কের স্থলে একথা মেনে নিলাম। কিন্তু এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঋণের দ্বারা পুঁজি সংগ্রহ করে ব্যবসা করার প্রথা হযরত ওমর (রা)-এর সময়ে শুরু হয়েছিল এবং তারপর, যেমন আমি আগে বলেছি, হযরত ইমাম আবু হানিফার সময় পর্যন্ত অবস্থা এতদূর গড়ালো যে, একমাত্র ইমাম সাহেবের ব্যবসাতেই পাঁচ কোটি টাকার পুঁজি ঋণ করে বিনিয়োগ করা ছিল। এখন প্রশ্ন এই যে, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন, আয়েম্মায়ে মুজতাহেদীন (মুজতাহিদ ইমামগণ) মোটকথা কারো মাথায় একথা কেন এলো না যে, কুরআনের উদ্দেশ্য তো শুধু ব্যক্তিগত প্রয়োজনে গৃহীত ঋণের উপর সুদ হারাম করা—লাভজনক কাজে গৃহীত ঋণের উপর সুদ হারাম নয়?

এখন প্রশ্ন এই যে, ইসলামী যুগের ঐতিহাসিকগণ, মুহাদ্দিস ও তাফসীরকারগণ ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও বাণিজ্যিক প্রয়োজনে গৃহীত ঋণের পৃথক পৃথক সুস্পষ্ট বর্ণনা কেন করেননি। পরিষ্কার কথা এই যে, তাদের নিকটে ঋণ যে কোনো উদ্দেশ্যেই গৃহীত হোক না কেন, তাকে ঋণ বলেই বিবেচনা করা হতো। এবং এর উপর গৃহীত সুদের পজিশনও তাদের দৃষ্টিতে ছিল অভিন্ন। তাঁরা এরূপ কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজনই বোধ করেননি যে, অনাহারক্লিষ্ট মানুষ তার ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যে ঋণ গ্রহণ করতো। আর না বিশেষ করে এরূপ কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন বোধ করেছেন যে, ব্যবসার জন্যে লোক ঋণ করতো। এসব ব্যাপারে চুলচেরা বিশদ বর্ণনা খুব কমই পাওয়া যায়, যার প্রকৃত অবস্থা জানার জন্যে তৎকালীন দুনিয়ার অবস্থা সামনে রেখেই আরবের অবস্থা দেখা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। বিভিন্ন ঋণের মধ্যে তাদের উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে পার্থক্য নির্ণয় করে এক উদ্দেশ্যে গৃহীত ঋণের উপর সুদ জায়েয এবং অন্য উদ্দেশ্যে গৃহীত ঋণের সুদ নাজায়েয হবার ধারণা সম্ভবত চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্বে দুনিয়ায় কোথাও বিদ্যমান ছিল না।[১] সে সময় পর্যন্ত ইয়াহুদী ধর্ম, খৃস্টান ধর্ম এবং ইসলামের সকল ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিগণ এবং অনুরূপভাবে নৈতিকতার নেতৃবৃন্দ এ ব্যাপারে একমত ছিলেন যে, প্রত্যেক প্রকার ঋণের উপর সুদ হারাম।

এরূপ বলা হয়ে থাকে যে, ইসলামপূর্ব যুগে এটা সম্ভবই ছিল না যে, মানুষ ঋণ করা পুঁজি দিয়ে ব্যবসা করতে পারতো। কারণ দেশে নিয়মতান্ত্রিক কোনো সরকারই ছিল না। চারিদিকে নিরাপত্তাহীনতা বিরাজ করতো। বাণিজ্যিক বহরগুলোকে মোটামোটা ট্যাক্স দিয়ে বিভিন্ন গোত্রের এলাকা অতিক্রম করতে হতো এবং এরূপ সংকটপূর্ণ অবস্থার জন্যে সুদের হার শতকরা তিন চার শত টাকায় পৌঁছেছিল। এমতাবস্থায় ঋণ করে পুঁজি ব্যবসায় বিনিয়োগ করা কিছুতেই লাভজনক হতে পারতো না। কিন্তু ঐতিহাসিক অবস্থার সাথে এ অবাস্তব কল্পনার কোনো মিল নেই। এ নিছক একটি কল্পনা মাত্র যা ইতিহাসকে উপেক্ষা করে—এ ধারণার বশবর্তী হয়ে করা হয়েছে যে, আরবে যখন কোনো নিয়মতান্ত্রিক সরকার বা শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল না এবং চারিদিকে অরাজকতা ছড়িয়ে ছিল, তখন নিশ্চয় তার পরিণাম তাই হবে। অথচ ঐতিহাসিক ঘটনাপুঞ্জ থেকে একথা জানা যায় যে, ইসলামের নিকটবর্তী সময়ে ইরান ও রোমের ক্রমাগত যুদ্ধ-বিগ্রহাদি ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের ফলে চীন, ইন্দোনেশিয়া, ভারত এবং পূর্ব আফ্রিকার সাথে রোম সাম্রাজ্যের যত প্রকার বাণিজ্যিক সম্পর্ক

১. (Henry Pirene Economic & Social History of Medieval Europe) (English Translation) IV, Edition Butler, London 1949, P. 140.

ছিল, তার মধ্যস্থতা করতো আরব বণিকগণ। বিশেষ করে ইয়ামনের উপরে ইরানের আধিপত্য বিস্তারের পর রোমীয়দের জন্যে প্রাচ্যের ব্যবসা-বাণিজ্যের সকল পথ রুদ্ধ হয়ে পড়েছিল। এ অবস্থায় প্রাচ্যের সমুদয় পণ্যদ্রব্য পারস্য উপসাগর এবং আরব সাগরে অবস্থিত আরবদের বন্দরসমূহে গিয়ে পৌঁছতো। সেখান থেকে মক্কা হয়ে রোম সাম্রাজ্যে পৌঁছত। এমনিভাবে রোম সাম্রাজ্যের যাবতীয় পণ্যদ্রব্য কুরাইশদেরই কাফেলা মক্কায় নিয়ে আসতো ; অতপর ঐসব বন্দরে পৌঁছিয়ে দিত, যেখানে প্রাচ্যের বণিকগণ খরিদ করতে আসতো। O'LEARY বলেন যে, সে সময়ে মক্কা ব্যাংকিং কার্যের কেন্দ্র হয়ে পড়েছিল। সেখানে দূরবর্তী দেশের জন্যে টাকা আদান-প্রদান হতো। বলতে গেলে মক্কা আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের বাজার হয়ে পড়েছিল।

Mecca had become a Banking centre where payments could be made to many distant lands, and a clearing house of international commerce.[১]

অবস্থা যদি তাই হতো, যা ধারণা করা হয়েছে, তাহলে এ সমৃদ্ধিশালী ব্যবসা-বাণিজ্য কিভাবে চলতো। অর্থনৈতিক রীতিনীতির মোটামোটি জ্ঞান একথা বুঝবার জন্যে যথেষ্ট যে, যেখানে নিরাপত্তার অভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য এতটা ব্যয়বহুল ও শংকাপূর্ণ। যার ফলে বাণিজ্যিক সুদের হার শতকরা তিন চারশ টাকায় পৌঁছে যায়, সেখানে অবশ্যই পণ্যদ্রব্যের ক্রয়মূল্য এতটা বেড়ে যাওয়া উচিত যে, বৈদেশিক বাজারে তা নিয়ে গিয়ে মুনাফাসহ বিক্রি করা কিছুতেই সম্ভব হতো না। তাহলে এত বর্ধিত মূল্যে খরিদ করা মাল মিসর, সিরিয়ার বাজারে কিভাবে বিক্রি হতো ? যেসব অরাজকতা ও বিশৃংখলা আরবে তৎকালে বিদ্যমান ছিল বলে বলা হয়, সেসব থাকা সত্ত্বেও ব্যাপক আকারে ব্যবসা-বাণিজ্য সেসব গোত্রই করতো, যারা স্বয়ং ছিল শক্তিশালী। বড় বড় গোত্রের সাথে যারা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেছিল, সুদে লাখো লাখো টাকার মালপত্র গোত্রসমূহের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে বহুসংখ্যক লোককে যারা ব্যবসাসূত্রে বেঁধে রেখেছিল এবং গোত্রীয় সরদারগণকে সব রকমের বিলাস দ্রব্যাদি সরবরাহ করে যারা তাদের বিরাট প্রভাব বিস্তার করে রেখেছিল। তাছাড়া স্বয়ং গোত্রগুলোর আপন আপন স্বার্থেও এটা দাবী করতো যে, বহির্দেশ থেকে আমদানীকৃত জীবন-যাপনের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যথা—খাদ্যশস্য, কাপড় প্রভৃতি তাদের নিকটে পৌঁছুক। এজন্য এসব শক্তিশালী গোত্রসমূহ যখন দু আড়াই হাজার উটসহ তাদের বাণিজ্য বহর নিয়ে আরবের পথ দিয়ে চলতো,

১. Arabia before Mohammad, P. 182.

তখন তাদেরকে তেমন মোটা ট্যাক্স দিতে হতো না। অথবা বিপদাপদ থেকে রক্ষার জন্যে এতটা অধিক ব্যয়ও করতে হতো না যে, পণ্যদ্রব্যের মূল্য লোকের ক্রয় ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করতো। বৈদেশিক বাণিজ্য ছাড়াও, আরব দেশের বিভিন্ন অংশে প্রতি বছর বিশটি কেন্দ্রীয় স্থানে নিয়মিত মেলা বসতো। এ সবের বিবরণ ইতিহাসে পাওয়া যায়। আরবের প্রত্যেক স্থান থেকে বহু কাফেলা এসে এসব মেলায় বেচা-কেনা করতো। এসব কাফেলার কোনো কোনোটিতে রোম, ইরান, চীন ও ভারতের ব্যবসায়ীও থাকতো। ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে গণকদের এই যে ক্রমাগত যাতায়াত তা কি করে সম্ভব হতো, যদি আরবের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি অতটা খারাপ হতো, যতোটা ধারণা করা হয়েছে। ঐতিহাসিকগণ কুরাইশদের ব্যবসা সম্পর্কে সুস্পষ্ট করে বলেছেন যে, তারা শতকরা একশত ভাগই লাভ করতো। এ ধরনের লাভজনক ব্যবসার জন্যে সুদী ঋণে পুঁজি না পাওয়া এবং সুদের হার শতকরা তিন চার শত হওয়া এক অবোধগম্য ব্যাপার। এ দাবীর অনুকূলে এমন কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণও নেই যে, সত্যি সত্যিই আরবে সুদের হার এতটা বেড়ে গিয়েছিল।

জবাব ঃ দ্বিতীয় প্রশ্ন

'রিবা' (الربوا) শব্দের অর্থ আরবী ভাষায় আধিক্য, অতিরিক্ত, বাড়তি প্রভৃতি। কিন্তু 'রিবা' দ্বারা পারিভাষিক দিক দিয়ে যা বুঝায় তা কুরআনেরই নিম্ন শব্দগুলির দ্বারা সুস্পষ্ট হয় ঃ

وَذَرُوْا مَابَقِيَ مِنَ الرِّبٰوا ...... وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ اَمْوَالِكُمْ ..... وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ -

"সুদের যতটুকু অবশিষ্ট আছে তা ছেড়ে দাও ---- যদি তুমি তওবা কর, তাহলে তুমি মূলধন পাবার হকদার হবে ----- আর যদি (ঋণগ্রহণকারী) অভাবগ্রস্ত অপরাগ হয়, তাহলে তার সচ্ছল হওয়া পর্যন্ত তাকে অবকাশ দাও।"-(সূরা আল বাকারা ঃ ২৭৮-৮০)

একথাগুলোর দ্বারা বুঝা যায় যে, রিবার এ বিধান ঋণের সাথে সংশ্লিষ্ট আর ঋণে আসলের অতিরিক্ত যাকিছু দাবী করা হবে তা হবে 'রিবা' (সুদ) যা ছেড়ে দেবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তা ছাড়া কুরআন একথা বলেও রিবার মর্ম সুস্পষ্ট করে দিচ্ছে احل الله البيع وحرم الربوا আল্লাহ ব্যবসা (বেচা-কেনা) হালাল করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন। এর দ্বারা সুস্পষ্ট হয় যে, সুদে মূলধন ঋণ দিয়ে যা কিছু তার চেয়ে বেশী গ্রহণ করা হয়, তা ঐ মুনাফা থেকে পৃথক যা ব্যবসা ক্ষেত্রে ক্রয়মূল্য থেকে বেশী লাভ করা যায়। অন্য কথায় রিবা

হচ্ছে মালের সেই আধিক্য যা ব্যবসার পদ্ধতিতে লাভ করা হয় না। এর উপর ভিত্তি করে মুহাদ্দিসগণ, ফকীহ্ ও তাফসীরকারগণ এ বিষয়ে একমত যে, কুরআনে সেই রিবাকে হারাম করা হয়েছে, যা ঋণের ব্যাপারে আসলের অতিরিক্ত দাবী করা হয়।

প্রথম প্রশ্নের জবাবে ইতিহাস থেকে প্রমাণ করা হয়েছে যে, কুরআন নাযিলের সময় আরববাসী এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অবগত ছিল যে, ঋণের আদান-প্রদান শুধু ব্যক্তিগত প্রয়োজনেই হয় না, বরঞ্চ ব্যবসার উদ্দেশ্যে এবং জাতীয় উদ্দেশ্যেও হয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও কুরআন রিবা হারাম করার নির্দেশ দিতে গিয়ে এমন কোনো ইংগিত করেনি যার থেকে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায় যে, উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে ঋণসমূহের মধ্যে পার্থক্য আছে এবং সুদ হারাম করার নির্দেশ শুধুমাত্র ব্যক্তিগত প্রয়োজনে গৃহীত ঋণের জন্যে নির্দিষ্ট। আর লাভজনক কাজের উদ্দেশ্যে যে ঋণ দেয়া যায় তার উপর সুদ হালাল। ইসলামের ফকীহগণ প্রথম হিজরী শতাব্দী থেকে আজ পর্যন্ত এ মূল নীতির উপর একমত যে كُلُّ قَرْضٍ جَرَّبِهِ نَفْعًا فَهُوَ رِبْوا "যে ঋণের সাথে মুনাফা লাভ করা হয়, তাহলো 'রিবা' (সুদ)।" কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত ফকীহগণের এ সর্বসম্মত রায়ের সাথে মতবিরোধ করার কোনো একটি দৃষ্টান্তও ফেকাহর ইতিহাস থেকে প্রমাণ করা যাবে না।

জবাব ঃ তৃতীয় প্রশ্ন

ربوا (সুদ) এবং ربح (লাভ) শব্দদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, ঋণে মাল দিয়ে আসল থেকে অতিরিক্ত গ্রহণ করার নাম হলো রিবা (ربوا)। পক্ষান্তরে ربح (রাবাহ্) শব্দের অর্থ হলো ব্যবসায়ে নিয়োজিত পুঁজি বা ক্রয়মূল্যের অধিক মূল্যে বিক্রয়ের মাধ্যমে লাভ করা। এর বিপরীত, ক্রয় মূল্য থেকে কমে কোনো পণ্য বিক্রি করাকে ক্ষতি বলা হয়। লিসানুল আরবে ربح শব্দের অর্থ বলা হয়েছে নিম্নরূপ ঃ

الربح والربح والرباح النماء فى التجر .... والعرب تقول ربحت تجارته
اذا ربح صاحبها فيها ..... وقوله تعالى فما ربحت تجارتهم -

ব্যবসায়ে লব্ধ অতিরিক্ত সম্পদ বা অর্থকে ربح ও رباح - ربح বলা হয়। ব্যবসায়ী ব্যবসায় লাভ করলে আরববাসী বলে ربحت تجارته (তার ব্যবসা লাভযুক্ত হয়েছে) অর্থাৎ সে লাভবান হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ فما ربحت تجارتهم (তারা ব্যবসায় লাভবান হয়নি)।

ইমাম রাগেব (র)-এর মুফরাদাত গ্রন্থে আছে ঃ

الربح الزيادة الحاصلة فى المبايعة

ক্রয়-বিক্রয়ের যে আধিক্য লাভ হয় তাহলো ربح (লাভ)।

স্বয়ং কুরআন মজীদ 'রিবা' (সুদ) এবং ব্যবসার মুনাফার মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করেছে। আরবের কাফেরগণ সুদ হারাম হবার বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করে বলতো ঃ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا (ব্যবসা তো সুদের মতোই) অর্থাৎ ব্যবসায়ে আসল ক্রয়মূল্য থেকে অধিক যে বিক্রয় মূল্য আদায় করা হয়, সেতো ঋণ দিয়ে আসল মূলধন থেকে অধিক টাকা নেয়ার মতোই। কুরআন এর জবাবে বলে দিয়েছে ঃ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا (আল্লাহ বেচা-কেনা হালাল করেছেন এবং সুদ করেছেন হারাম)। অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয়ের আকারে সম্পদে যে আধিক্য হয়, তা এক বস্তু এবং ঋণের আকারে আধিক্য আর এক বস্তু। একটিকে আল্লাহ হালাল করেছেন এবং অন্যটিকে হারাম করেছেন। কেউ মুনাফা করতে চাইলে নিজে ব্যবসা করে অথবা অন্য কারো সাথে ব্যবসায় অংশীদার হয়ে মুনাফা করার পথ তার জন্যে উন্মুক্ত আছে। কিন্তু ঋণ দিয়ে মুনাফা অর্জন করার পথ বন্ধ।

জবাব ঃ চতুর্থ প্রশ্ন

'রিবার' (সুদ) সংজ্ঞা এই ঃ ঋণের ব্যাপারে আসল থেকে অতিরিক্ত যাকিছু আদান-প্রদানের শর্ত হিসেবে আদায় করা হবে তাকেই বলে 'রিবা' বা সুদ। এ সংজ্ঞায় এ প্রশ্ন অবান্তর যে, এ 'রিবা' ঋণদাতা দাবী করেছে অথবা ঋণগ্রহীতা স্বেচ্ছায় দিতে চেয়েছে। এ প্রশ্ন সুদের আইনসংগত সংজ্ঞার উপর কোনো ক্রিয়া করে না এবং কুরআন অথবা নির্ভরযোগ্য হাদীস থেকে এ বিষয়ে এমন কোনো ইংগিতও পাওয়া যাবে না যে, ঋণগ্রহীতার পক্ষ থেকে সুদ দিতে চাইলে তা সুদে পরিণত হওয়া এবং হারাম হবার ব্যাপারে কোনো পার্থক্য সূচিত হবে। তা ছাড়া দুনিয়ায় এমন কোনো বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি নেই এবং ছিলও না যে, বিনা সুদে ঋণ লাভ করার সুযোগ পেয়েও স্বেচ্ছায় সুদ প্রদানের শর্ত পেশ করবে। ঋণগ্রহীতার পক্ষ থেকে এ ধরনের শর্ত একমাত্র তখনই উপস্থাপিত হতে পারে, যদি কোথাও তার বিনা সুদে ঋণ লাভের আশা না থাকে। সে জন্যে সুদের সংজ্ঞায় এ প্রশ্নের প্রভাব না থাকাই বাঞ্ছনীয়। উপরন্তু প্রাচীন কালে এবং আজও ব্যাংকের পক্ষ থেকে আমানত হিসেবে রক্ষিত টাকার সুদ এজন্য পেশ করা হয় যাতে করে লোকে এ সুদের প্রলোভনে তাদের সঞ্চিত টাকা ব্যাংকে জমা দিতে পারে, অতপর ব্যাংক যাতে কম হারে সুদে গৃহীত টাকা উচ্চ হারে ঋণ দিয়ে লাভবান হতে পারে। এভাবে সুদ প্রদানের আগ্রহ যদি সুদ প্রদানকারীর পক্ষ থেকেই হয় তাহলে সুদ হারাম হবার প্রশ্নে তা

বিবেচনাযোগ্য হবার কি সংগত কারণ থাকতে পারে ? আমানতী টাকার উপর সুদ দেয়া হয়। তা প্রকৃতপক্ষে এই যে, তা সেই সুদেরই একটা অংশ যা সেই আমানতী টাকা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে, ব্যবসার উদ্দেশ্যে এবং রাষ্ট্রীয় স্বার্থে ঋণ দিয়ে আদায় করা হয়। এটা তো ঐ ধরনের অংশ যেমন কোনো ব্যক্তি কারো নিকট থেকে সিঁদ কাটা অস্ত্রপাতি সংগ্রহ করলো এবং পরে সিঁদ কেটে যাকিছু চুরি করা মাল সে হস্তগত করলো তার একটা অংশ ঐ ব্যক্তিকে দিল, যার কাছ থেকে সে সিঁদ কাটা অস্ত্রপাতি নিয়েছিল। এ অংশ এ যুক্তির বলে জায়েয হতে পারে না যে, অংশ প্রদানকারী স্বেচ্ছায় তা দিয়েছে এবং গ্রহণকারী বলপূর্বক তা আদায় করেনি।

জবাব ঃ পঞ্চম প্রশ্ন

بيع سلم (বায়-এ-সালাম) এমন এক ধরনের ব্যবসা যা অগ্রিম সওদা করার একটি পদ্ধতি। অর্থাৎ এক ব্যক্তি অন্য একজনের নিকট থেকে আজ এক বস্তু খরিদ করে তার মূল্য দিয়ে দিল। তারপর একটি সময় নির্ধারিত করে দিল, যে নির্ধারিত সময়ে বিক্রেতা তাকে সে মাল দিবে। যেমন ধরুন, আমি একজনের কাছ থেকে আজ একশ' থান কাপড় খরিদ করছি এবং তার মূল্যও পরিশোধ করছি। এ শর্তে যে, চার মাস পর সেই থান আমি নিব। এ ক্রয়-বিক্রয়ে চারটি জিনিস অপরিহার্য। এক ঃ মালের মূল্য সওদা করার সংগেই দিতে হবে। দুই ঃ মালের গুণাগুণ (QUALITY) সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করা যেন ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে কোনো অস্পষ্টতা না থাকে, যা পরে বিতর্কের সূত্রপাত করতে পারে। তিন ঃ মালের পরিমাণ ওজন, মাপ অথবা সংখ্যা ইত্যাদি যেন সঠিকভাবে নির্দিষ্ট করা হয়। চার ঃ মাল ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করার সময় নির্ধারিত থাকবে। এর মধ্যেও যেন কোনো অস্পষ্টতা না থাকে যা পরে বিতর্কমূলক হয়ে দাঁড়ায়। এ সওদার জন্যে যে অগ্রিম মূল্য দেয়া হয়, তাকে কখনো ঋণের পর্যায়ভুক্ত করা যাবে না। বরঞ্চ তা ঠিক সেই রকম যেমন কোনো ক্রেতা লেনদেনে নগদ মূল্য প্রদান করে। ফিকাহ্ শাস্ত্রে তার নাম ثمن বা মূল্য, ঋণ নয়। নির্ধারিত সময়ে মাল হস্তান্তর না করা বা অন্য কোনো কারণে এ সওদা বাতিল হলে ক্রেতাকে শুধু আসল মূল্যই ফেরত দেয়া হয়। অতিরিক্ত কোনো কিছুর হকদার সে হয় না। এতে এবং সাধারণ কেনা-বেচায় এ ছাড়া আর কোনো পার্থক্য নেই যে, সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ে ক্রেতা বিক্রেতার নিকট থেকে মাল সংগে সংগেই নিয়ে নেয়। আর بيع سلم (বায়-এ-সালামে) এ মাল হস্তগত করার জন্যে ভবিষ্যতে একটি দিন-তারিখ নির্ধারিত করে দেয়। এ ব্যাপারটিকে ঋণ এবং সুদের সংগে জড়িত করার কোনোই সংগত কারণ আমি বুঝতে পারলাম না।

প্রশ্নে মহিষের যে দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে তা বায়-এ-সালামের নয়, বরঞ্চ অংশীদারিত্বের একটা দিক বা পদ্ধতি। অর্থাৎ মহিষ এক ব্যক্তির, অন্য ব্যক্তি তা নিয়ে কাজ করে এবং দুধ উভয়ের মধ্যে ভাগ করা হয়।

জবাব ঃ ষষ্ঠ প্রশ্ন

একই জাতীয় বস্তুর নগদ নগদ বিনিময়ে অধিক নেয়া হারাম করার উদ্দেশ্যে ইবনে কাইয়েম এবং অন্যান্যগণ যা বলেছেন, তা হচ্ছে আসলে উপায়ের পথ বন্ধ করা। অর্থাৎ আসল হারাম তো ঋণের সুদ। কিন্তু অধিক গ্রহণের মানসিকতা রুদ্ধ করার জন্যে একই জাতীয় বস্তুর নগদ বিনিময়ের সময় অধিক নেয়াকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। এ সত্য কথা যে, একই জাতীয় বস্তু যেমন চাউলের বিনিময় শুধুমাত্র এ অবস্থাতেই করা যায় যখন একটি উৎকৃষ্ট এবং অন্যটি নিকৃষ্ট হয়। শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্য এই যে, উৎকৃষ্ট ধরনের এক সের চাউলের বিনিময় নিকৃষ্ট ধরনের সোয়াসের চাউলের দ্বারা করা যাবে না। তা উভয়ের বাজার দরের পার্থক্য যেমনই হোক না কেন। বরঞ্চ এক ব্যক্তি তার চাউল টাকার বিনিময়ে বিক্রি করে অন্য চাউল টাকা দিয়েই খরিদ করবে। সরাসরি চাউলের সাথে আধিক্যসহ চাউলের বিনিময় সুদখুরীর মূল মানসিকতারই পরিপোষণ করে এবং শরীয়ত প্রণেতা (বিধানদাতা) এরই মূলোচ্ছেদ করতে চান। এ প্রসংগে একথা উল্লেখ যে, ফকীহগণের মধ্যে সুদের প্রশ্নে যত মতভেদ হয়েছে, তা শুধু 'রিবাল ফজলের' ব্যাপারেই। কারণ তার হারাম হবার হুকুম নবী করীম (স)-এর শেষ সময়ে দিয়েছিলেন এবং তাঁর পবিত্র জীবদ্দশায় এ হুকুমগুলো কার্যকর করার উপায়-পদ্ধতি সুস্পষ্ট হতে পারেনি। কিন্তু ঋণের সুদ সম্পর্কে কথা এই যে, তার অবৈধতা এর নির্দেশাবলী সম্পর্কে ফকীহগণের মধ্যে পরিপূর্ণ ঐকমত্য ছিল। এ বিষয়টি পরিষ্কার এবং এতে কোনোই জটিলতা নেই।

জবাব ঃ সপ্তম প্রশ্ন

ব্যবসায়ে উভয় পক্ষের সম্মতি অপরিহার্য। কিন্তু এ সম্মতি ব্যবসা হালাল হবারও কারণ নয় এবং সম্মতির অভাবে সুদ হারাম তাও নয়। কুরআনে কোথাও একথা বলা হয়নি যে, সুদ এ জন্য হারাম যে, সুদদাতা তা অনিচ্ছা সত্ত্বে দেয়, যদিও দুনিয়ার কোথাও কেউ স্বেচ্ছায় ও সন্তুষ্টচিত্তে সুদ দেয় না। বিনা সুদে ঋণ পাবার সম্ভাবনা থাকলে কেউ ঋণের জন্যে সুদ দিত না। কিন্তু এ বস্তুর হারাম হবার ব্যাপারে সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি বা ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রশ্নই অবান্তর। কারণ কুরআন নিরংকুশভাবে ঐ প্রকার ঋণকে হারাম ঘোষণা করে যাতে আসলের অতিরিক্ত আদায় শর্ত শামিল থাকে। এ শর্ত উভয় পক্ষের সম্মতিতে

অথবা অন্য যে কোনো প্রকারেই ঠিক করা হোক না কেন, তাতে কিছু আসে যায় না।

এখন কথা হচ্ছে এই যে, বলা হচ্ছে সুদী ঋণ হারাম হবার আসল কারণ অত্যাচার বা যুলুম এবং যে ঋণে সুদ আদায় করতে কোনো অত্যাচার হয় না, তা হালাল হওয়া উচিত। এ সম্পর্কে আমি বলতে চাই যে, কুরআনের শব্দাবলী থেকে একথা মনে করার কোনো সুযোগই নেই যে, যুলুম আসলে সুদ হারাম হবার কারণ। আর এ যুলুম শব্দের অর্থ আপনি যা খুশী করবেন, তারও উপায় নেই। কুরআন যেখানে এ হারামের কারণ বর্ণনা করছে, সেখানে নিজেই যুলুমের মর্মও সুস্পষ্ট করে দিচ্ছে। তা হচ্ছে এই ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَابَقِيَ مِنَ الرِّبٰوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○.......

وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ ج لَاتَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ○(البقرة : ٢٧٨-٢٧٩)

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং ঐ সমস্ত সুদ ছেড়ে দাও যা এখনো লোকের কাছে অবশিষ্ট আছে। যদি তোমরা মুমিন হও। --------- আর যদি তোমরা তওবা কর, তাহলে শুধু আসল গ্রহণ করার অধিকার তোমাদের আছে। না তোমরা যুলুম কর আর না তোমাদের উপর যুলুম করা হয়।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৭৮-৭৯)

এখানে দুটো যুলুমের কথা বলা হয়েছে। এক. যা ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার উপর করে। দুই. যা ঋণগ্রহীতা ঋণদাতার উপর করে ; আয়াতের পূর্বাপর বক্তব্য থেকে সুস্পষ্টরূপে জানা যায় যে, ঋণদাতার উপর ঋণগ্রহীতার যুলুম হচ্ছে—ঋণদাতার প্রদত্ত আসলটুকুও পরিশোধ না করা ঠিক অনুরূপভাবে ঋণগ্রহীতার উপর ঋণদাতার যুলুম হচ্ছে আসলের উপরে অতিরিক্ত দাবী করা। এভাবে কুরআন এখানে সেই যুলুমের অর্থ স্বয়ং নির্দিষ্ট করে বলে দিচ্ছে, যা ঋণের ব্যাপারে ঋণদাতা ও গ্রহীতা একে অপরের উপর করে থাকে। এ অর্থের দিক দিয়ে ইনসাফ এই যে, ঋণদাতা গ্রহীতার কাছ থেকে শুধুমাত্র আসল ফেরত নেবে। আর যুলুম হলো আসলের উপরে অতিরিক্ত আদায় করা। কুরআনের এ পূর্বাপর বক্তব্য অর্থের দিক দিয়ে ততই সুস্পষ্ট যে, ইবনে আব্বাস (রা) এবং ইবনে যায়েদ (রা) থেকে আরম্ভ করে বিগত শতাব্দীর শওকানী ও আলুসী পর্যন্ত সকল তফসীরকারগণ এ অর্থই গ্রহণ করেছেন। এ সুদীর্ঘ কালের মধ্যে এমন একজন তফসীরকারও পাওয়া যাবে না। যিনি কুরআন থেকে যুলুমকে সুদ হারাম হবার কারণ বলে গ্রহণ করেছেন, আর যুলুমের অর্থ বাইরের কোথাও থেকে নেয়ার চেষ্টা করেছেন। একটি বাক্যে তার পূর্বাপর

বক্তব্য থেকে যে অর্থ প্রকাশ পায় তা উপেক্ষা করে নিজের পক্ষ থেকে তাতে কোনো অর্থ যোগ করে দেয়া নীতিগতভাবে সম্পূর্ণ ভুল।

এ প্রশ্ন প্রসংগে দাবী করা হচ্ছে যে, বাণিজ্যিক সুদে কোনো পক্ষের উপরেই যুলুম হয় না। একথা আমরা স্বীকার করি না। একজন তার পুঁজি ঋণ দিয়ে নির্দিষ্ট মুনাফা লাভের নিশ্চয়তা লাভ করবে, কিন্তু যারা ব্যবসার জন্যে সময়, শ্রম এবং মস্তিষ্ক খরচ করবে তাদের জন্যে মুনাফা লাভের আদৌ কোনো নিশ্চয়তা থাকবে না। বরঞ্চ ব্যবসায় ক্ষতি হলেও ঋণদাতাকে সুদসহ আসল পরিশোধ করবে। এটা কি কম যুলুম ? সকল বিপদের ঝুঁকি নিবে যারা পরিশ্রম ও কাজ করবে তাদের ঘাড়ে আর মুনাফা লুটবে পুঁজি সরবরাহকারী। এটা কি করে ইনসাফ হতে পারে ? এজন্য সুদ সর্বাবস্থায়ই যুলুম, তা সে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে গৃহীত ঋণের উপরেই হোক অথবা ব্যবসার উদ্দেশ্যে গৃহীত ঋণের উপরে। ইনসাফ এই যে, আপনি যদি ঋণ দেন, তাহলে শুধু আসল ফেরত পাবার নিশ্চয়তা আপনার থাকতে হবে। আর যদি আপনি ব্যবসায় মূলধন বিনিয়োগ করতে চান, তাহলে একজন অংশীদার হিসেবে বিনিয়োগ করুন।

জবাব ঃ অষ্টম প্রশ্ন

এ প্রশ্নের জবাব আমি আমার গ্রন্থ 'সুদের সংস্কারের কার্যকরী পন্থা' শীর্ষক অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে দিয়েছি। এখানে সংক্ষেপে জবাব দিচ্ছি ঃ

(ক) শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর সাধারণ অংশ সম্পূর্ণ জায়েয কিন্তু শর্ত এই যে, সে সবের ব্যবসা হারাম ধরনের না হয়।

(খ) প্রাধান্যমূলক অংশে (PREFERENCE SHARES) নির্দিষ্ট মুনাফার নিশ্চয়তা থাকে বলে তা সুদের সংজ্ঞায় পড়ে এবং তা নাজায়েয।

(গ) ব্যাংকের নির্দিষ্ট আমানত (FIXED DEPOSITS) সম্পর্কে দু রকম পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। যারা শুধু নিরাপত্তার জন্যে তাদের টাকা জমা রাখতে চায় এবং নিজের টাকা কোনো কারবারে লাগাতে ইচ্ছুক নয়, তাদের টাকা ব্যাংক আমানত রাখার পরিবর্তে ঋণ হিসেবে গ্রহণ করবে, ব্যবসায় খাটিয়ে মুনাফা লাভ করবে এবং আসল টাকা নির্দিষ্ট সময়ে ফেরত দেয়ার নিশ্চয়তা দিবে।

যারা তাদের টাকা ব্যাংকের মাধ্যমে ব্যবসায় লাগাতে চায়, তাদের টাকা আমানত রাখার পরিবর্তে ব্যাংক তাদের সাথে একটা সাধারণ অংশীদারিত্বের চুক্তি করবে। এ ধরনের সমস্ত টাকা ব্যাংকের আওতায় পড়ে এমন বিভিন্ন

প্রকারের ব্যবসা, শিল্প, কৃষি এবং অন্যান্য কাজে বিনিয়োগ করবে। অতপর এ সামগ্রিক কারবারে যা মুনাফা হবে, তা একটি নির্ধারিত অনুপাতে ঐসব লোকের মধ্যে এমনভাবে ভাগ করে দেবে ব্যাংকের অংশীদারদের মধ্যে যেমনভাবে ভাগ করা হয়।

(ঘ) ব্যাংকের ঋণপত্র (লেটার অব ক্রেডিট) খোলার বিভিন্ন উপায় আছে। শরীয়ত অনুযায়ী তাদের অবস্থাও আলাদা ধরনের। যেখানে ব্যাংকে শুধু একটি সার্টিফিকেট দেয়া দরকার যে, অমুক ব্যক্তি নির্ভরযোগ্য, সেখানে ব্যাংক বৈধভাবেই তার অফিস খরচ বাবদ ফিস গ্রহণ করতে পারে। আর যেখানে ব্যাংক অপর পক্ষকে টাকা দেয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করবে, সেখানে সুদ আরোপ করা উচিত হবে না। তার পরিবর্তে বিভিন্ন বৈধ পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ ব্যাংকের চলতি হিসেবে (CURRENT ACCOUNT) ব্যবসায়ীদের যে টাকা থাকে, তার কোনো সুদ দেয়া উচিত হবে না। বরঞ্চ হিসেব রাখার জন্যে পারিশ্রমিক নেয়া যাবে এবং এসব টাকা স্বল্প মেয়াদী ঋণের আকারে বিনা সুদে ব্যবসায়ীদেরকে দেয়া উচিত। এ ধরনের ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে ব্যাংক কোনো সুদ গ্রহণ করবে না। অবশ্যি অফিস খরচের জন্যে তাদের কাছ থেকে ফিস নিতে পারে।

(ঙ) সরকার স্বয়ং অথবা তার প্রভাবাধীন যত প্রতিষ্ঠান কায়েম করবে তার থেকে সুদের উপাদান দূরীভূত হওয়া উচিত। এর পরিবর্তে সামান্য মনোযোগ দিয়ে এবং চিন্তা-গবেষণা করে অন্য পন্থা আবিষ্কার করা যেতে পারে যা বৈধ এবং লাভজনক হয়। এ ধরনের যাবতীয় প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে একটি সার্বিক আলোচনা এখানে কয়েকটি কথায় সম্ভব নয়। প্রথমত, প্রয়োজন হচ্ছে হারাম বস্তুকে হারাম বলে স্বীকার করা। তার থেকে বেঁচে থাকার ইচ্ছাও থাকা চাই। তারপর প্রতিটি কর্পোরেশনের জন্যে একটি করে কমিটি গঠন করতে হবে যে, কর্পোরেশনের সকল কাজের উপর দৃষ্টি রাখবে এবং দেখবে যে, কোথায় কোথায় তার বিভিন্ন কাজ-কর্ম হারাম পন্থায় কলুষিত হচ্ছে। আর এটাও দেখবে যে, তার বিকল্প কি হতে পারে যা ইসলামের দৃষ্টিতে জায়েয, কার্যকর এবং লাভজনক হয়। পাশ্চাত্যের প্রতিষ্ঠিত পথে আমরা যে চলতে অভ্যস্ত হয়ে এসেছি, সেই পথেই চক্ষু বন্ধ করে চলতে চাই এবং সকল প্রচেষ্টা এ ব্যাপারে নিয়োজিত করছি যে, কোনো প্রকারে এ পথ আমাদের জন্যে বৈধ করে দেয়া হোক। সর্বপ্রথম আমাদের এ মানসিকতার পরিবর্তন প্রয়োজন। আমাদের আরাম প্রিয়তা আমাদেরকে এ অনুমতি দেয় না যে, আমরা চিন্তাভাবনা ও পরিশ্রম করে কোনো নতুন পথ আবিষ্কার করি। দুর্ভাগ্যের বিষয় অন্ধ

অনুকরণের ব্যাধি গোটাজাতিকে সংক্রমিত করে রেখেছে। এ ব্যাধি থেকে কি জুব্বাধারী আর কি সুটবুট পরিধানকারী কেউই আরোগ্য লাভ করছে না।

(চ) দেশের অভ্যন্তর থেকে গৃহীত সরকারী ঋণের সুদ দেয়া যাবে না। এর পরিবর্তে সরকারের যেসব পরিকল্পনার অধীন ঋণের মূলধন খাটানো হয়, সেগুলোকে একটি মূলনীতির উপর সংগঠিত করতে হবে এবং তার যে মুনাফা হবে, তার থেকে একটা নির্ধারিত অনুপাতে মুনাফা ঐসব লোকের মধ্যে বন্টন করতে হবে যাদের পুঁজি ব্যবহার করা হচ্ছে। তারপর যে সময়ের জন্যে তাদের টাকা নেয়া হয়েছিল তার মেয়াদ শেষ হবার পর আসল টাকা ফেরত দিলে, মুনাফা লাভে তাদের অংশীদারিত্ব আপনা আপনি শেষ হয়ে যাবে। এ অবস্থার প্রকৃতপক্ষে কোনো বিরাট পরিবর্তনের প্রয়োজন হবে না। নির্দিষ্ট হারে সুদে যে ঋণ গ্রহণ করা হয়, তা পরিবর্তন করে শুধু লাভের অনুপাতে অংশীদারিত্বের রূপ দিতে হবে।

বিদেশ থেকে যে ঋণ গ্রহণ করা হয়, সে বিষয়টি বেশ জটিল। যতক্ষণ পর্যন্ত এসব ঋণের যাঁচাই-পর্যালোচনা বিশদভাবে করা না হয়েছে, ততক্ষণ এদের ধরন কি হবে এবং এসব ব্যাপারে অবৈধতা থেকে বাঁচার জন্যে কতদূর কি করা যেতে পারে, তা বলা যায় না। অবশ্যি নীতিগত দিক দিয়ে যে কথা আমি বলতে পারি তা এই যে, আমাদের সকল মনোযোগ ও প্রচেষ্টা দেশের অভ্যন্তর থেকে সুদ দূর করার কাজে নিয়োজিত করতে হবে। আর বাইরের দেশগুলোর সাথে সুদী লেনদেন থেকে বাঁচার কোনো উপায় যতদিন না থাকবে, ততদিন এ বিপদ বরদাশত করতে হবে। আমাদের ক্ষমতার সীমা যতটুকু পর্যন্ত, ততটুকু পর্যন্তই খোদার কাছে দায়ী। সে সীমা পর্যন্ত যদি আমরা গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকতে পারি, তাহলে বাধ্যতামূলকভাবে কিছু করলে তার জন্যে ক্ষমা পাবার আশা করতে পারি।–(তর্জুমানুল কুরআন মে-জুন-১৯৬০)

সুদ সমস্যা ও দারুল হরব

জনাব মাওলানা মানাযির আহসান গিলানী মরহুম

(সুদ সম্পর্কে আলেমদের একটি দল আলোচনার এ দিকটিও তুলে ধরেছেন যে, ভারত হচ্ছে দারুল হরব এবং দারুল হরবে হরবী অমুসলিমদের নিকট থেকে সুদ নেয়া জায়েয। জনাব গিলানী সাহেব নিম্নের প্রবন্ধে এ দিকটা জোরালো ভাষায় তুলে ধরেছেন। পাঠকদের অবগতির জন্যে তা আমরা এখানে উদ্ধৃত করছি। পরবর্তী অধ্যায়ে এর পূর্ণ সমালোচনা আমরা করেছি। তবে কতকগুলো বিষয়ের জবাব যথাস্থানে পাদটীকায় দিয়েছি। এ আলোচনা পাঠ করার সময় মনে রাখতে হবে যে, এ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ভারতে বৃটিশ আমলে–১৯৩৬-৩৭ খৃস্টাব্দে)।

অনৈসলামী শক্তি কর্তৃক অধিকৃত দেশ সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভংগী

এ দেশ দুই ধরনের হতে পারে। এক হতে পারে এই যে, এ দেশে ইসলামী হুকুমত কখনো কায়েম হয়নি। অথবা হয়েছে কিন্তু আন্তর্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বীতার ফলে এ দেশে অনৈসলামী শক্তির অধিকার স্থাপিত হয়েছে। প্রথম অবস্থায় তো এরূপ দেশের অনৈসলামী অধিকারভুক্ত ও অমুসলিম রাজ্য হওয়া সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। অনৈসলামী রাষ্ট্রকে ইসলামী রাষ্ট্র কে বলতে পারে ? কিন্তু আলোচনা একটু অন্যভাবে শুরু হচ্ছে।

আব্বাসীয় রাষ্ট্রের প্রধান বিচারপতি ইমাম আবু ইউসুফ এবং ফেকাহ প্রণেতা ইমাম শায়বানী এ সম্পর্কে নিম্ন ফতোয়া দিয়েছেন ঃ

ان دار الاسلام تصير دار الكفر بظهور احكام الكفر فيها ـ(بدايع الصنائع ـ كاسانى ـ جلد ٧ صـ ١٣)

দারুল ইসলামে কুফরী আইন জারী হলেই তা দারুল কুফর হয়ে যায়।

ফতোওয়ায়ে আলমগীরিতে অনৈসলামী আইন জারীর ব্যাখ্যা নিম্নরূপ করা হয়েছে ঃ

اى على الاشتهار و ان لايحكم فيها بحكم اهل الاسلام ـ

অর্থাৎ প্রকাশ্যভাবে সেই দেশে যদি ইসলামী আইন অনুসারে বিচার-শাসন না হয়।

এর অর্থ এই যে, যে দেশে আল্লাহ্ তায়ালার কালাম এবং শেষ নবী (স)-এর নির্দেশাবলী থেকে গৃহীত কার্যকর না থাকে, সে দেশই হচ্ছে অনৈসলামী দেশ এবং সে রাষ্ট্রকে অনৈসলামী রাষ্ট্র মনে করতে হবে। সে দেশে আদৌ কোনো আইন নেই, অথবা থাকলেও তা অনৈসলামী জনমস্তিষ্ক ও অনৈসলামী সূত্র প্রসূত আইন। মোটকথা, যে দেশ থেকে ইসলামী রাষ্ট্রের আইন-কানুন বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং যেখানে অনৈসলামী আইন জারী হয়েছে, না তা আর ইসলামী দেশ থাকে, আর না সে রাষ্ট্রকে ইসলামী রাষ্ট্র মনে করা যেতে পারে। এ হলো একটি মোটামোটি ব্যাখ্যা। ইমাম শ্রেষ্ঠ আবু হানিফা (র) অধিকতর বিশদভাবে অনৈসলামী রাষ্ট্রের প্রকৃত ব্যাখ্যা নিম্নরূপ করেছেন ঃ

ان دار الاسلام لاتصير دار الكفر الا بثلاث شرائط احدهما ظهور احكام الكفر فيها الثانى ان تكون ملحقة بدار الكفر والثالث ان لايبقى فيها مسلم او ذمى امنا بالامان الاول-(بدائع الصنائع- كاشانى جلد ٧ صـ ١٣)

"তিনটি শর্ত ব্যতীত দারুল ইসলাম দারুল কুফর হয় না। প্রথমত যদি কুফরী আইন সেখানে জারী হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত, যদি সে দেশ কোনো দারুল কুফরের সাথে মিলিত হয়ে যায়। তৃতীয়ত, যদি সে দেশে মুসলমান অথবা জিম্মী পূর্বের মতো নিরাপত্তার সাথে বাস করতে না পারে।"

এখন দুনিয়ার অধিকাংশ স্থানেই অনৈসলামী রাষ্ট্র রয়েছে। কিন্তু তাদের প্রকৃত অবস্থা আমার জানা নেই এবং তাদের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমার নিকটে শরীয়তের কোনো সাক্ষ্য প্রমাণও নেই। কিন্তু ভারত[১] আমাদের নিকট বর্তমান রয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এ দেশকেই ধরা যাক এবং দেখা যাক যে, ইমাম আবু হানিফা (র) অনৈসলামী রাষ্ট্রের যে আইনানুগ ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা এদেশের উপর কতটা প্রযোজ্য।

এতো জানা কথা যে, এ দেশে শরীয়তের আইন নয়, বরঞ্চ বৃটিশ আইন-কানুন ও শাসন প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহর কালাম কুরআন মজীদ এবং নবী (স)-এর হাদীস থেকে যে ইসলামী আইন প্রণীত হয়, তা এখানে আদৌ প্রতিষ্ঠিত নেই। বরঞ্চ অনৈসলামী মন-মস্তিষ্ক (তা সে একজনের হোক অথবা অনেকের, ভারতীয়ের হোক অথবা অভারতীয়ের) প্রসূত আইন-কানুন এ দেশে জারী আছে। এ দিক দিয়ে এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে, ইমাম সাহেবের উপরোক্ত সংজ্ঞার প্রথম কথা অনৈসলামী আইনের বাস্তবায়ন—সর্বতোভাবে এ দেশের উপর প্রযোজ্য।

১. বিভাগ পূর্ব ভারত

এভাবে দ্বিতীয় শর্তও যে এ দেশের উপর প্রযোজ্য তাতে কে সন্দেহ পোষণ করতে পারে ? ভৌগলিক দিক দিয়ে দেখতে গেলে কে না জানে যে, ভারতের সীমান্তের অধিকাংশই অনৈসলামী দেশ ও রাষ্ট্রের সাথে মিলিত হয়ে আছে। এমনভাবে মিলিত যে, উভয়ের মধ্যস্থলে কোনো ইসলামী দেশ নেই। আলমগীরিতে আছে ঃ

عدم اتصال بان لايتخلل بينها بلدة من بلاد الاسلام

"সংযুক্ত না হবার অর্থ এই যে, দারুল কুফর এবং দারুল ইসলামের মধ্যে কোনো ইসলামী শহর না থাকা (শামী থেকে বর্ণিত)।"

এ দেশের উত্তর এবং পূর্ব দিক তো স্থল সীমান্ত দ্বারা সীমিত। এখন রইলো সমুদ্র সীমান্ত। এ সম্পর্কে কথা এই যে, প্রথমত, আপাত দৃষ্টিতে গোটা সমুদ্রের উপর অনৈসলামী শক্তির পূর্ণ অধিকার বিদ্যমান। এমন কি এদের অনুমতি ব্যতিরেকে এসব সমুদ্রে আর কেউ তাদের জাহাজ চালাতে পারে না। আর যদি এরূপ নয় বলেও ধরে নেয়া যায়, তথাপি স্থলের সংযোগই তো শর্ত পূরণ করার জন্যে যথেষ্ট। উপরন্তু ইসলামী ফকীহগণের সমুদ্র সম্পর্কে ব্যাখ্যা নিম্নরূপ ঃ

ان بحر الملح ملحق بدار الحرب -(شامی صـ ۲۷۷)

লবণাক্ত সমুদ্র অনৈসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা হবে[১] মোটকথা যেভাবেই চিন্তা করুন না কেন, এ শর্তের ব্যাখ্যায়ও কোনো অস্পষ্টতা নেই। ইমাম সাহেবের উদ্দেশ্য এই ছিল যে, যদি চারদিক থেকে ইসলামী রাষ্ট্রের দ্বারা পরিবেষ্টিত কোনো দেশে অনৈসলামী রাষ্ট্র অধিকার লাভ করে, তাহলে তা দীর্ঘস্থায়ী হয় না এবং এমন মনে করা যায় না যে, সেখানে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা কঠিন। ফকীহগণ এর বিশদ ব্যাখ্যাও করেছেন। সামনে একটি প্রশ্নের আলোচনায় তার কিছুটা আসবে।

এখন তৃতীয় শর্তের কথা। একথা সত্য যে, বিভিন্ন আইন ও দণ্ডবিধির অধীনে অন্যান্য জাতির সাথে মুসলমানদেরকেও ফাঁসী দেয়া হয়। আর এ বিষয়ে আদৌ লক্ষ্য করা হয় না যে, ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে এ ব্যক্তি প্রাণদণ্ডের যোগ্য কিনা। এভাবে এখানকার বিচারালয়গুলো বর্তমান আইন অনুযায়ী মুসলমানদের সম্পদ অন্যকে দিয়ে দিচ্ছে এবং এ বিষয়ে লক্ষ্য করা

১. ইসলামী ফকীহগণ একথা এমন এককালে বলেছিলেন, যখন সমুদ্রে জলদস্যুদের চরম উৎপাত চলছিল এবং ইসলামী রাষ্ট্রের নৌশক্তি তখন এতটা প্রবল ছিল না যে, সামুদ্রিক পথে পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে। এটাকে একটা সাধারণ এবং স্থায়ী নির্দেশরূপে গণ্য করা কিছুতেই ঠিক হবে না। আজ যদি সমুদ্রের উপরে কোনো ইসলামী রাষ্ট্রের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, যেমন বৃটিশের আছে, তাহলে কেন আমরা তা হাত ছাড়া করে পানিকে দারুল হরবের সাথে সংযুক্ত করবো।-(মওদূদী)

হচ্ছে না যে, ইসলামী আইন অনুযায়ী সে ব্যক্তির সম্পদ অন্যকে দেয়া যায় না। আদালত থেকে প্রতিদিন লাখো লাখো কোটি কোটি টাকা সুদের ডিক্রী জারী করা হচ্ছে। শুধুমাত্র সুদ কেন, অসংখ্য এমন বিষয় আছে যেখানে ইসলামী আইন অনুযায়ী একজন মানুষের সম্পদ নিরাপদ ও সুরক্ষিত মনে করা হয়। কিন্তু দেশের আইন এ সম্পদের হকদার অন্যকে বানিয়ে দেয়।

এতো গেল জান ও মালের নিরাপত্তার অবস্থা। এখন মান-সম্মানের নিরাপত্তার অবস্থা দেখুন। মুসলমানদের জেল, দীপান্তর, জরিমানা, বেত্রদণ্ড প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার দণ্ড বিভিন্ন আইনের ধারানুসারে দেয়া হয়। কিন্তু সে সময়ে এটা কি লক্ষ্য করা হয় যে, এসব শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির মান-সম্মান ইসলামী আইন অনুসারে ভূলুণ্ঠিত হবার যোগ্য ছিল কি ? আমি একথা বলতে চাই না যে, ভারতে মুসলমানদের নিরাপত্তা নেই। কিন্তু আমার বক্তব্য এই যে, তাদের ইসলামী নিরাপত্তা নেই। কারণ স্বয়ং ইমাম আবু হানিফা (র) নিরাপত্তার নিম্নরূপ ব্যাখ্যা করেছেন ঃ

امنا بالامان الاول هو امان المسلمين ـ(بدائع)

"সেই নিরাপত্তা যা মুসলমানদের আইন অনুযায়ী হয়।"

আলমগীরিতে এর ব্যাখ্যা অধিকতর বিশদভাবে করা হয়েছে ঃ

اى الذى كان ثابتا قبل استيلاء الكفار للمسلم باسلامه وللذمى لعقد الذمة ـ(منقول ازشامى)

"অনৈসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বে মুসলমানদের ইসলামের কারণে এবং জিম্মীদের দায়িত্বের চুক্তির কারণে যে নিরাপত্তা ছিল, তা আর নেই।"

প্রকৃত ব্যাপারও তাই যে, যে দেশে অনৈসলামী শক্তির শাসন কায়েম হয়েছে এবং যে দেশে অনৈসলামী আইন চালু হয়েছে তাকে ইসলামী দেশ বলা অথবা সেখানে ইসলামী রাষ্ট্র হবার দাবী করা হাস্যকর মনে হয়। অন্যের দেশকে এবং অন্যের সরকারকে ইসলামী দেশ মনে করার অনুমতি মুসলমানদেরকে দুনিয়ার কোন্ সরকার দিতে পারে ?

ইসলামী ফকীহগণ কখনো কখনো এ দেশকে দারুল হরব বলে ব্যাখ্যা করেছেন। সম্ভবত এর থেকেই ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। প্রকৃত ব্যাপার এই, পূর্ববর্তী ওলামায়ে ইসলাম অধিকাংশ এ ধরনের দেশ সম্পর্কে দারুল ইসলামের বিপরীত দারুল কুফরের পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। এক্ষণি 'বাদায়ে' প্রণেতার উক্তির উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। তিনি তাঁর গ্রন্থে সাধারণত দারুল কুফরের পরিভাষা ব্যবহার করেছেন, যার সহজ সরল অর্থ হচ্ছে—যেখানে ইসলামী

শাসন নেই। যেখানে ইসলামী শাসন থাকবে না, যে দেশ মুসলমানদের হস্তগত হবে না, তাকে কি মুসলমানগণ মুসলমানদের সরকার এবং মুসলমানদের দেশ বলবে?

এ হলো প্রথম প্রশ্নের জবাব। এখন দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি।

অনৈসলামী রাষ্ট্রে মুসলমানদের জীবন পদ্ধতি

ইসলাম মুসলমানদের স্বাধীন বলে মনে করে এবং স্বাধীনতাকে স্বাভাবিক ও খোদাপ্রদত্ত অধিকার বলে স্বীকার করে। সাময়িকভাবে যদি কোনো মুসলমানদের অনৈসলামী রাষ্ট্রে গিয়ে বসবাস করার প্রয়োজন হয়, তাহলে সে রাষ্ট্রের অধিবাসীদের সাথে তার সম্পর্কের ধরনটা কি হবে—এ সম্পর্কে ইসলামী ফকীহগণ ইসলামী আইনের বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। বলতে গেলে আইনের দিক দিয়ে তার উপায় একটি এই যে, সেই মুসলমান সে রাষ্ট্রের সাথে একটা চুক্তি করবে যে, সে সেই রাষ্ট্রের প্রচলিত আইন মেনে চলবে। অর্থাৎ আইন-শৃংখলার পরিপন্থী কিছু করবে না। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় এরূপ মুসলমানকে নিরাপত্তা মুসলমান বলে। কুরআন পাকে চুক্তি সম্পর্কে সাধারণ নিয়ম এই ঃ

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ○(المؤمنون : ٨)

"যারা তাদের আমানত ও তাদের ওয়াদা-চুক্তির রক্ষণাবেক্ষণ করে।"

اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ –চুক্তি পূরণ করে।–(সূরা মায়েদা ঃ ১)

ইসলাম চুক্তিকে একটা বিরাট দায়িত্ব বলে ঘোষণা করেছে এবং তার জন্যে জবাবদিহি অপরিহার্য। এতো হলো সাধারণ চুক্তি সম্পর্কে ইসলামের শিক্ষা। আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট আইন মুসলমানদের উপর নির্ধারিত করা হয়েছে ঃ

اَلَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوْكُمْ شَيْئًا وَّلَمْ يُظَاهِرُوْا عَلَيْكُمْ اَحَدًا فَاَتِمُّوْا اِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ ـ(التوبة : ٤)

"যেসব মুশরিকদের সাথে তোমরা চুক্তি করেছ এবং তারা সে চুক্তির কোনো অংশই লংঘন করেনি এবং তোমাদের মুকাবিলায় অন্য কাউকে সাহায্য করেনি, এমতাবস্থায় তাদের চুক্তি পূরণ কর।"-(সূরা তাওবা ঃ ৪)

কোনো চুক্তি না থাকলে অথবা অপর জাতি চুক্তি ভংগ করলে তার জন্যে কি করতে হবে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। এখানে 'চুক্তি আইনের' শুধু সেই ধারাটি আলোচনা করা হচ্ছে যার ভিত্তিতে

চুক্তি পালন করা মুসলমানদের জন্যে অপরিহার্য হয়ে যায়। যে মুসলমান চুক্তি ভংগ করবে তার পরিণাম কি হবে সে বিষয়ে নবী করীম (স) বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। নবী (স) বলেন ঃ

ان الغادر ينصب له لواء يوم القيمة فيقال انه غدرة فلان -(ابوداؤد)

"চুক্তি ভংগকারীদের জন্যে কিয়ামতের দিনে একটা নিশান উড়ানো হবে এবং বলা হবে এ অমুক ব্যক্তির চুক্তি ভংগের নিশান।"

অপর এক বর্ণনায় আছে ঃ

لكل غادر لواء يركز عند باب استه يوم القيمة يعرف يه غدرة

"চুক্তি ভংগকারীর দেহের বিশিষ্ট স্থানে একটি নিশান প্রোথিত করা হবে। এর দ্বারাই কিয়ামতের দিনে তার পরিচয় পাওয়া যাবে।"

নবী করীম (স) যখন সেনাবাহিনীকে বিদায় দিতেন তখন এরূপ উপদেশ দিতেন ঃ لاتغلوا ولا تغدروا

"তোমরা বিশ্বাস ভংগ এবং চুক্তি ভংগ কিছুতেই করবে না।"

এজন্য ইসলামের আলেম সমাজ 'চুক্তি ভংগকে' সমবেতভাবে হারাম ফতোয়া দিয়েছেন ঃ الغدر حرام بالاجماع -(فتح القدير ج ٥ ص ٣٣٦)
"চুক্তি ভংগ সর্বসম্মতিক্রমে হারাম।"

মুসলমানদের অতুলনীয় শান্তি প্রিয়তা

'চুক্তি আইনের' তথ্য অবগত হবার পর যে মুসলমান কোনো অনৈসলামী রাষ্ট্রের সাথে শান্তি চুক্তি করে, তদানুযায়ী 'নিরাপত্তা প্রাপ্ত' (মুস্তামান) ব্যক্তি হিসেবে বসবাস করতে থাকে, তার দায়িত্ব যে কত কঠিন তা স্পষ্ট বুঝা যায়। হেদায়া গ্রন্থে আছে ঃ

اذا دخل المسلم دار الحرب فلا يحل له ان يتعرض لشئ من اموالهم ولا من دمائهم لانه ضمن ان لايتعرض بهم بالاستئمان -

"কোনো মুসলমান যখন কোনো অমুসলিম রাষ্ট্রে প্রবেশ করে তখন তার জন্যে সেখানকার অধিবাসীদের জান ও মালে হস্তক্ষেপ করা তার জন্যে জায়েয হবে না। কারণ (চুক্তির মাধ্যমে) সে এরূপ না করার নিশ্চয়তা দান করেছে এবং শান্তি চুক্তির পর এটা হয়ে পড়ে তার বিরাট দায়িত্ব।"

একথার অর্থ এই যে, যখন কোনো রাষ্ট্রের সাথে কোনো মুসলমান চুক্তি করার পর যখন সে দেশে প্রবেশ করে তখন ঐ রাষ্ট্র অপরের জান-মাল রক্ষার

জন্যে যেসব আইন-কানুন জারী করেছে, তা ভংগ করা তার জন্যে একেবারে নাজায়েয। সে অনৈসলামী রাষ্ট্র যেসব কার্যকলাপকে আইন বিরুদ্ধ ঘোষণা করেছে, তা করার কারণে সে শুধু আইনতই অপরাধী হবে না, বরঞ্চ চুক্তি আইন অনুযায়ী সে চুক্তিভংগের দায়ে অপরাধী হবে। ইসলাম, কুরআন এবং আল্লাহর কাছেও অপরাধী হবে। কুরআন, হাদীস এবং সর্বসম্মত ফতোয়া অনুযায়ী যে কাজ হারাম করা হয়েছে, তা করে সে গোনাহগার হবে। কে এমন আছে যে, তার ধর্মে অপর জাতির আইন-কানুন মেনে চলাকে এতটা প্রয়োজনীয় বলে প্রমাণ করতে পারে ? মুসলমানদের প্রতি শান্তি ভংগের অভিযোগ করা হয়ে থাকে। কিন্তু লোকদের জানা নেই যে, তাদের চেয়ে অধিকতর শান্তিপ্রিয় ও আইনের প্রতি আনুগত্যশীল জাতি দুনিয়ায় কেউ নেই।

فَاَیُّ الْفَرِیْقَیْنِ اَحَقُّ بِالْاَمْنِ ۚ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ -(الانعام : ٨١)

"উভয় পক্ষের মধ্যে কোন্ দল নিরাপত্তার অধিকতর অধিকারী, যদি তোমরা জান (তো বল)।"-(সূরা আল আনআম ঃ ৮১)

কতিপয় আলেম সম্ভবত এর উপর ভিত্তি করে ফতোয়া দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি ডাকে পত্র দেয়ার সময় নির্ধারিত ওজনের বেশীর জন্যে অতিরিক্ত টিকেট লাগায় না অথবা যে ব্যক্তি বিনা ভাড়ায় নির্ধারিত ওজনের অধিক মাল রেল গাড়ীতে বহন করে, সে শুধু দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ীই অপরাধী হয় না, বরঞ্চ আল্লাহর নিকটে এবং আপন ধর্মের নিকটেও অপরাধী।

আন্তর্জাতিক আইন সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

এখানে আন্তর্জাতিক আইন সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন। সাধারণত তা উপলব্ধি না করার জন্যে বিভিন্ন প্রকারের ভুল ধারণা প্রচলিত আছে। সম্ভবত অন্যান্য আইন সম্পর্কেও এ প্রশ্ন উথাপিত হয়েছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় ইসলামী আইন এ প্রশ্নটি উত্থাপন করেছে। বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন সময়ে একে অপরের উপর আক্রমণ চালায়। এক জাতি অন্য জাতির জান-মাল, ধন-সম্পত্তি ও অধিকৃত দেশের উপর আক্রমণ করে। এখন আমাদের আলোচনার বিষয় নয় যে, এ আক্রমণ বৈধ কি অবৈধ এবং বৈধ হলে তা কি উপায়ে। বরঞ্চ এ সময়ে আমাদের প্রশ্ন এই যে, এক জাতি অন্য জাতির সম্পদের উপর যে আধিপত্য লাভ করলো তা কি সংগত হলো ? অর্থাৎ আইনত ও ধর্মত কি দখলদার জাতি তার মালিক হয়ে গেল ? মনে করুন, কোনো যুদ্ধে ইংরেজ-জার্মান অথবা অন্য কোনো জাতির সম্পদ লাভ করার পর তা মুসলমানদের কাছে বিক্রি করতে চায়। সাধারণত সে সময়ে আইনের প্রতি আনুগত্যশীল একজন পাকা দ্বীনদার মুসলমানের

জন্যে এ প্রশ্নের সমাধান প্রয়োজন হয়ে পড়ে। অন্য জাতির জন্যে এ বিষয়ে কোনো মাথা ব্যাথা হোক বা না হোক, কিন্তু মুসলমান কোনো অধিকারকে ততক্ষণ পর্যন্ত ন্যায়সংগত মনে করতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলামী আইন তার ন্যায়সংগত হবার ফতোয়া না দিয়েছে। তার জন্যে অপরিহার্য যে, সে তার শরীয়তের কাছে জানতে চাইবে যে, ইংরেজ-জার্মানবাসী সে সম্পদের মালিক হয়েছে কিনা। যদি হয়ে থাকে, তাহলে তার বিক্রি করা এবং আমাদের খরিদ করা ও খরিদ করে নিজের কাজে লাগানো ন্যায়সংগত হবে। কিন্তু ইংরেজ যদি নিজেই অন্যায়ভাবে মালিক হয়ে থাকে, তাহলে তার বিক্রি করার অধিকার নেই। আর তার যদি বিক্রি করার অধিকারই না থাকে, তাহলে আমি তা খরিদ করার পর কিরূপে তার মালিক হবো। মোটকথা, আন্তর্জাতিক আইনের এ একটা বড় মজার প্রশ্ন। ইসলামী ফকীহগণ এ সম্পর্কে তাঁদের গ্রন্থে অধ্যায় সন্নিবেশিত করেছেন এবং খুঁটিনাটি বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সারকথা এই যে, এ প্রশ্নের কয়েকটি উপায় আছে।

এক ঃ তা হচ্ছে এই যে, কোনো অমুসলিম জাতির[১] সম্পদ এভাবে দখল করা হলে ইসলাম এ দখলের পর দখলকারীকে ঐ সম্পদের ন্যায়সংগত মালিক ঘোষণা করে। ফতহুল কাদীরেতে আছে ঃ

اذا غلب الترك على كفار الروم فسلبوهم واخذوا اموالهم ملكوها ـ

"যদি তুরস্কের কাফেরগণ ইউরোপের কাফেরগণের উপর বিজয়ী হয় এবং তাদেরকে বন্দী করে তাদের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করে নেয়, তাহলে তারা তার মালিক হয়ে যাবে।"–(৩য় খণ্ড, ১৪৫ পৃঃ)

দুই ঃ কোনো অমুসলিম জাতি কোনো মুসলমান রাষ্ট্রের উপর পূর্ণ আধিপত্য লাভ করলো। এমতাবস্থায় ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ এবং ইমাম আবু হানিফা প্রমুখ ইমামগণের ফতোয়া নিম্নরূপ ঃ

اذا غلبوا على اموالنا والعياذ بالله واحرزواها بدارهم ملكوها ـ

"আর যদি কাফেরগণ, খোদা না খাস্তা, আমাদের সম্পদ দখল করে বসে এবং তা তাদের নিজ দেশে নিয়ে যায়, তাহলে তারা তার অধিকারী হবে।"–(হেদায়া)

সুতরাং এমতাবস্থায় শুধু অমুসলিমই যে অমুসলিমদের সম্পদের ন্যায়সংগত মালিক হয়ে যাবে তা নয়, বরঞ্চ যদি মুসলমানদের সম্পদের উপরে কাফেরগণও

১. মনে রাখতে হবে যে, আমি অমুসলিম বলতে তাদেরকে বুঝিয়েছি যারা মুসলমান নয় এবং কোনো ইসলামী রাষ্ট্র তাদের জান-মালের দায়িত্ব গ্রহণ করেনি।–(গিলানী)

পূর্ণ অধিকার লাভ করে, তাহলে ইসলাম এ অধিকারকেও সংগত বলে স্বীকার করে নিয়ে কাফেরকে এ সম্পদের মালিক মনে করে। এটা কি ইসলামের অসংগত আচরণ ?

রক্ষিত ও অরক্ষিত সম্পদ এবং তার বৈধতা ও অবৈধতা

যেহেতু শেষোক্ত প্রশ্নে অন্যান্য ইমামগণের সাথে ইমাম শাফেয়ী (র) দ্বিমত পোষণ করেছেন, সে জন্যে ইসলামী ফকীহগণ কুরআন, হাদীস এবং বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে এ আইনটির খাঁটি ইসলামী আইন হওয়া সম্পর্কে অত্যন্ত সুস্পষ্ট প্রমাণ পেশ করেছেন। কিন্তু প্রবন্ধ দীর্ঘ হয়ে যায় বলে তা উদ্ধৃত করার প্রয়োজন নেই। আমি এখানে শুধু কুরআন হাদীস থেকে গৃহীত আইনগত সমালোচনারই উল্লেখ করছি ঃ

ان الا ستيلاء ورد على مال صباح فيصير سبيلا للملك -(هدايه ص ٢٥٥)

"বৈধ মালের উপর কাফেরদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এজন্য এ অধিকার মালিকানার কারণ হবে।"

এর অর্থ এই যে, মুসলমানদের সম্পদ মুসলমানদের জন্যে তো নিসন্দেহে রক্ষিত। অপর কোনো মুসলমানের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রহণ করা প্রতিটি মুসলমানের জন্যে নিষিদ্ধ। কিন্তু অপর জাতির জন্যে এ আইন চলে না। তাদের জন্যে তো এ বৈধ হবে। শামী গ্রন্থে আছে ঃ

لان العصمة من جملة الاحكام المشروعة وهم لم يخاطبوابها فبقى فى حقهم مالا غير معصوم اى هو مباح يملكونه -(ج ٣ - ص ٢٦٧)

"কারণ সম্পদের নিরাপত্তা তো একটি ইসলামী আইন। অনৈসলামী দেশের বাসিন্দাগণ এ আইনের আওতায় পড়ে না। এজন্য মুসলমানের সম্পদ তাদের জন্যে রক্ষিত নয়। অর্থাৎ তা তাদের জন্যে বৈধ। অতএব তারা তার মালিক হয়ে যাবে।"–(তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৬৭)

এখন স্বাভাবিকভাবেই তৃতীয় উপায়টি সামনে এসে যায়। তা এই যে, এভাবে যদি কোনো মুসলমান অমুসলিম দেশ ও সম্পদের উপর অধিকার লাভ করে, তাহলে সে তার মালিক হবে কিনা ? এ আন্তর্জাতিক আইনের মূলনীতি অনুযায়ী এর জবাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট। যদি অমুসলমান মুসলমানের সম্পদের মালিক হয়ে যেতে পারে তাহলে ধর্ম, দীন, নৈতিকতা ও আইনের দিক দিয়ে এ অধিকার মুসলমানের কেন হবে না ? 'বাদায়েতে' বলা হয়েছে ঃ

مال الحربى مباح لانه لاعصمة لمال الحربى -(ص ١٣٢ كاسافى)

"অর্থাৎ যে অমুসলমানের জান ও মালের দায়িত্ব কোনো ইসলামী রাষ্ট্র গ্রহণ করেনি, তার সম্পদ বৈধ। কারণ এ ধরনের অমুসলমানের সম্পদ রক্ষিত নয়।"

কি আশ্চর্যের কথা যে, যে জাতি নিজেদের জান ও মালের দায়িত্ব মুসলমানদের উপর অর্পণ করেনি, ইসলামের রক্ষণাবেক্ষণ ও দায়িত্ব যারা অস্বীকার করে, তাহলে ইসলাম তাদের দায়িত্ব অস্বীকার করবে না তো কি করবে ? তুমি যদি আল্লাহ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন কর তো আল্লাহ কেন তোমার জান-মালের দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকার করবে না ? এজন্য কুরআন পাকে আছে ঃ

اَنَّ اللّٰهَ بَرِئٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ـ(التوبة : ٣)

"মুশরিকদের দায়িত্ব থেকে আল্লাহ মুক্ত।"−(সূরা আত তাওবা ঃ ৩)

দুনিয়ার সকল জাতিই যখন সুযোগ ও ক্ষমতা পেলে মুসলমানদের জান-মাল ও রাষ্ট্র দখল করে নেয় তখন এছাড়া আর কোনো উপায় হতে পারে কি ? কুরআন যেমন স্বয়ং বলেছে ঃ

وَاِنْ يَّثْقَفُوْكُمْ يَكُوْنُوْا لَكُمْ اَعْدَآءً وَّيَبْسُطُوْآ اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ وَاَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوْءِ

وَوَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ ـ(الممتحنه : ٢)

"তারা যদি তোমাদের উপর বিজয়ী হয়, তাহলে তারা তোমাদের শত্রু হয়ে যায়, তোমাদের উপর অত্যাচার করে ও কটূ ভাষা প্রয়োগ করে। তারা তো এটাই চায় যে, তোমরাও কাফের হয়ে যাও।"

এ কুরআনের সাক্ষ্য এবং প্রকৃত ঘটনার পরও যদি মুসলমানদের ধর্ম তাদেরকে এ অনুমতি না দিত, তাহলে তা কি অন্যায় ? কুরআন অতপর এ নির্দেশ দেয় ঃ

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَاحَرَّمَ اللّٰهُ

وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ ـ (التوبة : ٢٩)

"আহলে কেতাবদের মধ্যে যারা আল্লাহ এবং আখেরাতের উপর ঈমান আনে না এবং আল্লাহ ও তার রসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম মনে করে না এবং যারা সত্য দ্বীনকে তাদের জীবন বিধান হিসেবে গ্রহণ করে না, তাদের সাথে যুদ্ধ কর।"−(সূরা আত তাওবা ঃ ২৯)

তাহলে কি তাদের কল্যাণ ইসলামী ফকিহগণ কর্তৃক আলোচিত নীতি বহির্ভূত ? অর্থাৎ মুসলমানদের রাষ্ট্র ও সম্পদ যেরূপ অমুসলিমদের জন্যে স্বয়ং ইসলামী আইন অনুযায়ী বৈধ হবে, তদ্রূপ তারা এবং তাদের সম্পদও আল্লাহ ও তার রসূলের শরীয়ত ও আইন অনুযায়ী বৈধ হবে। যদি মুসলমান তার উপর অধিকার লাভ করে তাহলে তারা তার সত্যিকার মালিক হবে এবং তা সকল প্রকার ব্যয় ও হস্তান্তরের অধিকার লাভ করবে।[১]

---

১. সম্পর্কচ্ছেদ ও যুদ্ধ শুধু সেই সব অমুসলিমদের সাথে যারা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধরত। কিন্তু যেসব অমুসলমান মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করে না এবং যারা জিম্মীও নয় তাদের জন্যে এ বিধান নয় ; এরূপ মনে করা কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে অজ্ঞতারই পরিচায়ক। يعدكم احدى الطائفتين। এ বাক্যে আল্লাহ তায়ালা বেসামরিক বাণিজ্যিক কাফেলারও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কিনা ? সাহাবাগণের ইচ্ছাও তাই ছিল। এমন করা যদি হারাম হতো, তাহলে কুরআনে এর প্রতিবাদ করা উচিত ছিল। হুদায়বিয়ার সন্ধির সময়ে আবু বসীর সাহাবী এবং তাঁর বন্ধুদের জীবিকা নির্বাহ বেসামরিক বাণিজ্যিক কাফেলার অরক্ষিত সম্পদ দ্বারাই হতো, আবু যরও এক সময়ে এসব সম্পদই ভক্ষণ করতেন। মোটকথা সামরিক হোক অথবা বেসামরিক, আমীরের অনুমতি থাকুক বা না থাকুক, জিম্মী নয় এমন কাফেরের প্রাণ ও সম্পদ হালাল। আবু বকর জাস্সান তার তফসীরে বলেন ঃ

ولا نعلم احدا من الفقهاء يحظر (يمنع) قتال من اعتزل قتالنا من المشركين

ফকীহগণের মধ্যে এমন কাউকে আমরা জানি না, যিনি যেসব মুশরিক আমাদের পক্ষে যুদ্ধ করা ছেড়ে দিয়েছে, তাদের সংগে যুদ্ধ করতে নিষেধ করেন। সত্যিই মুসলিমের একটি হাদীসে আছে ঃ

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما قرية اتيتموها فافتسمتم فيها فسهمكم فيها وايما قرية غنمه الله ورسوله فان خمسها الله ورسوله ثم هى لكم

রসূলুল্লাহ (স) বলেন, তোমরা যে গ্রাম বা জনপদের উপরেই বিজয়ী হবে, তা তোমরা ভাগ করে নিবে—এতে তোমাদের অংশ আছে। আর আল্লাহ ও তাঁর রসূল যে গ্রাম বা জনপদ গনীমত স্বরূপ তোমাদেরকে দিয়েছেন, তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ ও তার রসূলের জন্যে এবং অবশিষ্ট তোমাদের। কাযী এয়ায এর ব্যাখ্যায় বলেন, গ্রাম অর্থ যা মুসলমানগণ ঘোড়া অথবা বাহন দ্বারা জয় করেনি। বরঞ্চ সেখানকার অধিবাসী গ্রাম ত্যাগ করে চলে গেছে ও সন্ধি করেছে। এতে 'ফাই'-এর মতো তাদের অংশ থাকবে।—(গিলানী)

মাওলানা মওদূদীর মন্তব্য ঃ মওলানার এখানে একটি বড় ভুল হয়েছে। তিনি যুদ্ধরত (Beligerent) এবং যারা যুদ্ধরত নয় (Non-beligerent) -এ দু এর মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা ভুলে গেছেন। যুদ্ধরত তো সে জাতি যারা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত আছে। এ জাতির কোনো ব্যক্তি বা দল কার্যত যুদ্ধে লিপ্ত (Combatant) থাকুক বা না থাকুক, সর্বাবস্থায় তার সম্পদ বৈধ। আমরা তাদের বাণিজ্য কাফেলাগুলো আটক করতে পারি। তাদের লোকজন আমাদের হাতের মধ্যে এলে তাদেরকে ধরে ফেলবো। এবং তাদের সম্পদ হস্তগত করবো। মওলানা গিলানী যতগুলো দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, তা সবই এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। কিন্তু যে জাতি আমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত নয়, তাদের সাথে চুক্তি থাকুক বা না থাকুক, তাদের সম্পদ আমাদের জন্যে বৈধ নয়। কুরআনে এ সম্পর্কে বিশদভাবে বলা হয়েছে ঃ

মূল আলোচ্য বিষয়ে প্রত্যাবর্তন

মোটকথা আসল আলোচ্য বিষয় এই ছিল যে, অনৈসলামী দেশে একজন মুসলমানদের জীবন পদ্ধতি কেমন হওয়া উচিত এবং সেখানকার অধিবাসীদের সাথে তার সম্পর্কের ধরনটা কিরূপ হবে ? মাঝখানে অন্য একটি প্রশ্নের প্রসংগ এসে গেছে।

কথা তো অতি সাধারণ ছিল। কিন্তু ভুল ধারণা অপনোদনের জন্যে আমাকে আলোচ্য বিষয় থেকে একটু দূরে যেতে হয়েছিল। এখন আমি আমার আসল বক্তব্যের দিকে ফিরে আসছি। আমি বলেছি যে, নিরাপত্তাপ্রাপ্ত মুসলমানদের কর্তব্য হচ্ছে যে দেশে সে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা গ্রহণ করে প্রবেশ করেছে সে দেশের প্রচলিত আইন পুরোপুরি মেনে চলা। কারো জান-মাল ও ইজ্জত-আবরুর উপর হস্তক্ষেপ করে প্রচলিত আইন ভংগ করা হবে বিশ্বাসঘাতকতা আর বিশ্বাসঘাতকতা করা কুরআন-হাদীস ও সর্বসম্মত মতানুযায়ী হারাম। মোটকথা, প্রচলিত আইন মেনে চলা তার ধর্মীয় কর্তব্য। আমি বলেছি যে, দেশের আইনের পরিপন্থী ডাকের খামে বিনা টিকেটে আধ আনা পর্যন্ত ওজন বৃদ্ধি করা এবং রেলে মাল পাঠানোর ব্যাপারে নির্দিষ্ট ওজনের

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ ـ(الممتحنة : ٨)

"আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না তাদের সাথে সদ্ব্যবহার ও ইনসাফপূর্ণ আচরণ করতে, যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের গৃহ থেকে বহিষ্কৃত করেনি-(মুমতাহিনা ঃ ৮)।" এটা বিবেক ও ইনসাফের কথা। নতুবা মুসলমানদের জন্যে নিরংকুশভাবে যদি জিম্মী নয় এমন অমুসলিমদের সম্পদ বৈধ হতো, যেমন মাওলানার বিবরণে জানা যায়, তাহলে বিশ্বের জাতিসমূহের মধ্যে মুসলিম জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি (امت وسط) হবার পরিবর্তে একটি লুণ্ঠনকারী জাতি বলে গণ্য হবে। অপর জাতির উপর দস্যুবৃত্তি করাই তাদের জীবিকা বলে গণ্য করা হবে এবং তাদের অস্তিত্ব পৃথিবীর জন্যে এক সাধারণ বিপদ হয়ে পড়বে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, অমুসলিম যদি মুসলমানদের সম্পদ অন্যায়ভাবে হস্তগত করে তার মালিক হতে পারে, তাহলে মুসলমান তাদের সম্পদ অধিকার করার অনুমতি লাভ করবে না কেন ? প্রকৃতপক্ষে এ ব্যাপারটিও যুদ্ধাবস্থার সাথে সম্পর্কিত। শান্তির সময়ে ইসলাম স্বীয় প্রজাদেরকে যুদ্ধে লিপ্ত নয় এমন জাতির উপর দস্যুবৃত্তি করার অনুমতি দেয় না। তবে হ্যাঁ অন্য জাতির লোক যদি মুসলমানদের উপর দস্যুবৃত্তি শুরু করে, তাহলে তাদের মধ্যে এবং মুসলমানদের মধ্যে যুদ্ধাবস্থার সৃষ্টি হবে মুসলমানদের জন্যে তাদের প্রাণ ও ধন-সম্পদ বৈধ হয়ে যাবে। কুরআনে যেখানে মুশরিকদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ ঘোষণা করা হয়েছে, সেখানে সুস্পষ্টভাবে একথা বলা হয়েছে ঃ وهم بدوكم اول مرة অন্যায়ের সূচনা তাদের পক্ষ থেকে হয়েছে। সুতরাং মুসলমান লুণ্ঠন ও গ্রাস করার কাজ প্রথমে শুরু করবে না। বরঞ্চ সূত্রপাত যখন তাদের পক্ষ থেকে হবে, তখন চুক্তি অবস্থায় فانبذ اليهم على سواء (তাদের দিকে তা সমানভাবে প্রত্যার্পণ কর) এ বিধানের উপরে এবং পূর্ব থেকে কোনো চুক্তি না হয়ে থাকলে যুদ্ধ ঘোষণার উপরে কাজ করতে হবে। অতপর গোটা জাতি যুদ্ধরত বলে গণ্য করা হবে এবং তাদের জান ও মাল বৈধ হয়ে যাবে।

উপরে বিনা ভাড়ায় এক পোয়া ওজন বৃদ্ধি করা জায়েয নয়। এ কারণেই মুসলমান অপেক্ষা অধিকতর শান্তি প্রিয় জাতি ধর্মের দিক দিয়ে আর কেউ হতে পারে না।

কিন্তু প্রশ্ন তখনই উঠে, যখন ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে একটি কাজ নাজায়েয হয়। যেমন ধরুন, সুদের বিষয়টি। সুদের মাধ্যমে অপরের অর্থ গ্রহণ করা ইসলামে লিখিতরূপে হারাম। কিন্তু অনৈসলামী আইনের মাধ্যমে সম্পদ লাভের অনুমতি আছে। শুধু জনসাধারণই এ কাজ করতে পারে না, বরঞ্চ সরকারও বিরাট আকারে বিভিন্ন উপায়ে সুদী লেনদেন করে। এ অবস্থাতে মুসলমানদের কি করা উচিত ? একথা ঠিক যে, এ অবস্থায় যদি নিরাপত্তাপ্রাপ্ত মুসলমান সুদের মাধ্যমে সে দেশের অমুসলিম অধিবাসীদের সম্পদ লাভ করে, তাহলে চুক্তিভংগ, আইন ভংগ অথবা বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে সে অপরাধী হবে না। এ দিক দিয়ে ধর্মত সে চুক্তি আইনে কোনোমতেই অপরাধী বলে সাব্যস্ত হবে না।

এখন আলোচ্য এই যে, সে কি অন্যের কাছ থেকে এমন কোনো সম্পদ হস্তগত করেছে যা দেশের আইন অনুযায়ী বৈধ হলেও ধর্ম ও আল্লাহ্ নিষিদ্ধ করেছেন ? অথবা অন্য কথায় সে এমন সম্পদ হস্তগত করেছে যা আইনত না হলেও ইসলামের দৃষ্টিতে অবৈধ, বরঞ্চ রক্ষিত। একটু আগেই আমরা জানতে পারলাম যে, শরীয়ত (ইসলামী আইন) অনুযায়ী এ ধরনের সম্পদ মুসলমানের জন্যে অরক্ষিত এবং বৈধ।[১] অতপর একজন মুসলমানের করণীয় কি হতে পারে ? কুরআন এবং ধর্ম যাকে অরক্ষিত এবং বৈধ বলছে, সে কি আপন ধর্মের বিরোধিতা করে তাকে রক্ষিত ও অবৈধ বলবে ? এ এক অবোধগম্য

১. যদি মাওলানার এ আইনের ব্যাখ্যা মেনে নেয়া যায়, তাহলে তার অর্থ এই হবে যে, ভারতে কোনো অমুসলিমের ধন-সম্পদ যদি লুণ্ঠন করা হয়, চুরি, ঘুষ অথবা আত্মসাৎ করে হস্তগত করা যায়, তাহলে এসব কাজ যে মুসলমান করবে, সে শুধু দেশের আইন অনুযায়ী অপরাধী হবে। আর ধর্মের দিক দিয়ে তাকে গোনাহগার মনে করা হলেও শুধু এ কারণে যে, সে চুক্তি আইনের বিপরীত কাজ করেছে। তাকে এজন্য গোনাহগার মনে করা হবে না যে, সে ঐসব কাজ করেছে যা ইসলাম হারাম ঘোষণা করেছে। উপরন্তু যদি কোনো অমুসলিম রাষ্ট্রে কোনো মুসলিম নারী বেশ্যাবৃত্তি করে এবং অমুসলিমের নিকট থেকে দেহ ব্যবসার বিনিময়ে (নাউযুবিল্লাহ) মূল্য গ্রহণ করে, তাহলে এ বেশ্যাবৃত্তি লব্ধ অর্থ তার জন্যে হালাল ও পবিত্র হবে। কারণ অমুসলিম রাষ্ট্রের আইন তার এ পেশাকে বৈধ মনে করে এবং এ বেশ্যাবৃত্তির জন্যে তাকে লাইসেন্সও প্রদান করে। অতএব সে চুক্তি আইন ভংগের অপরাধে অপরাধী হবে না এবং ইসলামী শরীয়ত যখন জিম্মী নয় এমন কাফেরের সম্পদ বৈধ বলে ঘোষণা করে, যে কোনো উপায়েই সে সম্পদ হস্তগত করা হোক না কেন–তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিতেও সে হারাম ভক্ষণের অপরাধে অপরাধী হবে না। সম্ভবত মাওলানা এ সিদ্ধান্ত মেনে নেবেন না। কিন্তু তাঁর যুক্তি প্রদর্শনের ধরন থেকে এ সিদ্ধান্তেই পৌঁছতে হয়।–(মওদূদী)

ব্যাপার যে, যে সম্পদকে আইন নাজায়েয বলছে না এবং শরীয়তও হারাম বলছে না, বরঞ্চ তা হস্তগত করার আদেশ করছে, হতভাগ্য মুসলমান সে জায়েযকে নাজায়েয এবং হালালকে হারাম কিরূপে করবে ? সে কি রাষ্ট্রীয় আইনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে অথবা শরীয়তের নির্দেশ ভংগ করবে ? এর পরে মুসলমানদের জন্যে কোনো আশ্রয়স্থল আছে কি ?

ইসলামী আইনের এ সংকটজনক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামী শরীয়তের সবচেয়ে সতর্ক এবং কিছুসংখ্যক লোকের মতে কঠোর ইমাম, ইমামকুল শিরমনী, ধার্মিক প্রবর, তাবেয়ী ও মুজতাহিদ ইমাম আবু হানিফা (র)-এর ফতোয়া ইমাম মুহাম্মদ সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তার 'সিয়ারে কবীর' গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন ঃ

واذا دخل المسلم دار الحرب بامان فلا باس بان ياخذ منهم اموالهم بطيب انفسهم باى وجه كان لانه انما اخذ المباح على وجه عرى عن الغدر فيكون ذالك طيباله ـ(منقول ازشامى ص ٢١٠ ج ٥ مطبوعه مصر)

"যখন মসুলমান নিরাপত্তা চুক্তি করে দারুল হরবে[১] প্রবেশ করে তখন সেখানকার অমুসলিম অধিবাসীদের সম্মতিক্রমে যে কোনো উপায়ে তাদের সম্পদ হস্তগত করলে তাতে কোনো দোষ হবে না।[২] কারণ সে চুক্তি ভংগ

১. দারুল হরবের অর্থ হলো সেই অমুসলিম রাষ্ট্র যা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধরত, যার সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের কোনো চুক্তি নেই এবং যেখানে ইসলামী রাষ্ট্রের মুসলিম নাগরিকগণ যুদ্ধাবস্থায় ব্যক্তিগতভাবে নিরাপদ বাণিজ্যের অনুমতিপত্র নিয়ে (Safe conducts of trade Licenses) যুদ্ধের সাথে সম্পর্কহীন (Non-hostile intercourses) এমন কাজ-কারবারের জন্যে গমনকারী হানাফী আইনের এ ধারাকে এখন দারুল কুফরের প্রতি আরোপিত করা যায় না। যেখানে মুসলমানদের একটি দল যুদ্ধরত ও নিরাপত্তাপ্রাপ্ত হিসেবে নয়, বরঞ্চ সে দেশের প্রজা বা নাগরিক হিসেবে বসবাস করে এর আপন সাধ্যমত ব্যক্তিগত আইন মেনে চলার অধিকার থাকে। মাওলানার দৃষ্টিভংগীর মৌলিক ভ্রান্তি এই যে, তিনি প্রত্যেক গায়ের জিম্মী কাফেরকে যুদ্ধরত (শত্রু) এবং প্রত্যেক অনধিকৃত দেশকেই দারুল হরব (Enemy country) মনে করেছেন। ইসলামের আন্তর্জাতিক আইনের এটা সম্পূর্ণ ভুল ব্যাখ্যা। অমুসলিমদের জান ও মাল শুধু মাত্র যুদ্ধাবস্থায় বৈধ হয় এবং তাও ইসলামী রাষ্ট্রের জন্যে সে অমুসলিম রাষ্ট্রের মুসলমান প্রজাদের জন্যে নয়, যে রাষ্ট্রকে আপনি হরবী যুদ্ধরত বলছেন। হানাফী আইনের উদ্দেশ্য শুধু এতটুকু যে, যখন কোনো মুসলমান নিরাপত্তা নিয়ে শত্রু দেশে যায়, তখন সে সেখানে অবৈধ চুক্তিতেও ক্রয়-বিক্রয় করতে পারে। দুটো কারণে এ অনুমতি দেয়া হয়। এক এই যে, দুশমনের সম্পদ আসলে বৈধ। তা বলপূর্বক কেড়ে নেয়া যখন বৈধ, তখন অবৈধ চুক্তি অনুসারে তো অধিকতর জায়েয হওয়া উচিত। দ্বিতীয় কারণ এই যে, যুদ্ধের অবস্থা একটি জরুরী অবস্থা (Emergency) এবং জরুরী অবস্থায় হারাম হালাল হয়ে যায়।-(মওদূদী)

২. এ শব্দগুলোর সাধারণ অর্থবোধ হওয়াটা চিন্তার বিষয়। যদিও ইমাম মুহাম্মদ (র) এরূপ বলেছেন, কিন্তু তা বিনা শর্তে মেনে নেয়া যেতে পারে না। নতুবা মুসলমান দারুল হরবে গিয়ে মদের ব্যবসা করলে, বেশ্যালয় খুলে দিলে অথবা কোনো মুসলিম নারী দেহব্যবসা করলে তা জায়েয হবে।-(মওদূদী)

না করেই একটি বৈধ বস্তু গ্রহণ করেছে। অতএব এ সম্পদ বা বস্তু তার জন্যে হালাল এবং পবিত্র হবে।"

একথা সুস্পষ্ট যে, এ ফতোয়া এ অন্ধকার যুগের নয় যখন মুসলমান একটি বিজিত জাতি। যে সময়ে ইমাম (র) সাহেব শরীয়ত থেকে আইনের এ ধারাটি রচনা করেছিলেন, তখন কেউ ধারণাই করতে পারেনি যে, মুসলমানদের কাজ-কর্মে, আকীদা-বিশ্বাসে ও আচার-আচরণে এতটা অবনতি ঘটবে যা ইউরোপের রূপ নিয়ে হঠাৎ প্রকাশ হয়ে পড়বে।১ এমন কি মহৎ লোকগণ দাস জাতিকে দাসত্বের খোয়াড়ের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবার জন্যে নিজেদের উত্তরাধিকারে গওসী ও কুতুবী উত্তরাধিকারে এমন সব বাঘ ছেড়ে দিয়েছেন, যারা সবার উপর অনুগ্রহ করলেও যাদের কর্তব্য ছিল ইবাদত করা তাদের জন্যে কোনো অনুগ্রহ নেই এবং কোথাও নেই।

ফকীহগণ যখন এ বিষয়টির উল্লেখ করেন। যেমন ধরুন কোনো মুসলিম দেশের উপর অনৈসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলো, তখন মাঝখানে। معاذ الله (খোদা না করুন, অর্থাৎ আল্লাহর কাছে মুসলমানদের এমন দুর্ভাগ্য থেকে আশ্রয় চাই) বাক্যটি ব্যবহার করেন। অর্থাৎ এমনটি মনে করতেও তাঁরা ঘাবড়িয়ে যেতেন।

এমতাবস্থায় মনে করা যেতে পারে যে, ইমাম আযম কোনো সময়ে প্রয়োজনের সামনে নয়, বরঞ্চ শরীয়তের কঠোর বাধ্য-বাধকতার সামনে মাথা নত করেছেন। আর প্রকৃত ব্যাপার এই যে, শুধু কুরআনই নয় বরঞ্চ নবী মুস্তফা (স) থেকেও প্রামাণ্য সূত্রে এ ফতোয়ার সত্যতা প্রমাণিত হয়। আবু বকর সিদ্দিক (রা) রোম-ইরান যুদ্ধের সময় কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণীর উপর জোর

---

১. সম্ভবত ইমাম আবু হানিফা (র)-এর ধারণা ছিলো না যে, যে বিধান তিনি শত্রু দেশে নিরাপত্তা সহকারে গমনকারী ব্যবসায়ী অথবা ভ্রমণকারীদের জন্যে দিয়েছিলেন, তা অমুসলিম রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী কোটি কোটি মুসলমানদের উপর প্রযোজ্য হবে যারা মুসলিম রাষ্ট্রে এতটুকু স্বাধীনতা অবশ্যই ভোগ করে যাতে তারা ইসলামের অর্থনৈতিক ও তামাদ্দুনিক বিধান মেনে চলতে পারে। ইমাম সাহেব যে আইন বর্ণনা করেছেন তা শুধু এমন দারুল হরব (যুদ্ধরত দেশ) সম্পর্কে, যেখানে দারুল ইসলামের কোনো মুসলমান ব্যবসার উদ্দেশ্যে নিরাপত্তাসহ গ্রহণ করে। তার এ উদ্দেশ্য কখনোই ছিল না যে, মুসলমান যেখানে অমুসলিম রাষ্ট্রের অধীনে বিরাট সংখ্যায় স্থায়ীভাবে বসবাস করে সেখানে তারা ইসলামের অর্থনৈতিক আইন থেকে বেপরোয়া থাকবে এবং যেসব অর্থনৈতিক লেনদেন ইসলাম হারাম করেছে, তা সেখানে করা যেতে পারে। এখানে বরঞ্চ মুসলমানদের কর্তব্য হচ্ছে যথাসম্ভব অনৈসলামী অর্থব্যবস্থা থেকে দূরে থাকা এবং প্রচলিত ব্যবস্থার পরিবর্তন করে ইসলামী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কাজে নিজেদের সামগ্রিক শক্তি নিয়োজিত করা। কিন্তু মাওলানা (গিলানী) যেভাবে ইসলামী আইনের ব্যাখ্যা করছেন, তার মূল এই হবে যে, ভারতের কয়েক কোটি মুসলমান নিজেদের জাতীয় শক্তি দেশের অর্থনৈতিক ও তামাদ্দুনিক সংস্কার সাধনে নিয়োজিত করার পরিবর্তে স্বয়ং এ ভ্রান্ত ব্যবস্থায় মিশে একাকার হয়ে যাবে।−(মওদূদী)

দিয়ে একটি অনৈসলামী সমাজে অর্থাৎ মক্কা শহরে (তখনও মক্কা ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়নি) কুরাইশদের নিকটে এই বলে বাজী রেখেছিলেন যে, কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণীই সত্যে পরিণত হবে এবং তা যখন সত্যে পরিণত হলো, তখন স্বয়ং নবী করীম (স) ঐ বাজীর উট নিতে আদেশ দেন এবং তা ওয়ারিশদের নিকট থেকে আদায়ও করা হয়েছিল-(তিরমিযি)।[১] ইসলামী ফকীহগণ এ ঘটনা থেকে এ আইনের সত্যতা ঘোষণা করেন। নতুবা একথা সুস্পষ্ট যে, এ ধরনের বাজী রাখা সুস্পষ্ট জুয়া-যার হারাম হওয়া কুরআন থেকে প্রমাণিত আছে।

দারুল হরবে সুদ হালাল নয় 'ফাই' হালাল

লোকের মধ্যে এ এক অদ্ভূত কথা প্রচলিত আছে যে, অনৈসলামী রাষ্ট্রে সুদ হালাল হয়ে যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আসল সমস্যা বুঝতে এ ব্যাখ্যাই প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। নতুবা এ মাসয়ালাটির বুনিয়াদ কুরআনের যে আইনটি, তদনুযায়ী একথা বলা ভুল যে, যে জিনিস একদা হারাম ছিল তা হালাল হয়ে গেছে। অথচ ব্যাপার এই যে, যে জিনিস বরাবর হালাল ছিল, তাই হালাল হয়েছে। আল্লাহ যে বস্তুকে হালাল ও পবিত্র ঘোষণা করেছেন, ইমাম আযম তাকেই পবিত্র বলছেন। নতুবা একজন মুসলমানের কি অধিকার আছে যে, যে বস্তুকে কুরআন হারাম করছে তাকে নিজের খেয়াল-খুশী মত অথবা সাধারণ আনুমানিক তথ্যের উপর নির্ভর করে হালাল করে দিবে ? বিশেষ করে এমন এক ব্যক্তি যে 'খবরে ওয়াহেদ' (এক ব্যক্তির বর্ণনা) এ নির্ভর করে কুরআনের সিদ্ধান্তের উপর কিছু বাড়িয়ে দেয়া কিছুতেই জায়েয মনে করে না। এজন্যেই আরবী ای وجه كان। (প্রচলিত আইনের বৈধকৃত যে কোনো পন্থায় সে মাল পাওয়া যাক না কেন) এ সাধারণ নীতি ছাড়াও ইমাম আবু হানিফা শুধু সুদকেই নয়, বরঞ্চ জুয়ার ঐসব পন্থায়ও সম্পদ লাভ বৈধ বলেছেন যা প্রচলিত আইনে অবৈধ নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ জীবন বীমার কথাই ধরা যাক।[২] আলেম

১. তিরমিযিতে এ বিষয়ের বিশদ বিবরণ রয়েছে যে, এ বাজী তখন ধরা হয়েছিল, যখন বাজী হারাম হবার নির্দেশ জারী হয়নি। ইবনে জারীরের তফসীরেও এর বিশদ বিবরণ আছে। তফসীরে বায়যাবীতে আছে যে, হযরত আবু বকর (রা) এ বাজীর মাল উবাই বিন খালফের নিকট থেকে নিয়ে নবীর খেদমতে পেশ করেন। নবী তা সদকা করে দিতে বলেন। এর থেকে বুঝতে পারা যায় যে, এ মাল ছিল মাকরূহ। দুশমনের কাছ থেকে নেয়া হলো বটে। কিন্তু নিজের জন্যে তা ব্যবহার করা সমীচীন মনে করা হলো ন।-(মওদূদী)

২. হানাফী ফেকাহ মতে দারুল হরবের যেসব বিধান যুদ্ধ সম্পর্কিত তা ভারতের উপর আরোপ করে মাওলানা মারাত্মক ভুল করেছেন। তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, ভারতে জুয়া, ফটকাবাজারী, লটারী, ঘোড় দৌড় প্রভৃতির মাধ্যমেও মুসলমান অর্থ উপার্জন করতে পারে আর এ লব্ধ অর্থ তার জন্যে পবিত্র। এর উপরেই যদি ফতোয়া হয়ে যায়, তাহলে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে মুসলমান অমুসলমানের মধ্যে কোনোই পার্থক্য থাকবে না এবং অর্থনৈতিক জীবনে ভারতের সকল মুসলমান

সমাজের মতে এ হচ্ছে জুয়া, এর সুদের এক সংমিশ্রিত রূপ। কিন্তু সিয়ারে কবীরে ইমাম মুহাম্মদ আযমের বরাত দিয়ে বলেনঃ

لو اخذ مالا منهم بطريق القمار فذالك كله طيب

"যদি অমুসলিমদের কাছ থেকে জুয়ার মাধ্যমে সম্পদ লাভ করা হয়, তাহলে তার সবটুকুই তার জন্যে হালাল ও পবিত্র হবে।"

সুদের খ্যাতির কারণ সম্ভবত ইমাম মাকহুলের সে মুরসাল হাদীস যা এ মাসলার সমর্থনে পেশ করা। মাকহুল মুহাদ্দিসগণের মতে একজন নির্ভরযোগ্য রাবী। তাঁর বর্ণিত হাদীসটি এই ঃ

عن مكحول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاربوا بين الحربى والمسلم -

---

(পূর্ব পৃষ্ঠার পর)
অমুসলমান হয়ে পড়বে। আসল ভুল এই যে, মাওলানা এমন প্রত্যেক অমুসলমানের সম্পদ বৈধ মনে করছেন, যার কোনো দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্র গ্রহণ করেনি। অথচ এরূপ ধারণার পেছনে কুরআন ও হাদীসের কোনো সমর্থন নেই। দ্বিতীয় ভুল এই যে, ইসলামী পরিভাষায়, যে দারুল কুফর দারুল হরব নয়, তাকে তিনি দারুল হরব বলছেন। এটা শুধু অপব্যাখ্যাই নয়। বরঞ্চ পরিণামের দিক দিয়ে মুসলমানদের জাতীয় জীবনের জন্যে ধ্বংসাত্মকও বটে। ভারত সে সময়ে নিসন্দেহে দারুল হরব ছিল, যখন ইংরেজ সরকার এখানে ইসলামী রাষ্ট্রের বিনাশ সাধনের চেষ্টায় লিপ্ত ছিল। সে সময়ে মুসলমানদের কর্তব্য (ফরয) ছিল, ইসলামী রাষ্ট্র রক্ষার জন্যে জীবন বিসর্জন দেয়া অথবা অকৃতকার্য হবার পর এখান থেকে হিজরত করে অন্যত্র চলে যাওয়া। কিন্তু যখন তারা পরাজিত হলো, এখানে ইংরেজ সরকার প্রতিষ্ঠিত হলো এবং মুসলমানগণ তাদের ব্যক্তিগত আইন পালন করার স্বাধীনতাসহ এখানে বসবাস করা স্বীকার করে নিল, তখন এ দেশ আর দারুল হরব রইলো না। বরঞ্চ এমন এক দারুল কুফর হয়ে গেল, যেখানে মুসলমানগণ নাগরিক হিসেবে বসবাস করে এবং দেশীয় আইনের নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যে নিজেদের ধর্ম-কর্ম মেনে চলার স্বাধীনতা ভোগ করে। এমন দেশকে দারুল হরব বলে ঘোষণা করা এবং দারুল হরবে মুসলমানদের জন্যে নিছক জরুরী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যেসব সুবিধা দেয়া হয়েছে সেসব এখানে প্রয়োগ করা ইসলামী আইনের মূলনীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী এবং অত্যন্ত বিপজ্জনকও। এর পরিণাম ফল এই হবে যে, এ দেশে ইসলামী আইন মেনে চলার যে যৎকিঞ্চিৎ অধিকার রয়েছে, তা তারা নিজেরাই ছেড়ে দেবে। শরীয়তের যে অবশিষ্ট সীমারেখাটুকু তাদের জাতীয় সত্তাকে রক্ষা করে চলেছে, তাও আর টিকে থাকবে না। ফলে মুসলমান অনৈসলামী সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে মিশে যাবে। যাদের কোনো সামাজিক ও সামগ্রিক শক্তি নেই এবং যারা চারদিক থেকে দুশমন কর্তৃক পরিবেষ্টিত, মুসলিম জাতির এরূপ বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিদেরকে অত্যন্ত সংকটজনক অবস্থায় ইসলাম তার আইনের কঠোরতা শিথিল করে কিছু সুযোগ-সুবিধা দান করে। তার সাথে এ আদেশও দেয় যে, এ অবস্থায় তারা যেন নিশ্চিন্তে বসে না থাকে, বরঞ্চ যত শীঘ্র সম্ভব দারুল ইসলামের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। মাওলানা এ সুযোগ সুবিধাগুলোকে এমন এক জাতির জন্যে সাধারণ করে দিচ্ছেন যারা সংখ্যায় কয়েক কোটি এবং এ দেশের স্থায়ী অধিবাসী। দারুল হরবের বিধান এ জাতির জন্যে কিছুতেই প্রযোজ্য নয়। ইসলামী বিধানগুলোর মধ্যে যেগুলো যতবেশী পরিমাণে সম্ভব মেনে চলার চেষ্টা করাই শুধু তাদের উচিত নয়। বরঞ্চ তাদের উচিত দারুল কুফরকে দারুল ইসলামে রূপান্তরিত করার জন্যে সকল শক্তি নিয়োজিত করা।-(মওদূদী)

"নবী (স) বলেন যে, হরবী অমুসলমান এবং মুসলমানের মধ্যে সুদ বলে কিছু নেই।"

লোক এর কি অর্থ গ্রহণ করে তা জানি না। নতুবা প্রকাশ্য শব্দগুলোর দ্বারা যা কিছু বুঝতে পারা যায় তাহচ্ছে এই যে, একজন মুসলমান এবং জিম্মী নয় এমন একজন অমুসলিমের মধ্যে যদি সুদের লেনদেন হয়, তাহলে তা সুদ হবে না। বরঞ্চ কুরআনের বৈধতা আইন অনুযায়ী এ মাল মুসলমানের জন্যে হালাল ও পবিত্র।

মোটকথা, ইসলামী শরীয়ত, কুরআন, হাদীস এবং সাহাবাগণের কার্যকলাপ অনুযায়ী এ এমন একটি সুস্পষ্ট আইন যা অস্বীকার করার কোনো অবকাশ নেই। লোক মাকহুলের মুরসাল হাদীসটির বিশ্বস্ততা ও অবিশ্বস্ততা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করে। অথচ এসব তো (প্রসংগটির) সমর্থনে পেশ করা হয়। নতুবা ব্যাপার এই যে, এ ধরনের সম্পদের হালাল হবার বিধান তো কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত দ্বারাই প্রমাণিত। আল্লামা ইবনে হুমাম ঠিকই বলেছেন ঃ

وفی التحقیق یقتضی انه لو لم یرو مکحول اجازه النظر المذکور -

"পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ব্যাপার এই দাঁড়ায় যে, মাকহুলের বর্ণনা যদি উদ্ধৃত না-ই করা হয়, তথাপি উপরে বর্ণিত চিন্তাধারা এর অনুমতি দেয়।"–(ফতহুল কাদীর খঃ ৭, পৃঃ ১৭৮)

'বাদাএ'-র গ্রন্থকার এর উপর ভিত্তি করে ইমাম আবু হানিফা (র)-এর মতের সঠিক ব্যাখ্যা নিম্নরূপ করেছেন ঃ

وعلی هذا اذا دخل مسلم اوذمی دار الحرب بامان فعاقد حربیا عقد الربا -
او غیره من العقود الفاسدة فی الاسلام جاز -(ج ۷ صفح ۱۳۲)

"এর উপর ভিত্তি করেই এ ফতোয়া যে, যদি কোনো মুসলমান অথবা জিম্মী দারুল হরবে শান্তি চুক্তি সহকারে প্রবেশ করে এবং কোনো অমুসলিমের সাথে সুদের কারবার করে অথবা এমন কোনো কারবার করলো যা ইসলামী আইন অনুযায়ী অবৈধ, তাহলে সে কারবার জায়েয হবে।"

'ফাই' ও 'ফাও'-এর পরিভাষা

এজন্য আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান মতে এ ধরনের সকল উপার্জিত অর্থ বা সম্পদ যা অনৈসলামী রাষ্ট্রে মুসলমানদের হস্তগত হয়, তাকে সুদ জুয়া প্রভৃতি নামে অভিহীত করার পরিবর্তে তার একটি বিশিষ্ট নাম 'ফাই' রাখা যেতে পারে।

যার অর্থ এই যে, সে অর্থ বা সম্পদ কোনো প্রকার যুদ্ধ বিগ্রহ ব্যতিরেকেই অন্য জাতির নিকট থেকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে প্রচলিত আইন অনুযায়ী মুসলমানদের হস্তগত হয়।[১] আমার মনে পড়ছে যে, হিন্দিতে 'ফাও' বলে একটি শব্দ আছে যার উচ্চারণ প্রায়ই ফাই-এর মতো। আর সম্ভবত কিছুটা সেই অর্থই প্রকাশ করে। বিশিষ্ট লোকেরা তো এসব উপার্জনকে ফাই-এর উপার্জনই বলবে। কিন্তু সাধারণ লোক ف অক্ষর উচ্চারণ করতে না পারলে 'ফাও' বলবে। এ পরিভাষা নির্ধারণ করার একটা বিশেষ প্রয়োজনও আছে। কারণ কতিপয় নির্ভরযোগ্য মুসলমানের পক্ষ থেকে এ মাসয়ালাটির ব্যাপারে কিছু আশংকা প্রকাশ করা হয়। তাঁদের ধারণা এই যে, যদি এ মাসলাটি ঘোষণা করা হয়, তাহলে সম্ভবত দীর্ঘদিন পরে মুসলমানগণ একথা ভুলেই যাবে যে, সুদ, জুয়া প্রভৃতির দ্বারা অর্থ উপার্জন শরীয়তে হারাম ছিল কিনা। এজন্য আমার ধারণা এই যে, এসব লব্ধ অর্থের নাম 'ফাই' রাখা হোক। এ শব্দের দ্বারা বিজাতীয়দের সাথে মুসলমানদের কি সম্পর্ক তা তাদের স্মরণ হবে। আর অনৈসলামী রাষ্ট্রের সাথে শান্তি চুক্তি পূরণ করা শরীয়ত অনুযায়ী কতটা

---

১. শামী গ্রন্থে আছে ঃ

وما اخذ منهم بلا حرب ولاقهر كالهدنة والصلح فهو لاغنيمة ولا فئى وحكمه حكم الفى -(ص : ٢٥)

"যুদ্ধ না করে এবং বলপ্রয়োগ না করে যাকিছুই তাদের (অমুসলিমদের) কাছ থেকে নেয়া হবে, যেমন, কর অথবা সন্ধির টাকা, তা গনীমতের মালও হবে না এবং 'ফাই'ও হবে না। কিন্তু তার উপরে ফাই-এর বিধানই বর্তাবে।"

ফতহুল কাদীরে আছে ঃ

فكان هذا اكتساب مباح من المباحات كالاحتطاب والاصطياد -

"কাষ্ঠ সংগ্রহ করা এবং মৎস্য শিকার করা যেমন জায়েয, তেমনি এ ধরনের উপার্জিত মালও জায়েয।"

সুবুলুস সালাম গ্রন্থে ফাই-এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

هو ما حصل للمسلمين من اموال الكفر من غير حرب ولا جهاد -

"যুদ্ধবিগ্রহাদি ও জিহাদ না করেই মুসলমানগণ কাফেরদের নিকট থেকে যে সম্পদ লাভ করে, তাহলো 'ফাই'।"

বনী নজীরের ভূ-সম্পত্তি সম্পর্কে কুরআন বলে ঃ

وَمَا اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلاَ رِكَابٍ -

"যার জন্যে ঘোড়া এবং উটের সাহায্যে তোমরা চেষ্টা-চরিত্র করনি।

সমস্ত হাদীস গ্রন্থেই আছে যে, এ ফাই-এর অর্থ দ্বারাই নবী পরিবারের ব্যক্তিগত ব্যয় নির্বাহ করা হতো।-(গিলানী)

বাধ্যতামূলক, সেটাও তাদের স্মরণ হবে।[১] মোটকথা যেসব কারবারী লেনদেনে আল্লাহ্ নারাজ নন এবং অপরদিকে আইন অক্ষুণ্ন। সরকার সন্তুষ্ট, অর্থ দানকারী ও গ্রহণকারী উভয়েই সন্তুষ্ট, সেসব অবলম্বনে মুসলমানদের কোনো কিছুর ভয় করা উচিত নয়।

'ফাই' অস্বীকার করা জাতীয় অপরাধ

সত্য কথা এই যে, মুসলমানদের মধ্যে অবশিষ্ট কিছু সংখ্যক পুঁজির মালিক ও স্বল্প সম্পদের মালিক যে হালাল বস্তু ইমাম আবু হানিফা (র)-এর ভাষায় পবিত্র উপার্জন, যাকে আমি 'ফাই' বা 'ফাও' বলে অভিহিত করছি এবং যে সম্পর্কে কুরআনে এর হালাল হওয়া সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে, তা গ্রহণ না করে জাতীয় অপরাধ ও জাতীয় আত্মহত্যা করছে। মুসলমানদের যে মূলধন ব্যাংকে রক্ষিত আছে তাঁর লাখো লাখো টাকার 'ফাই' যে অমুসলিম শক্তির বৃদ্ধির কারণ এবং মুসলমানদের জন্যে অর্থনৈতিক পথ পরিবর্তন হলে সমস্ত ধনই যে অকেজো হয়ে যায়, তা কে না জানে। উপরন্তু একথাও শুনা যায় যে, মুসলমানদের এ ফাই-এর আমদানী থেকেই তাদেরই শিশু, নারী ও দরিদ্রগণকে ইসলাম থেকে বিচ্যুত করে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (স)-এর শিবির থেকে টেনে টেনে বের করে অন্যদের শিবিরে ভর্তি করা হয়।

يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَاِيَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوْا

"তোমরা ঈমান এনেছ বলে তোমাদের রসূলকে এবং তোমাদেরকে বহিষ্কৃত করে দেবে"—প্রকাশ্যে এ আয়াতই কার্যকর করা হচ্ছে।

---

১. কুরআনের পরিভাষায় 'ফাই' শুধুমাত্র সেই মালকে বুঝায় যা যুদ্ধরত জাতির নিকট থেকে অস্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকেই লাভ করা যায়। সূরায়ে হাশর পড়ে যান। দেখবেন যে, সমস্ত প্রসংগই যুদ্ধের অবস্থা সম্পর্কিত। বনী নজিরের উপর আক্রমণ চালানো হলো। অস্ত্র ধারণের পূর্বেই তারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং নির্বাসনদণ্ড মেনে নেয়। এ অবস্থায় যে ধন-সম্পদ মুসলমানদের হস্তগত হয় তাকেই 'ফাই' বলে। শান্তির সময়ে, যুদ্ধরত নয় এমন অমুসলিমের নিকট থেকে সুদ, জুয়া, ফটকাবাজারী এবং অন্যান্য অনৈসলামী পন্থায় উপার্জিত সম্পদের উপর 'ফাই' এর পরিভাষা কেন প্রয়োগ করা হবে? আর যদি একে 'ফাই'-ই বলা হয়, তাহলে জাতির ব্যক্তিগণ একজন একজন করে পৃথকভাবে তা কি করে ভোগ করতে পারে? 'ফাই'-এর সম্পদ সম্পর্কে কুরআনে সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে যে, তা সরকারী ট্রেজারীতে জমা করতে হবে এবং তা ব্যয়িত হবে ইসলামের সাধারণ কল্যাণমূলক কাজে।

مَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ -(الحشر : ٧)

"যা কিছুই (এসব জনপদের লোকদের কাছ থেকে নিয়ে) আল্লাহ তাঁর রসূলকে দিচ্ছেন, তা আল্লাহ, তাঁর রসূল, নিকট আত্মীয়দের, এতিম-মিসকীন এবং মুসাফিরদের জন্যে।"-(সূরা হাশর ঃ ৭) (মওদূদী)

এটা আপন জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা নয় তো আর কি ?[১] আফসোস! মুসলমানদেরই চাঁদির ছুরি দিয়ে মুসলমানদেরকেই যবেহ করা কে জায়েয করে দিল ? খোদা কি দেখছেন না ? নবী (স) পর্যন্ত কি এ সংবাদ পৌছে যাচ্ছে না ? জগদ্বাসী ! দেখ, মুহাম্মদ (স)-এর উম্মতকে সুদের জালে আবদ্ধ করে ইউরোপ, প্রাচ্য ও প্রতিচ্যের লোক মনের আনন্দে শিকার করছে। সুদ দাও অথবা ক্ষেত খামার দাও, ভূ-সম্পত্তি দাও অথবা ঘরবাড়ী দাও। নতুবা আরবের উম্মী নবী (স)-এর আস্তানা ত্যাগ কর। এসব মোহরের দাবার ছকের উপর কেমন বেদনাদায়ক বাজি খেলা হচ্ছে।

ব্যাংকের সুদ

সত্য কথা এই যে, ব্যাংক হলো প্রধানত সুদখোরদের আইনসম্মত কতক-গুলো কমিটির নাম। কিন্তু তার ব্যবস্থাপনা কাজের কর্মচারীগণ যদি এমন না হয়, যার থেকে মুসলমানদেরকে নিবৃত্ত করা হয়নি, তাহলে কারবার সে কমিটির সদস্যদের না হয়ে হবে একটি কোম্পানীর সাথে যে মানুষকে সুদে টাকা ঋণ দেয়। অতএব মুসলমানদের এমন পবিত্র 'ফাই' অস্বীকার করার কি কারণ হতে পারে ? কোম্পানী কি কাজ করে ? কাকে ঋণ দেয় ? কার নিকট থেকে সুদ গ্রহণ করে ? এ হচ্ছে তার নিজস্ব কারবার এবং একটি নতুন চুক্তি যার সাথে ঐ কারবারের কোনোই সম্পর্ক নেই যা একজন মুসলমান ব্যাংকের মালিকদের সাথে করেছে। আন্তর্জাতিক আইনের যে ধারাগুলো ইসলামী আইনের দিক দিয়ে দেখা হয়েছে সেগুলো সামনে রাখার পর ব্যাংক মালিকদের কারবার যার সাথেই হোক না কেন, তা সংগত হয়ে যায়। এখন চিন্তা করে দেখুন।[২]

---

১. সুদের টাকা ব্যাংকে ছেড়ে দিলে তার দ্বারা কাফেরদের শক্তি বৃদ্ধি করা হয়, একথা চিন্তা করে সতর্ক আলেমগণ এ ফতোয়া দিয়েছেন যে, ব্যাংক থেকে সুদ নিয়ে সে অর্থ গরীব মুসলমানদেরকে সদকা হিসেবে দিতে হবে অথবা মুসলমানদের কোনো কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করতে হবে। এ ফতোয়া অত্যন্ত ন্যাংসংগত। ফেকাহ্ গ্রন্থে নিষিদ্ধ মাল সম্পর্কে এরূপ ফতোয়া আছে যে, যদি তা বাধ্য হয়ে অথবা অন্য কোনো বিশেষ কারণে নেয়া হয়, তাহলে তা সদকা করে দিতে হবে। অতএব যে ক্ষতির উল্লেখ মাওলানা করছেন তার থেকে বাঁচার জন্যে এর কোনো প্রয়োজন নেই যে, সুদকে 'ফাই' বলে অভিহিত করার চেষ্টা করতে হবে।-(মওদূদী)

২. ব্যাংকের সুদ নিষিদ্ধ হবার একটি কারণ এই যে, যে টাকা আমরা ব্যাংকে রাখি। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ তা সমুদয় অন্যান্য কারবারের সাথে সুদী ঋণের কারবারেও লাগায়। যাদের এ সুদী ঋণ দেয়া হয় তাদের মধ্যে মুসলিম অমুসলিম সবই থাকে। এভাবে যে সুদ আমরা ব্যাংক থেকে পাই, তা শুধু অমুসলমানদের পকেট থেকেই আসে না, বরঞ্চ মুসলমানদের পকেট থেকেও। অন্য কথায় আমরা মুসলমানদের কাছ থেকে সরাসরি সুদ খাই না, খাই ব্যাংকের মাধ্যমে। মাওলানা এ প্রশ্নকে এই বলে উড়িয়ে দেন যে, হরবী ব্যাংকার আমাদের আমানতের টাকা যখন কোনো মুসলমানকে ঋণ দিয়ে তার সুদ আদায় করে তখন বলতে গেলে আমরা হরবীর মাল হস্তগত করলাম যা আমাদের জন্যে হালাল। এখন প্রশ্ন এই রয়ে গেল যে, যখন এই অমুসলিম হরবী স্বয়ং আমাদের প্রদত্ত অস্ত্রেই মুসলমানদেরকে জবাই করে এবং তাদের গোশত থেকে কিছুটা আমাদেরকেও খেতে দেয়, তখন আমরা আমাদের অস্ত্র তাকে দেই কেন ? মাওলানা এদিকে খেয়াল করেননি।-(মওদূদী)

হ্যাঁ, আমি আগেও বলেছি, এখানো বলছি এবং সবসময়েই বলব যে, যারা এরূপ করে তারা আপন দেশের স্বার্থ রক্ষা করছে না। দেশবাসীর, দেশের মজুর ও গরীব দুঃখীদের ভালো করছে না। কিন্তু যারা দেশের রক্ষক, যে সরকারের উপর দেশবাসীর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। তারাই যখন এসব বিষয়কে দেশের মংগল ও উন্নয়নের উপায় মনে করেন এবং স্বয়ং দেশবাসীও এরূপই মনে করে, তখন দেশের আনুগত্যের প্রশ্নে কি মুসলমান আপন জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে ?[১] অথচ স্বদেশের কথা ছেড়ে দিলেও পারিবারিক অধিকারের ব্যাপারে জাতীয় বিশ্বাসঘাতকতা তাদের জন্যে হারাম। কুরআনের সাধারণ ঘোষণা ঃ

لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَلاَ اَوْلاَدُكُمْ ج يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ج يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ٥ (الممتحنة : ٣)

"তোমাদের আত্মীয়স্বজন ও সন্তানাদি কেয়ামতের দিনে কোনো কাজে আসবে না। আল্লাহ তোমাদের মধ্যে ফায়সালা করবেন। এবং তোমরা যাকিছু কর তা আল্লাহ দেখছেন।"–(সূরা মুমতাহিনা ঃ ৩)

একথা ঠিক যে, আমাদেরকে ধৈর্যশীল হতে বলা হয়েছে এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করাই আমাদের জন্যে শ্রেয় ঃ কিন্তু ধৈর্য ধারণের নীতির সাথে সমান প্রতিশোধের নীতিও কি কুরআন শিক্ষা দেয়নি ?

وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَاعُوْقِبْتُمْ بِهٖ ط وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصّٰبِرِيْنَ ٥

"যদি তোমাদের উপর অত্যাচার করা হয় তাহলে তোমরাও ততটুকু কর যতটুকু তোমাদের উপর করা হয়েছে। আর যদি ধৈর্যধারণ কর তাহলে ধৈর্যশীলদের জন্যে মংগল।"–(সূরা আন নাহল ঃ ১২৬)

কিন্তু ধৈর্যের কোনো শেষ আছে কি ? ধৈর্যের কোনো সীমা আছে কি ? যিনি ধৈর্যের শিক্ষা দিয়েছেন, তিনিই তো বলেছেন ঃ

لاَتُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ج -(البقرة : ١٩٥)

"আপন হাতে নিজেদের ধ্বংস টেনে এনো না।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ১৯৫)

---

১. এ মাসয়ালায় মাতৃভূমির আনুগত্য বা বিশ্বাসঘাতকতার আদৌ কোনো প্রশ্ন উঠে না। ঈমানদাররা সুদী কাজ-কাম হতে এজন্যে ফিরে থাকে যেহেতু আল্লাহ একে সম্পূর্ণরূপে হারাম করে দিয়েছেন। আপনি এই প্রতিবন্ধকতাকে উঠায়ে নিয়ে যান দেখবেন আর কোনো প্রমাণেরই প্রয়োজন হবে না। সীমান্তের পাঠানদের মত হিন্দুস্তানের মুসলমানরাও সুদ গ্রহণের ব্যাপারে মাড়ওয়ারীদের থেকে দশ কদম অগ্রসর হয়ে যাবে।–(মওদূদী)

কন্সণ্টান্টিনোপলে মাটির তলায় শায়িত ইউরোপের গাজী আবু আইয়ুব আনসারী تهلكة শব্দের যে ব্যাখ্যা করেছেন, শুধু সাধারণ নয়, বিশিষ্ট ব্যক্তিগণও কি ভুলে গেছেন ?

'ফাই' গ্রহণ না করা জাতীয় অপরাধ

চিন্তাশীলগণ বলেন যে, এ 'ফাই' গ্রহণ না করা শুধু আপন জাতির প্রতিই নয়, বরঞ্চ দেশবাসীর প্রতিও শত্রুতা করা। বিষ ভক্ষণকারীকে বিষ ভক্ষণ করতে দেখে শুধু মনে মনে দুঃখ করাই কি সত্যিকার সহানুভূতি প্রদর্শন ? অথবা সম্মুখে অগ্রসর হয়ে তার হাত থেকে বিষ কেড়ে নেয়া প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা ?[১]

من راى منكم منكرا فليغيره بيده وان لم يستطع فبلسانه وان لم يستطع فبقلبه وذالك اضعف الايمان ـ

"তোমাদের মধ্যে কেউ যদি কাউকে মন্দ কাজ করতে দেখে তাহলে সে আপন হাত দিয়ে তা ঠেকিয়ে রাখবে। যদি তা না করতে পারে তবে মুখ দিয়ে বাধা দিবে। যদি তা করতে না পারে, তাহলে তা অন্তর দিয়ে খারাপ মনে করবে। আর এ হচ্ছে দুর্বলতম ঈমান।"

হাদীসের সমস্ত গ্রন্থেই এসব পড়া হয়ে থাকে। কিন্তু তথাপি ঈমানের দুর্বলতার বৃত্ত থেকে বাইরে আসার সাহস কারও হয় না। বিশেষ করে যখন এর ক্ষমতা থাকে। দেশের সরকার যদি তোমাদের সহযোগিতা করে এবং দেশবাসী এ ব্যাপারে তোমাদের সাথে একমত হয়, তাহলে বল এরপর কোনো আপত্তি থাকতে পারে কি ? যে অপরের গণ্ডে চপেটাঘাত করে তার নিজের গণ্ডে চপেটাঘাত না পড়া পর্যন্ত সেকি তার অপরাধের পরিণাম[২] বুঝতে পারবে? যদি তা পারা না যায়, তাহলে তারা হতভাগ্য—দরিদ্র লোকদের কোমল চামড়াকে তাদের আঙুলের শক্তিবৃদ্ধির ক্ষেত্র বানাবে। অতএব চিন্তা করুন।

হতে পারে যে, যে চপেটাঘাত আজ মুসলমানদেরকে দেয়া হচ্ছে, তার অনুভূতি যখন অন্যেরও হবে, তখন সম্ভবত সরকারই এ লেনদেন আইনত নিষিদ্ধ করবে। যদি তারা এমন করে, তাহলে এ আইন পালনের জন্যে সর্বাগ্রে

---

১. বিষ কেড়ে নেয়া অবশ্যই শুভাকাঙ্ক্ষার পরিচায়ক। কিন্তু কেড়ে নিয়ে নিজে তা ভক্ষণ করা এবং অতপর এ বিষকে স্বর্ণ ভস্ম মনে করা শুভাকাঙ্ক্ষাও নয় এবং বুদ্ধিমত্তাও নয়।-(মওদূদী)

২. হিন্দু, ইয়াহুদী, ঈসায়ী সকলেই একে অপরকে এ চপেটাঘাত করছে এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে করে আসছে। কিন্তু এ আঘাতের আস্বাদ গ্রহণ করা ও করানো সত্ত্বেও এর প্রতিক্রিয়া ও পরিণামফল তারা বুঝতে পারছে না। তাহলে কেমন করে আশা করা যেতে পারে যে, মুসলমানদের কয়েকটি মৃদু চপেটাঘাত তাদেরকে এমন সচেতন করে দিবে যে, তারা এ অপরাধ থেকে বিরত থাকবে ? মাওলানা সম্ভবত মনে করেছেন যে, সুদ প্রদানকারী শুধু মুসলমান এবং অমুসলিমগণ শুধু সুদ গ্রহণ করে, দেয় না। এজন্য তার ধারণা এই যে, মুসলমান যখন সুদ খাওয়া শুরু করবে তখন

(পরের পৃষ্ঠায় দেখুন)

তাদের মস্তক অবনত হবে, যারা নবী (স)-এর উম্মত এবং দুনিয়ায় সর্বোত্তম চরিত্রের প্রতিফলন ছিল যাদের কাজ। তখন ধর্মত আমরা অপরাধী হবো যদি আইন মেনে না চলি। আর সরকারও যদি কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ না করে, তাহলে আপনি কি আশ্চর্য হবেন যে, যে দুঃখ মুসলমানগণ পেয়েছে, তা যদি অন্যান্যরাও পায় তাহলে দেশবাসী গলা ফাটানো ওয়াজের কোনোই পরোয়া করবে না। যেমন, লিখনীর মাধ্যমে বক্তৃতার প্রতি তারা উপহাস করে আসছে।[১] যদি তারা অগ্রসর হয়ে এসব কারবার রহিত করার জন্যে কোনো চুক্তি করে, তাহলে আল্লাহ কি মুসলমানদেরকে এ অনুমতি দেয়নি ? যেমন–

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ○

"যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে না এবং তোমাদেরকে গৃহ থেকে বহিষ্কার করে না, তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার ও ইনসাফ করতে আল্লাহ তোমাদেরকে বাধা দেন না। ইনসাফকারীদেরকে আল্লাহ ভালোবাসেন।"–(সূরা আল মুমতাহানা ঃ ৮)

এ ধরনের চুক্তিতে সর্বপ্রথম স্বাক্ষর তারা করবে। দুনিয়ার মানব জাতির মঙ্গলের জন্যে যাদের আবির্ভাব হয়েছিল, এসব কারবারকে অন্তরের সাথে আমরা খারাপ মনে করবো, একথা মুখে বারবার বলব সরকারের দৃষ্টিও এদিকে আকৃষ্ট করব এবং দেশবাসীকেও বলবো। এ যাবত যেভাবে বলেছি, ভবিষ্যতেও বলবো এবং জোরগলায় বলবো এবং অবিরাম বলতেই থাকবো। আমাদেরকে দেশান্তরিত করতে এবং গৃহ থেকে বহিষ্কৃত করতে তারা যতোই

(পূর্ব পৃষ্ঠার পর)

অমুসলমান সুদখোর ঘাবড়ে যাবে এবং অবশেষে ভারত গভর্নমেন্ট সুদের লেনদেন আইনত নিষিদ্ধ করে দিবে। কিন্তু ব্যাপার তা নয়, সমস্ত অমুসলিম সম্প্রদায় সুদ গ্রহণও করে এবং প্রদানও করে। মুসলমান তাদের কাছ থেকে সুদ নিয়ে নতুন কোনো আস্বাদ গ্রহণ করতে পারবে না। অবশ্য তারা এক এক নতুন বস্তুর আস্বাদ নিশ্চয় গ্রহণ করবে এবং তা সম্ভবত তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করে দিয়ে 'ফাও' এবং 'অ-ফাও'-এর পার্থক্য ভুলিয়ে দিবে। অতপর মনে রাখতে হবে যে, মুসলমান এতো বড় পুঁজিপতিও নয় যে, তারা সুদ নেয়া শুরু করলে মাড়ওয়ারী ও সুদী মহাজনগণ দেউলিয়া হয়ে যাবে এবং সকলে পরাজয় স্বীকার করে সুদ নিষিদ্ধকরণের জন্যে উঠে পড়ে লাগবে।–(মওদূদী)

১. তাদের উপহাস ও অট্টহাসি তখনো বন্ধ হবে না বরঞ্চ আরও বেড়ে যাবে। তারা বলবে যে, অর্থনৈতিক ব্যাপারে ইসলামের কোনো নীতি যে চলতে পারে না, এটাই প্রমাণিত হচ্ছে এবং সুদের নিষিদ্ধকরণ বাস্তব জগতে সম্পূর্ণ অচল। তালাক, উত্তরাধিকার, বিধবা বিবাহ প্রভৃতি মাস-লাগুলোতে তারা যেসব ধর্মীয় আইনের সংশোধনী পেশ করেছে, তার যেমন আপনি প্রতিবাদ করেন, তেমনি তারাও ইসলামের দুর্বলতা প্রকাশ করার জন্যে সুদের ব্যাপারে আপনার পরিবর্তিত মতবাদকে একটা প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করবে।–(মওদূদী)

পীড়াপীড়ি করুক না কেন, আমরা তাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা হ্রাস করবো না। আর এ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষার ব্যাপারে মুখ থেকে অগ্রসর হয়ে হাত দিয়েও আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করবো।

امر بالمعروف نهى عن المنكر এ আল্লাহর বিধান[১] পালনের জন্যে আমাদেরকে পয়দা করা হয়েছে। যতোক্ষণ পর্যন্ত না দেশবাসী ও প্রতিবেশীগণ এর অপকারিতা সম্পর্কে একমত হয়েছে ততোক্ষণ আমরা এ নির্দেশ পালন করে চলব। ভগ্ন হৃদয় এভাবেই জোড়া লাগে এবং একদিন তা ইনশাআল্লাহ জোড়া লাগবে।

ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকারের বিধান

প্রসঙ্গ শেষ করার আগে আরও কিছু উল্লেখযোগ্য কথা থেকে যাচ্ছে। তা কি করেই বা ছাড়া যায় ? ইসলামী আইন যখন আমাদের হাত ধরে পথ দেখাবার জন্যে প্রস্তুত, তখন প্রশ্ন জাগে যে, যেসব ইসলামী দেশে শরীয়তের আইন কোনো না কোনো কারণে রহিত হয়ে গেছে, সেখানে কি করা যায় ? সেখানকার শাসক ও রাজা-বাদশাহ তো মুসলমানই বটে। শামী গ্রন্থে এ সম্পর্কে ফতোয়া আছে যে, এসব দেশের মুসলমান শাসকগণ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যদি ইসলামী আইন জারী না করে, তাহলে এসব দেশ দারুল ইসলামই থাকবে।

وبهذا ظهر ان مافى الشام من جبل تيم الله المسمى بجبل الدروز وبعض البلاد التابعة له كلها دار الاسلام لانها وان كانت بها حكم الدروز او نصارى ولهم قضاء على دينهم وبعضهم يعلنون بشتم الاسلام والمسلمين لكنهم تحت حكم ولاة امورنا وبلاد الاسلام محيط ببلادهم من كل جانب واذا رأوا اولى الامر تنفيذ احكامنا فيهم نفذوها ـ(شامى : ج ٣ صفح ٢٧٧)

---

১. امر بالمعروف ونهى عن المنكر (ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধাদান) আল্লাহর এ বিধান পালনের এ পন্থাতে বড়ই অদ্ভুত যে, যে মন্দ কাজ থেকে অপরকে আমরা বিরত রাখতে চাই, আমরা তার মধ্যেই লিপ্ত হয়ে পড়বো। যেমন ধরুন, কোনো ব্যক্তি মদ পান করে দাংগা-ফাসাদ শুরু করে দিল। তারপর অনেক বুঝানোর পরও যখন সে মদ পান ছাড়লো না তখন আমরা নিজেরাও তার মতো মদ খেয়ে দাংগা-ফাসাদ করে তাকে বলব, দেখ, মদ খাওয়ার কত দুঃখজনক পরিণাম ঃ এখন তাহলে আমাদের সাথে চুক্তি কর যে না তুমি মদ খাবে, আর না আমরা খাবো। তা যদি না হয় তবে মনে রেখো আমরা তোমার চেয়ে বেশী করে মদ খেয়ে ও দাংগা করে দেখিয়ে দিব। এ ধরনের নছিহতের দ্বারা মদ পরিত্যাগ করার চুক্তি হয়তো হবে না। তবে হবে এই যে, শরাবখানায় ধার্মিককে দেখে পাঁড় মদখোরেরা জয়ধ্বনী করবে এবং চীৎকার করে বলবে, "শরাবীদের দলে শায়েখকে খোশ আমদেদ জানাই।"-(মওদূদী)

"এর থেকে জানা গেল যে, সিরিয়ার তায়মুল্লাহ্ নামক পার্বত্য এলাকা জাবালে দুরুজ এবং তার অধীন অন্যান্য শহরগুলো সবই দারুল ইসলাম। কেননা যদিও সেখানে দুরুজ অথবা ঈসায়ীদের শাসন চলে, সেখানকার প্রশাসক ও বিচারক তাদেরই ধর্মাবলম্বী এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ প্রকাশ্যে ইসলাম ও মুসলমানদের গালি দেয়, তথাপি তারা ইসলামী রাষ্ট্রের অধীন। তারা চতুর্দিক থেকে মুসলিম রাষ্ট্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। যখনই মুসলিম শাসনকর্তা ইচ্ছা করবেন, তখনই সেখানে ইসলামী আইন চালু করতে পারবেন।"

এর দ্বারা প্রচলিত হয় যে, যেসব দেশে মুসলিম শাসকগণ ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ইসলামী আইন প্রবর্তন করতে অক্ষম, তারা আর দারুল ইসলাম থাকতে পারে না।[১] অবশ্য আল্লাহই এ সম্পর্কে ভালো জানেন।

---

১. মনে হচ্ছে মাওলানা একথা বলতে চান যে, ভারতের মুসলিম রাজ্যগুলোও দারুল হরবের সংজ্ঞায় পড়ে এবং সে সবের অমুসলিম প্রজাবৃন্দও হরবী যাদের সম্পদ হালাল। এ ধরনের ইজতিহাদের অন্তত হানাফী ফিকায় কোনো অবকাশ নেই। ফকীহগণের বিশদ ব্যাখ্যার জন্যে তাহাবী কর্তৃক দুররুল মুখতারের টীকা দ্রষ্টব্য ঃ

لواجريت احكام المسلمين واحكام الشرك لاتكون دار الحرب -

"যে রাষ্ট্রে ইসলামী আইন ও শির্কের আইন প্রচলিত তা দারুল হরব নয়।"

ফাতওয়ায়ে বায্যায়াতে আছে ঃ

فاذا وجدت الشرائط كلها صارت دار الحرب وعند تعارض الدلائل والشرائط يبقى ما كان ويترجح جانب الاسلام احتياطا -

"যদি দারুল হরবের সকল শর্তই পাওয়া যায়, তাহলে তো দারুল হরব হবে। আর যদি দলিল শর্তসমূহের মধ্যে গরমিল দেখা যায়, তাহলে তা আগের মতোই থাকবে অথবা নিরাপত্তার জন্যে দারুল ইসলাম হবে।"

খাজানাতুল মুফতীন গ্রন্থে আছে ঃ

ان دار الاسلام لاتصير دار الحرب متى لم يبطل جميع ماصارت به دار الاسلام فما بقى علقة من علائق الاسلام يترجح جانب الاسلام -

"যেসব কারণে দারুল ইসলাম হয়, তার সবগুলো বাতিল না হলে দারুল ইসলাম দারুল হরবে পরিণত হয় না। সুতরাং ইসলামের কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকলেই তা দারুল ইসলামের পক্ষেই গণ্য হবে।"

এসব ব্যাখ্যার পর কে বলতে পারে যে, হায়দরাবাদ, ভুপাল, জুনাগড় প্রভৃতি রাজ্যসমূহ দারুল হরব হয়ে গেছে এবং তার অমুসলিম প্রজাগণ হরবী। মাওলানা সম্ভবত জানেন যে, ইসলামী ফিকাহ অনুযায়ী দারুল হরব দারুল ইবাহাতের অপর নাম। এখানে ইসলামী আইনের অধিকাংশ কানুনই প্রয়োজনের তাকীদে শিথিল করে দেয়া হয়। এ সাময়িক শিথিলতা যদি স্থায়ী করে দেয়া হয়, তাহলে মুসলমানদের মুসলমান থাকা অবসম্ভব হয়ে পড়বে। যেমন ধরুন, লর্ড ওয়েলেসলীর বাধ্যতামূলক মিত্রতায় শরীক হবার পর থেকে আলেমগণ যদি হায়দারাবাদকে দারুল হরব ঘোষণা করে দারুল ইবাহাত বানিয়ে দিতেন, তাহলে একশত ছত্রিশ বছরের মধ্যে এ রাজ্যের মুসলমান এতটা বিকৃত হয়ে পড়তো যে, মুসলমান দেশের কোনো ব্যক্তি তাদেরকে মুসলমান বলে চিনতেই পারতো না।–(মওদূদী)

এ ধরনের অনৈসলামী রাষ্ট্রে জুমা, ঈদ ইত্যাদি কিভাবে হতে পারে তাও শামী গ্রন্থে আছে ঃ

كل مصر فيه والى مسلم من جهة الكفار يجوز منه اقامة الجمع والاعياد واخذ الخراج وتقليد القضاء وتزويج الا يامى ناقلا عن جامع الفصولين (ج ٣ ص ٢٧٧)-

"যেসব শহরে কাফেরদের পক্ষ থেকে মুসলিম শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়, সেখানে জুমা ও ঈদ জায়েয। সে রাজ্যের কর আদায় করা, বিচার বিভাগ পরিচালনা করা ও বিধবা বিবাহ দেয়া জায়েয।"

কিন্তু যে অনৈসলামী রাষ্ট্রে সরকারের স্বীকৃত কোনো মুসলিম শাসক না থাকে, সে সম্পর্কে নির্দেশ হচ্ছে ঃ

واما فى بلاد عليها ولاة كفار فيجوز للمسلمين اقامة الجمع والاعياد ويصير القاضى قاضيا بتراضى المسلمين ويجب عليهم طلب والى المسلم

"যে রাষ্ট্রে শাসক কাফের সেখানে মুসলমানদের জুমা ও ঈদ জায়েয। তারা পরস্পরের পরামর্শ করে কাজী নিযুক্ত করবে। কিন্তু তাদের কর্তব্য হবে মুসলিম শাসনকর্তা দাবী করা।"

মাওলানার দ্বিতীয় প্রবন্ধ

(মাওলানা গিলানীর উপরোক্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার পর কোনো কোনো আলেম যে প্রতিবাদ জানান তার জবাবে মাওলানা নিম্নের প্রবন্ধটি লিখেন–সংকলক।)

এক ঃ বিষয়টির ব্যাখ্যায় কিছু অসতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে যার জন্যে ভুল বুঝাবুঝির আশংকা আছে। লিখা হয়েছে যে, অনৈসলামী রাষ্ট্রে সুদ আর সুদ থাকে না ইত্যাদি। তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, হানাফী ফিকাহ অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে—সে মুসলিম হোক অথবা অমুসলিম—এ ধরনের কারবার জায়েয এবং তাদের ধন-সম্পদ রক্ষিত ও হালাল হয়ে যায়। অথচ বলার উদ্দেশ্য তা নয়। বরঞ্চ এ বিধান শুধু অমুসলিম জাতি যথা ইয়াহুদী, নাসারা, অগ্নি-উপাসক, হিন্দু প্রভৃতির জন্যে নির্দিষ্ট যাদের দায়িত্ব কোনো ইসলামী রাষ্ট্র গ্রহণ করেনি। আমি আমার দাবীর সমর্থনে ইমাম মুহাম্মদের সিয়ারে কবীরের বিখ্যাত ফতোয়া উদ্ধৃত করেছি। চূড়ান্ত নিশ্চয়তার জন্যে এ আইনের নিম্নলিখিত ধারা উদ্ধৃত করছি ঃ

ولو كانت هذه المعاملة بين المسلمين مستأمنين او اسيرين فى دار الحرب

كان باطلامردودا لانهما يلتزمان احكام الاسلام فى كل مكان

(سير كبير ج ٢ ـ ص ٢٢٦)ـ

"এ কারবার যদি দুজন মুসলমানের মধ্যে হয়, যারা নিরাপত্তা চুক্তির মাধ্যমে দারুল হরবে বসবাস করে, অথবা যদি তারা কয়েদী হয়, তাহলে তা বাতিল ও পরিত্যক্ত হবে। কারণ তারা উভয়ে সর্বত্রই ইসলামী আইন মেনে চলার জন্যে দায়ী।"[১]

কয়েদী অথবা বন্দীর জন্যে ফেকাহর দৃষ্টিতে এমন প্রয়োজন নয় যে, তাকে জেলখানায় থাকতে হবে। কিন্তু কোনো দেশ থেকে অন্য দেশে বিনা অনুমতি বা পার্সপোর্টে যেতে পারে না—এমন প্রত্যেক ব্যক্তিই বন্দী।[২] যথাসময়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

দুই ঃ দ্বিতীয় কথা এই যে, নিসন্দেহে আমি তাড়াহুড়ার মধ্যে এ প্রবন্ধ লিখেছি এবং প্রকাশিত হবার আগে কারো সাথে পরামর্শও করতে পারিনি। আমার এ ত্রুটি আমি স্বীকার করছি। কিন্তু আমি যেসব চিন্তা ও ধারণায় অনুপ্রাণিত হয়ে এ প্রবন্ধ লিখেছিলাম তা সর্বজ্ঞ আল্লাহ তায়ালা অবগত আছেন। এছাড়া এ বিষয়টির বুনিয়াদ যেসব ক্ষেত্রের উপর তাহলো দুটি। এক. ভারত দারুল কুফর, দ্বিতীয়. দারুল কুফরে অবৈধ উপায়ে অরক্ষিত সম্পদ

---

১. এর দ্বারা শুধু এতটুকু প্রমাণিত হয় যে, ইসলামী রাষ্ট্রের দুজন নাগরিক অপর রাষ্ট্রে একে অপরের কাছ থেকে সুদ নিতে পারবে না। কিন্তু দারুল ইসলামের নাগরিকদের মধ্যে কোনো মুসলমান যদি নিরাপত্তা সহ দারুল হরবে যায়, তাহলে সে দারুল হরবের মুসলিম অধিবাসীর কাছ থেকে সুদ নিতে পারবে। কেননা হানাফী ফেকাহের মতে কাফের হরবীর মতো ঐ মুসলমানের সম্পদও রক্ষিত নয়। যাহরুর রায়েতে আছে ঃ

وحكم من اسلم فى دار الحرب ولم يحاجر كالحربى عند ابى حنيفة لان ماله غير معصوم عنده فيجوز للمسلم الربا معه ـ(جلد ٦ صفح ١٤٧)

"দারুল হরবে যে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং হিজরত করেনি সে আবু হানিফার মতে হরবী সমতুল্য। কারণ তাঁর মতে মাল অরক্ষিত। সুতরাং তার কাছ থেকে সুদ নেয়া মুসলিমের জন্যে জায়েয।"

এ দিক দিয়ে মাওলানার ব্যাখ্যা অনুযায়ী যদি ভারত দারুল হরব হয়, তাহলে সীমান্তের পাঠানদের জন্যে ভারতে শুধু হিন্দুর নিকট থেকে নয়। বরঞ্চ মুসলমানের নিকট থেকে সুদ নেয়াও হালাল ও পবিত্র হবে। শুধু তাই নয়, বরঞ্চ তারা এখানে মুসলমানদের সাথে জুয়াও খেলতে পারে এবং হারাম জিনিস তাদের কাছে বিক্রী করতে পারে।—(মওদূদী)

২. বন্দীর সংজ্ঞা যদি মাত্র এতটুকু হয়, তাহলে ভারতের সকল মুসলমানই নিরাপত্তাপ্রাপ্ত নয়, বরঞ্চ বন্দী বলেই পরিগণিত হবে। আর যুদ্ধ বন্দীদের জন্যে দেশের আইন মেনে চলাও অপরিহার্য নয়। সে চুরি, হত্যা এবং ঘুষ প্রদানের কাজ করতে পারে।

ইসলাম অনুযায়ী হালাল। এ দুটোর মধ্যে প্রথমটি সম্পর্কে আমি ভারতের অধিকংাশ নির্ভরযোগ্য আলেম, মনীষী ও ধর্মভীরু, ব্যক্তিগণকে একমত পেয়েছি। অবশ্য দ্বিতীয় বিষয়টি সম্পর্কে ঐ সকল প্রসিদ্ধ আলেমের সাথে বিশদভাবে আলোচনা করতে পারিনি, যাঁদের নাম আপনি উল্লেখ করেছেন এবং যাঁদের মধ্যে অধিকাংশই আমার ওস্তাদ এবং ওস্তাদ শ্রেণীর। শুধু মাওলানা আশরাফ আলী থানভী সাহেবের অভিমত আমি জানতে পেরেছি।

তিনি এ মাসয়ালাটির ব্যাপারে হানাফি ফেকাহর এসব খুঁটিনাটি সম্পর্কে নিশ্চিত নন। তিনি তাঁর ফতোয়া ও তাফসীরে দ্বিতীয়টির নির্ভুল হওয়া সম্পর্কে হাদীস থেকে এবং নীতিগতভাবে আলোচনা করেছেন। কিন্তু যতদূর আমার জানা আছে, ইমাম আবু হানিফা (র)-এর অভিমতকেই আমি কুরআন ও সুন্নাহর সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ পেয়েছি। ইমাম সাহেব উপলব্ধি করেছেন যে, لاتقتلوا انفسكم (নিজেদেরকে হত্যা করো না)-এর প্রকাশ্য বিধান শুধু মুসলমানদের জন্যেই সীমাবদ্ধ। নতুবা জিহাদের বিধান অর্থহীন হয়ে পড়ে। এভাবে لاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل (তোমাদের ধন-সম্পদ নিজেদের মধ্যে অবৈধ উপায়ে ভক্ষণ করো না) এবং তারই উপ-তপসীল لاتاكلوا الربا (সুদ খেয়ো না)-এর প্রকাশ্য সাধারণ বিধান শুধু মুসলমানদের জন্যে নির্দিষ্ট।[১] বিশেষ করে যখন নিষিদ্ধ মালের বিধান নিষিদ্ধ জ্ঞাপক শব্দে بينكم শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তখন সে আইন হত্যা আইনের ব্যাপকতার চেয়ে আরও

১. মাওলানার একথায় এটাই প্রমাণিত হয় যে, রক্তের সম্মান, অর্থ-উপার্জনে হালাল-হারামের পার্থক্য এবং সুদের অবৈধতা প্রভৃতি সবকিছুই মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যেই সীমিত। ইসলামের গণ্ডির বাইরে অমুসলিমদের রক্তের না কোনো মর্যাদা আছে, আর না তাদের সাথে আর্থিক লেনদেনে হালাল-হারামের ভেদাভেদ। এর চেয়ে ইসলামী আইনের অপব্যাখ্যা আর কিছু হতে পারে না। কুরআনে এরশাদ করা হয়েছে ঃ

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ط(الانعام : ١٥١)

"আল্লাহ যে প্রাণ হত্যা হারাম করেছেন হক ব্যতীত অন্য কোনো উপায়ে তা হত্যা করো না।" এ আয়াত অনুযায়ী, প্রত্যেক মানুষের জীবন সম্মানযোগ্য। তা হত্যা করা বৈধ একমাত্র তখনই হতে পারে যদি 'হকের' উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। জিহাদের সময় এ হারাম হকের জন্যে হালাল হয়ে যায়, যেমন ধারা 'কিসাসে' স্বয়ং মুসলমানের হারাম খুন হালাল হয়ে যায়। যদি নীতিগতভাবে ইসলাম কাফের গায়ের জিম্মীকে 'হরবী' ঘোষণা করে থাকে, তাহলে তার অর্থ এই নয় যে, ইমাম এবং জামায়াত থেকে আলাদা হয়ে প্রতিটি মুসলমান প্রতিটি গায়ের জিম্মী কাফেরকে যখন খুশী তখন হত্যা করে 'হক' কায়েম করবে এবং তাদের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করবে। যদি এমন হয় তাহলে একজন মুসলমান ও একজন রক্ত পিপাসু দস্যুর (Anarchist) মধ্যে কি পার্থক্য থাকে? এমনিভাবে অর্থ উপার্জন ও ব্যয়ের যে পন্থাসমূহ ইসলাম হারাম করেছে, তা সবই অকাট্য হারাম। এর মধ্যে এ ধরনের কোনো পার্থক্য হতে পারে না যে, মুসলমানদের নিকট থেকে সম্পদ গ্রহণের যে পন্থা হারাম, কাফেরের নিকট থেকে সম্পদ গ্রহণের সেই পন্থা হালাল। আল্লাহ বলেন ঃ

অধিকতর নির্দিষ্ট হয়ে গেল। এ সত্য কথা যে, সুদের বিধানটি বড় কঠোর। কুরআন এক ব্যক্তির হত্যাকে মানব জাতির হত্যার সমতুল্য বলে বর্ণনা করেছে যার শাস্তিস্বরূপ চিরকাল জাহান্নামের অগ্নির ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। কিন্তু কে জানে না যে, এ কঠোর আইনের একটা দিক [ইমাম আবু হানিফা (র)-এর মতে তাহলো সম্পদ সম্পর্কিত] বড় সওয়াবের বলে উল্লেখ করা হয়েছে ? ইমাম সাহেবই বা করবেন কি ? কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَاخُذُونَهَا ـ(الفتح : ٢٠)

"আল্লাহ্ তোমাদেরকে বহু গণিমতের মালের ওয়াদা করেছেন যা তোমরা পাবে।"-(সূরা আল ফাতহ্ ঃ ২০)

এর অর্থ কি এই যে, এসব সম্পদ মুসলমানগণ খরিদ করে নিবে ? অথবা তা কি উত্তরাধিকার সূত্রে পাবে, না তাদেরকে কেউ 'হেবা' করে দেবে ?

وَلَا تَاكُلُوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا اِلَى الْحُكَّامِ لِتَاكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○ (البقرة : ١٨٨)

"তোমাদের মাল তোমরা তোমাদের মধ্যে অবৈধ উপায়ে ভক্ষণ করো না এবং অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদের কিছুটা লাভ করার জন্যে বিচারকদের কাছে (মিথ্যা) মামলা দায়ের করো না। অথচ তোমরা জান (যে এ মামলা অন্যায়ভাবে করা হচ্ছে)।"-(সূরা আল বাকারা ঃ ১৮৮)

احل اللّٰه البيع وحرم الربوا "আল্লাহ কেনা-বেচা হালাল করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন।" এবং আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ ـ

"নিশ্চয় মদ, জুয়া, দেবমূর্তি, তীরের সাহায্যে জুয়া প্রভৃতি অপবিত্র কাজ এবং শয়তানের কাজের মধ্যে শামিল।"-(সূরা আল মায়েদা ঃ ৯০)

এসব বিধানের মধ্যে কোন্‌টিকে শুধুমাত্র মুসলমানদের পারস্পরিক কায়-কারবারের সাথে নির্দিষ্ট করা যেতে পারে ? মুসলমানদের রীতিনীতি যদি এই হয় যে, মদকে হারামও বলবে, ওদিকে অমুসলিমদের কাছে তা বিক্রিও করবে, জুয়া হারাম বলবে আর অমুসলিম জাতির সাথে জুয়া খেলবে, শূকর হারামও বলবে, শূকর ভক্ষণকারীদের কাছে তা বিক্রিও করবে, একদিকে সুদ হারাম হবার কথা বক্তৃতার মাধ্যমে বলে বেড়াবে, আর অন্যদিক থেকে অমুসলিম জাতির সাথে সুদী লেনদেনকে হালাল এবং পবিত্র বলবে, তাহলে দীন ইসলাম একটি হাস্যাস্পদ বস্তুতে পরিণত হবে এবং কোনো বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি এমন ধর্ম গ্রহণ করতে অগ্রসর হবে না। দুঃখের বিষয় এই যে, মাওলানা এ ধরনের অপব্যাখ্যাকে ইমাম আবু হানিফার উপর আরোপ করছেন। অথচ এসব সাধারণ বিধানের মধ্যে তিনি যে ব্যতিক্রম নির্ধারণ করেছেন, তা শুধু বিশেষভাবে সামরিক প্রয়োজনে শুধু ওদের জন্যে যারা যুদ্ধে লিপ্ত। এর উদ্দেশ্য এটা কখনই নয় যে, মুসলমানদের সকল জনপদগুলো স্থায়ীভাবে অপর জাতির সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে হালাল হারামের পার্থক্য মিটিয়ে দিবে এবং বংশানুক্রমে এই হারামখুরীতে জীবন কাটিয়ে দিবে।-(মওদূদী)

তারপর বলপ্রয়োগ নয়, বিনা বলপ্রয়োগেই যে সম্পদ পাওয়া যাবে সে সম্পর্কে বিধান এই যে, তা এমন বস্তু যেমন ঃ

وَمَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ فَمَآ اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهٗ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ط(الحشر : ٦)

"আল্লাহ তাঁর রসূলকে তাদের নিকট থেকে 'ফাই' হিসেবে যাকিছু দান করেছেন, তার জন্যে তোমরা উট অথবা ঘোড়া (যুদ্ধের আকারে) ব্যবহার করনি। আল্লাহ তাঁর রসূলগণকে যাদের উপর ইচ্ছা করেন বিজয়ী করে দেন।"–(সূরা আল হাশর ঃ ৬)

শুধু যুদ্ধকালেই এ প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়নি। বরঞ্চ সকলেরই জানা আছে যে ঃ

اِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَى الطَّآئِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ ـ

"যখন আল্লাহ তায়ালা দুটো দলের মধ্যে একটি সম্পর্কে এ ওয়াদা করেছিলেন যে, এ তোমাদের জন্যে।"

কে না জানে যে এ দুটো দলের মধ্যে আল্লাহ ঐ দলটির ওয়াদা করে ছিল যা عير অর্থাৎ বাণিজ্য কাফেলা ছিল ? কি ওয়াদা করেছিলেন ? তাই এ انها لكم অর্থাৎ তা তোমাদের জন্যে। ব্যবসা-বাণিজ্য, 'হেবা' দান, সদকা-খয়রাত অথবা অন্য কোনো উপায়ে কি তা হস্তগত করার জন্যে মুসলমানদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল ?[১] মুসলমানদের জন্যে সম্পদ লাভের এই পন্থাই যদি নির্ধারণ করে দেয়া হয়, তাহলে তাকি অবৈধ পন্থা এবং لاتاكلُوا اَموالكم بينكم بالباطل -এর অন্তর্ভুক্ত হবে না ? বুখারীতে আছে যে, হুদায়বিয়ার সন্ধি অনুযায়ী, সাহাবী আবু বাসীর (রা)-কে যখন মদীনায় থাকার অনুমতি দেয়া হলো না, তখন তিনি কয়েকজন সংগী-সাথীসহ সমুদ্রতীরে অবস্থান করতে লাগলেন। তাঁর কাজ কি ছিল ? ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন ঃ

فوالله ما يسمعون بعير حرجت لقريش الى الشام الا اعترضوا لها فقتلوهم واخذوا اموالهم ـ

---

১. এ কাফেলা ছিল একটি যুদ্ধরত জাতির, যদিও কার্যত কাফেলাটি যুদ্ধ করছিল না। শত্রুর বাণিজ্যে বাধা সৃষ্টি করা, তাদের বাণিজ্য জাহাজ অথবা কাফেলা আটক করা, তাদের ধন-সম্পদ হস্তগত করা যুদ্ধ আইন অনুযায়ী সম্পূর্ণ জায়েয। রসূলুল্লাহ (স)-এর সময়ে একমাত্র যুদ্ধের অবস্থা ব্যতীত অন্য সময়ে গায়ের জিম্মী কাফেরদের রক্ত ও মাল হালাল করা হয়েছে এবং ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক মুসলমানকে এ অধিকার দেয়া হয়েছে যে, যেখানে যে গায়ের জিম্মীকে পাওয়া যাবে সেখানেই তাকে লুণ্ঠন করা হবে—এমন কোনো দৃষ্টান্ত মাওলানার জানা থাকলে তা পেশ করুন।–(মওদূদী)

"আল্লাহর কসম, যখনই তারা শুনতেন যে, কুরাইশদের কোনো বাণিজ্য কাফেলা সিরিয়ার দিকে যাচ্ছে, তখন তা আক্রমণ করতেন, কাফেলার লোকদেরকে হত্যা করতেন এবং তাদের ধন-সম্পদ হস্তগত করতেন।"

এর চেয়ে অধিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে কি ? কুরআনে তো শুধু (عير) কাফেলার ওয়াদা করা হয়েছে। কিন্তু এখানে তো বাস্তবে পরিণত করা হয়েছে। এ বিধান কি হানাফী ফিকাহর, না কুরআনের প্রকাশ্য দলিলের দাবী ? আশ্চর্য কথা এই যে, ইমাম সাহেব যে আইনের অধীনে এ ধারা প্রণয়ন করলেন (অর্থাৎ গনিমতের আইন), তা নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েত অনুসারে শুধু মুসলমানদের জন্যে নির্দিষ্ট মনে করা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও লোকে বলে যে যদি সুদের কারবার অন্য জাতির সাথে জায়েয হতো, তাহলে ইয়াহুদীদের সম্পর্কে কুরআনে কেন বলা হয়েছে ঃ

وَاَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ـ(النساء :١٦١)

"এবং ইয়াহুদীদের সুদ নেয়ার কারণে, অথচ তা নিতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল এবং লোকের মাল তাদের অবৈধভাবে ভক্ষণ করার কারণে।"

যখন ইয়াহুদীদের জন্যে গনিমতই হারাম ছিল, তখন কি কারণে তাদের জন্যে সুদ জায়েয হবে ?[১]

আর যখন এটা প্রমাণিত হবে যে, তারা শুধু এমন লোকের সাথে কারবার করতো যারা ইয়াহুদী নয়, তখনই একথা বলা যাবে।[২] মাওলানা শিবলী তাঁর সীরাত গ্রন্থে আবু দাউদের বর্ণনা বারবার উল্লেখ করেছেন। তার থেকে ভুল ধারণা পোষণ করা উচিত হবে না। কেননা, এ কঠোরতার ভিত্তি হলো 'গলুল' (বন্টনের পূর্বেই গনীমতের মাল আত্মসাত করা)। হযরত সামরাহ বিন জুন্দব কাবুলের যুদ্ধে এর বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন। আবু লবীদ বর্ণনা করেন—আমরা কাবুল যুদ্ধে সামরাহ বিন জুন্দবের সাথী ছিলাম। গনিমতের মাল হস্তগত হবার সাথে সাথে লোক তা লুট করা শুরু করলো। হযরত সামরাহ (রা) বক্তৃতা

---

১. ইয়াহুদীদের জন্যে গনিমত হালাল হোক বা না হোক, কিন্তু 'ফাই' হওয়াতে কোনো সন্দেহ নেই। কুরআন একথার সাক্ষী—একটা গোটা দেশ আল্লাহ তাদেরকে দেবার ওয়াদা করেছিলেন। একথা সুস্পষ্ট যে, সমুদয় মাল তাদের জন্যে 'ফাই' হবে। নতুবা বলুন, প্রতিশ্রুত দেশের মালের উপর তাদের অধিকার কি করে জায়েয হলো ? ক্রয়-বিক্রয়, সদকা অথবা দান তো ছিল না।-(মওদূদী)

২. এর প্রমাণের প্রয়োজন কি ? কুরআন তো সাধারণভাবে اموال الناس (মানুষের সম্পদ) বলা হয়েছে। আপনার নিজের বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী যখন اموالهم بينهم বলা হয়নি, তখন তার অর্থ এই হয় যে, তারা ইয়াহুদী অ-ইয়াহুদী সকলের নিকটই সুদ খেতো, যেমন ধারা আজ পর্যন্ত খেয়ে আসছে।-(মওদূদী)

করতে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি নবী (স)-এর নিকট শুনেছি, তিনি আত্মসাত করতে নিষেধ করেছেন। তারপর সকলে লুণ্ঠিত মাল ফিরিয়ে দিল। অতপর শরীয়ত অনুযায়ী তিনি (জুন্দব) বণ্টন করে দিলেন (মাজমাউল ফাওয়ায়েদ)। এতে একথা নেই যে, আসল মালিকদেরকে ফেরত দেয়া হলো। বরঞ্চ বণ্টনের পূর্বে আত্মসাত করতে নিষেধ করা হয়। যাকে বলা হয় গুলুল।

'রিবার' বিধান কখন নাযিল হয়েছিল এ বিষয়ে মতভেদ আছে। لاتاكلوا الربا اضعافا مضاعفة অনেক পূর্বে নাযিল হয়েছিল। কিন্তু একে মদের মতো ক্রমশ প্রেরণামূলক নির্দেশ মনে করা যেতে পারে। অতপর সুদের খুঁটিনাটি হারাম কার্যকর করা হয়েছিল সপ্ত হিজরী থেকে। ইমাম মালেকের মুয়াত্তায় আছে, রসূলুল্লাহ (স) খয়বরে চাঁদির একটি পাত্র বিক্রির ব্যাপারে বলেন, তোমরা উভয়ে সুদী কারবার করেছ। অতএব তারা তা ফেরত দিল।

এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, দারুল ইসলামে এ বিধান সপ্তম হিজরী থেকে কার্যকর হয়েছিল। কিন্তু সমগ্র আরবে কখন কার্যকর হয়েছিল ? সকলেই জানেন যে, মক্কা বিজয়ের সময়ে নয়, বরঞ্চ বিদায় হজ্জে জাহেলিয়াত যুগের সুদ বন্ধের ঘোষণা নবী (স)-এর পক্ষ থেকে করা হয়েছিল। এর থেকে কি একথা জানা যায় না যে, যে দেশে ইসলামী শাসন কায়েম হয়নি, সেখানে সুদী লেনদেন সে ধরনের হতে পারে না ; যেমন হয় ইসলামী শাসন কায়েম হবার পর।[১] নতুবা, হযরত আব্বাস (রা) তো বিদায় হজ্জের বহু পূর্বেই মুসলমান হয়েছিলেন এবং অন্ততপক্ষে তাঁর সুদ বিদায় হজ্জ বন্ধ হবার পরিবর্তে সপ্তম হিজরীর আগেই বন্ধ হওয়া উচিত ছিল।[২] আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কতিপয়

১. এর থেকে শুধু এতটুকু প্রমাণিত হয় যে, মুসলমানগণ কোনো দেশে সুদী কারবার বন্ধের সাধারণ নির্দেশ একমাত্র তখনই জারী করতে পারে। যখন তারা সে দেশের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠার পর অমুসলিমদের প্রতিও তাদের বিধানসমূহ প্রয়োগ করতে সমর্থ হবে। প্রত্যেক বিজ্ঞ ব্যক্তিই বুঝতে পারেন যে, কোনো দেশের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠার পূর্বে সেখানে কোনো আইন কার্যকর করার নির্দেশ দেয়া হবে সম্পূর্ণই অযৌক্তিক। নবী (স)-এর নিকটে কি করে এ আশা করা যেতে পারে যে, জাহেলিয়াত যুগের সুদী লেনদেনকারী তাঁর অধীনতা স্বীকার করার পূর্বেই সে সুদ বন্ধের ঘোষণা করবেন ? অবশ্য যারা তাঁর আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন অর্থাৎ মুসলমান হয়েছিলেন, তাদেরকে তিনি সুদী লেনদেন করতে নিষেধ করেছিলেন, সমগ্র আরব দেশে সুদী কারবার বন্ধ হবার পূর্বেই।-(মওদূদী)

২. হযরত আব্বাস (রা) সম্পর্কে জানা যায় যে, তিনি ইসলাম গ্রহণ করার পর মক্কায় ফিরে যান এবং মুসলমান হবার পরও সেখানে যে তিনি সুদী কারবার করতেন এটা নবী (স)-এর জানা ছিল না। (ইমাম সারাখসীর কিতাবুল মাবসুত ১৪ ঃ ৫৭ দ্রঃ)। নবী (স) কখন তা জানতে পারেন, তা বলা যায় না। মোটকথা বিদায় হজ্জের সময় যখন তিনি আল্লাহর নির্দেশে সুদ নিষিদ্ধ করার সাধারণ ঘোষণা করেন, তখন সকলের সাথে হযরত আব্বাস (রা)-এর বকেয়া সুদও রহিত করা হয়। এ ঘটনা অকাট্যরূপে প্রমাণ করে না যে, রসূলুল্লাহ (স) হযরত আব্বাস (রা)-এর সুদী কারবার জায়েয রেখেছিলেন।-(মওদূদী)

মুসলিম মনীষী বিদায় হজ্জের এ রেওয়ায়েতের প্রতি সন্দেহ পোষণ করে বলেন যে, যদি অমুসলিমগণের নিকট সুদ নেয়া জায়েয হতো, তাহলে ইসলাম পূর্ব কালের যে বকেয়া সুদ ছিল, তা শরীয়াতের বিধানদাতা কেন রহিত করলেন ?

নিশ্চিতরূপে সমস্যা যদি এই হতো যে, শুধু সুদের চুক্তি দ্বারাই সুদের অধিকারী সুদখোর হয়ে যায়, তাহলে প্রশ্ন হতে পারতো যে, একটি প্রতিষ্ঠিত অধিকার রহিত করার কি অর্থ হতে পারে ? কিন্তু সমস্যার ভিত্তি এটা নয় যে, সুদের মাধ্যমে অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। অতএব বৈধতার বিধান বলবৎ থাকবে। দেশ যখন ইসলামী হয়ে যাবে, তখন অরক্ষিত সম্পদ রক্ষিত হয়ে যাবে। তারপর এ রক্ষিতকে কিভাবে অরক্ষিত বলা যাবে ?[১] আর এ কারণেই, নাজরানবাসী ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করার পর এ সুদী কারবার বন্ধ করার নির্দেশ তাদেরকে দেয়া হয়েছিল। কারণ তাদের দায়িত্ব গ্রহণের চুক্তির পর তাদের সম্পদ রক্ষিত হয়ে গিয়েছিল।

লোক জিজ্ঞাসা করে যে, সাহাবায়ে কেরামের কার্যপ্রাণালীর দ্বারা এমন কোনো বিশেষ প্রতিক্রিয়া জানতে পারা যায় কি যে, তাঁরা অমুসলিমদের সাথে সুদের কোনো বিশেষ কারবার করেছেন ? তার জবাবে ইমাম মুহাম্মদ তাঁর সিয়ারে কবীর গ্রন্থে হযরত আব্বাস (রা)-এর কার্যকলাপ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, হযরত আব্বাস (রা) মক্কা বিজয়ের পূর্বে এ সুদী কারবারের

---

১. কুরআনী বিধানের এ কারণ নির্ণয় সঠিক নয়। এ প্রশ্নের সাথে বৈধতার প্রশ্নের কোনো সম্পর্ক নেই। কুরআনে যাকিছু বলা হয়েছে তা এই ঃ

فَمَنْ جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهُ مَا سَلَفَ ـ(البقرة : ٢٧٥)

"যে ব্যক্তি আল্লাহর উপদেশ মেনে নিয়ে সুদখোরী পরিত্যাগ করবে, তাকে পূর্বের সুদখোরীর জন্যে মাফ করা হবে।" তা আর তার নিকট থেকে ফেরত দেয়া হবে না। وَذَرُوا مَابَقِىَ مِنَ الرِّبوا "মানুষের কাছে তোমাদের যে প্রাপ্য সুদ বাকী আছে তা ছেড়ে দাও।"

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ج ـ(البقرة : ٢٧٩)

"যদি এ নির্দেশ তোমরা মেনে না চল, তাহলে আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্যে তৈরী হও।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৭৯)

এ হলো কোনো কিছু বাস্তবায়নের বিজ্ঞতাপূর্ণ পদক্ষেপ। আর প্রত্যেক সরকার অবৈধতার আইন কার্যকরীর সময় এরূপই করে থাকেন। বিধান ঘোষিত হবার পূর্বে সুদের যে লেনদেন হয়ে গেছে তা যদি ফেরত দেয়ার নির্দেশ দেয়া হতো, তাহলে অসংখ্য মামলা-মোকদ্দমা চলতে থাকতো যা কোনোদিন শেষ হতো না। আর ঘোষণার পর বকেয়া সুদ আদায়ের অনুমতি দিলে নিষিদ্ধকরণ আইনটিই অর্থহীন হয়ে পড়তো। আর এ বকেয়া আদায়ের কাজ যে কতদিন পর্যন্ত চলতো, তাও বলা যেতো না। অতএব একই সময়ে সুদ এবং তার যাবতীয় কার্যকলাপ বন্ধ করে দেয়াই হচ্ছে শরীয়তী আইন-বিধানের দৃষ্টিকোণ থেকে এক কার্যকর পদক্ষেপ।–(মওদূদী)

জন্যে মদীনা থেকে মক্কায় যেতেন এবং তখন পর্যন্ত মক্কা দারুল ইসলামে পরিণত হয়নি।[১] এরূপ হাদীসে আছে যে, হযরত আবু বকর (রা) সুদের নয়, জুয়ার কারবার করেছেন এবং বদর যুদ্ধের পর জুয়া লব্ধ অর্থ গ্রহণ করেন। একথা বলা মুস্কিল যে, তাঁর এ কাজ জুয়ার বিধান নাযিল হবার পূর্বে হয়েছিল।[২] কারণ একথা ঠিক যে, ইরান রোমের নিকটে পরাজিত হয় সেই সময়ে, যখন কুরাইশগণ মুসলমানদের হাতে পরাজিত হয়। এ বাজীর ব্যাপারে হযরত আবু বকর (রা)-এর প্রতিপক্ষ ছিল উমাইয়া বিন খালফ যে বদর যুদ্ধে নিহত হয়। বাজী ধরা হয়েছিল একশ উটের। হযরত আবু বকর (রা) নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশদের নিকটে বাজীর উট দাবী করলে তা মেনে নেয়া হয়। তারপর আবু বকর (রা) একশ উট নিয়ে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। একথা ঠিক যে, বদর যুদ্ধের কত পরে এ বাজীর উট আদায় করা হয়েছিল, তা সঠিকভাবে জানা নেই। কিন্তু এটা ধারণার অতীত যে, শোকাবিভূত ও বিক্ষুব্ধ কুরাইশগণ বদরের পরেই এতটা সুবিচার করবে যে, যে বাজী ধরেছিল তার নিকটে নয় বরঞ্চ তার উত্তরাধিকারীর নিকট থেকে একশ উট আদায় করে হযরত আবু বকর (রা)-কে দিবে। স্পষ্ট মনে হচ্ছে যে, এ বিষয়ে যদি সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে তাহলে হুদায়বিয়ার সন্ধির পরে হয়ে থাকবে। আর একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, মদ ও জুয়া হারামের বিধান নাজিল হয়েছিল ওহোদ যুদ্ধের কাছাকাছি সময়ে। বুখারী থেকে একথা প্রমাণিত আছে। অতএব বাজীর উট আদায়ের ঘটনা জুয়া হারামের বিধান নাযিলের পরে সংঘটিত হয়েছে বলেই অধিকতর ধারণা করা যায়। ঐতিহাসিক নিরিখে যদি এ ঘটনার অনুসন্ধান কারো অভিপ্রেত হয়, তাহলে মাওলানা শিবলী নোমানীর সীরাতুন্নবী গ্রন্থ থেকে আমার বর্ণনার সত্যতা যাঁচাই করতে পারেন, বিশেষ করে আরবী ভাষায় যাদের দক্ষতা নেই। মোটকথা সাহাবীদের জীবন চরিত ও কথায় যদি এ নাও থাকে, তবে কি সাহাবীদের কথা থেকে নবী (স)-এর কাজ নয় বরঞ্চ আইন

---

১. মনে করুন, হযরত আব্বাস (রা)-এর সুদী কারবার সম্পর্কে নবী (স) পরিজ্ঞাত ছিলেন, তথাপি মক্কা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত মক্কা ও তার চতুষ্পার্শ্বের সকল গোত্রগুলো মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। মক্কা বিজয়ের পর যদিও মক্কা ইসলামী রাষ্ট্রের মধ্যে শামিল হয়েছিল, তথাপি তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে যে সকল মুশরিক বাস করতো তাদের সাথে যুদ্ধ চলছিল। এ দৃষ্টান্ত বড়জোর একথা প্রমাণের জন্যে পেশ করা যেতে পারে যে, যুদ্ধাবস্থায় দুশমনের সাথে অবৈধ চুক্তিতে কারবার চলতে পারে।-(মওদূদী)

২. এ 'কাজের' অর্থ কি ? এর দুটো অংশ—এক. বাজী ধরা। দ্বিতীয়, বাজীর মাল আদায় করা। প্রথম অংশতো নিশ্চয়ই জুয়া হারাম হবার পূর্বেকার। কেননা তাহলো হিজরতের ছয় বছর পূর্বেকার ঘটনা। আর জুয়া হারাম হবার আয়াত নাযিল হয় হিজরতের পর। এখন রইলো দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ বাজীর উট আদায় করা। এহলো বদর যুদ্ধের পরের ঘটনা। সম্ভবত জুয়া হারামের বিধান নাযিল হবার পরে তা হয়েছিল। কিন্তু একথার কি জবাব আছে যে, নবী করীম (স) এ মাল আবু বকর (রা)-এর ব্যবহারের অনুমতি না দিয়ে সদকা করে দেয়ার নির্দেশ দেন।-(মওদূদী)

সম্পর্কিত বাণী কি অধিকতর শক্তিশালী হবে না যার বর্ণনাকারী স্বয়ং ইমাম আবু হানিফা (র) ? ইমাম শাফেয়ী কাযী আবু ইউসুফের মধ্যস্থতায় ইমাম আবু হানিফা থেকে বর্ণনা করেন ঃ

عن مكحول عن رسول الله صلى اللّهُ عليه وسلم قال لاربوا بين المسلم والحربى -(كتاب الام للشافعى)

"মকহুল থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী (স) বলেন, মুসলিম ও হরবীর মধ্যে সুদ হয় না।"

আমি স্বীকার করি যে, এ রেওয়ায়েত মুরসাল। কিন্তু সাহাবীদের কথা অনুসন্ধানকারীদের জন্যে মুরসাল হাদীস কি যথেষ্ট নয় ? আশ্চর্য কথা এই যে, ইবনে সাদ অথবা ইসাবা থেকে যদি সাহাবীর কোনো কথা উদ্ধৃত করা হয় তাহলে লোকে তার মর্যাদা দেয়। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা নিজ বিশ্বাস মতে একটি মরফু-মুরসাল কওলী হাদীস পেশ করলে তা শুধু মুরসাল বলে উড়িয়ে দিতে চায়। এ রেওয়ায়েত সম্পর্কে একথাও বলা হয় যে, এ খবরে ওয়াহেদ। এর দ্বারা কুরআনে সমর্থন নির্দিষ্ট করা জায়েয নয়। কিন্তু কুরআনের সমর্থনও কি এর দ্বারা পাওয়া যায় না ? এর মর্যাদা বা গুরুত্ব কি সাহাবাদের কথার সমানও নয় ? সম্ভবত এ ব্যাখ্যার পর, এ মাসয়ালাটি শুধু হানাফী ফেকাহর রয়ে যায় না। মোটের উপর আমি আরও বিশদ আলোচনা করতাম, কিন্তু এখন তার সময় নেই। এখন একটু তাদের অপেক্ষায় রয়েছি যারা আবু হানিফা (র)-এর ফতোয়াকে এ মাসয়ালার সাথে মিশ্রিত করতে চায়।

এরপর শাহ আবদুল আজীজ দেহলভী (র) তাঁর ফতোয়াসমূহের মধ্যে একাধিক স্থানে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট ফতোয়া প্রকাশ করেছেন। যদি তাঁর ফতোয়ার উপরে কথা বলা চলে, তাহলে ভারতে কারো কাছে হাদীসের সূত্র সংরক্ষিত থাকতে পারে ? জমিয়তুল ওলামার মুখপত্র আল জমিয়তেও এর ফতোয়া প্রকাশিত হয়েছে। দেওবন্দ দারুল উলুমের মুফতী সাহেব যে কোনো কারণেই হোক ব্যাংকের সুদ গ্রহণ করার ফতোয়া দিয়েছেন। হারাম মাল নিয়ে সদকা করার অনুমতি কে দিতে পারে ? যতদূর আমার ধারণা এদের নিকটেও এ মাসয়ালার ব্যাপকতা বিদ্যমান ছিল। অন্তত আমি তাঁদের এ ফতোয়ার কারণ নির্ণয়ে অক্ষম। মাওলানা আবদুল হাই মরহুম তাঁর ফতোয়ায় যদিও ভারতের বিশ্লেষণ করেননি, তথাপি দারুল কুফরে এ বস্তু জায়েয হবার কথা বলেছেন এবং বারবার বলেছেন। বেরেলী এবং বাদাউনের আলেমগণেরও এ ব্যাপারে আমার জ্ঞানমতে কোনো মতভেদ নেই। এতদসত্ত্বেও আমি আমার প্রবন্ধে ফতোয়ার রূপ দেইনি, বিষয়টির বিশ্লেষণ করে ফতোয়া দিয়েছি। আলেমগণকে জিজ্ঞেস করেছি যে, ভারতে এ মাসয়ালা কার্যকর করার সময় এসেছি কিনা।

কিন্তু সত্য কথা বলতে আমি ব্যক্তিগতভাবে এ সন্দেহের কারণে, যা আপনি উত্থাপন করেছেন, এসব লিখতে ইতস্তত করছিলাম। কিন্তু কি বলব, কোন্ অত্যাচার-অবিচার শেষ পর্যন্ত আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়ে লিখনি ধরতে বাধ্য করেছিল। মুসলমানদেরকে জ্বালানো হলো, লুট করা হলো, ধ্বংস করা হলো এবং এখনো হচ্ছে।[১] আমি এসব দেখে দেখে অধীর হয়ে পড়েছিলাম। কোনো উপায়ন্তর না দেখে অর্থনৈতিক আত্মরক্ষা অথবা অর্থনৈতিক আক্রমণের পথই সামনে ছিল। তাই পেশ করলাম এবং এজন্য আমি এর নাম রেখেছি 'ফাই'। শামী গ্রন্থে এর খুঁটিনাটি বিবরণ আছে ঃ

وما يوخذ منهم بلاحرب ولا قهر كالهدنة والصلح فهو لاغنيمة ولا فى وحكمه حكم الفى -

"বিনা যুদ্ধে অথবা বিনা বলপ্রয়োগে তাদের কাছ থেকে নেয়া হয় যেমন, সন্ধিসূত্র প্রাপ্ত মাল, তা গনীমত নয়, 'ফাই'ও নয়। তবে তার বিধান 'ফাই'-এর বিধানের অনুরূপ।"

অতএব যার বিধান হলো ফাই-এর। তাকে ফাই বললে দোষ কি ? আর অনুমতি হলে কি বলতে পারি যে অত্যাচারের ভয়ে কি বিবাহ ত্যাগ করার ফতোয়া দেয়া যেতে পারে ? প্রকৃতপক্ষে মুসলমান যে পরস্পর গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হলো, তা কি যুদ্ধনীতির ফলশ্রুতি ? সত্য সত্যই কি এ আশংকা আছে ?

কিন্তু এতদসহ আমি ঐসব মৌলভীদেরকে অবশ্যই ভয় করি যারা ইসলামী শাসনের অবসানের পর ছোটখাটো ব্যাপারে কুফরী ফতোয়া দিয়ে বিবাহ বাতিল ও সন্তানের অবৈধতার হুকুম জারী করে। এ অবস্থায় এটাই সম্ভব যে, প্রত্যেক মুসলমান অপরের কুফরী ফতোয়া নিয়ে পরস্পর এমন কুকর্ম শুরু করবে যা অবশ্যম্ভাবীরূপে তাদের জন্যে জাহান্নামের আযাবের কারণ হবে। কিন্তু কত ভালো হতো, যদি এ ফতোয়াকে বাস্তব রূপ দেবার জন্যে এসব আলেম এসব ঘৃণ্য পন্থা অবলম্বন করা থেকে বিরত থাকতেন। নতুবা প্রত্যেকে তার নিয়তের জন্যে দায়ী হবে।

لكل امرء مانوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها وامراة تنكحها فهجرته الى ما هاجر اليها -

"প্রত্যেক মানুষের জন্যে তাই হবে যার সে নিয়ত করে, অর্থাৎ কার্যের ফলাফল নিয়তের উপর নির্ভরশীল। যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সন্তুষ্টির জন্যে হিজরত করবে, যে হিজরত করবে পার্থিব স্বার্থের জন্যে অথবা কোনো নারীর জন্যে, তারা প্রত্যেকে তাই পাবে যার জন্যে সে হিজরত করেছে।"

১. পরবর্তী পর্যায়ে মাওলানা নিজেই তাঁর একথার জবাব দিয়েছেন।-(মওদূদী)

নামাযও তো জাহান্নামের চাবিকাঠি হতে পারে। এমনিভাবে যদি ফতোয়া বাজি করে লোক একে অপরের ঘাড় ভাঙে, তাহলে এ কারণে কি জিহাদ আইন হারাম করার ফতোয়াটি সঠিক হবে ?

আর একটি সন্দেহ আছে তা হচ্ছে এই যে, সেভিংস ব্যাংক নয়, সাধারণ ব্যাংক এবং কো-অপারেটিভ ব্যাংকের মালিকদের মধ্যে কিছু মুসলমানও আছে এ অবস্থায় কি করা যায় ? একথা ঠিক যে, লোক যাদের সাথে ব্যাংকের লেনদেন করে এমনসব কর্মচারী সাধারণতঃ অমুসলিম হয়ে থাকে। কিন্তু মালিকদের মধ্যে যখন মুসলমানও আছে তখন কাজের উপায় কি হতে পারে ?

এ ব্যাপারে আলেম সমাজ চিন্তা করলে কত ভালো হতো ! শাসকদের জন্য বৈধ বিষয়গুলোর ব্যাপারে ফকীহগণ কি বলেছেন ? শুধু একটি মাসয়ালা সম্পর্কে আলেমদেরকে সজাগ করে দিতে চাই। সুদ বন্ধ করার জন্যে তাঁরা মাদক নিবারনী সমিতির মতো জোরদার আন্দোলন করবেন। নতুবা অন্ততপক্ষে আইনানুগ পন্থায় এতটুকু করবেন যতোটুকু করছে 'গো-রক্ষা' সমিতি। হয় তো সরকার এদিকে দৃষ্টি দিবেন অথবা দেশবাসী কিছু মেহেরবানী করবেন। এমনও হতে পারে যে, কুরবানীর পশুকে (মুসলমান) কুরবানী করার দ্বারাই সুদের মীমাংসা হয়ে যাবে। নতুবা পুঁজিপতি মুসলমানদেরকে কোনো আইনানুগ ব্যবস্থাপনার অধীন এ কাজের জন্যে উৎসাহিত করতে হবে যে, যে আচরণ অমুসলিমগণ মুসলমানদের সাথে করে তারাও (মুসলমানগণও) অন্যের সংগে অনুরূপ আচরণ করবে।

فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ -(البقرة : ١٩٤)

"যারা তোমাদের উপর অত্যাচার করে, তোমরাও তাদের উপর ততটা অত্যাচার কর যতটা তারা তোমাদের উপর করেছে।"-(বাকারা ঃ ১৯৪)

উদ্দেশ্য শুধু এতটুকুই। নতুবা যারা পেটপূজা ও ধন লিপ্সার জন্যে এ মাসয়ালার বৈধতার চিন্তায় এতটা উন্মত্ত হয়ে পড়েছেন যে, সত্য-মিথ্যা যে কোনো পন্থায় কুরআনের একটি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত বিধান রদ করার জন্যে বদ্ধপরিকর। তাদের জেনে রাখা উচিত যে, ইসলামের বুনিয়াদ রাষ্ট্রক্ষমতা ও ধন-সম্পদ নয়। বরঞ্চ যিনি দারিদ্রকে গৌরব মনে করতেন সেই মহান নবীই ইসলামের বুনিয়াদ বা স্তম্ভ কায়েম করেছেন। তাহলো এই যে, সকল মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব ঈমানের উপর নির্ভরশীল। انتم الاعلون। (তোমরাই সর্বশ্রেষ্ঠ)-এর প্রতিশ্রুতি ان كنتم مؤمنين। (যদি তোমরা ঈমানদার হও)-এ নীতির শর্তাধীন। ধনবান ও বিত্তশালী এখন যারা আছে, তারা আগেও ছিল। তখনো কুরআনের এ পথনির্দেশই ছিল ঃ

وَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَ اَوْلَادُهُمْ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّعَذِّبَهُمْ بِهَا فِى الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُوْنَ ۝ (التوبة : ٨٥)

"তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদেরকে যেন মুগ্ধ না করে। আল্লাহ তায়ালা এসবের দ্বারা দুনিয়ায় তাদেরকে আযাবে লিপ্ত করতে চান এবং তাদের প্রাণ জরাজীর্ণ অবস্থায় কাফের হয়ে (দেহ থেকে) বহির্গত হবে।"-(সূরা আত তাওবা ঃ ৮৫)

এর মধ্যে এখনো আমাদের জন্যে শক্তি নিহিত আছে। আমাদের মতো উম্মতকে কেন স্বয়ং নবী (স)-কেই আদেশ করা হয়েছে ঃ

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ؕ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ۝ (طه : ١٣١)

"(হে নবী!) তাদের দিকে বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে তাকিও না যাদেরকে পরীক্ষা করার জন্যে নানাবিধ সম্পদ দিয়ে ভূষিত করেছি। তোমার প্রভু তোমাকে যে রেজেক দান করেছেন তাই তোমার জন্যে উৎকৃষ্ট এবং স্থায়ী।"

আজ যারা ইউরোপের (বাতিল) খোদাদেরকে দেখে চীৎকার করে বলছে, আমাদেরও এরূপ খোদা থাকা দরকার। তাদেরকে একথা বলে দেয়া দরকার, যাঁর উম্মতের জন্যে তোমরা কাঁদছো, তিনিই কসম করে বলেছেন ঃ

فوالله ما اخشى عليكم الفقر ولكن اخشى ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما الهتهم -(بخارى)

"খোদার কসম আমি তোমাদের জন্যে দারিদ্রের ভয় করি না। কিন্তু আমি ভয় করি তোমাদের ঐরূপ পার্থিব ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের যা দেয়া হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে। তারপর তারা যেমন এ সবের জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বীতা-প্রতিযোগিতা করেছিল তোমরাও তাই না কর। আর এসব ঐশ্বর্য ও প্রতিযোগিতা তাদেরকে যেমন আল্লাহ থেকে ভুলিয়ে রেখেছিল, তেমনি তোমাদেরকে যেন না রাখে।"-(বুখারী)

তোমরা বলছো যে, মুসলমানদের কাছে অর্থ নেই, ভালো পোশাক-পরিচ্ছদ নেই, এটা নেই, সেটা নেই। কিন্তু মুসলমানদের অস্তিত্বের সার্থকতা যাঁর জন্যে, তিনি বলেন, ওরে পাগল ! তোমরা খবরই রাখ না।

বুখারীতে আছে ঃ

تعس عبد الدينار وعبد الدرهم والقطيفة والخميصة -

"দীনার-দিরহাম তথা অর্থ-সম্পদের মালিক, জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরিধানকারী, চাকচিক্যময় হোব্বা-জোব্বা পরিধানকারী—সকলেই ধ্বংস হয়েছে।"

তোমরা বল যে, দরিদ্র জাতি ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু তোমরা যাঁর উম্মত তিনি বলেন, বিত্তশালী ধ্বংস হয়েছে। এখন তোমরা বল, আমরা কার কথা শুনব ? সত্য কথা এই যে, যে জাতির মধ্যে দারিদ্রের হাহাকার আছে তারা যখন সুদ খেলো এবং পেট ভরে খেলো, তের বছরের মধ্যে বাইশ টাকাকে বাইশ লাখে পরিণত করলো, তাদের দারিদ্রের মর্সিয়া গাইবার জন্যে লোকের অভাব নেই। যে জাতি সুদের ময়দানে অগ্রগামী, তাদের সকলেই কি পেট ভরে খেতে পায় ? মাথা পিছু তিন পয়সা আয় কোন্ জাতির ? তাদের কথা ছেড়ে. দিলেও, সরকারের সাহায্যে যারা সুদ খায় তাদের মজুরদের দুরবস্থা কি সংবাদপত্রে তোমাদের নজরে পড়ে না ? নবী মুস্তাফা (স) সত্যিই বলেছেন ঃ

لو كان لابن ادم واديان من مال لابتغى ثالثا ولا يملاء جوف ابن ادم (وفى رواية) عين ابن ادم الا التراب -(بخارى)

"আদম সন্তানদের কাছে যদি দুটো উপত্যকাপূর্ণ সম্পদও থাকতো, তবু তারা তৃতীয় একটির জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়তো। আর মানব সন্তানের পেট (বা চোখ) মাটি ছাড়া আর কিছু দিয়ে পূর্ণ করা যাবে না।"–(বুখারী)

سر منزل قناعت نتواں زوست دادن
اے ساربان فردکش کیں رہ کراں ندارد !

"সুতরাং অল্পে তুষ্টির জন্যে মনজিল ত্যাগ করা যায় না। হে রাষ্ট্র চালক ! দাঁড়াও, এ পথের (সম্পদ লাভের) শেষ নেই।"

আজ থেকে চৌদ্দশ বছর আগে মুসলমানদের জন্যে যে সুর ঝংকৃত হয়েছিল তাই যথেষ্ট ঃ

اللهم لاعيش الا عيش الاخرة -

"হে খোদা ! আখেরাতের আরাম-আয়েশ ছাড়া আর আমাদের জন্যে কিছুই চাই না।"

–(তর্জুমানুল কুরআন–শাবান-রমযান-১৩৫৫ হিজরী, নভেম্বর-ডিসেম্বর-১৯৭৬খৃঃ)

সমালোচনা

(সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী)

মাওলানা মানাযের আহসান গিলানী সাহেবের মতের সাথে যে যে বিষয়ে আমি একমত হতে পারিনি, তা সংক্ষেপে টীকায় সন্নিবেশিত করেছি। কিন্তু যে মৌলিক বিষয়ের উপর ভিত্তি করে মাওলানা তাঁর যুক্তি প্রদর্শন করেছেন, তার উপরে আলোকপাত করার জন্যে নিছক ইশারা-ইংগিত যথেষ্ট নয়। তাই এ বিশদ আলোচনার প্রয়োজন বোধ করছি।

নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর উপর ভিত্তি করে মাওলানা তাঁর যুক্তি পেশ করছেন ঃ

মাওলানার যুক্তির সংক্ষিপ্ত সার

এক ঃ তাঁর দাবী এই যে, নিছক সুদ হারামের বিধানই নয়, বরঞ্চ সকল অবৈধ চুক্তি ও নাজায়েয অর্থনৈতিক উপায়-উপাদান হারাম করার বিধান দুজন মুসলমানের পারস্পরিক লেনদেনের মধ্যেই সীমিত থাকবে। তার অর্থ এই যে, অমুসলিম জাতির সাথে যেসব আর্থিক কারবার হবে তাতে হালাল-হারাম ও জায়েয-নাজায়েযের কোনো ভেদাভেদই থাকবে না।

দুই ঃ তার মতে জিম্মী নয় এমন অমুসলমানের রক্ত ও সম্পদ শরীয়তে হালাল করা হয়েছে। অতএব এ ধরনের অমুসলিমদের ধন-সম্পদ যেভাবেই নেয়া হোক, তা জায়েয। তা সুদ হোক, জুয়া হোক অথবা তাদের কাছে মদ, শূকরের মাংস, মৃত জীব প্রভৃতি বিক্রি করা হোক না কেন। অথবা অন্যান্য এমন কোনো পন্থা অবলম্বন করা হোক যা মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে হারাম করা হয়েছে। মুসলমান যেভাবেই তাদের সম্পদ হস্তগত করুক না কেন, তা মালে গনীমত অথবা 'ফাই' বলে বিবেচিত হবে। আর তা হবে তাদের জন্যে হালাল ও পবিত্র।

তিন ঃ তাঁর মতে, ইসলামী রাষ্ট্র নয় এমন প্রত্যেকটি দেশই দারুল হরব এবং তার অমুসলিম অধিবাসী হরবী। তিনি 'দারুল কুফর'কে দারুল হরবের এবং কাফের গায়ের জিম্মীকে হরবীর সম অর্থবোধক মনে করেন। এজন্য তাঁর নিকটে যেসব দেশে অমুসলিম শাসক অধিষ্ঠিত আছে তা সত্যিকার অর্থে 'দারুল হরব' আর সেখানে চিরকাল মুসলমানদের জন্যে সেসব বিধানই জারী থাকা উচিত যা দারুল হরব সম্পর্কে ফেকাহর গ্রন্থসমূহে বর্ণিত আছে।

চার ঃ পূর্ববর্তী ফকীহগণ দারুল হরবের যে সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন, মাওলানার মতে তা ভারতের বেলায় খাটে। আর এ দেশের মুসলমানদের

পজিশন ফেকাহর দৃষ্টিতে 'নিরাপত্তাপ্রাপ্ত'-এর ন্যায়। অন্য কথায় মুসলমান এ দারুল হরবে এ অবস্থায় বসবাস করে যেন তারা এখানকার হরবী শাসকদের কাছে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা লাভ করেছে।

পাঁচ ঃ 'নিরাপত্তাপ্রাপ্তদের' সম্পর্কে ইসলামী আইন হচ্ছে এই যে, তারা যে অনৈসলামী রাষ্ট্রে নিরাপত্তা লাভ করে বসবাস করছে, সে রাষ্ট্রের কোনো আইন লংঘন করতে পারবে না। অতএব মাওলানার মতে, ভারতের মুসলমানদের জন্যে অনৈসলামী রাষ্ট্রের আইনের আনুগত্য এতটা অপরিহার্য যে, চুল পরিমাণে তা অমান্য করলে জাহান্নামের যোগ্য হয়ে পড়বে। কিন্তু ইসলামের অধিকাংশ নির্দেশ ও আইন পালনের ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ স্বাধীন। তার কারণ এই যে, তারা দারুল হরবে বসবাস করে। হত্যা, ধ্বংসাত্মক কাজ, চুরি-ডাকাতি, ঘুষ, শঠতা এবং এ ধরনের অন্যান্য পন্থায় হরবী কাফেরদের ক্ষতি সাধন করা এবং তাদের সম্পদ হস্তগত করা মুসলমানদের জন্যে এ জন্য নাজায়েয যে, দেশীয় আইন তা অন্যায় বলে ঘোষণা করে। এজন্য নয় যে, এ কাজগুলো ইসলামী শরীয়তে হারাম। কারণ তামাদ্দুন, অর্থনীতি এবং নৈতিকতার অধিকাংশ ব্যাপারে ভারত ভূমিতে ইসলামী শরীয়ত ততোদিন পর্যন্ত মানসুখ থাকবে যতোদিন এখানে অনৈসলামী রাষ্ট্র কায়েম থাকবে। এখন শরীয়তের আইনের মধ্যে শুধুমাত্র চুক্তি আইন এখানে মুসলমানদের পালনীয় এবং তাঁর দৃষ্টিতে লেনদেন এবং জীবিকা অর্জনের যেসব উপায়-উপাদান শরীয়ত হারাম করেছে, কিন্তু দেশীয় আইন হালাল করেছে, তার সবই আইনত হালাল এবং শরীয়তের দিক দিয়েও হালাল। তার জন্যে দুনিয়াতেও কোনো শাস্তি নেই এবং আখেরাতেও নেই কোনো জবাবদিহি।

বর্ণিত যুক্তিসমূহের উপর সামগ্রিক মন্তব্য

আমার মতে এর একটি কথাও ঠিক নয়। যে হানাফী আইনের প্রতিনিধি হিসেবে মাওলানা যেসব কথা বলেছেন, সে আইনও এসব সমর্থন করে না। এ প্রবন্ধে মাওলানা ইসলামী আইনের যে চিত্র এঁকেছেন, তা শুধু ভ্রান্তই নয়, কুৎসিৎও বটে। এসব দেখে ইসলাম এবং মুসলমান সম্পর্কে কেউ কখনোই কোনো ভালো ধারণা পোষণ করতে পারে না। যদি কোনো অজ্ঞ ব্যক্তি এ চিত্র দেখে তাহলে সে ইসলামকে দুনিয়ার মধ্যে একটি অতি নিকৃষ্ট ধর্ম এবং মুসলমানদেরকে একটি মারাত্মক জাতি মনে করবে। অতপর আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবে যে, অমুসলিম রাষ্ট্রের আইন-কানুন এসব নিরাপত্তাপ্রাপ্তদের হাত থেকে অন্যান্য জাতির জান-মাল ইজ্জত-আবরু সংরক্ষিত করে রেখেছে। অন্যদিক দিয়ে যদি শরীয়তের এ ব্যাখ্যা মেনে নিয়ে ভারতের মুসলমানগণ এ

দেশে বসবাস করা শুরু করে তাহলে পঞ্চাশ বছরের মধ্যে তাদের ভিতর ইসলামের নামটুকুও বাকী থাকবে না। আল্লাহ না করুন, যদি অমুসলিম শাসনের প্রথম থেকেই ভারতে এসব মূলনীতির উপরে কাজ করা হতো, তাহলে আজ যতটুকুও ইসলামীয়াত মুসলমানদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে, তাও দেখা যেতো না। বিগত দেড়শ বছরে ভারতের মুসলমান একেবারে বিকৃত হয়ে পড়তো। এটা অবশ্যই হতে পারতো যে, তাদের বিষয়-সম্পত্তির একটা অংশ সংরক্ষিত থাকতো এবং তাদের মধ্যে মাড়োয়ারী, বেনিয়া ও শেঠদের মতো একটা শ্রেণীর উদ্ভব হতো।

একথা বলার উদ্দেশ্য কক্ষণো এই নয় যে, মাওলানা স্বেচ্ছায় ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা করেছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি ইসলামী আইন যেভাবে বুঝেছেন, পরিপূর্ণ ঈমানদারী ও সদিচ্ছাসহ, ঠিক তেমনি প্রকাশ করেছেন। কিন্তু আমার আপত্তি তাঁর বর্ণিত মর্ম ও ব্যাখ্যা সম্পর্কে। ইসলামী আইন যতটুকু আমি অধ্যয়ন করেছি, তার আলোকেই একথা বলার সাহস করছি যে, বিশেষ করে উপরে বর্ণিত বিষয়গুলো সম্পর্কে মাওলানা শরীয়তের মূলনীতি ও বিধানসমূহ ঠিকমত বুঝতে পারেননি। এ ভুল ধারণার দুটো কারণ অনুমান করা যেতে পারে।

প্রথম ঃ যে সময়ে মুজতাহিদ ইমামগণ ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক আইন (CONSTITUTIONAL LAW) ও আন্তর্জাতিক আচরণ সম্পর্কে কিতাব ও সুন্নাহর হেদায়েত অনুযায়ী এবং স্বীয় ইজতিহাদের ভিত্তিতে এসব বিধান প্রণয়ন করেছিলেন, সে সময়ে এসব ফকীহগণ শুধু কুরআন-হাদীস-ফেকাহর শিক্ষাদাতাই ছিলেন না, বরঞ্চ তারাই ছিলেন রাষ্ট্রের আইন সম্পর্কে পরামর্শদাতা এবং বিচারালয়গুলোর প্রধান বিচারক। ইসলামী রাষ্ট্র দৈনন্দিন শাসনতান্ত্রিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যার সম্মুখীন হতো। তখন এসব মনীষীদের মতামত গ্রহণ করা হতো। প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সাথে যুদ্ধ ও সন্ধি হতে থাকতো, ইসলামী রাষ্ট্রগুলোর নাগরিকদের মধ্যে সম্পর্ক-সম্বন্ধের বিভিন্ন রূপ প্রকাশ পেতো এবং তার থেকে যে আইনগত সমস্যার উদ্ভব হতো, তার মীমাংসা এসব মনীষীগণই করতেন। তাঁরা তাঁদের সিদ্ধান্ত ও প্রস্তাবে যেসব আইন সংক্রান্ত পরিভাষা ও বাক্য ব্যবহার করতেন তার মর্ম শুধু শাব্দিক ব্যাখ্যার উপরই সীমিত ছিল না। বরঞ্চ তার প্রকৃত ব্যাখ্যা ছিল সেসব অবস্থা ও পরিস্থিতি, যার উপর এসব পরিভাষা ও বাক্য প্রযোজ্য হতো। অথবা যদি কোনো পরিভাষা ও বাক্যে অস্পষ্টতা রয়ে যেতো, অথবা একই বিষয়ের বিভিন্ন স্তরে একই পরিভাষা ব্যবহৃত হতো এবং প্রকাশ্য শব্দে স্তরসমূহের পার্থক্য

নির্ণয়কারী কিছু থাকতো না, অথবা ব্যাপক অর্থে একটি শব্দ বলা হতো এবং শুধু অবস্থাভেদে তার বিভিন্ন অর্থের মধ্যে পার্থক্য সূচিত হতো, তাহলে এর দ্বারা বাস্তবে আইন প্রয়োগ ও ব্যবহারে কোনো অনিষ্ট ঘটবার আশংকা থাকতো না। এ আশংকাও ছিল না যে, কোনো আইনজ্ঞ ব্যক্তি নিছক শব্দগুলো সুস্পষ্ট না হবার কারণে কোনো বিধানকে সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থার উপর প্রয়োগ করবে। এজন্য যে, সে সময়ে ইসলামী আইনের পরিভাষা এবং বিশেষ আইন সংক্রান্ত বাক্যগুলোর মর্যাদা ছিল তৎকালে প্রচলিত মুদ্রার মতো। বাস্তব জগতে তার প্রচলন ছিল না। ---- এদের মর্ম উপলব্ধি করতে, যথাস্থানে ব্যবহার করতে ও প্রত্যেকটির সঠিক সংজ্ঞা জানতে কোনোই অসুবিধা ছিল না। প্রত্যেক আইনজ্ঞ ব্যক্তিকে দিবা-রাত্র পরোক্ষ অথবা প্রত্যক্ষভাবে ঐসব অবস্থার সম্মুখীন হতে হতো যাতে এ ভাষা প্রয়োগ করা হতো। কিন্তু এখন কিছুকাল যাবত সে অবস্থা আর নেই। শাসনতান্ত্রিক সমস্যাবলী ও আন্তর্জাতিক ব্যাপারের সাথে কার্যত আলেমদের কোনো সম্পর্ক নেই। ইসলামী রাষ্ট্রসমূহ বিলুপ্ত হয়েছে এবং যেসব রাষ্ট্র এখনো আছে সেখানেও এসব সমস্যা শরীয়তের আলেমদের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। ব্যবহারিক জগতে ইসলামী আইনের পরিভাষা ও বাক্যগুলোর ব্যবহার বহুকাল যাবত বন্ধ হয়ে গেছে। এখন প্রাচীন ঐতিহাসিক মুদ্রায় পরিণত হয়েছে। এখন তার মূল্যের আর সে অবস্থা নেই যে, প্রচলিত থাকার কারণে বাজারে সবার কাছে সে এক পরিচিত বস্তু। কিন্তু তার পুরাতন বাজার দর (MARKET VALUE) জানার জন্যে পুরানো নথি-পত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা এবং বর্তমান যুগের কার্যকরী অবস্থার উপর অনুমান করে সে সময়ের প্রকৃত অবস্থা বুঝবার চেষ্টা করা প্রয়োজন। এ কারণেই রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সম্পর্কে ইসলামী ফিকাহর বিধানগুলো উপলব্ধি করা, বিবাহ, উত্তরাধিকার আইন প্রভৃতির তুলনায় অধিকতর কষ্টকর।[১] কারণ এখন তার শুধু শব্দগুলো রয়ে গেছে। গ্রন্থের মূল পঠিতব্যও শাব্দিক এবং তার ব্যাখ্যাও শাব্দিক।

---

১. এর একটি মজার দৃষ্টান্ত মাওলানার প্রবন্ধে উপরে বর্ণিত হয়েছে। শামী গ্রন্থের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে এ বিধানের উল্লেখ করেছেন যে, গোটা সমুদ্র চিরকালের জন্যে অনৈসলামী রাষ্ট্রের অধিকারে থাকবে। যে সময়ে প্রথম প্রথম কোনো মুজতাহিদ একথা বলেন, তখনকার অবস্থার প্রেক্ষিতে তা হয়তো ঠিক ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালের লোকেরা যখন একথা কোনো কিতাবে লিখিত আকারে দেখলো, তখন অন্ধ অনুকরণ করে তাকে ইসলামী আইনের একই স্থায়ী সিদ্ধান্ত মনে করলো। অথচ সমুদ্র হচ্ছে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সম্বন্ধের বৃহত্তম উপায়। কোনো রাষ্ট্রই বিশ্বব্যাপী প্রভাব ও ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে না, সমুদ্রের উপরে যদি তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হয়। ইসলামী ফিকাহর অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা যদি মাদ্রাসাগুলো পর্যন্ত সীমিত না হতো, আর আলেমদের বাস্তব সম্পর্কে যদি দুনিয়ার রাজনীতির সাথে হতো, তাহলে তাঁরা অনুভব করতেন যে, সমুদ্র কাফেরদের অধিকারে ছেড়ে দিয়ে নিজের জন্যে স্থলেই আবদ্ধ থাকার সিদ্ধান্ত করা কত মারাত্মক ভুল।

দ্বিতীয় ঃ যার দিকে স্বয়ং মাওলানা ইংগিত করেছেন, তা হচ্ছে এই যে, বিগত এক-দেড় শতাব্দী যাবত মুসলমানদের উপরে যে আর্থিক দুর্গতি নেমে এসেছে, যেভাবে দেখতে দেখতে তাদের কোটি কোটি টাকার বিষয় সম্পত্তি হাতছাড়া হয়েছে এবং যেভাবে মুসলমানদের বড় বড় সচ্ছল পরিবার- গুলো অন্নের ভিখারি হয়ে পড়েছে, তা দেখে দেখে প্রত্যেক দরদী মুসলমানের মতো মাওলানার হৃদয়ও দুঃখে ভেঙে পড়েছে এবং তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করে দেখেছেন শরীয়তে এ বিপদের কোনো সমাধান খুঁজে বের করা যায় কিনা। এ অনুপ্রেরণার দ্বারা বশীভূত হয়ে অধিক ক্ষেত্রে তাদের লিখনী ভারসাম্য এবং ফকীহসুলভ সতর্কতা থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে। যেমন ধরুন তাঁদের এ সিদ্ধান্ত যে ভারতে সুদ না নেয়া গুনাহ। অথবা তাঁদের এ বিবৃতি যে 'অবৈধ চুক্তির' অবৈধতার যাবতীয় বিধান শুধুমাত্র মুলমানদের পারস্পরিক কায়কারবার পর্যন্তই সীমিত। ভারতীয় মুসলমানদের বর্তমান হৃদয় বিদারক অবস্থা দেখলে কোন্ মুসলমানের হৃদয় দুঃখে ভারাক্রান্ত হয় না ? আর কে চায় না যে, তারা এ দুর্দশা থেকে মুক্তি লাভ করুক ? এ বিষয়ে আমাদের ও তাঁদের মধ্যে তিল পরিমাণ মতানৈক্য নেই। কিন্তু আমি একথা স্বীকার করতে রাজী নই যে, ভারতে মুসলমানদের অর্থনৈতিক অধঃপতন হয়েছে, পরোক্ষ অথবা প্রত্যক্ষভাবে, সুদ না খাবার কারণে। আর এ অবস্থার পরিবর্তন সুদ হালাল হবার উপর নির্ভরশীল। উপরন্তু আমি একথা মানতে রাজী নই যে, সুদের অবৈধতা সামান্যতম পরিমাণেও মুসলমানদের অর্থনৈতিক উন্নতির প্রতিবন্ধক। যে ব্যক্তি يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقَاتِ (আল্লাহ সুদ ধ্বংস করেন ও সদকা বর্ধিত করে দেন)-এর উপর ঈমান রাখে এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর এ বাণীকে জীবিকা ও পরকাল উভয়ের মধ্যে এক অটল সত্য বলে জানে, তার মনে এ ধরনের কোনো সন্দেহের উদ্রেক হওয়া উচিত নয়। মাওলানা চিন্তা করলেন তার কাছে এ সত্য উদ্ঘাটিত হবে যে, মুসলমানদের অর্থনৈতিক অধঃপতনের প্রকৃত কারণ সুদ না খাওয়া নয়। বরঞ্চ প্রকৃত কারণ হচ্ছে সুদ দেয়া, যাকাত দিতে অবহেলা করা এবং ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা একেবারে রহিত করে দেয়া। যেসব পাপের শাস্তি মুসলমানদেরকে ভোগ করতে হচ্ছে তা হচ্ছে এই। তারা যদি এ পাপের উপর অবিচল থাকে এবং তার উপরে সুদখোরীর পাপ যোগ করা হয়, তাহলে কতিপয় লোক হয়তো বিত্তশালী হবে এবং কিছু সরলচেতা মুসলমান প্রতারিত হবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সামগ্রিক দিক দিয়ে জাতির আর্থিক অবস্থার কোনোই পরিবর্তন হবে না। অন্যদিকে মুসলমানদের নৈতিক অবস্থা, তাদের পারস্পরিক ভালোবাসা, সৌহার্দ, দয়া-দাক্ষিণ্য, সাহায্য, সহানুভূতি প্রভৃতির চরম অধঃপতন ঘটবে। এমনকি তাদের জাতীয়তা বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

আপনি সুদের নাম 'ফাও' রাখুন অথবা 'মায়েদাতুম মিনাস সামায়ে'— আকাশ থেকে অবতীর্ণ খাদ্যপূর্ণ (দস্তরখান) বলুন, তাতে করে তার আসল তত্ত্ব ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যে চুল পরিমাণ পার্থক্য সূচিত হবে না। সুদ তার প্রকৃতিগত দিক দিয়ে যাকাতের বিপরীত এবং এর মনস্তাত্ত্বিক প্রকৃতিতে কোনো রাষ্ট্রের দারুল হরব অথবা দারুল ইসলামে হওয়াতে কোনোই পার্থক্য হয় না। এ কিছুতেই সম্ভব নয় যে, একই অর্থনৈতিক জীবনে এ দুটো (সুদ ও যাকাত) একত্র হতে পারে। এক মানসিকতা হচ্ছে টাকা গণনা করাতে, গণনা করে করে তা জমা করে রাখাতে, সপ্তাহ ও মাসের হিসেবে তা বাড়াতে এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধির হিসেব করতে আনন্দ লাভ করা। দ্বিতীয় মানসিকতা আনন্দ লাভ করে—মাথার ঘাম পায়ে ফেলে জীবিকা অর্জন করতে, অর্জন করে তা নিজে খেতে ও অপরকে খাওয়াতে এবং আল্লাহর পথে বিলিয়ে দিতে। কোনো বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি কি ধারণা করতে পারে যে, এ উভয় মানসিকতা একই মন-মস্তিষ্কে একত্র হতে পারে ? একি কখনো আশা করা যেতে পারে যে, যখন কোনো মুসলমান সুদে টাকা খাটাতে লাগবে এবং মাঝে-মধ্যে তার বৃদ্ধির প্রতি নজর রাখতে মজা পাবে, তারপর তার পকেট থেকে যাকাত ও সদকার জন্যে একটি পয়সাও বেরুবে ? এর পরেও কি কোনো মুসলমান কোনো মুসলমানকে কর্জে হাসানা (বিনা সুদে কর্জ) দেয়া সহ্য করবে ? এরপরে মুসলমানদের অবস্থা কি সেই জাতির মতো হবে না যাদের সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً ـ(البقرة : ٧٤)

এবং وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَصَ النَّاسِ عَلٰى حَيٰوةٍ ج ـ(البقرة : ٩٦)

"অতপর তোমাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেল, প্রস্তরের ন্যায় অথবা তার চেয়েও কঠিন এবং তোমরা নিশ্চয় তাদেরকে জীবন ধারণে মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা লোভী দেখতে পাবে।"

কয়েকজন কারুণ এবং শাইলক সৃষ্টি করার জন্যে গোটা জাতি কেন আত্মহত্যা করবে ? আর এ আত্মহত্যা জায়েয প্রমাণ করার জন্যে আল্লাহ ও রসূলের বিধানের কেন অপব্যাখ্যা করা হবে ? তারপর ইমাম আযম আবু হানিফা (র)-এর মতো মনীষীকে এ কাজের অংশীদার কেন করা হবে ?

তারপর আমি বলতে চাই যে, দুনিয়ার মধ্যে মুসলমানই এমন এক জাতি যারা বিগত তেত্রিশ বছর ধরে পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিরোধিতা করে আসছে এবং যারা কার্যত এ ভ্রান্ত ব্যবস্থার মূলোচ্ছেদের জন্যে চেষ্টা করছে। যে বস্তু

চিরদিনের জন্যে এ জাতিকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার শত্রু হিসেবে অবিচল রেখেছে এবং তার মধ্যে মিশে যাওয়া থেকে রক্ষা করেছে তাহলো যাকাতের অপরিহার্যতা এবং সুদের অবৈধতা। সমাজতান্ত্রিক, কমিউনিষ্ট এবং নিহিলিষ্ট সকলেই পুঁজিবাদীর সাথে আপোষ করতে পারে, কিন্তু যতোক্ষণ পর্যন্ত এ দুটো প্রতিবন্ধকতা কায়েম আছে, মুসলমান কখনো তার সাথে আপোষ করতে পারে না। এ কারণেই ঐসব জাতি পুঁজিবাদে মিশে একাকার হয়ে গেছে, যাদের ধর্ম সুদ খেতে নিষেধ করেছিল। কিন্তু মুসলমাগণ তেরশ বছর ধরে এ মুকাবিলায় অটল হয়ে আছে। এখন যখন দুনিয়াবাসীগণ চক্ষু খুলেছে এবং তারা এ ব্যবস্থার মূলোচ্ছেদের জন্যে দলে দলে একত্র হচ্ছে, তখন এ কেমন দুর্ভাগ্যের কথা যে, মুসলমান এ সংগ্রাম থেকে পশ্চাৎপদ হবে এবং আপন হাতে নিজ দুর্গের সুদৃঢ় গম্বুজগুলো ধ্বংস করে পুঁজিবাদের দিকে সন্ধির হস্ত প্রসারিত করবে ?

এ প্রয়োজনীয় ভূমিকার পর এখন আমরা আইনগত আলোচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছি।

অবৈধ চুক্তি কি শুধু মুসলমানদের মধ্যেই নিষিদ্ধ ?

মাওলানার প্রথম দাবীর ভিত্তি এই যে, কুরআন মজিদের যেখানে জীবিকার্জনের অবৈধ উপায়সমূহ নিষিদ্ধ করা হয়েছে সেখানে بينكم (তোমাদের মধ্যে) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। তার অর্থ এই যে, মুসলমান পরস্পরে অবৈধ চুক্তিতে কোনো কারবার করবে না। বলা হচ্ছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَاكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ قف -(النساء : ٢٩)

"হে মুমেনগণ ! তোমরা তোমাদের মধ্যে অবৈধ উপায়ে তোমাদের মাল ভক্ষণ করো না। তবে তোমাদের উভয়ের সম্মতিক্রমে ব্যবসা করতে পারো।"-(সূরা আন নিসা ঃ ২৯)

এখন একথা ঠিক যে, সুদও ধন অর্জনের অবৈধ পন্থাগুলোর একটি। এজন্য কুরআনে যে বলা হয়েছে, اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا (আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল এবং সুদকে হারাম করেছেন)-এ যদিও প্রকাশ্য শব্দের দিক দিয়ে সাধারণ বিধান, কিন্তু এটা যে মূল বিধানের শাখা তার সাথে একেও তার অনুসরণে শুধু মুসলমানদের পারস্পরিক আচরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ মনে করা উচিত। এর সমর্থন পাওয়া যায় মকহুলের বর্ণিত হাদীস থেকে ঃ لاربوا بين المسلم والحربى। অর্থাৎ মুসলিম ও অমুসলিম হরবীর মধ্যে আধিক্যের শর্তে যে লেনদেন হবে তার উপরে 'সুদ' শব্দ আরোপ করা যাবে না। অন্য কথায়

لا ربوا -এর অর্থ এই যে, গায়ের জিম্মী কাফেরের নিকট হতে যে সুদ নেয়া হবে তা মোটেই সুদ নয়। তাহলে তা হারাম কি করে হলো?

এ হলো মাওলানার যুক্তির সারাংশ। এ বিষয়ে প্রথম এবং মৌলিক ভুল এই যে, কুরআনের উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য না রেখে শুধু বাহ্যিক শব্দগুলো থেকে মর্ম উদ্ধারের চেষ্টা করা হয়েছে। কুরআনের সাধারণ বর্ণনাভংগী এই যে, সে নৈতিকতা ও আচার-আচরণ সম্পর্কে যত উপদেশ দেয় তা সব মুমিনদের উদ্দেশ্যেই দেয় এবং বলে তোমরা এরূপ করো অথবা এরূপ করো না। এ বর্ণনাভংগীর মধ্যে অন্যান্য তাৎপর্যও রয়েছে যার আলোচনার ক্ষেত্র এটা নয়। এখানে শুধু এতটুকু বলতে চাই যে, এ ধরনের বাচনভংগীতে নৈতিকতা এবং আচার-আচরণ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা যত নির্দেশ দিয়েছেন ফকীহগণের মধ্যে কেউই সেগুলোকে শুধুমাত্র মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ বলেননি। কেউ একথা বলেননি যে, দুজন মুসলমানের মধ্যে যে জিনিস হারাম, তাই মুসলমান এবং অমুসলমানের মধ্যে হালাল অথবা মুস্তাহাব। এমন হলে প্রকৃতপক্ষে ইসলামী নৈতিকতা ও ইসলামী তামাদ্দুনিক আইনের মূল উৎপাটিত হবে। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلَا تَتَّخِذُوْٓا اَيْمَانَكُمْ دَخَلًاۢ بَيْنَكُمْ -(النحل : ٩٤)

অর্থাৎ এর অর্থ কি এরূপ মনে করা হবে যে, মুসলমান শুধু মুসলমানের নিকটেই মিথ্যা কসম করবে না? আর অমুসলিমদের বেলায় মিথ্যা কসম করতে কোনো দোষ নেই?

আল্লাহ বলেন ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ -(انفال : ٢٧)

অর্থাৎ এর অর্থ কি এই যে, মুসলমান কি শুধু ঐসব আমানতের রক্ষণাবেক্ষণ করবে যা মুসলমানের সাথে সম্পর্কিত? আর কাফেরের গচ্ছিত আমানত অবাধে খেয়ানত করা যাবে?

আল্লাহ্ আরও বলেন ঃ

فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ -(البقرة : ٢٨٣)

অর্থাৎ এর ব্যাখ্যা কি এই হবে যে, মুসলমানের পরিবর্তে কোনো কাফের যদি কোনো মুসলমানকে বিশ্বাস করে বিনা লেখা-পড়ায় তার কাছে কিছু মাল জমা রাখে, তাহলে তাকে 'ফাও' মনে করে আত্মসাৎ করা যাবে?

وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ .... وَلَايَاْبَ الشُّهَدَاءُ اِذَا مَادُعُوْا .... وَاَشْهِدُوْآ اِذَا تَبَايَعْتُمْ ص وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ ....

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ط ـ(البقرة : ٢٨٢ـ٢٨٣)

তাহলে কি এসব নির্দেশ বা বিধান শুধু কি মুসলমানদের পারস্পরিক ব্যাপারসমূহের জন্যে ? কাফেরের পক্ষে সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করা অথবা সত্য সাক্ষ্য গোপন করে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া অথবা দলিল-পত্রের অমুসলিম লেখক ও সাক্ষ্য দাতাকে ভয় দেখানো প্রভৃতি কি জায়েয কাজ ?

এরপর যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ لا ـ(النور : ١٩)

এর থেকে কি এটা বলা যেতে পারে যে, অন্য জাতির মধ্যে অশ্লীলতা ও ব্যভিচার ছড়ানো মুসলমানদের জন্যে জায়েয ?

اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ الْغٰفِلٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ لُعِنُوْا فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ص ـ(النور : ٢٣)

এর কি এ ব্যাখ্যা করা হবে যে, কাফের নারীদের বিরুদ্ধে প্রাণ খুলে মিথ্যা অপবাদ রটানো যাবে ?

وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ـ(النور : ٣٣)

এর অর্থ কি এই হবে যে, কাফের নারীদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করা এবং তাদের উপার্জনের অর্থ ভোগ করা জায়েয ? এ ধরনের ব্যাখ্যা করে প্যারিসে সরকারী লাইসেন্সে গ্রহণ করে কোনো বেশ্যালয় খোলা কি মুসলমানের জন্যে হালাল হবে ?

لَايَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ط اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ط ـ(الحجرت : ١٢)

শুধু মুসলমানদের গীবত করা নাজায়েয—উপরোক্ত আয়াতের কি এরূপ ব্যাখ্যা করা যাবে ? কাফেরদের বদনাম করাতে কি কোনো দোষ নেই ?

যদি এ মূলনীতির ভিত্তিতে কুরআন সুন্নাহর বিধানের ব্যাখ্যা করা হয় এবং মুসলমান তা মানতে শুরু করে তাহলে অনুমান করুন যে, এ জাতির কি পরিণাম হতে পারে।

যদি ধরেই নেয়া যায় যে, لَاتَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ -এর বিধান মুসলমানদের পারস্পরিক ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ, আর এ নীতি অন্যান্য বিধানগুলোতে প্রযোজ্য হবে না, তাহলে প্রশ্ন জাগে যে, জিম্মী কাফেরদেরকে সুদী লেনদেন করতে নিষেধ কেন করা হয়েছে ? আর নবীই বা কেন অমুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে এমন চুক্তি করলেন যে, তাদেরকে সুদী কারবার ছেড়ে দিতে হবে। নতুবা চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। ফেকাহর গ্রন্থগুলোতে এ কথাই বা কেন বলা হলো যে, যদি কোনো হরবী কাফের নিরাপত্তাসহ দারুল ইসলামে আসে তাহলে তার সংগে সুদের লেনদেন করা হারাম ?

এখন রইলো لاربوا بين المسلم والحربى হাদীসটি। এ সম্পর্কে কথা এই যে, প্রথমত, 'হরবী' শব্দের অর্থ শুধু গায়ের জিম্মী কাফের নয়। বরঞ্চ যুদ্ধরত জাতির এক ব্যক্তি। হানাফী ফকীহগণের ব্যাখ্যা দ্বারা তা সামনে প্রমাণ করা হবে।

দ্বিতীয়ত, لاربوا -এর এ অর্থ নয় যে, হরবী কাফের থেকে যে সুদ নেয়া যাবে, তা সুদই নয়। বরঞ্চ তার অর্থ এই যে, যদিও তা আকৃতি ও প্রকৃতিতে সুদ, কিন্তু তাকে আইনে হারাম হওয়া থেকে ব্যতিক্রম করা হয়েছে এবং তা এমন এক বস্তু যেন তা সুদই নয়। নতুবা কোনো সুদ সম্পর্কে একথা বলা যে, তা সুদই নয়, এমন অর্থহীন বেহুদা কথা যে তা নবী (স)-এর প্রতি আরোপিত করাকে আমি গোনাহ মনে করি। এ অত্যন্ত যুক্তিসংগত কথা যে, কোনো বিশেষ অবস্থায় সুদকে শাস্তি ও অবৈধতা থেকে ব্যতিক্রম করে রাখা হবে, যেমন স্বয়ং কুরআন অনিবার্য কারণে মৃত জীব, শূকর এবং এরূপ অন্যান্য হারাম জিনিস খাওয়া ব্যতিক্রম করেছেন। কিন্তু এ এক অত্যন্ত অযৌক্তিক কথা যে, সুদের প্রকৃতি হুবহু রইলো। আর তাকে আমরা কোথাও সুদ বলে আখ্যায়িত করবো এবং অন্যস্থানে তার সুদ হওয়াটাই অস্বীকার করবো। এভাবে তো প্রতিটি হারাম কাজকে নাম পরিবর্তন করে হালাল করা যেতে পারে। খেয়াল খুশী মতো যে কোনো খিয়ানতকে বলে দিলেই হলো যে, এ খিয়ানতই নয়। যে মিথ্যাকে জায়েয করতে হবে, তা শুধু বলে দিলেই হবে মিথ্যা শব্দটি এর উপর প্রযোজ্য নয়। কোনো গীবত, অশ্লীলতা ও হারামখোরীর প্রতি মন আকৃষ্ট হলে, তার নামটা পরিবর্তন করে মনে করুন যে, তার প্রকৃতি বদলে গেছে। আল্লাহর রসূল তাঁর উম্মতকে এ ধরনের শাব্দিক ছলনা শিক্ষা দিবেন এ তাঁর মর্যাদার পরিপন্থী।

তৃতীয়ত, এ হাদীসটিতে যে বিধান বর্ণিত হয়েছে, তা একটি অনুমতি ও সুযোগ মাত্র, তাকে মুসলমানের সাধারণ কর্মপদ্ধতি বানানো উদ্দেশ্য নয়। এ

হাদীসটি কোন্ পর্যায়ের তা আলোচনা করা আমি নিষ্প্রয়োজন মনে করি। কারণ হাদীস গ্রহণ ও বর্জন করার ব্যাপারে ফকীহগণের নীতি মুহাদ্দিসগণের নীতি থেকে আলাদা। ইমাম আযম ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতো মুজতাহিদগণ যে হাদীসকে গ্রহণযোগ্য মনে করেছেন, তাকে অবিশ্বাসযোগ্য মনে করা ঠিক হবে না। কিন্তু সংক্ষিপ্ত, অস্পষ্ট ও বিতর্কিত খবরে ওয়াহেদকে[১] এতটা ফলাও করাও ঠিক নয় যে, কুরআন, হাদীস ও সাহাবীদের কার্যকলাপের সর্বসম্মত সাক্ষ্য একদিকে আর অপরদিকে রাখতে হবে এ হাদীসটি এবং এ হাদীসটির ব্যাখ্যা ঐ সবের সাথে সামঞ্জস্যশীল করার পরিবর্তে, ঐগুলোকে হাদীসটির ছাঁচে ঢালবার চেষ্টা করতে হবে। কুরআন এবং সমস্ত সহীহ হাদীসগুলোতে 'রিবা'কে হারাম বলা হয়েছে। তার অর্থ এই যে, মুসলমানগণ পরস্পরেও এর লেনদেন করতে পারবে না এবং অন্য জাতির সাথেও এ কারবার জায়েয হবে না। রসূলুল্লাহ (স) নাজরানবাসীদের সাথে যে চুক্তি করেছিলেন তার থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, মুসলমানগণ শুধু নিজেরাই সুদী লেনদেন থেকে বিরত থাকবে না। বরঞ্চ যে সকল অমুসলিমদের উপর তাদের ক্ষমতা চলে তাদেরকেও জোর করে এ কাজ থেকে বিরত রাখবে। সুদ হারাম হবার পর এমন একটি ঘটনাও ঘটেনি যে, নবীর অজ্ঞাতসারে বা তাঁর অনুমতিতে কোনো মুসলমান কোনো জিম্মী অথবা গায়ের জিম্মী কাফেরের সাথে সুদী কারবার করেছে। খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগেও এর কোনো নজীর পেশ করা যাবে না। শুধু সুদের ব্যাপারই নয়, অবৈধ চুক্তিসমূহের মধ্যে এমন একটিও নেই যার হারাম হবার বিধান নাযিল হবার পর তা সম্পাদন করার জন্যে নবী (স) কাউকে অনুমতি দিয়েছেন। দৃষ্টিভংগী ও নীতির দিক দিয়ে যারা হরবী তারা তো দূরের কথা, যারা কার্যত যুদ্ধে লিপ্ত ছিল, তারা ঠিক যুদ্ধের সময় নবী (স)-এর সাথে একটি অবৈধ চুক্তির উপরে কাজ করতে চাইলো এবং মোটা টাকা দিতে চাইলো, কিন্তু তিনি তা নিতে অস্বীকার করলেন।[১]

১. একথা উপেক্ষা করা উচিত হবে না যে, ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ এবং অধিকাংশ মুহাদ্দিস এ রেওয়াতকে বর্জন করেছেন।

১. এ ঘটনা ঘটে খন্দকের যুদ্ধের সময়। বর্ণনা করেছেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)। মুশরেকদের এক সম্ভ্রান্ত লোকের লাশ খন্দকে পড়ে যায়। তারা মুসলমানদেরকে টাকা দিয়ে সে লাশ খরিদ করতে চায়। নবী (স)-কে একথা জানানো হলে তিনি এরূপ করতে নিষেধ করেন। (ইমাম আবু ইউসুফের কেতাবুল খেরাজ –দ্রষ্টব্য)

এর থেকে জানা গেছে যে, যুদ্ধের সময় দুশমনের সাথে অবৈধ চুক্তির উপর কারবার করার অনুমতি যদি দেয়া হয়ে থাকে, তথাপি তা ছিল অপছন্দনীয়। চরম অনিবার্য প্রয়োজন ছাড়া এরূপ চুক্তির সুযোগ গ্রহণ করা মুসলমানদের মর্যাদার খেলাপ। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর সাথে জড়িত ঘটনা থেকেও একথার প্রমাণ মিলে। জুয়া হারাম হবার পূর্বে তিনি মক্কায় মুশরেকদের সাথে একটি বাজি ধরেছিলেন। এ বাজির টাকা তিনি এমন সময়ে নিয়েছিলেন, যখন মুশরেকদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছিল। শুধু সাময়িকভাবে যুদ্ধ বিরতি হয়েছিল। কিন্তু নবী (স) এ টাকাও হালাল ও পবিত্র করেননি। সে জন্যে তিনি হযরত আবু বকর (রা)-কে বাজির মাল সদকা করে দিতে বলেন।

একদিকে রয়েছে কুরআনের আয়াত, নবীর বিভিন্ন সহীহ হাদীস নবী (স)-এর জমানার প্রমাণিত কার্যকলাপ, যার থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, মুসলমানদের শুধু সুদই নয়, যাবতীয় অবৈধ চুক্তি নিরংকুশভাবে নাজায়েয এবং এতে মুসলিম অমুসলিম অথবা হরবী ও জিম্মীর কোনো পার্থক্য নেই। অপর দিকে রয়েছে একটি মুরসাল হাদীস যা এ সবের মতের বিরুদ্ধে হরবী এবং মুসলমানের শুধু লেনদেন হালাল বলছে। আপনি এ হাদীসটির প্রতি এতখানি গুরুত্ব দিয়েছেন যে, তার উপর ভিত্তি শুধু সুদই নয়, যাবতীয় অবৈধ চুক্তি সকল গায়ের জিম্মী কাফেরের সাথে সাধারণভাবে হালাল করে দিয়েছেন। আমি তাকে সঠিক মনে করে শুধু এতটুকু অবকাশ বের করতে পারি যে, যুদ্ধের অনিবার্য জরুরী অবস্থায় যদি কোনো মুসলমান দুশমনের নিকট থেকে সুদ গ্রহণ করে অথবা অবৈধ চুক্তির উপর কারবার করে তাহলে তার জন্যে জবাবদিহি করতে হবে না।

এ শুধু মাত্র একটি অনুমতি যার সুযোগ কোনো উন্নত ধরনের মুসলমান কখনো গ্রহণ করেনি। ইসলামের আত্মসম্মানবোধ এটাই দাবী করে যে, মুসলমান যেন কোনো অবস্থাতেই অবৈধভাবে অর্জিত অর্থ গ্রহণে আগ্রহান্বিত না হয়। বিশেষ করে কাফের এবং দুশমনদের বিরুদ্ধে তো তাদের জাতীয় চরিত্রের মহত্ব অধিকতর শান-শাওকতের সাথে প্রকাশ করা উচিত। কারণ মুসলমানের যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে তীর-ধনুকের যুদ্ধ নয়—আদর্শ ও চরিত্রের যুদ্ধ। তার উদ্দেশ্য সম্পদ ও ভূখণ্ড অর্জন করা নয়, বরঞ্চ সে চায় দুনিয়ায় তার আদর্শের প্রচার ও প্রসার করতে। যদি সে তার চারিত্রিক মহত্বই হারিয়ে ফেলে এবং যে আদর্শ প্রচারের জন্যে সে দাঁড়িয়েছিল, তা যদি স্বহস্তে সে ধ্বংস করে তাহলে অপর জাতির উপর তার শ্রেষ্ঠত্ব রইলো কোথায় ? কিসের ভিত্তিতে সে অন্যের উপর জয়ী হবে এবং কোন্ শক্তি বলে সে অন্যের হৃদয়-মন জয় করবে ?

দারুল হরবের আলোচনা

এখন আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্নটির দিকে মনোনিবেশ করা উচিত। তা হচ্ছে এই যে, দারুল ইসলাম ও দারুল হরবের পার্থক্যের ভিত্তিতে সুদ এবং যাবতীয় অবৈধ চুক্তির বিধানসমূহের পার্থক্য কি। আর একথারই বা মূলতত্ত্ব কি যে, সকল গায়ের জিম্মী কাফেরের রক্ত ও সম্পদ বৈধ, অতএব সকল সম্ভাব্য উপায়ে তাদের সম্পদ হস্তগত করা জায়েয ? এ ফতোয়ার জন্যে শরীয়তে কতটুকু অবকাশ আছে যে, যে রাষ্ট্রের উপর যে কোনো অর্থে দারুল হরবের পরিভাষা প্রয়োগ করা যাবে। সেখানকার অধিবাসীদের উপর চিরকাল সেসব বিধান জারী হওয়া উচিত যা দারুল হরবের সাথে সম্পর্কিত।

ইসলামী আইনের তিনটি বিভাগ

এ ব্যাপারে একথা মনের মধ্যে বদ্ধমূল করে নিতে হবে যে, শরীয়ত তথা ইসলামী আইনের তিনটি বিভাগ আছে ঃ

এক ঃ বিশ্বাসমূলক আইন। এ সকল মুসলমানের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

দুই ঃ শাসনতান্ত্রিক আইন। এ শুধু ইসলামী রাষ্ট্রের সম্পর্কযুক্ত।

তিন ঃ আন্তর্জাতিক আইন। সঠিক অর্থে বৈদেশিক সম্পর্কের আইন।

এ মুসলমান অমুসলমান নির্বিশেষে সকলের সম্পর্কে আলোচনা করে। আমাদের ফেকাহর গ্রন্থগুলোতে এ আইনগুলোকে পৃথক পৃথকভাবে প্রণয়ন করা হয়নি। তাদেরকে পৃথক পৃথক নামেও অভিহিত করা হয়নি। কিন্তু কুরআন ও হাদীসে এমন সুস্পষ্ট ইংগিত রয়েছে যার থেকে স্বাভাবিকভাবে তিনটি পৃথক পৃথক পথে ইসলামী আইনের ক্রমবিকাশ ঘটেছে। বিশেষ করে যে মহান ইসলামী শাস্ত্রবিদের আইন সম্পর্কিত দূরদর্শিতা এবং ফেকাহ শাস্ত্রের সূক্ষ্ম জ্ঞান সর্বাধিক পরিমাণে এসব ইংগিত করতে পেরেছে ও তার ভিত্তিতে এ তিনটি বিভাগের সীমারেখার সঠিক পার্থক্য নির্ণয় করেছে এবং জটিল জটিল সমস্যায় এ পার্থক্য অক্ষুণ্ন রেখেছে, তিনিই হলেন ইমাম আবু হানিফা (র)। ইসলামী শাস্ত্রবিদগণের মধ্যে কাউকেই এ ব্যাপারে তাঁর সমকক্ষ দেখা যায় না। এমনকি ইমাম আবু ইউসুফের মতো দূরদর্শী ফকীহও তাঁর স্থান পর্যন্ত পৌঁছতে পারেননি। ইমাম আযমের গভীর পাণ্ডিত্যের একটি নগণ্য প্রমাণ এই যে, বারোশ বছর পূর্বে তিনি কুরআন হাদীস মন্থন করে শাসনতান্ত্রিক ও আন্তর্জাতিক আইনের যে বিধানগুলো রচনা করেন, বর্তমান জগতের আইন সম্পর্কিত চিন্তাধারার ক্রমবিকাশ তার থেকে এক ইঞ্চিও সামনে অগ্রসর হতে পারেনি। বরঞ্চ অধিকতর সত্য কথা এই যে, আসলে এ ক্রমবিকাশ হয়েছিল সেই রূপরেখার উপরেই যা বারোশ বছর পূর্বে কুফার জনৈক বস্ত্র ব্যবসায়ী অংকিত করেছিলেন। আধুনিক যুগের আইন-কানুনে হানাফী মতাদর্শের তুলনায় বাহ্যত যে ক্রমোন্নতি পরিলক্ষিত হয়, তা কিয়দংশ তামাদ্দুনিক অবস্থার পরিবর্তন ও বহুলাংশে আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহের ফলশ্রুতি। তথাপি নীতিগত দিক দিয়ে আধুনিক যুগের আইন-কানুন বহুলাংশে হানাফী ফেকাহরই চর্বিত-চর্বন। এসব অধ্যয়নের দ্বারা হানাফী ফেকাহ অনুধাবন করা বড় সহজ হয়।

বিশ্বাসমূলক আইন

আকীদাহ-বিশ্বাসমূলক আইন অনুযায়ী পৃথিবী দুটো জাতিতে বিভক্ত— ইসলাম ও কুফর। সমস্ত মুসলমান এক জাতি এবং সমস্ত কাফের মিলে অন্য

জাতি। ইসলাম অবলম্বনকারী সকলে ইসলামী জাতীয়তার অন্তর্ভুক্ত এবং ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে সকলেই একে অপরের উপর অধিকার রাখে।

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ -

"তারপর যদি তারা কুফর থেকে তওবা করে নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয়, তাহলে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই।"–(সূরা তাওবা ঃ ১১)

মুসলমানের জান-মাল ইজ্জত-আবরু সবকিছুই মুসলমানের জন্যে হারাম।

ان دماء كم واموالكم واعراضكم عليكم حرام -(حجة الوداع)

"তোমাদের জন্যে একে অপরের খুন, মাল ও ইজ্জত হারাম (বিদায় হজ্জ)।"

ইসলামের যাবতীয় বিধান মেনে চলা প্রত্যেক মুসলমানের ওয়াজিব, তা সে দুনিয়ার যে কোনো স্থানেই থাকুক না কেন, যা কিছু ফরজ করা হয়েছে, তা সকলের জন্যে। যাকিছু হালাল করা হয়েছে তা সকলের জন্যে এবং যা কিছু হারাম করা হয়েছে, তা সকলের জন্যে। কারণ প্রত্যেক বিধানের লক্ষ্যই হলো (الذين امنوا) তারা যারা ঈমান এনেছে। কোনো অবস্থা ও স্থানের শর্ত তাতে নেই।

পক্ষান্তরে, কুফর একটি অন্য জাতি। যাদের সাথে আমাদের মতভেদ হলো আদর্শ, বিশ্বাস ও জাতীয়তার।[১] মূলত তাদের ও আমাদের মধ্যে সংগ্রাম হচ্ছে এ মতভেদের ভিত্তিতে। তবে যদি সন্ধি, চুক্তি অথবা দায়িত্ব গ্রহণের কোনো অবস্থা দাঁড়ায়, তাহলে সেটা হবে এর ব্যতিক্রম। অতএব ইসলাম ও কুফর, মুসলমান ও কাফেরের মধ্যে সন্ধি আসল বস্তু নয়, আসল বস্তু যুদ্ধ এবং সন্ধি সাময়িকভাবে তারপর এসে দাঁড়ায়। কিন্তু এ যুদ্ধ বাস্তব নয়। চিন্তা ও আদর্শমূলক। তার অর্থ এই যে, যতোক্ষণ পর্যন্ত আমাদের ও তাদের জাতীয়তা আলাদা এবং আমাদের উভয়ের আদর্শ পরস্পর সংঘর্ষশীল, ততোক্ষণ আমাদের এবং তাদের মধ্যে সত্যিকার এবং স্থায়ী সন্ধি ও বন্ধুত্ব হতে পারে না।

---

১. প্রকাশ থাকে যে, এখানে আমরা জাতীয়তা, শব্দটি বংশীয় ও ভৌগলিক জাতীয়তার অর্থে বলছি না, বরঞ্চ বলছি কৃষ্টিগত জাতীয়তার স্বার্থে। কৃষ্টিগত জাতীয়তার উপরেই ইসলাম তামাদ্দুনিক ও রাজনৈতিক জাতীয়তার প্রাসাদ নির্মাণ করে। এক মায়ের দুটো সন্তান জন্মগতভাবে এক জাতীয়তার অন্তর্ভুক্ত। এক মহল্লার দুজন বাসিন্দা ভৌগলিক দিক দিয়ে এক জাতীয়তার লোক। কিন্তু তাদের একজন যদি মুসলমান এবং অন্যজন কাফের হয়, তাহলে তাদের কৃষ্টিগত জাতীয়তা হবে পৃথক পৃথক এবং আদর্শ ও নীতির দিক দিয়ে এমন এক মতানৈক্য সৃষ্টি হয়, যার আলোচনা আমরা এখানে করতে চাই।

إِنَّا بُرَءٰؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ز كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ اَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ ـ(الممتحنة : ٤)

"[হযরত ইবরাহীম (আ)] কাফেরদেরকে বলেন, তোমাদের সাথে এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে যেসব মাবুদগণের তোমরা ইবাদত কর তাদের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের থেকে পৃথক হয়ে গেছি এবং আমাদের ও তোমাদের মধ্যে চিরদিনের জন্যে শত্রুতা হয়ে গেল। যতোক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর উপর ঈমান এনেছো।"(মুমতাহিনা ঃ ৪)

এ বিষয়টিকে নবী করীম (স) একটি সংক্ষিপ্ত হাদীসে পরিপূর্ণরূপে বর্ণনা করেন ঃ

امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا اللّٰه وان محمدا عبده ورسوله وان يستقبلوا قبلتنا وان ياكلوا ذبيحتنا وان يصلوا صلوتنا فاذا فعلوا ذالك حرمت علينا دماؤهم واموالهم الا بحقها لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين ـ(ابو داؤد باب على ما يقاتل المشركين)

"আমাদের আদেশ করা হয়েছে যে, আমি লোকের সাথে ততোক্ষণ পর্যন্ত সংগ্রাম করি, যতোক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ তাঁর বান্দাহ ও রসূল এবং যতোক্ষণ না আমাদের কেবলার দিকে মুখ করে। আমাদের যবেহ করা পশু খায় এবং.আমাদের মতো নামায পড়ে। তারা যখন এরূপ করবে, তখন আমাদের জন্যে তাদের খুন ও মাল হারাম হয়ে যাবে। তবে হকের জন্যে কোনো প্রাণ হত্যা করলে সে অন্য কথা। এরপর তাদের অধিকার তাই হবে যা মুসলমানদের এবং সেসব দায়িত্বই আরোপিত হবে যা মুসলমানদের উপর।"-(আবু দাউদ মুশরিকদের সাথে সংগ্রাম সম্পর্কিত অধ্যায়।)

এ বিশ্বাসমূলক আইনের দৃষ্টিতে ইসলাম ও কুফরের মধ্যে চিরন্তনের সংগ্রাম। কিন্তু এ সংগ্রাম নিছক চিন্তাধারামূলক (THEORETICAL) প্রত্যেক কাফের হরবী (ENEMY)। কিন্তু এ অর্থে যে, যতোক্ষণ আমাদের ও তাদের জাতীয়তা পৃথক ততোক্ষণ তাদের সংগে সংগ্রামের ভিত্তি বর্তমান থাকবে। প্রতিটি দারুল কুফরই দারুল হরব। কিন্তু তার অর্থ শুধু এই যে, যতোক্ষণ তা দারুল কুফর থাকবে ততোক্ষণ তা যুদ্ধের ক্ষেত্র থাকবে। অথবা অন্য কথায় যুদ্ধাবস্থার সামগ্রিক বিলুপ্তি হতে পারে জাতীয়তার বিভিন্নতা দূর হবার পর। এ আইন শুধু একটি মতবাদ এবং মৌলিক নীতি সুস্পষ্ট করে মুসলমানদের

সামনে তুলে ধরেছে। যার উপর তাদের বাস্তব কর্মপদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত। এখন রইলো অধিকার ও দায়িত্ব এবং যুদ্ধ সন্ধির বাস্তব সমস্যাবলী। তা এ আইনের সাথে তার কোনোই সম্পর্ক নেই। তার সম্পর্ক হলো শাসনতান্ত্রিক ও আন্তর্জাতিক আইনের সাথে।

শাসনতান্ত্রিক আইন

শাসনতান্ত্রিক আইনের দৃষ্টিতে ইসলাম দুনিয়াকে দু ভাগে বিভক্ত করে। একটি দারুল ইসলাম, অন্যটি দারুল কুফর। দারুল ইসলাম ঐ অঞ্চলকে বলে যেখানে মুসলমানদের শাসন প্রতিষ্ঠিত এবং যেখানে কার্যত ইসলামী আইন প্রবর্তিত। অথবা শাসকদের মধ্যে এতটা শক্তি-সামর্থ থাকবে যাতে করে তারা এ আইন বাস্তবায়িত করতে পারে।[১] পক্ষান্তরে যেখানে মুসলমানদের শাসন

---

১. দারুল ইসলামের এ সংজ্ঞার কিছুটা ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। প্রকৃতপক্ষে সত্যিকার অর্থে দারুল ইসলাম সেই অঞ্চলকে বলে, যেখানে ইসলাম একটি জীবন বিধান হিসেবে শাসন পরিচালনা করবে এবং যেখানে ইসলামী আইন দেশের আইন হিসেবে চালু থাকবে। কিন্তু যদি কখনো এমন অবস্থা হয় যে, কোনো দেশে শাসন ক্ষমতা থাকে মুসলমানদেরই হাতে, কিন্তু তারা ইসলামের পরিবর্তে অন্য কোনো জীবন বিধান কায়েম করে এবং ইসলামী আইনের পরিবর্তে অন্য কোনো আইন প্রবর্তন করতে থাকে, তাহলে ইসলামী শাস্ত্রবিদগণ (ফকীহ) নৈরাশ্য পোষণ করে হঠাৎ করে সে দেশকে দারুল কুফর হবার ঘোষণা করা সংগত মনে করেন না। যতোক্ষণ পর্যন্ত না মুসলমানগণ ইসলাম থেকে তাদের নাম মাত্র সম্পর্কও ছিন্ন করে, ততোক্ষণ সে দেশকে ক্ষমতাসীন দারুল ইসলাম বলেই তাঁরা অভিহিত করতে থাকেন। ফকীহগণের এ সতর্কতাপূর্ণ কর্মপদ্ধতি এজন্য যে, মুসলমানদের কোনো স্বাধীন রাষ্ট্রের আদর্শ ও আইন-কানুনের দিক দিয়ে অমুসলমান হওয়া অনিবার্যরূপে দুটো কারণের মধ্যে কোনো একটি কারণেই হতে পারে। এক হচ্ছে এই যে, দেশের মুসলমান অধিবাসীগণ রীতিমত ইসলামের অনুসারী এবং তারই আনুগত্যে জীবনযাপন করার ইচ্ছা রাখে। কিন্তু কোনো না কোনো কারণে, একটি পথভ্রষ্ট দল ক্ষমতাসীন হয়ে পড়েছে। দ্বিতীয় কারণ এই যে, দেশের জনগণের মধ্যে সাধারণভাবে অজ্ঞতা ও গোমরাহী প্রসার লাভ করেছে এবং তাদের মরযী অনুযায়ী সে পথভ্রষ্ট দলটি ক্ষমতা লাভ করেছে যারা অনৈসলামী পন্থায় জাতীয় ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করছে। প্রথম অবস্থার ব্যাপারতো আশা করা যায় যে, মুসলিম জনগণের ইসলামী অনুভূতি শেষ পর্যন্ত মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে এবং ঐ দলটিকে ক্ষমতাচ্যুত করবে যারা ইসলামের গৃহে কুফরের কাজ চালাচ্ছে। এজন্য এমন কোনো কারণ নেই যার জন্যে এ গৃহকে নিজেরাই কুফরের গৃহ বলে বসবো। অবশ্যি দ্বিতীয় অবস্থাটি নৈরাশ্যজনক বটে। কিন্তু যে জাতি অজ্ঞতা ও গোমরাহী সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত ইসলামের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন করেনি এবং যারা এতটা বিগড়ে যাওয়া সত্ত্বেও ইসলামকেই নিজেদের ধর্ম মনে করে, তাদের সম্পর্কেও আমরা এতটা নিরাশ হতে পারি না যে, সত্যিকার ইসলামের দিকে তাদের প্রত্যাবর্তন করার সকল আশা নির্মূল হয়ে গেছে। অতএব তাদের গৃহকেও আমরা দারুল কুফর বলবো না। বরঞ্চ দারুল ইসলামই বলতে থাকবো। কিন্তু একথা ভালো করে উপলব্ধি করা উচিত যে, বাস্তব ক্ষেত্রে ইসলামী আইনের সম্পর্ক শুধুমাত্র সেই দারুল ইসলামের সাথে যা কার্যত দারুল ইসলাম। এখন কথা রইলো তথাকথিত দারুল ইসলাম সম্পর্কে যে স্বয়ং ইসলাম থেকে তার আইনগত সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। ইসলাম তার রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে সেরূপ শাসনতান্ত্রিক অধিকার দিতে প্রস্তুত নয়, যা শুধু ইসলামী রাষ্ট্রের জন্যে নির্দিষ্ট।

নেই এবং ইসলামী আইনও চালু নেই, তাহলো দারুল কুফর। এ হলো ঠিক সেরূপ যেমন ঐসব দেশ যেখানে ইংরেজ শাসন চলছে সেগুলোকে বৃটিশ অঞ্চল বলা হবে এবং যেসব এলাকা এর সীমারেখার বাইরে তাকে বলা হবে অন্য অঞ্চল। ইসলামী রাষ্ট্র ইসলামী বিধানসমূহ শুধু তাদের উপর প্রয়োগ করতে পারে যারা তার আপন সীমার (JURISDICTION) মধ্যে বাস করে। এভাবে সে রাষ্ট্র শুধু সেসব সম্পদ, মান-সম্মান ও জীবন রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারে যা তার ক্ষমতার অথবা অধিকৃত অঞ্চলের (TERRITORY) গণ্ডির মধ্যে হবে। এ সীমারেখার বাইরে কোনো কিছুর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তার নয়।

এ আইন অনুযায়ী ইসলামী রাষ্ট্রের রক্ষণাবেক্ষণাধীন প্রতিটি জীবন, সম্পদ ও সম্ভ্রম রক্ষিত। তা সে মুসলমানের হোক অথবা অমুসলমানের। পক্ষান্তরে দারুল কুফরে অবস্থানকারী প্রতিটি জীবন, সম্পদ ও সম্ভ্রম অরক্ষিত যার রক্ষণাবেক্ষণকারী ইসলামী রাষ্ট্র নয়, তা সে জীবন, সম্পদ ইত্যাদি মুসলমানের হোক অথবা অমুসলমানের। অরক্ষিত শুধু এতটুকু অর্থে যে, যদি তার জীবন, ধন-সম্পদ ও মান-সম্ভ্রম কোনো প্রকার আক্রান্ত হয়, তাহলে ইসলামী রাষ্ট্র কোনো হস্তক্ষেপ করবে না। কারণ এ কাজ তার কর্মসীমার বাইরে সংঘটিত হয়েছে। এ কাজ আল্লাহর কাছে গোনাহ বলে বিবেচিত হবে কিনা এবং তার জন্যে জবাবদিহি করতে হবে কিনা, সে হলো অন্য কথা। অতএব কোনো কিছুর অরক্ষিত হবার অর্থ এই নয় যে, তা হালাল হবে, আর না তার অরক্ষিত হবার অর্থ এভাবে গ্রহণ করা হবে যে, তার কোনো ক্ষতিসাধন করা অথবা তা অধিকার করে নেয়া আল্লাহর কাছে জায়েয ও হালাল। এভাবে শাসনতান্ত্রিক আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে যদি এরূপ কোনো কাজকে জায়েয মনে করা হয় যা দারুল কুফরে সংঘটিত হয়েছে, তাহলে তার অর্থ শুধু এতটুকু হবে যে, ইসলামী রাষ্ট্র তাতে বাধা দেবে না, এর জন্যে কোনো শাস্তিও দেবে না। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, এ হারাম কাজের জন্যে আল্লাহর কাছেও জবাবদিহি করতে হবে না।

এখানে বিশ্বাসমূলক আইন ও শাসনতান্ত্রিক আইন আলাদা হয়ে যাচ্ছে। বিশ্বাসমূলক আইন যে মুসলমানকে ভাই বলে এবং যার জান ও মালকে হারাম বলে গণ্য করে, সে শাসনতান্ত্রিক আইনের দৃষ্টিতে অরক্ষিত। কারণ সে ইসলামী রাষ্ট্রের আওতার বাইরে থাকে। আবার যে কাফেরকে বিশ্বাসমূলক আইন দুশমন মনে করে, শাসনতান্ত্রিক আইন তাকে রক্ষিত বলে গণ্য করে এজন্য যে, সে ইসলামী রাষ্ট্রের রক্ষণাবেক্ষণে এসে গেছে। বিশ্বাসমূলক আইন যে কাজকে কঠিন গোনাহ ও অপরাধ বলে গণ্য করে, শাসনতান্ত্রিক আইন

তাতে কোনো হস্তক্ষেপ করে না। কারণ তা তার শাসন আওতার বাইরে। উভয়ের মধ্যে প্রকাশ্য পার্থক্য এই যে, বিশ্বাসমূলক আইনের সম্পর্ক আখেরাতের সাথে এবং শাসনতান্ত্রিক আইনের সম্পর্ক দুনিয়া এবং তৎসংক্রান্ত বিষয়াদির সাথে। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা (র) ব্যতীত অন্যান্য সকল ইমামগণ কম-বেশী এ উভয় আইনকে মিশ্রিত করে ফেলেছেন এবং তারা এর সীমারেখাগুলোর পুরোপুরি পার্থক্য নির্ণয় করতে পারেননি।

কিছু দৃষ্টান্তের মাধ্যমে এ জটিল বিষয়টির ব্যাখ্যা করছি ঃ

এক ঃ মনে করুন একজন মুসলিম ব্যবসায়ী নিরাপত্তা নিয়ে দারুল হরবে গেল এবং সেখান থেকে কিছু মাল চুরি করে আনলো। এ কাজ বিশ্বাসমূলক আইন এবং আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে হারাম। কারণ সে ব্যক্তি চুক্তি ভংগ করেছে। কিন্তু শাসনতান্ত্রিক আইন সে ব্যক্তিকে উক্ত চোরাই মালের বৈধ মালিক মনে করে এবং তাকে কোনো জিজ্ঞাসাবাদ করে না।–(হেদায়া)

দুই ঃ মনে করুন, দারুল ইসলামের কোনো নাগরিক দারুল হরবে বন্দী ছিল। সে কারাগার থেকে পলায়ন করলো অথবা তাকে ছেড়ে দেয়া হলো। এখন সে ওখানে চুরি করুক, মদ্য পান করুক অথবা ব্যভিচার করুক ; শাসনতান্ত্রিক আইন অনুযায়ী সে অভিযুক্ত হবার যোগ্য নয়।–(বাহরুর রায়েক)

অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্র না তার হাত কেটে দেবে, না মদ্যপান ও ব্যভিচারের জন্যে কোনো শাস্তি দেবে, আর না হত্যার জন্যে কিসাস জারী করবে।[১] কিন্তু বিশ্বাসমূলক আইনে সে আল্লাহর কাছে গোনাহগার হবে।

তিন ঃ মনে করুন, এক ব্যক্তি দারুল হরবে মুসলমান হলো। অতপর সেখান থেকে হিজরত করে দারুল ইসলামে এলো না। বিশ্বাসমূলক আইনে সে মুসলমানদের ভাই হয়ে গেছে। তার খুন ও মাল হারাম হয়ে গেছে। কিন্তু যেহেতু সে ইসলামী রাষ্ট্রের আওতার বাইরে, সে জন্যে শাসনতান্ত্রিক আইনে তার কোনো কিছুই রক্ষিত নয়। একটি দুশমন রাজ্যের নাগরিকের মতোই তার অবস্থা হবে। যদি কোনো মুসলমান দারুল ইসলামের বাইরে তাকে হত্যা করে, তাহলে ইসলামী আদালত তার উপর কিসাস গ্রহণ করবে না। সে ব্যক্তি

---

১. প্রকাশ থাকে যে, দারুল ইসলামের যেসব নাগরিক বিদেশে গিয়ে কোনো অপরাধ এবং চরিত্রহীনতার কাজ করে, দারুল ইসলাম সরকার অবশ্যই তাদেরকে অভিযুক্ত করতে পারে যে, তারা তাদের অপকর্মের দ্বারা ইসলাম ও মুসলমানদের উপর কলংক লেপন করেছে। এজন্যও অভিযুক্ত করতে পারে যে, তারা তাদের অপকর্মের দ্বারা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আপন রাষ্ট্রের জন্যে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। কিন্তু দারুল ইসলামের আওতার বাইরে যেসব অপরাধ, যথা চুরি, হত্যা ইত্যাদি, সে করেছে তার জন্যে কোনো মামলা দায়ের করা হবে না।

স্বেচ্ছায় অবশ্যি কাফ্‌ফারা দিয়ে দিতে পারে। এরূপ যদি কোনো মুসলমান তার নিকটে সুদ নেয় অথবা কোনো অবৈধ উপায়ে তার মাল হস্তগত করে, তাহলে শাসনতান্ত্রিক আইনে সে অভিযুক্ত হবার যোগ্য হবে না। কারণ তার মাল অরক্ষিত। এ ব্যাপারে ফকীহগণের ব্যাখ্যা তাৎপর্যপূর্ণ ঃ

واذا اسلم رجل من اهل الحرب فقتله رجل من المسلمين قبل ان يخرج الى دار الاسلام خطاء فعليه الكفارة ولا دية عليه ـ وفى الاملاء عن ابى حنيفة رحمه اللّه انه لاكفارة عليه ايضا لان وجوبها باعتبار تقوم الدم لاباعتبار حرمة القتل ..... وتقوم الدم يكون بالاحراز بدار الاسلام ـ(شرح السير الكبير مطبوعه دائرة المعارف ج ١ ص ٨٨)

"যদি দারুল হরবের কোনো লোক মুসলমান হয় এবং হিজরত করে দারুল ইসলামে আসার আগে যদি কোনো মুসলমান অনিচ্ছাবশত কতল করে, তাহলে তাকে কাফ্‌ফারা দিতে হবে—বিনিময়ে রক্ত দিতে হবে না। ইমলাতে এ বিষয়ে আবু হানিফা (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তাকে কাফ্‌ফারাও দিতে হবে না। কারণ কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হয় খুনের মূল্য হিসেবে, হত্যা হারাম হওয়া হিসেবে নয়। আর খুনের মূল্য তখনই মাত্র নির্ধারিত হয়, যখন তা দারুল ইসলামের রক্ষণাধীন হয়।"

ولما ثبت بما قدمنا انه لاقيمة لدم المقيم فى دار الحرب بعد اسلامه قبل الهجرة الينا ..... اجروه اصحابنا مجرى الحربى فى اسقاط الضمان عن متلف ماله ..... وان يكون ماله كمال الحربى من هذا الوجه ولذالك اجاز ابو حنيفة مبايعته على سبيل مايجوز مبايعة الحربى من بيع الدرهم بالدرهمين فى دار الحرب ـ(احكام القران لجصاص الحنفى ج ٢ ص ٢٩٧)

"এবং আমাদের পূর্ববর্তী বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি মুসলমান হয়ে হিজরত না করে দারুল হরবের অধিবাসী হয়ে গেল, তার খুনের কোনো মূল্য নেই।[১] .... এরই ভিত্তিতে আমাদের আলেমগণ (হানাফী) এ ধরনের

---

১. এর অর্থ এই যে, যে মুসলমান কোনো ইসলামী রাষ্ট্রের রক্ষণাবেক্ষণে নেই, বরঞ্চ তার আওতার বাইরে থাকে, তার খুনের যতই মূল্য হোক না কেন, ইসলামী রাষ্ট্রের কাছে তার আইনানুগ মূল্য কিছুই নেই। সে বিপন্ন হলে ইসলামী রাষ্ট্র তার কোনো প্রতিকার করতে পারে না। তাকে কেউ হত্যা করলে তাহলে তার কিসাস অথবা রক্তের বিনিময় আদায় করে দেয়ার কোনো দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্রের নেই। তার মাল ও ইজ্জত-আবরুর উপর কেউ অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করলে, সে অন্যায়-অত্যাচারের প্রতিকারের দায়িত্বও ইসলামী রাষ্ট্রের নয়। কিন্তু এতসব কিছু আইনের দিক দিয়ে, নতুবা আকীদাহ-বিশ্বাসের দিক দিয়ে তো মুসলমানের জান-মাল, ইজ্জত-আবরু-দুনিয়ার সবকিছু থেকে অধিক মূল্যবান এবং দারুল ইসলামের মুসলমানদের দীনি মর্যাদার দাবী এই যে, তারা দারুল কুফরের মুসলমানদের যতটা সাহায্য করতে পারে, তা করবে।

মুসলমানকে হরবীর মতোই মনে করেছে। অর্থাৎ তার সম্পদ হস্তগতকারীর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই --- এ দিক দিয়ে তার মাল হরবীর মালের ন্যায় এবং এরই ভিত্তিতে ইমাম আবু হানিফা (র) তার সাথে সেভাবে ক্রয়-বিক্রয় বৈধ বলেছেন যেভাবে হরবীদের সাথে বৈধ। অর্থাৎ দারুল হরবে এক দিরহামকে দুই দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করা।"

وقال الحسن بن صالح اذا اسلم الحربى فاقام ببلادهم وهو يقدر على الخروج فليس بمسلم يحكم فيه بما يحكم على اهل الحرب فى ماله ونفسه -(احكام القران)

"হাসান ইবনে সালেহ বলেন, দারুল হরবের কোনো বাসিন্দা ইসলাম গ্রহণ করার পর সেখানেই রয়ে গেল, অথচ তার হিজরতের সামর্থ ছিল, তাহলে তার মর্যাদা একজন মুসলমানের মতো নয়।[১] তার জান-মাল সম্পর্কে সেই বিধান, যা একজন দারুল হরবের অধিবাসীর জন্যে রয়েছে।"-(আহকামুল কুরআন)

واذا اسلم الحربى فى دار الحرب فقتله مسلم عمدا او خطاء وله ورثة مسلمون هناك فلا شئ عليه الا الكفارة فى الخطاء -(هدايه كتاب السير)

"কোনো হরবী যদি দারুল হরবে মুসলমান হয় এবং কোনো মুসলমান তাকে স্বেচ্ছায় অথবা ভুল বশত হত্যা করে এবং তার ওয়ারিশগণ দারুল হরবে বর্তমান থাকলেও হত্যাকারীকে কিছুই দিতে হবে না। ভুলবশত হত্যা করে থাকলে শুধু কাফ্ফারা দিবে।"-(হেদায়া)

---

১. বর্তমান যুগে 'হিজরত সামর্থ'—এ বিধানের সাথে আর একটি শর্ত লাগাতে হবে। তা হচ্ছে এই যে, দারুল ইসলামে মুহাজিরদের আগমনের দ্বার উন্মুক্ত থাকতে হবে এবং ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এ ঘোষণা থাকতে হবে যে, সাধারণ দারুল হরব ও দারুল কুফর থেকে এবং বিশিষ্ট কোনো দারুল হরব ও দারুল কুফর থেকে মুসলমানগণ ইসলামী রাষ্ট্রে চলে আসুক। এ অবস্থায় সামর্থ থাকা সত্ত্বেও যারা হিজরত করবে না, তাদের সাথে দারুল ইসলামের মুসলমান সকল দিক দিয়ে সেই আচরণই করবে যা সেই দারুল হরব বা দারুল কুফরের বাসিন্দার সাথে করবে। আর যারা হিজরত করতে অপারগ, শাসনতান্ত্রিক দিক দিয়ে তাদের কোনো অধিকার না থাকলেও তাদের সাথে একেবারে অমুসলিমের মতো আচরণ করা যাবে না। বরঞ্চ সেনাবাহিনীর লোকদেরকে এবং অন্যান্য মুসলমানদেরকে এ নির্দেশ দেয়া হবে যে, যুদ্ধের সময় যতটা সম্ভব তাদেরকে রক্ষা করার চেষ্টা করতে হবে। সন্ধির অবস্থায়ও তাদের সাথে অধিকতর সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ করতে থাকবে। কিন্তু যদি দারুল ইসলামের সরকারের পক্ষ থেকে যদি বাইরের মুসলমানদের হিজরত করার আহ্বান জানানো না হয়, আর হিজরতের জন্যে দ্বার উন্মুক্ত না হয়, তাহলে এ অবস্থায় বাইরের মুসলমানদের উপর হাসান ইবনে সালেহের একথা প্রযোজ্য হবে না যে, হিজরতের সামর্থ থাকা সত্ত্বেও যারা হিজরত করবে না তাদের মর্যাদা মুসলমানদের মতো নয়। অবশ্যি শাসনতান্ত্রিক আইনের এ নীতি সর্বত্র অটল থাকবে যে, যেসব মুসলমান দারুল ইসলামের নাগরিক নয় এবং তার আওতার বাইরে তাদের জান-মাল ইজ্জত-আবরুর দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্রের নয়।

وحكم من اسلم فى دار الحرب ولم يهاجر كالحربى عند ابى حنيفة لان ماله غير معصوم عنده ـ(بحر الرائق ج ٥ ص ١٤٧)

"যে ব্যক্তি দারুল হরবে মুসলমান হয়ে হিজরত করবে না, আবু হানিফা (র)-এর মতে তার মর্যাদা হরবীর ন্যায়। কারণ তাঁর মতে তার মাল অরক্ষিত।"-(বাহরুর রায়েক)

চার ঃ মনে করুন একজন মুসলমান নিরাপত্তাসহ দারুল হরবে গেল। তারপর সেখানে সে কোনো হরবীর নিকট হতে কর্জ গ্রহণ করলো, অথবা তার মাল আত্মসাৎ করলো। অতপর সে দারুল ইসলামে প্রত্যাবর্তন করলো এবং উক্ত হরবীও নিরাপত্তাসহ দারুল ইসলামে এলো। এখানে ঐ নিরাপত্তাপ্রাপ্ত হরবী সে কর্জ অথবা আত্মসাৎ করা মালের জন্যে দারুল ইসলামের আদালতে দাবী করতে পারে না। ইসলামী রাষ্ট্রে তাকে এক পয়সাও ফেরত দিতে বলবে না। এরূপ যদি দারুল হরবী মুসলমান থেকে গৃহীত কর্জ মেরে দেয় অথবা তার মাল আত্মসাৎ করে এবং অতপর সে হরবী নিরাপত্তাসহ দারুল ইসলামে আসে, তথাপি ইসলামী আদালত সে হরবীর উক্ত মুসলমানের কোনো প্রতিকার করতে পারবে না।-(জামেউস সাগীর ইমাম মুহাম্মদ)

পাঁচ ঃ পিতা যদি থাকে দারুল ইসলামে এবং তার নাবালেগ সন্তানগণ থাকে দারুল হরবে, তাহলে সেই সন্তানগণের উপর থেকে পিতার অভিভাবকত্ব বিলুপ্ত হবে। এরূপ যদি সম্পদের মালিক থাকে দারুল ইসলামে এবং তার সম্পদ থাকে দারুল হরবে, তাহলে মালিকের জীবন রক্ষিত হবে, কিন্তু সম্পদ রক্ষিত হবে না।-(ফতহুল কাদীর ৪ ঃ ২৫৫)

ছয় ঃ দারুল ইসলামের নাগরিকদের দুজন মুসলমান নিরাপত্তাসহ দারুল হরবে গিয়ে একজন অপরজনকে হত্যা করলো। অতপর হত্যাকারী দারুল ইসলামে প্রত্যাবর্তন করলে তার থেকে কিসাস নেয়া হবে না। হেদায়ার গ্রন্থকার এর যে কারণ বর্ণনা করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য ঃ

وانما لايجب القصاص لانه لايمكن استيفاءه الا منعة ولا منعه دون الامام وجماعة المسلمين ولم يوجد ذالك فى دار الحرب ـ(هدايه كتاب السير)

"তার উপর কিসাস এজন্য ওয়াজিব নয় যে, রক্ষণাবেক্ষণ ব্যতিরেকে কিসাস ওয়াজিব হয় না এবং ইমাম ও মুসলিম জামায়াত ব্যতিরেকে রক্ষণাবক্ষেণ হয় না। আর এ ব্যবস্থা দারুল হরবে নেই।"

সাত ঃ দারুল ইসলামের নাগরিকদের দুজন মুসলমান দারুল হরবে বন্দী ছিল। তাদের একজন অপরজনকে হত্যা করলো। অথবা কোনো মুসলমান

নিরাপত্তাসহ দারুল হরবে গিয়ে সেখানে কোনো বন্দী মুসলমানকে হত্যা করলো। উভয় অবস্থাতেই হত্যাকারীর জন্যে কিসাসও নেই, খুনের বিনিময়ও নেই। আল্লামা ইবনে হামাম যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা আরও অর্থপূর্ণ।

فلا شئ على القاتل من احكام الدنيا الا الكفارة فى الخطاء عند ابى حنيفة وانما عليه عقاب الاخرة فى العمد ... لانه صار بالاسر تبعا لهم .... وصار كالمسلم الذى لم يهاجر الينا فى سقوط عصمته الدنيوية -

> "ইমাম আবু হানিফা (র)-এর মতে হত্যাকারীর জন্যে পার্থিব কোনো বিধান নেই। তবে ভুলবশত হত্যা করলে কাফ্ফারা দিবে। স্বেচ্ছায় হত্যা করলেও কাফফারা দিতে হবে না, তবে আখেরাতে শাস্তির যোগ্য হবে। ---------- কিসাস ও রক্তের বিনিময় প্রযোজ্য না হবার কারণ এই যে, বন্দী হবার জন্যে সে আইনে হরবের অধীন হয়েছে। -------- তার অবস্থা সেই মুসলমানের মতোই হয়েছে যে আমাদের রাষ্ট্রে হিজরত করেনি। এ কারণে তার পার্থিব রক্ষণ-ব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়েছে।"
>
> –(ফতহুল কাদীর ৪র্থ খঃ পৃঃ ৪৫১)

এ দৃষ্টান্তগুলোর দ্বারা বিশ্বাসমূলক আইন এবং শাসনতান্ত্রিক আইনের পার্থক্য কতখানি সুস্পষ্ট হয়েছে তা লক্ষ্য করুন। বিশ্বাসমূলক আইন মুসলমানদেরকে এক জাতি এবং কাফেরদেরকে অন্য জাতি গণ্য করে। তার দাবী এই যে, মুসলমানদের জান-মাল ইজ্জত কাফেরদের জান-মাল ইজ্জতের উপর প্রাধান্য দিতে হবে। কিন্তু শাসনতান্ত্রিক আইন এ বিশ্বজনীন বিভাগের পরিবর্তে নিজের শাসনের গণ্ডিকে (JURISDICTION) ভৌগলিক গণ্ডিতে (TERRITORIAL LIMITS) সীমিত করে। ইসলামী রাষ্ট্রের গণ্ডির মধ্যে অবস্থিত জান-মাল ইত্যাদি 'রক্ষিত' তা মুসলমানের হোক অথবা অমুসলমানের। কারণ রাষ্ট্রীয় আইন তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। এ সীমারেখার বাইরে যাকিছু আছে তা 'অরক্ষিত', তা মুসলমানের হোক বা অমুসলমানের। ইসলামী রাষ্ট্রের গণ্ডির মধ্যে কেউ চুরি করলে তার হাত কেটে দেয়া হবে, হত্যা করলে কিসাস অথবা রক্তপণ আদায় করা হবে। অবৈধ উপায়ে সম্পদ অর্জন করলে তা ফেরত দেওয়ানো হবে। আর এ সীমারেখার বাইরে কোনো মুসলমান অথবা জিম্মী এসব কাজ করলে তা আমাদের আইনে অপরাধ বিবেচিত হলেও অপর অঞ্চলে আমরা তার বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারি না, এমন কি আমাদের অঞ্চলে ফিরে এলেও। কারণ অপরাধ এমন এক অঞ্চলে সংঘটিত হয়েছে যেখানকার নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আমাদের নয়। কিন্তু এ যা কিছু তাহলো পার্থিব দিক দিয়ে। ইসলামী

সীমারেখার বাইরে যে গোনাহ্ করা হবে, তা পার্থিব শাসন সীমার বাইরে হবার কারণে পার্থিব শাস্তিযোগ্য হবে না ; কিন্তু আল্লাহর নিকট শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে না। কারণ আল্লাহর শাসন সীমারেখা ভৌগলিক সীমারেখার ঊর্ধে (ULTRA TERRITORIAL)। তিনি যাকিছু হারাম করেছেন তা সর্বত্রই হারাম।

এ ইমাম আবু হানিফা (র)-এর স্বকপোলকল্পিত আইন নয়। বরঞ্চ তা কুরআন-হাদীস থেকেই গৃহীত। কুরআন একদিকে যেমন বলে ঃ

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ ط(التوبة : ١١)

"যদি তারা নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয় তাহলে তারা তোমাদের দীনি ভাই হয়ে যায়" এবং

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاۤؤُهٗ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا ـ(النساء : ٩٣)

"এবং যে স্বচ্ছায় কোনো মুমেনকে হত্যা করে তার শাস্তি হচ্ছে চিরন্তনের জাহান্নাম," অপর দিকে সেই কুরআনই ইসলামী সীমারেখার মধ্যে অবস্থানকারী মুসলমান এবং অপর অঞ্চলে অবস্থানকারী মুসলমানের মধ্যে পার্থক্যও বলে দেয়। উল্লিখিত প্রথম ধরনের স্বেচ্ছায় হত্যাকারীদের জন্যে কাফ্ফারাও আছে, রক্তপণও আছে। আর দ্বিতীয় ধরনের হত্যাকারীর জন্যে শুধু কাফ্ফারা।[১]

নবী করীম (স) উসামা ইবনে যায়েদকে একটি অভিযানের অধিনায়ক করে 'হারাকাত' অভিমুখে পাঠান। সেখানে একজন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' উচ্চারণ করে আত্মরক্ষা করতে চাইলো কিন্তু মুসলমানগণ তাকে হত্যা করলো। একথা নবী করীম (স) জানতে পেরে উসামাকে বার বার বলেন ঃ من لك بلا اله الا الله يوم القيمة (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর মুকাবেলায় কিয়ামতে তোমাকে কোন্ জিনিস রক্ষা করবে ?) কিন্তু এ নিহত ব্যক্তির রক্তপণ আদায় করার হুকুম দেননি।[২] এমনিভাবে অপর এক ঘটনায় ইসলামী

---

১. وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق -এর অর্থ এই যে, অমুসলিম এলাকায় অবস্থানকারী মুসলমান যদি এমন এক দলভুক্ত হয়, যাদের সাথে রক্তপণ সম্পর্কে মুসলমানদের চুক্তি হয়েছে, তাহলে যেভাবে সে দলের একজন অমুসলিমের রক্তপণ দেয়া হবে। সেভাবে তার একজন মুসলমানেরও দেয়া হবে। অতএব এ রক্তপণ চুক্তির ভিত্তিতে, ইসলামী রক্ষণ-ব্যবস্থার ভিত্তিতে নয়।-(সূরা আন নেসা ঃ ১৩ রুকূ দ্রষ্টব্য)

২. আবু দাউদ অধ্যায় ঃ على ما يقاتل المشركين

গণ্ডির বাইরে অবস্থানকারী কিছু মুসলমানকে হত্যা করা হলে নবী করীম (স) বলেন ঃ

انا برئى من كل مسلم يقيم بين اظهر المشركين -

যেসব মুসলমান মুশরেকদের মধ্যে বাস করে তাদের কোনো দায়িত্ব আমার উপর নেই।[১] কুরআনও এ ধরনের মুসলমানদের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হবার ঘোষণা করেছে ঃ

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يُهَاجِرُوْا مَالَكُمْ مِّنْ وَّلَا يَتِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا ء -

"এবং যারা ঈমান এনেছে বটে, কিন্তু হিজরত করে দারুল ইসলামে আসেনি, তাদের উপর তোমাদের অভিভাবকত্বের কোনো সম্পর্ক নেই যতোক্ষণ না তারা হিজরত করে এসে যায়।"[২]-(সূরা আনফাল ঃ ৭২)

এভাবে স্বয়ং কুরআন ও হাদীস পার্থিব রক্ষণ-ব্যবস্থাকে পারলৌকিক রক্ষণ-ব্যবস্থা থেকে পৃথক করে দিয়েছে এবং উভয়ের সীমারেখা বলে দিয়েছে। সকল ইসলামী শাস্ত্রবিদগণের মধ্যে শুধুমাত্র ইমাম আবু হানিফা (র)-ই এ নাজুক এ জটিল আইন সম্পর্কিত বিষয়টিকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করেছেন। ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল প্রমুখ খ্যাতনামা মুজতাহিদগণও এ দু ধরনের রক্ষণ-

---

১. আবু দাউদ কিতাবুল জিহাদ উক্ত অধ্যায়।
এ দ্বিতীয় ঘটনায় নবী করীম (স) হত্যাকারীদের অর্ধেক রক্তপণ দেওয়ান। সম্ভবত তাঁর এ সিদ্ধান্ত ঐ আয়াত নাযিলের পূর্বেকার যাতে নিহত ব্যক্তির রক্তপণ বাতিল করা হয়েছিল।

২. এ আয়াতটি ইসলামের শাসনতান্ত্রিক আইনের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ধারা। এতে এ মূলনীতি ঘোষণা করা হয়েছে যে, 'অভিভাবকত্বের' সম্পর্ক শুধু সেসব মুসলমানদের সাথে হবে যারা দারুল ইসলামের অধিবাসী অথবা বাইরে থেকে হিজরত করে দারুল ইসলামে এসেছে। এখন রইলো ঐসব মুসলমান যারা দারুল ইসলামের বাইরে বাস করে অথবা দারুল ইসলামে এলেও হিজরত করে নয়—দারুল কুফরের নাগরিক হিসেবে—তাদের এবং দারুল ইসলামবাসীর মধ্যে অভিভাবকত্বের কোনোই সম্পর্ক নেই। ولايت শব্দটি আরবী ভাষায় সমর্থন-সহানুভূতি, সাহায্য, পৃষ্ঠপোষকতা, বন্ধুত্ব, আত্মীয়তা, অভিভাবকত্ব এবং অনুরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ আয়াতের পূর্বাপর প্রসংগে সুস্পষ্টরূপে সে সম্পর্কই বুঝানো হয়েছে, যা কোনো রাষ্ট্রের স্বীয় নাগরিকদের সাথে, নাগরিকদের তাদের রাষ্ট্রের সাথে এবং নাগরিকদের পরস্পরের সাথে হয়ে থাকে। অতএব এ আয়াত দারুল ইসলাম বহির্ভূত মুসলমানদেরকে দ্বীনি ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সত্ত্বেও সে রাজনৈতিক ও তামাদ্দুনিক সম্পর্ক থেকে ছিন্ন করে দিচ্ছে। এর থেকে ব্যাপক আইনগত সূত্র বা সিদ্ধান্ত আবিষ্কৃত হয়। ফিকাহর বিস্তারিত গ্রন্থসমূহে তা পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, এ অভিভাবকত্ব হীনতার কারণেই দারুল ইসলাম এবং দারুল কুফরের মুসলমান পরস্পর বিয়ে-শাদী করতে পারে না। একে অপরের উত্তরাধিকারী হতে পারে না। একে অপরের আইনগত 'অলী' (GUARDIAN) হতে পারে না। ইসলামী রাষ্ট্র কোনো দায়িত্বপূর্ণ পদে এমন কোনো মুসলমানকে নিয়োগ করতে পারে না, যে দারুল কুফরের সাথে তার নাগরিকত্ব ছিন্ন করেনি।

ব্যবস্থার মধ্যে পুরোপুরি পার্থক্য করতে পারেননি। ধরুন, যদি দারুল কুফরে মুসলিম নাগরিকদের একজন অন্য একজনকে খুন করে, তাহলে এসব ইমামগণের মতে খুনীর নিকট থেকে কিসাস গ্রহণ করা হবে। কারণ সে এমন এক ব্যক্তিকে খুন করেছে যে ছিল ইসলামে রক্ষিত।[১] অতএব এত বড় বড় ইমামগণ যখন এ মাসলায় বিভ্রান্ত হয়েছেন, তখন অসম্ভব নয় যে, হানাফী ফেকাহর পরবর্তীকালের ব্যাখ্যাকারীগণও ইমাম আবু হানিফা (র)-এর কথা বুঝতে ভুল করে থাকবেন।

দারুল হরব ও দারুল কুফরের পারিভাষিক পার্থক্য

ইমাম আযম সম্পর্কে প্রামাণ্য সূত্রে জানতে পেরেছি যে, উপরে যতগুলো বিষয় বর্ণিত হয়েছে তাতে এবং এ ধরনের অন্যান্য বিষয়ে তিনি দারুল হরবের পরিবর্তে দারুল কুফরের পরিভাষাই ব্যবহার করেছেন। কারণ শাসনতান্ত্রিক আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে দারুল ইসলামের প্রতিপক্ষ, অমুসলিম এলাকা বা বৈদেশিক এলাকা (FOREIGN TERRITORY) অর্থে দারুল কুফরই হতে পারে। হরব ও গায়ের হরবের এখানে কোনো কথাই নেই। যেসব দেশ ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ তারাও দারুল কুফর। উপরে যেসব বিধান বর্ণিত হয়েছে তা এসব দেশের সাথে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু যেহেতু ইসলামের প্রাথমিক শতাব্দীগুলোতে ইসলামী রাষ্ট্রের সন্নিহিত সকল দারুল কুফর সাধারণত দারুল হরবই থাকতো, সে জন্যে পরবর্তী ফকীহগণ দারুল কুফরকে একেবারে দারুল হরবের সমার্থবোধক মনে করেন এবং এ দুটো পরিভাষার সূক্ষ্ম আইনগত পার্থক্য উপক্ষো করে বসেন। এভাবে ইমাম আবু হানিফা (র)-এর কথায় কোথাও আমরা এমন কোনো শব্দ পাইনি যার থেকে প্রমাণ হয় যে, তিনি 'অরক্ষিতকে' বৈধ অর্থে গ্রহণ করেছেন। তিনি ইসলামী সীমারেখার বহির্ভূত বস্তুগুলোকে অরক্ষিত বলাই যথেষ্ট মনে করতেন। এসব বস্তুসমূহের উপর হস্তক্ষেপকারীদের জন্যে শুধু এতটুকু বলতেন لاشيئ عليه অথবা لم يقض عليه ইত্যাদি। অর্থাৎ তাকে অভিযুক্ত করা হবে না অথবা তার বিরুদ্ধে আদালতে কোনো বিচার করা হবে না। কিন্তু পরবর্তীকালের ফকীহগণ অধিকাংশ স্থলে 'অরক্ষিত হওয়া' এবং বৈধতাকে একত্রে মিশ্রিত করে ফেলেছেন। তার ফলে এ ভুল ধারণার সৃষ্টি হয় যে, ইসলামী সীমারেখার বাইরে যতোই নিষিদ্ধ ও অবৈধ কাজ করা হোক, সরকার যেমন তার জন্যে অভিযুক্ত করবে না, আল্লাহ তায়ালাও ধরবেন না। অথচ এ দুটো জিনিস কিন্তু একেবারে আলাদা। আপনি ভারতে কারো মাল চুরি করুন, তারপর এটা ঠিক

১. জামেউস সাগীর ও ফতোয়া—কাযী খান দ্রষ্টব্য।

যে আফগানিস্তানের আদালতে আপনার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হবে না। দারুল ইসলামের আইনে আপনি দায়িত্বমুক্ত। কিন্তু এর অর্থ কি এই যে, আল্লাহর আদালতেও আপনি বেঁচে যাবেন ?

এখন আপনি বুঝতে পারেন যে, ফেকাহর বইগুলোতে দারুল হরবে সুদ, জুয়া এবং অন্যান্য অবৈধ চুক্তি এজন্য বৈধ করা হয়েছে যে, হরবীর জন্যে রক্ষণ ব্যবস্থা (PROTECTION) নেই। এর দুটো দিক আছে ঃ

একটি এই যে, 'দারুল হরব' অর্থে শুধু অমুসলিম এলাকা বুঝাবে। এ দিক দিয়ে এ বিষয়টি শাসনতান্ত্রিক আইনের সাথে সংশ্লিষ্ট। তার ধরন এই যে, হরবীর (অমুসলিম এলাকার নাগরিক এ অর্থে) ধন-সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব যেহেতু আমরা গ্রহণ করিনি, সে জন্যে আমাদের কর্মসীমার বাইরে আমাদের রাষ্ট্রের কোনো নাগরিক যদি সে হরবীর কাছ থেকে সুদ গ্রহণ করে অথবা জুয়া খেলে কিংবা অন্য কোনো অবৈধ পন্থায় সম্পদ লাভ করে আমাদের এলাকায় এসে যায়, তাহলে আমরা তার বিরুদ্ধে কোনো মামলা দায়ের করবো না, দীন ও আকীদাহ-বিশ্বাসের দিক দিয়ে সে অপরাধী হোক বা না হোক।

দ্বিতীয়টি এই যে, দারুল হরব বলতে এমন এক দেশ বুঝাবে যার সাথে আমাদের প্রত্যক্ষ যুদ্ধ চলছে অর্থাৎ শত্রু দেশ (ENEMY COUNTRY)। এ দিক দিয়ে এ বিষয়টি বৈদেশিক সম্পর্কের আইনের সাথে সংশ্লিষ্ট যার বিবরণ সামনে দেওয়া হচ্ছে।

বৈদেশিক সম্পর্কের আইন

ইসলামী আইনের এ শাখা এমন সব লোকের জান-মালের আইনগত আলোচনা করে যারা ইসলামী রাষ্ট্রের সীমারেখার বাইরে অবস্থান করে। এর বিশদ আলোচনার পূর্বে কিছু বিষয়ের ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

ফেকাহর পরিভাষায় دار শব্দটি প্রায় ইংরেজী (TERRITORY) শব্দের অর্থে ব্যবহার করা হয়। যে ভূখণ্ডে মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়, তাকে বলে দারুল ইসলাম। যেসব এলাকা এর সীমারেখার বাইরে হয়, তাকে বলা হয় দারুল কুফর অথবা দারুল হরব। বৈদেশিক সম্পর্কের আইন পুরোপুরি সেসব সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করে, যা ভৌগলিক পার্থক্য অথবা উভয়বিধ রাষ্ট্রের বিচ্ছিন্নতার কারণে মানুষের জান-মাল সম্পর্কে উদ্ভূত হয়।

আমি পূর্বেই বলেছি যে, বিশ্বাসের দিক দিয়ে তো সকল মুসলমান ইসলামী জাতীয়তার নাগরিক। কিন্তু আইনের এ শাখার উদ্দেশ্যে তাদেরকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। এক, যারা দারুল ইসলামের নাগরিক। দুই,

যারা দারুল কুফর অথবা দারুল হরবের নাগরিক। তিন, নাগরিক তো দারুল ইসলামের। কিন্তু নিরাপত্তাপ্রাপ্ত হিসেবে সাময়িকভাবে দারুল কুফর অথবা দারুল হরবে গিয়ে তথাকার বাসিন্দা হয়। এদের অধিকার ও দায়িত্ব পৃথক পৃথক নির্ধারণ করা হয়েছে।

পক্ষান্তরে কাফের যদিও সকলেই বিশ্বাসের দিক দিয়ে ইসলামী জাতীয়তা বহির্ভূত, তথাপি আইনের দিক দিয়ে তাদেরকেও অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে।

এক ঃ যারা জন্মগতভাবে জিম্মী-(NATURAL BORN SUBJECTS অথবা জিজিয়া ধার্য করার পরে জিম্মি করা হয়েছে NATVRAL LISED SUBJECTS)।

দুই ঃ যারা দারুল ইসলামের নাগরিক নয়। নিরাপত্তাসহ দারুল ইসলামে এসে বসবাস করে-(DOMICILED ALICEN)।

তিন ঃ যারা দারুল কুফর অথবা দারুল হরবের নাগরিক। কিন্তু নিরাপত্তা ব্যতিরেকেই দারুল ইসলামে প্রবেশ করে।

চার ঃ যারা আপন আপন রাষ্ট্রেই বসবাস করে। এ চতুর্থ শ্রেণীর অমুসলমানগণেরও আবার কয়েক শ্রেণী আছে।

(ক) যাদের সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের চুক্তিও নেই, শত্রুতাও নেই।

(খ) যাদের সাথে মুসলমানদের শত্রুতা আছে।

এভাবে ভূখণ্ডের (TERRITORY) সীমারেখার দিক দিয়ে মানুষ এবং সম্পদের মর্যাদায় যে পার্থক্য, তদনুযায়ী তাদের মধ্যে বিধানেরও পার্থক্য অনিবার্য। তাকে সামনে রেখেই ইসলামী আইনের ব্যাখ্যা অত্যন্ত প্রয়োজন। এসব পার্থক্যের প্রতি লক্ষ্য না রেখে যদি শুধুমাত্র আইনের ভাষাগত শব্দের অনুসরণ করা হয়, তাহলে শুধু সুদের বিষয়েই নয় অধিকাংশ ফেকাহর মাসলায় এমন সব ভুল হয়ে পড়বে যার ফলে আইন বিকৃত হয়ে পড়বে এবং আপন উদ্দেশ্যের বিপরীত তা ব্যবহৃত হতে থাকবে।

এ প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যার পর, আমরা ঐসব প্রশ্নের দিকে মনোযোগ দিতে চাই যে, দারুল ইসলাম প্রকৃতপক্ষে কোন্ এলাকাকে বলা হবে, তার শ্রেণী বিন্যাস কিরূপ এবং প্রত্যেক শ্রেণীর জন্যে কিরূপ বিধান হবে। হরবীদের শ্রেণী কৃত এবং শ্রেণী হিসেবে জীবন ও ধন-সম্পদের ধরনটাও কিভাবে বদলে যায়।

অমুসলিমদের শ্রেণী বিভাগ

অমুসলিমদের যে শ্রেণী বিভাগ উপরে বর্ণনা করা হয়েছে। তাদের জিম্মীদের সম্পর্কে তো সকলেরই জানা আছে যে, মদ, শূকরের মাংস, নিষিদ্ধ ব্যক্তিদের

সাথে বিবাহ এবং আল্লাহ ব্যতীত অপর কিছুর ইবাদত উপাসনা ছাড়া, অন্যান্য ব্যাপারে তাদের অবস্থা মুসলমানদের মতোই। ইসলামের যাবতীয় রাষ্ট্রীয় আইন (LAWS OF THE LAND) তাদের উপর প্রযোজ্য হবে। যেসব বিষয় থেকে মুসলমানদেরকে বিরত রাখা হয়, তাদেরকেও সেসব থেকে বিরত রাখা হবে। জান-মাল, ইজ্জত-আবরু রক্ষার অধিকার তাদের থাকবে, যেমন মুসলমানদের থাকবে। নিরাপত্তাপ্রাপ্ত অমুসলিমদের ব্যাপারেও জিম্মীদের থেকে পৃথক নয়। কারণ তাদের উপরেও ইসলামী রাষ্ট্রের বিধানসমূহ প্রযোজ্য হবে এবং দারুল ইসলামে থাকার কারণে তাদের জান-মাল ও ইজ্জতের অধিকার থাকবে। এদেরকে বাদ দিলে, শুধু সেসব অমুসলিমদের দিকে আমাদের নজর দিতে হবে যারা দারুল কুফরে বসবাস করে।

এক ঃ করদাতা—যেসব অমুসলিম ইসলামী রাষ্ট্রকে কর দেয় এবং নিজেদের দেশে যারা কুফরী বিধান জারী করার স্বাধীনতা রাখে, তাদের দেশ যদিও দারুল কুফর, কিন্তু দারুল হরব নয়। কারণ মুসলমানগণ যখন কর নিয়ে তাদেরকে নিরাপত্তা দিয়েছে তখন তাদের হরবীয়ত (হরবী হওয়া) বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কুরআনে আছে ঃ

فَاِنِ اعْتَزَلُوْكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ وَاَلْقَوْا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ ۙ فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيْلًا ۝ (النساء : ٩٠)

"যদি তারা যুদ্ধ থেকে বিরত হয় এবং সন্ধির প্রস্তাব পেশ করে তাহলে আল্লাহ তাদের প্রতি হস্তক্ষেপ করার পথ তোমাদের জন্যে খোলা রাখেনি।"

এর ভিত্তিতে ফকীহগণ বলেন যে, তাদের জান-মাল ও ইজ্জতের উপর হস্তক্ষেপ করা যাবে না।

وان وقع الصلح على ان يؤدوا اليهم كل سنة مائة رأس فان كانت هذه المائة الرأس يؤدونها من انفسهم واولادهم لم يصلح هذا لان الصلح وقع على جماعتهم فكانوا جميعا مستامنين واسترقاق المستامن لايجوز -

"যদি তাদের সাথে এ বিষয়ে সন্ধি হয়ে থাকে যে, তারা প্রতি বছর একশ গোলাম দিবে, আর এ একশ গোলাম যদি তাদের দলের হয় অথবা তাদের সন্তান-সন্ততি হয়, তাহলে তা নেয়া দুরস্ত হবে না। কারণ, সন্ধি তাদের সম্পূর্ণ দলের উপর বর্তাবে। তারা নিরাপত্তাপ্রাপ্ত এবং নিরাপত্তা প্রাপ্তকে গোলাম বানানো জায়েয হবে না।"

–(আল মাবসূত ইমাম সারাখসী–খণ্ড ১০০, পৃঃ ৮৮)

ولو دخل منهم دار حرب اخرى فظهر المسلمون عليهم لم يتعرضوا له لانه فى امان المسلمين ـ

"যদি তাদের কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো দারুল হরবে বসবাস করে এবং ইসলামী সেনাবাহিনী সেখানে প্রবেশ করে তাহলে তাদের উপর হস্তক্ষেপ করা যাবে না। কারণ তারা মুসলমানদের পক্ষ থেকে নিরাপত্তাপ্রাপ্ত।"-(ঐ পৃঃ ৮৯)

وان كان الذين سبوهم قوم من المسلمين غدروا باهل الموادعة لم يسع للمسلمين ان يشتروا من ذالك السبى وان اشتروا ردت البيع لانهم كانوا فى امان المسلمين ـ

"মুসলমানদের কোনো দল যদি তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাদের লোককে গোলাম বানায়, তাহলে মুসলমানদের জন্যে সেসব গোলাম খরিদ করা নাজায়েয হবে। খরিদ করলে তা বাতিল হয়ে যাবে। কারণ তারা মুসলমানদের নিরাপত্তার অধীন ছিল।"-(ঐ পৃঃ ৯৭)

এ ধরনের অমুসলিমগণ যদিও দৃষ্টিভংগীর দিক দিয়ে হরবীই থাকে।[১] কিন্তু তাদের সম্পদ বৈধ নয় এবং তাদের সংগে অবৈধ চুক্তির কোনো কারবার করা যেতে পারে না, তারা সুদখোর হোক না কেন। কিন্তু তারা যদি নিজেদের ভূখণ্ডে না থাকে এবং এমন এক ভূখণ্ডে থাকে যেখানে প্রত্যক্ষ যুদ্ধ চলছে, তথাপি তাদের সাথে অবৈধ চুক্তির কারবার করা মুসলমানদের জন্যে জায়েয হবে না।

দুই ঃ চুক্তিবদ্ধ—যেসব অমুসলিমদের সাথে দারুল ইসলামের চুক্তি হয়েছে তাদের সম্পর্কে কুরআন বলে ঃ

اِلاَّ الَّذِيْنَ عَاهَدتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوْكُمْ شَيْئًا وَّلَمْ يُظَاهِرُوْا عَلَيْكُمْ اَحَدًا فَاَتِمُّوْا اِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ اِلٰى مُدَّتِهِمْ ط(التوبة : ٤)

---

১. لانهم بهذه الموادعة لايلتزمون احكام الاسلام ولا يخرجون من ان يكونوا اهل حرب ـ

কারণ তারা এ সন্ধি ও চুক্তির জন্যে ইসলামী বিধান মানতে বাধ্য নয়। এজন্য তারা হরবীত্বের গণ্ডি থেকে বের হতে পারে না।-(আল মাবসুত-১ পৃঃ ৮৮)

"যেসব মুশরিকদের সাথে তোমরা চুক্তি সম্পাদিত করেছ এবং তারা তোমাদের সাথে চুক্তি পালনে ত্রুটি করেনি, আর না তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করেছে, তাহলে চুক্তির মেয়াদ পর্যন্ত তাদের চুক্তি পূরণ করো।"−(সূরা আত তাওবা ঃ ৪)

فَمَا اسْتَقَامُوْا لَكُمْ فَاسْتَقِيْمُوْا لَهُمْ ط(التوبة : ٧)

"যতোক্ষণ তারা চুক্তিতে অবিচল থাকে, তোমরাও তাই থাক।"
−(সূরা আত তাওবা ঃ ৭)

وَاِنِ اسْتَنْصَرُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ اِلاَّ عَلٰى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ ط(الانفال : ٧٢)

"এবং যেসব মুসলমান দারুল কুফরে থাকে, তারা যদি দীনের সত্যতার ভিত্তিতে তোমাদের সাহায্য প্রার্থনা করে, তাহলে তাদের সাহায্য কর। কিন্তু এমন কোনো দলের বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য করো না যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি হয়েছে।"−(সূরা আল আনফাল ঃ ৭২)

وَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰى اَهْلِهٖ -

"যদি নিহত ব্যক্তি এমন এক দলের লোক হয়, যাদের এবং তোমাদের মধ্যে চুক্তি হয়েছে, তাহলে তার ওয়ারিশদেরকে রক্তপণ দিতে হবে।"
−(সূরা আন নিসা ঃ ৯২)

এ আয়াতগুলো থেকে জানা যায় যে, চুক্তিকারী কাফের যদিও মতবাদের দিক দিয়ে হরবী এবং তাদের দেশকে দারুল হরব বলা যেতে পারে, কিন্তু যতোদিন পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্র তাদের সাথে চুক্তির সম্পর্ক বজায় রাখবে ততোদিন তাদের খুন ও মাল বৈধ হবে না এবং তাদের জান-মালের উপর হস্তক্ষেপ করা শরীয়তে নিষিদ্ধ। যদি কোনো মুসলমান তাদেরকে খুন করে তাহলে রক্তপণ দিতে হবে। তাদের সম্পদে হস্তক্ষেপ করলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। অতএব তাদের সম্পদ যখন বৈধ নয়, তখন তাদের সাথে অবৈধ চুক্তিতে কারবার কিরূপে করা যাবে ? কারণ তার বৈধতা তো বৈধতার ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

তিন ঃ বিশ্বাসঘাতক—যেসব কাফের চুক্তি সূত্রে আবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও শত্রুতাচরণ করে তাদের সম্পর্কে কুরআন বলে ঃ

وَاِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ اِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَاءٍ ط(الانفال : ٥٨)

"যদি তোমরা কোনো জাতির পক্ষ থেকে বিশ্বাসঘাতকতার আশংকা কর তাহলে সমতার প্রতি লক্ষ্য রেখে তাদের চুক্তি তাদের উপর নিক্ষেপ কর।"[১]–(সূরা আল আনফাল ঃ ৫৮)

ইমাম শ্রেষ্ঠ সারাখসী এ মাসয়ালাটির ধরন বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ

ولكن ينبغى ان ينبذ اليهم على سواء اى على سواء منكم ومنهم فى العلم بذالك فعرفنا انه لايحل قتالهم قبل النبذ وقبل ان يعملوا بذالك -

"(এ অবস্থায় চুক্তি ভংগ করা জায়েয), তবে চুক্তি ভংগ যেন সমতার ভিত্তিতে হয়। অর্থাৎ তোমাদের মতো তারাও যেন জানতে পারে যে, তোমরা চুক্তি বাতিল বলে ঘোষণা করেছ। এ বিধানের অর্থ আমরা এই বুঝি যে, চুক্তি ভংগের ঘোষণা ব্যতীত তাদের সাথে যুদ্ধ করা বৈধ হবে না।"–(মাবসুত খঃ ১০০, পৃঃ ৮৭)

এ আয়াত এবং তার উপরোক্ত ব্যাখ্যা একথাই প্রকাশ করে যে, চুক্তি সম্পাদনকারী দল যদিও বিশ্বাসঘাতকতা করে তথাপি যুদ্ধ ঘোষণার পূর্বে তাদের জান ও মাল বৈধ হবে না।[২]

---

১. অর্থাৎ প্রকাশ্যভাবে চুক্তি ভংগের ঘোষণা তাদেরকে শুনিয়ে দাও, যাতে করে চুক্তি যে আর বলবৎ নেই একথা জানতে তারা এবং তোমরা যেন সমান হয়ে যাও।

২. এ বিধানের শুধুমাত্র সেই অবস্থাই ব্যতিক্রম হবে যখন চুক্তি সম্পাদনকারী জাতি ঘোষণা করে তাদের চুক্তি ভংগ করেছে, প্রকাশ্যে আমাদের অধিকারসমূহের উপর হস্তক্ষেপ করেছে এবং আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেছে। এমতাবস্থায় আমাদের অধিকার থাকবে ঘোষণা ব্যতিরেকে যুদ্ধ করার। নবী করীম (স)-এর একটি পদক্ষেপকে ফকীহগণ প্রমাণ স্বরূপ পেশ করেন। ঘটনাটি এই যে, কুরাইশগণ যখন বনী খুযায়ার ব্যাপারে হুদায়বিয়ার সন্ধি প্রকাশ্যে ভংগ করে, তখন নবী (স) চুক্তি বাতিল ঘোষণার কোনো প্রয়োজন বোধ করলেন না। বরঞ্চ কোনো প্রকার খবর না দিয়েই মক্কা আক্রমণ করেন। কিন্তু এই দৃষ্টান্তের সুযোগ গ্রহণ করতে হলে প্রয়োজন হবে, যেসব অবস্থা ও পরিস্থিতিতে নবী (স) চুক্তি বাতিল ঘোষণা করার প্রয়োজন বোধ করেননি, তা সামনে রাখা এবং যে পদ্ধতি এ অবস্থায় তিনি গ্রহণ করেছিলেন তা অনুসরণ করা।

প্রথমত, কুরাইশদের চুক্তি ভংগ এতই সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য ছিল যে, তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশই ছিল না। স্বয়ং কুরাইশগণ একথা স্বীকার করে যে, তাদের পক্ষ থেকে চুক্তি ভংগ করা হয়েছিল। এজন্য তারা নতুন করে চুক্তি করার জন্যে আবু সুফিয়ানকে মদীনা পাঠায়। এর পরিষ্কার অর্থ এই যে, তাদের মতেও চুক্তি অক্ষুণ্ন ছিল না। তবে চুক্তি ভংগকারী জাতির পক্ষ থেকে চুক্তি ভংগের স্বীকৃতি নিতে হবে এমন কোনো প্রয়োজন নেই। অবশ্যি চুক্তি ভংগ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে।

দ্বিতীয়ত, তাদের পক্ষ থেকে চুক্তি ভংগ হবার পর নবী করীম (স) প্রকাশ্যে, আকারে-ইংগিতে অথবা পরোক্ষভাবে এমন কিছু করেননি যার থেকে এ ইংগিত পাওয়া যায় যে, চুক্তি ভংগ হওয়া সত্ত্বেও তিনি কুরাইশকে একটি চুক্তিবদ্ধ জাতি মনে করেন এবং তাদের সাথে চুক্তির সম্পর্ক এখনো বিদ্যমান আছে। সর্বসম্মত বর্ণনা এই যে, আবু সুফিয়ান মদীনায় এসে যখন নতুন করে চুক্তির আবেদন করে, নবী করীম (স) তখন তা প্রত্যাখ্যান করেন। (পরের পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

চার ঃ অচুক্তিবদ্ধ জাতি–অচুক্তিবদ্ধ ঐসব কাফেরদের বলা হয়, যাদের সাথে কোনো চুক্তি হয়নি। এ এমন এক অবস্থা যাকে সর্বদা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যুদ্ধের অগ্রগামী বলা হয়। কূটনৈতিক সম্পর্কের অবসানের (RUPTURE OF DEPLOMATIC RELATIONS) প্রকৃত অর্থ এই যে, উভয় জাতি এখন পারস্পরিক সম্মান প্রদর্শনের দায়িত্ব থেকে মুক্ত। এমন অবস্থায় যদি এক জাতি অন্য জাতির লোক হত্যা করে, অথবা লুণ্ঠন করে তাহলে রক্তপণ অথবা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। এ অর্থে বলা যায় যে, উভয় জাতির জন্যে পরস্পরের জান ও মাল বৈধ। কিন্তু কোনো সভ্য রাষ্ট্রই দস্তুরমতো যুদ্ধ ঘোষণা না করে কোনো মানব গোষ্ঠীর রক্ত প্রবাহিত করা, ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করা পছন্দ করতে পারে না। এ ব্যাপারে ইসলামী বিধান হচ্ছে এই ঃ

ولو قاتلوهم بغير دعوة كانوا اثمين فى ذالك ولكنهم لايضمنون شيئا مما اتلفوا من الدماء والاموال عندنا ـ(المبسوط ج ـ١ ص ٣٠)

"যদি মুসলমানগণ দাওয়াত১ ব্যতিরেকে যুদ্ধ করে তাহলে গোনাহগার হবে। কিন্তু এতে যে ধন-প্রাণ বিনষ্ট হয় তার জন্যে হানাফী মতে কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।"–(মাবসুত খঃ ১০, পৃঃ ১৩)

ইমাম শাফেয়ী বলেন যে, ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কারণ যতোক্ষণ পর্যন্ত না তারা চরমপত্র প্রত্যাখ্যান করে। ততোক্ষণ তাদের জান-মালের অবৈধতা বলবৎ থাকবে। কিন্তু হানাফীগণ বলেন ঃ

ولكنا نقول العصمة المقومة تكون بالاحراز وذالك لم يوجد فى حقهم .... ولكن شرط الاباحة تقديم الدعوة فبدونه لايثبت ومجرد حرمة القتل لايكفى بوجوب الضمان ـ(ايضا ص ـ ٣٠ ـ٣١)

পূর্বের পৃষ্ঠার পর

তৃতীয়ত, কুরাইশদের বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপ তিনি স্বয়ং নেন এবং প্রকাশ্যে নেন। তাঁর কার্যকলাপে ধোঁকা-প্রতারণার কোনো লেশমাত্র ছিল না যে, তিনি বাইরে চুক্তির কথা বলেন এবং গোপনে যুদ্ধের পন্থা অবলম্বন করেন। এ হচ্ছে এ ব্যাপারে নবীর একটি উৎকৃষ্ট আদর্শ। অতএব কুরআন মজিদের নির্দেশ فانبذ اليهم على سواء -এর থেকে সরে গিয়ে যদি কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে, তাহলে ঠিক সেই অবস্থায় এবং সেইভাবে, যে অবস্থায় এবং যেভাবে নবী করীম (স) পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন।

১. 'দাওয়াত' অর্থ এই যে তাদেরকে এই বলে চরমপত্র (Ultimatum) দিতে হবে যে, তোমরা সন্ধি বা চুক্তি কর, জিযিয়া দাও অথবা মুসলমান হয়ে আমাদের জাতির মধ্যে শামিল হয়ে যাও। এ তিনটি শর্তের মধ্যে যদি একটিও গ্রহণ না কর, তাহলে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ছাড়া উপায় নেই।

"যে রক্ষণ-ব্যবস্থার ভিত্তিতে তাদের জান-মালের মূল্য নির্ধারিত হয়, তাতো দারুল ইসলামের রক্ষণাবেক্ষণের অধীনে হবার কারণে। আর এ জিনিস তাদের সপক্ষে নেই। --------------- বৈধতার জন্যে চরমপত্র দেয়াটা অবশ্যই শর্ত। তা ব্যতিরেকে বৈধতা প্রমাণিত হয় না। কিন্তু হত্যার অবৈধতার জন্যে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, এমন কথা বলা যায় না।"-(ঐ পৃঃ ৩০-৩১)

এর থেকে জানা গেল যে, যেসব হরবী কাফের জিম্মী নয়, যাদের সাথে কোনো চুক্তি সম্পাদিত হয়নি, যাদের আবাস ভূমি আমাদের আবাসভূমি থেকে পৃথক, যাদের রক্ষণ ব্যবস্থা আমাদের আইন স্বীকার করে না, তাদের জান-মাল ততোক্ষণ পর্যন্ত বৈধ হবে না, যতোক্ষণ না চরমপত্র দেয়া হয় এবং তাদের সাথে আমাদের রীতিমত যুদ্ধ শুরু না হয়। নবী করীম (স) এ বিষয়ে হযরত মায়ায ইবনে জাবালকে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তা প্রনিধানযোগ্য ঃ

لاتقتلوا هم حتى تدعوهم فان ابوا فلا تقتلوهم حتى يبداؤكم فان بداؤكم فلا تقاتلوهم حتى يقتموا منكم فتيلا - ثم اروهم ذالك القتيل وقولو لهم هل الى خير من هذا سبيل فلان يهدى اللّه تعالى على يديك خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت -

"তাদের সাথে যুদ্ধ করো না যতোক্ষণ না তাদেরকে চরমপত্র দিয়েছ। অতপর যদি তারা প্রত্যাখ্যান করে তথাপি যুদ্ধ করো না যতোক্ষণ না তারা প্রথমে অগ্রসর হয়। যদি তারা প্রথমে অগ্রসর হয়, তথাপি যুদ্ধ করো না যতোক্ষণ না তারা তোমাদের কাউকে হত্যা করে। অতপর সে নিহত ব্যক্তিকে দেখিয়ে তাদেরকে বলবে এর চেয়ে কোনো ভাল কিছু তোমরা করতে পারতে না ? হে মায়ায এতখানি ধৈর্যের শিক্ষা এজন্য দেয়া হচ্ছে যে, যদি আল্লাহ্ তোমার দ্বারা কাউকে হেদায়েত করেন, তাহলে সমস্ত প্রাচ্য ও প্রতিচ্যের সম্পদ তোমার হস্তগত হওয়া থেকে তা হবে অতি উত্তম।"

পাঁচ ঃ যুদ্ধরত কাফেরগণ—এখন শুধু সেসব কাফেরদের কথা বলা যাক, যারা প্রত্যক্ষ মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত। প্রকৃত হরবী এরাই, এদের আবাস ভূমিকে—বৈদেশিক সম্পর্কের আইনে-দারুল হরব বলে। তাদের জান-মাল বৈধ। তাদেরকে হত্যা করা, গ্রেফতার করা, লুণ্ঠন করা প্রভৃতি শরীয়ত জায়েয বলে ঘোষণা করেছে। কিন্তু তাই বলে সকল হরবীর হরবীত্ব (ENEMY CHARACTER) এক রকম নয়, আর না হরবীর সকল সম্পদ একই বিধানের অধীন। হরবী কাফেরদের নারী, শিশু, রুগ্ন, বৃদ্ধ, পংগু প্রভৃতি

যদিও হরবী, কিন্তু শরীয়ত তাদেরকে বৈধ বলেনি। বরঞ্চ হত্যার বৈধতা শুধুমাত্র যুদ্ধকারী (COMBATANTS) পর্যন্ত সীমিত রেখেছে।

انما يقتل من يقاتل - قال اللّٰه تعالى وقاتلوهم والمفاعلة تكون من الجانبين

"হত্যা শুধু তাকেই করা যাবে, যে আমাদের সাথে যুদ্ধ করছে। কারণ আল্লাহ وقاتلوهم বলেছেন। আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী মুকাবিলা (যুদ্ধ) দু পক্ষ থেকে হয়, এক পক্ষ থেকে নয়।"-(মাবসুত খঃ ১, পৃঃ ৬৪)

এভাবে হরবীদের মালের মধ্যেও শরীয়ত শ্রেণী পার্থক্য করে দিয়েছে এবং প্রত্যেক শ্রেণীর জন্যে পৃথক পৃথক বিধান রয়েছে।

হরবীদের সম্পদের শ্রেণী বিভাগ ও তার বিধান

যেসব ধন-সম্পদ ও বিষয়-সম্পত্তি দুশমন এলাকায় পাওয়া যাবে, তার সবটাই নীতিগতভাবে বৈধ (CONFISCABLE)। কিন্তু শরীয়তে ইসলামী সেগুলোকে দু ভাগে বিভক্ত করেছে—গনিমত ও ফাই।

গনিমত ঃ ঐ সকল অস্থাবর সম্পদ (MOVEABLE PROPERTIES) যা যুদ্ধের সময় ইসলামী সেনাবাহিনী অস্ত্রবলে হস্তগত করে, তাহলো গনিমতের মাল। তার এক-পঞ্চমাংশ রাষ্ট্রের এবং ৫.৪ অংশ ঐসব সৈনিকদের যারা তা হস্তগত করেছে। ইমাম আবু ইউসুফ তাঁর কিতাবুল খেরাজ গ্রন্থে গনিমতের সংজ্ঞা নিম্নরূপ বর্ণনা করেছেন ঃ

فهذا فيما يصيب المسلمون من عساكر اهل الشرك وما اجلبوا به من المتاع والسلاح والكراع -(ص-١٠)

"ঐ সমস্ত সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ যা মুসলমানগণ মুশরেক সৈনিকদের নিকট থেকে হস্তগত করেছে এবং যাকিছু হস্তগত করেছে তাদের সাজ-সরঞ্জাম, অস্ত্রশস্ত্র এবং পশুর মধ্যে (অর্থাৎ অস্থাবর সম্পদ)।"

এর থেকে একথা সুস্পষ্ট হয় যে, গনিমত শুধুমাত্র ঐসব সম্পদকে বুঝাবে যা (১) অস্থাবর (২) যুদ্ধকালীন অবস্থায় (WAR LIKE OPERATIONS) (৩) শত্রু পক্ষের সৈন্য থেকে হস্তগত করা হবে। সৈনিকদের আওতার বাইরে সাধারণ বেসামরিক জনপদ লুণ্ঠন করে বেড়ানো শরীয়তের দৃষ্টিতে দুরস্ত নয়। যদিও দারুল হরবের যাবতীয় সম্পদ বৈধ এবং যদি কেউ বেসামরিক লোকের সম্পদে হস্তক্ষেপ করে, তাহলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না এবং লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি ফেরত দিতে হবে না, তথাপি এ ধরনের লুটতরাজ বাঞ্ছনীয় নয়। মুসলিম বাহিনীর অধিনায়ক তার সেনাবাহিনীকে এ ধরনের কার্যকলাপ থেকে বিরত রাখবে। কারণ নবী করীম (স) ইরশাদ করেছেন ঃ

من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الامام وافسد فى الارض فانه لم يرجع بالكفاف ـ(ابوداود باب فى من يغزو ويلتمس الدنيا)

"যে ব্যক্তি অহংকার বশত নিজের ক্ষমতা ও বীরত্ব দেখাবার জন্যে এবং খ্যাতি লাভের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে, নেতার অবাধ্যতা করে এবং দুনিয়ায় অশান্তি সৃষ্টি করে, তার সওয়াব লাভ করাতো দূরের কথা, সে তার কাজের সমান পারিশ্রমিক নিয়েও (আল্লাহর দরবারে) ফিরতে পারবে না।"

ফাই ঃ দ্বিতীয় প্রকারের ঐসব স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ যা শত্রুর সাথে যুদ্ধ করে হস্তগত করা হয়নি, বরঞ্চ বিজয় লাভের ফলে ইসলামী রাষ্ট্রের অধিকারে আসে, ইসলামী পরিভাষায় তাকে 'ফাই' নামে অবিহিত করা হয়। এ সম্পদ বিজিত শত্রুর জনগণের হোক অথবা শত্রু রাষ্ট্রের সম্পদ হোক। গনিমত থেকে এ সম্পূর্ণ এক পৃথক বস্তু।

وغنيمة العسكر مخالفة لما افاء الله من اهل القرى والحكم فى هذا غير الحكم فى تلك الغنائم ـ

"শত্রুসেনাদের নিকট থেকে কেড়ে নেয়া মালে গনিমত এক বস্তু আর দুশমনের জনপদ থেকে অধিকৃত 'ফাই'-এর মাল আর এক বস্তু। উভয়ের বিধান পৃথক পৃথক।"−(কিতাবুল খেরাজ পৃঃ ৩৮)

সূরা হাশরে এ বিষয়ে ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে যে, এ 'ফাই' কোনো ব্যক্তির মালিকানায় দেয়া হবে না। তা বায়তুলমালে জমা থাকবে এবং জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয়িত হবে।

وَمَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ فَمَآ اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ ـ

"আল্লাহ তাদের নিকট থেকে তাঁর রসূলকে 'ফাই' হিসেবে যা দান করেছেন তা অর্জন করার জন্যে তোমরা উট এবং ঘোড়া পরিচালনা করনি, অর্থাৎ যুদ্ধ করনি।"−(সূরা হাশর ঃ ৬)

এছাড়া 'ফাই' শব্দের আর কোনো অর্থ হতে পারে না। লোকে ইচ্ছামত 'ফাই' লাভ করে নিজের ব্যবহারে লাগিয়েছে, ফেকাহর গ্রন্থে এমন কোনো দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। কোথাও কোথাও فئى للمسلمين (মুসলমানদের জন্যে 'ফাই') فئى يوضع فى بيت المال المسلمين ('ফাই' মুসলমানের বায়তুলমালে রাখা হয়) فئى لجماعة المسلمين (মুসলিম দলের জন্যে 'ফাই') প্রভৃতি কথাগুলো দেখতে পাওয়া যায়। এর থেকে মনে হয় যে, পূর্ববর্তী

শাস্ত্রবিদগণ শুধু ঐসব 'ফাই' সম্পর্কে ওয়াকেফহাল ছিলেন যা মুসলিম দলের মালিকানায় হতো এবং তা থাকতো রাষ্ট্রের আয়ত্তাধীন।

গনীমত ও লুণ্ঠিত দ্রব্যের মধ্যে পার্থক্য

শরীয়তের গনীমত লাভ করার অধিকার শুধু তাদেরকে দেয়া হয়েছে যারা ইসলামী রাষ্ট্রের রক্ষণাধীন এবং যাদেরকে মুসলিমগণের নেতা বা ইমাম প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অনুমতি দিয়েছে। নতুবা যদি মুসলিম জনসাধারণ ব্যক্তিগত ভাবে অথবা দলবদ্ধ হয়ে ইচ্ছামতো লুটতরাজ করা শুরু করে তাহলে তারা লুণ্ঠনকারী বলে গণ্য হবে। তাদের গনীমত, গনীমত না হয়ে হবে লুটের মাল। এজন্য তার মধ্য থেকে এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহর অংশ গ্রহণ করা হবে না। অবশ্য তা তাদের কাছেই থাকতে দেয়া হবে। কারণ দুশমনকে তা ফেরত দেয়া সম্ভব নয়।

فان كان دخول القوم الذين لامنعة لهم بغير اذن الامام على سبيل التلصص فلا خمس فيما اصابوا عندنا ولكن من اصاب منهم شيئا فهوله خاصة۔

"ইমামের সাহায্য ও অনুমতি ব্যতিরেকে এমন কোনো লোক যদি শত্রু এলাকায় দায়িত্বহীনের ন্যায় প্রবেশ করে সম্পদ লুণ্ঠন করে, তাহলে আমাদের মতে তার থেকে এক-পঞ্চমাংশ গ্রহণ করা হবে না। বরঞ্চ তা হবে তাদেরই জন্যে নির্দিষ্ট।"-(আল মাবসুত খঃ ১০, পৃঃ ৭৪)

আল্লামা সারাখসী এর যা কারণ বর্ণনা করেছেন তা নিম্নরূপ ঃ

والمعنى ما بينا ان الغنيمة اسم لمال مصاب باشرف الجهات وهو ان يكون فيه اعلاء كلمة اللّٰه تعالى واعزاز الدين ولهذا جعل الخمس منه لله تعالى وهذا المعنى لايحصل فيما ياخذه الواحد على سبيل التلصص فيتمحض فعله اكتسابا للمال۔(ايضا ص ٧٤)

"আসল কথা হলো এই, যেমন আমরা পূর্বে বলেছি যে, গনীমত এমন মালকে বলা হবে যা অতিমাত্রায় পাক এবং সম্মানিত উপায়ে হস্তগত করা হয়েছে। তা হচ্ছে এই যে, তাতে আল্লাহর বাণী সমুন্নত করা এবং দীনকে মর্যাদায় ভূষিত করা হয়। এজন্য তার মধ্যে এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহর জন্যে নির্ধারিত করা হয়েছে। এ মর্যাদা সে মালের হতে পারে যা চোরের মতো হস্তগত করা হয়েছে, কারণ তার উদ্দেশ্য তো শুধু সম্পদ অর্জন করা।"-(আল মাবসুত, পৃঃ ৭৪)

দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইমাম সারাখসী এমন একটি হাদীস পেশ করেন যার মধ্যে উল্লেখ আছে যে, মুশরেকগণ একটি মুসলিম বালককে ধরে নিয়ে যায়। কিছুদিন পরে সে তাদের হাত থেকে পালিয়ে আসে এবং আসার সময়ে কিছু ছাগল ধরে নিয়ে আসে। নবী করীম (স) এ ছাগলগুলো তার কাছেই রাখতে দিলেন এবং তার থেকে এক-পঞ্চমাংশ গ্রহণ করলেন না। মুগীরাহ বিন শোবা (রা)-এর ঘটনা থেকেও এ বিষয়ের সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি তাঁর সাথীদের মাল লুট করে নিয়ে মদীনায় হাজীর হন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি যখন তাঁর লুটের মাল হুজুর (স)-এর খেদমতে পেশ করলেন তখন তিনি বললেন— "তোমার ইসলাম কবুল করা হলো, কিন্তু মাল কবুল করা হবে না।"

দারুল হরবে কাফেরদের মালিকানার অধিকার

গনীমতের উপরে তৃতীয় বাধা-নিষেধ এই আরোপ করা হয়েছে যে, গনীমত লাভকারীরা যতদিন দারুল হরবে অবস্থান করবে, ততোদিন তারা গনীমতের মাল ব্যবহার করতে পারবেন না। ব্যতিক্রম শুধু পানাহারের সামগ্রী এবং পশুর খাদ্য। অর্থাৎ যুদ্ধ চলাকালীন যত পরিমাণ খাদ্য দ্রব্য ও পশু খাদ্য মুসলিম সেনাবাহিনীর হস্তগত হবে, তার থেকে প্রত্যেক মুজাহিদ তার প্রয়োজন পরিমাণ দ্রব্যাদি গ্রহণ করতে পারে। এতদ্ব্যতীত সমুদয় গনীমতের মাল সেনাধ্যক্ষের নিকট জমা দিতে হবে। গনিমত লাভকারীদেরকে দারুল ইসলাম অভিমুখে রওয়ানা করে না দেয়া পর্যন্ত তাদের মধ্যে গনীমতের মাল বণ্টন করা যাবে না। তার কারণ এই যে, হানাফীদের মতে যতোদিন পযন্ত গনীমতের মাল দারুল হরবে থাকবে ততোদিন তার উপর গনীমত লাভকারীদের মালিকানা বর্তাবে না। ইমাম শাফেয়ী (র)-এর অভিমত তার বিপরীত। তিনি বলেন যে, হরবী যুদ্ধকারীদের মাল বৈধ। এজন্য যখনই মুসলিম মুজাহিদগণ তা অধিকার করবে, তখনই তারা তার মালিক হয়ে পড়বে। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা (র) এবং তার সহকর্মীগণ বলেন যে, এ মালিকানা দুর্বল। গনীমত যদিও আমাদের কিন্তু ভূখণ্ড তো তাদের। যতোক্ষণ পর্যন্ত মাল তাদের ভূখণ্ড থেকে আমাদের ভূখণ্ডে স্থানান্তরিত না হয়েছে, ততোক্ষণ আমরা পুরোপুরি তার মালিক হতে পারি না। অতএব পরিপূর্ণ মালিকানার জন্যে শুধুমাত্র অধিকার লাভই (OCCUPATION) যথেষ্ট নয়। ইমাম সারাখসী এ বিষয়ে হানাফী মতের ব্যাখ্যা নিম্নরূপ করেন ঃ

فاما عندنا الحق يثبت بنفس الاخذ ويتاكد بالاحراز وتيمكن بالقسمة كحق

الشفيع يثبت بالبيع ويتاكد بالطالب ويتم الملك بالاخذ وما دام الحق

ضعيفا لاتجوز القسمة .... بالاخذ يملك الارضى كما يملك الاموال ثم لايتاكد الحق فى الارض التى نزلوا فيها اذا لم يصيروها دار الاسلام ـ

"আমাদের মতে দখল দ্বারা শুধু অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়, দারুল ইসলামে নিয়ে যাবার পর অধিকার সুদৃঢ় হয় এবং গনীমত বণ্টনের পর অধিকার পূর্ণ হয়। এর দৃষ্টান্ত হলো প্রতিবেশীর হকের মতো। বিক্রয়ের মাধ্যমে প্রতিবেশীর হক প্রমাণিত হয়, দাবীর দ্বারা সে হক মজবুত হয় এবং দখলের দ্বারা হক পরিপূর্ণ হয়। অতএব যতোক্ষণ হক বা অধিকার দুর্বল থাকে, বণ্টন জায়েয হয় না। --- যেমন ধারা অস্থাবর সম্পত্তির উপর দখলের দ্বারা মালিকানা প্রমাণিত হয়, তেমনি জমিজমা তথা স্থাবর সম্পত্তির উপর দখল দ্বারা মালিকানা প্রমাণিত হয়। কিন্তু যে ভূখণ্ডে মুসলিম সৈন্য প্রবেশ করে, তার উপর তাদের অধিকার ততোক্ষণ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত যতোক্ষণ না তা দারুল ইসলামে শামিল করে নেয়া হয়।"

–(আল মাবসুত খঃ ১, পৃঃ ৩৩)

এ ব্যাখ্যা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শুধুমাত্র গনীমতই নয়, বরঞ্চ ফাই ব্যবহারের অধিকারও ইসলামী রাষ্ট্রের ততোক্ষণ পর্যন্ত হয় না, যতোক্ষণ দখলকৃত অঞ্চলকে (OCCUPIED TERRITORY) দারুল ইসলামে পরিণত করা না হয়েছে। অথবা আধুনিক পরিভাষায় দখলকৃত এলাকাকে রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত (ANNEXATION) করার যথারীতি ঘোষণা করা না হয়েছে। নবী করীম (স)-এর কার্যপদ্ধতি এর সমর্থন করে। মকহুল বলেন ঃ

ماقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم الا فى دار الاسلام ـ

"নবী করীম (স) গনীমতের মাল দারুল ইসলাম ব্যতীত অন্য কোথাও বণ্টন করেননি।"

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক এবং কালবী বলেন যে, নবী করীম (স) হোনায়েনের গনীমত প্রত্যাবর্তন কালে জিয়িররানা নামক স্থানে বণ্টন করে ছিলেন। এ স্থানটি ছিল দারুল ইসলাম সীমান্তে অবস্থিত। পথে বেদুইন আরবগণ গনীমত বণ্টনের জন্যে এতো পীড়াপীড়ি করে যে, নবী করীম (স) অত্যন্ত বিব্রত হয়ে পড়েন যে, তার গায়ের চাদর ছিড়ে যায়। কিন্তু এতটা হৈচৈ সত্ত্বেও দারুল ইসলাম সীমান্তে না পৌঁছা পর্যন্ত তিনি মালে গনীমতের একটি দানাও বণ্টন করেননি।

আল্লাহর নবীর এ কার্যপ্রণালী এবং ইসলামী শাস্ত্রবিদগণের ব্যাখ্যা চিন্তা-ভাবনা করে দেখুন, এর কারণ এ ছাড়া আর কিছুই মনে হবে না যে, ইসলামী

আইন যেভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের অধিকৃত অঞ্চলের উপরে মুসলমানদের মালিকানার অধিকার স্বীকার করে, তেমনিভাবে অধিকৃত অনৈসলামী অঞ্চলের উপর হারবীদের পর্যন্ত মালিকানা অধিকার স্বীকার করে। যদিও যুদ্ধ তাদের সম্পদ আমাদের জন্যে বৈধ করে দেয়, তথাপি এ বৈধতার সুযোগ গ্রহণ করার জন্যে শরীয়ত সাধারণ ও শর্তহীন কোনো অনুমতি দেয় না। বরঞ্চ তাদের মালিকানা থেকে আমাদের মালিকানায় হস্তান্তরের জন্যে সম্পদ স্থানান্তরের কিছু আইনানুগ পন্থা নির্ধারিত করে দিয়েছে। তা এমন যে তার মধ্যে কাফেরদের ও আমাদের মধ্যে সমতার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। হানাফী আইন বলে যে, আমরা তাদের সম্পদের মালিক তখনই হতে পারি যখন রীতিমতো যুদ্ধের সাহায্যে তা হস্তগত করে আমাদের ভূখণ্ডে (ইসলামী রাষ্ট্রে) নিয়ে আসবো। এভাবে যুদ্ধে তারা আমাদের সম্পদ হস্তগত করে, তাদের ভূখণ্ডে নিয়ে গেলে, তারাও এসবের মালিক হয়ে যাবে। তাদের ভূখণ্ডে তাদের মালিকানার অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা আমাদের কর্তব্য।

এ ব্যাপারে ফকীহগণের অধিকতর ব্যাখ্যা প্রনিধানযোগ্য ঃ

نفس الاخذ سبب لملك المال اذا تم بالاحراز وبيننا وبينهم مساوات فى اسباب اصابة الدنيا بل حظهم اوفر من حظنا لان الدنيا لهم ولانه لامقصود لهم فى هذه الاخذ سوى اكتساب المال ونحن لانقصد بالاخذ اكتساب المال۔

"সম্পদ হস্তগত করার পর যখন তা স্বীয় ভূখণ্ডে পৌঁছিয়ে দেয়া হলো তখন সে সম্পদের উপর পূর্ণ মালিকানার কারণ হয়ে গেলে। ইহলৌকিক সম্পদ লাভের ব্যাপারে আমাদের ও কাফেরদের পূর্ণ সমতা বিদ্যমান। বরঞ্চ ইহলৌকিক ব্যাপারে আমাদের অপেক্ষা তাদের অংশ কিছুটা বেশী। কারণ তাদের জন্যে তো শুধু দুনিয়া এবং সম্পদ অর্জন করা ব্যতিত তাদের জীবনের আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। পক্ষান্তরে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য সম্পদ অর্জন নয়।"–(আল মাবসুত খঃ ১, পৃষ্ঠা ঃ ৫৩)

واذا دخل المسلم دار الحرب بامان وله فى ايديهم جارية ماسورة كرهت له غصبها ووطيها لانهم ملكوها عليه والتحقت بسائر املاكهم۔

"কোনো মুসলমান নিরাপত্তাসহ দারুল হরবে প্রবেশ করলো এবং সেখানে সে তার দাসীকে হাতের নাগালে পেলো, এমতাবস্থায় তার দাসীকে হস্তগত এবং তার সাথে সহবাস করা তার জায়েয হবে না। কারণ কাফেরগণ এখন তার মালিক এবং সে তাদের মালিকানার অধীন।"–(ঐ পৃঃ ৬৫)

ولو خرج الينا بامان ومعه ذالك المال فانه لايتعرض له فيه ـ(ايضا ص ٦٣

"যদি কোনো হরবী কাফের নিরাপত্তাসহ আমাদের রাষ্ট্রে প্রবেশ করে এবং তার কাছে যদি আমাদের নিকট থেকে লুণ্ঠিত মাল পাওয়া যায়, তাহলে তা আমরা তার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারি না।"-(ঐ পৃঃ ৬৩)

فان غلب العدو على مال المسلمين فاحرزوه وهناك مسلم تاجر مستامن حل له ان يشتريه منهم فياكل الطعام من ذالك ويطاء الجارية لانهم ملكوها بالاحراز فالتحقت بسائر املاكهم وهذا بخلاف مالو دخل اليهم تاجر بامان فسرق منهم جارية واخرجها لم يحل المسلم ان يشتريها منه لانه احرزها على سبيل الغدر وهو مامور بردها عليهم فيما بينه وبين ربه وان كان لايجبره الامام على ذالك ـ(ايضا ص ٦١)

"যদি দুশমন মুসলমানদের মাল হস্তগত করার পর তা আপন আবাসভূমিতে নিয়ে যায় আর সেখানে যদি নিরাপত্তা প্রাপ্ত কোনো ব্যবসায়ী মুসলমান থাকে তাহলে সে মাল খরিদ করা ও ব্যবহার করা তার হালাল হবে। সে দুশমনের নিকট থেকে খরিদ করা দাসীর সাথে সহবাসও করতে পারে, কারণ আপন ভূখণ্ডে নিয়ে যাবার পর সে ওসব মালের মালিক হয়ে গেছে এবং সবকিছুই এখন তার মালিকানাধীন। পক্ষান্তরে যদি কোনো ব্যবসায়ী নিরাপত্তাসহ দারুল হরবে যায় এবং তাদের অধিকার থেকে কোনো দাসীকে চুরি করে নিয়ে দারুল ইসলামে আসে, তাহলে সে দাসী খরিদ করা মুসলমানের জন্যে হালাল হবে না। কেননা সে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাকে এনেছে। আল্লাহ্ ও তার মধ্যে যে সম্পর্ক তার জন্যে তাকে সে দাসী ফেরত দিতে হবে। অবশ্যি ইমাম তাকে ফেরত দিতে বাধ্য করবে না।"-(ঐ পৃঃ ৬১)

এ কর্মপদ্ধতি ঠিক হাদীসেরই অনুরূপ। মক্কা বিজয়ের দিনে হযরত আলী (রা) নবী করীম (স)-কে অনুরোধ করে বললেন, হিজরতের আগে আপনি যে বাড়ীতে ছিলেন, সেখানে গিয়ে উঠে পড়ুন না কেন ?" নবী করীম (স) বললেন, هل ترك لنا عقيل من ربع "আকীল কি আমাদের জন্যে কিছু ছেড়ে দিয়েছে ?"

তার অর্থ এই যে, নবী করীম (স) যখন তা ছেড়ে দিয়ে চলে যান, তখন আকীল ইবনে আবি তালেব তা দখল করে। তখন তাঁর মালিকানা চলে যায় এবং আকীলের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন যদিও তিনি মক্কা জয়

করেছেন, তথাপি তিনি তাঁর পূর্ববর্তী মালিকানার ভিত্তিতে সে বাড়ী নিজের বলে ঘোষণা করতে অস্বীকার করেন।

পূর্ববর্তী আলোচনার সংক্ষিপ্তসার

এসব আইনগত ব্যাখ্যা সামনে রইলো। এসবের উপর মনোনিবেশ করলে নিম্ন সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায় ঃ

এক ঃ দারুল হরব যদি সাধারণভাবে দারুল কুফর (FOREIGN TERRITORY) অর্থে গ্রহণ করা হয়, তাহলে তার সম্পদ বৈধ (مباح) নয়, বরঞ্চ 'অরক্ষিত'। রক্ষণহীনতার ফল শুধু এতটুকু যে, ইসলামী রাষ্ট্র সে ভূখণ্ডে কোনো জান-মালের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে দায়ী নয়। সেখানে যদি কোনো মুসলমান মুসলমান অথবা অমুসলিমের জান-মালের ক্ষতি করে, কিংবা তার মালিকানা থেকে কোনো কিছু অবৈধ উপায়ে হস্তগত করে তাহলে সেটা হবে তার এবং আল্লাহর মধ্যকার ব্যাপার। ইসলামী রাষ্ট্র এতে কোনো হস্তক্ষেপ করবে না।

দুই ঃ দারুল হরব যদি এমন কাফেরদের আবাসভূমি বুঝায় যাদের জান ও মাল বৈধ, তাহলে এ অর্থে প্রত্যেক দারুল কুফর দারুল হরব নয়। বরঞ্চ শুধু মাত্র সেই অঞ্চলই দারুল হরব যার সাথে দারুল ইসলামের প্রত্যক্ষ যুদ্ধ চলছে। এ বিশেষ ধরনের দারুল কুফর ব্যতীত অন্য দারুল কুফরের অধিবাসীর জান-মাল বৈধ নয় যদিও তারা জিম্মী না হয় এবং তাদের জান ও মাল অরক্ষিত হয়।

তিন ঃ যে দেশের সাথে মুসলানদের কার্যত যুদ্ধ চলছে, তাদের জান ও মাল সাধারণভাবে এমন বৈধ নয় যে, প্রত্যেকে সেখানে লুটতরাজ করার ও কাফেরদের সম্পদ দখল করার স্বাধীনতা রাখে। বরঞ্চ তার জন্যে কিছু শর্ত ও বাধা-নিষেধ আছে ঃ

(ক) মুসলমানদের নেতা রীতিমতো যুদ্ধ ঘোষণার মাধ্যমে সে দেশকে দারুল হরব বলে অভিহিত করবে এবং

(খ) সেখানে যারা যুদ্ধ করবে তাদের জন্যে ইমামের অনুমতি ও সাহায্য থাকতে হবে।

চার ঃ গনীমত সেসব স্থাবর সম্পদকে বলা হয়, যা শুধু সেনাদের সাথে যুদ্ধ করে হস্তগত করা হয়। অন্য কথায়, যা সম্মানজনক পন্থায় অর্জন করা হয় এবং যাতে দীনের মর্যাদা বৃদ্ধি হয়। এ মালের এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহর। অর্থাৎ আল্লাহর পথে ব্যয়িত হবে।

পাঁচ ঃ 'ফাই' ঐসব স্থাবর অবস্থার সম্পদকে বলে যা বিজয় লাভের ফলে ইসলামী রাষ্ট্রের দখলে আসে। খেরাজ, সন্ধিসূত্রে লব্ধ মাল প্রভৃতিও ফাই-এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এর সবটাই ইসলামী রাষ্ট্রের মালিকানা ভুক্ত সম্পদ এবং কোনো ব্যক্তি বিশেষের মালিকানা অধিকার এতে থাকবে না।

ছয় ঃ 'ফাই' এবং গনীমতের মালের উপর বিজয়ীদের পূর্ণ মালিকানা অধিকার তখনই প্রতিষ্ঠিত হয়, যখন তা দারুল হরব থেকে দারুল ইসলামে স্থানান্তরিত করা হয়। অথবা দারুল হরবকে দারুল ইসলামে পরিণত করা হয়। এর পূর্বে সেসব মাল ব্যবহার করা ও তা কাজে লাগানো মাকরূহ।

সাত ঃ ইসলামী আইন—হরবী কাফেরদের মালের উপর তাদের মালিকানা অধিকার স্বীকার করে। তাদের মালিকানা থেকে মুসলমানদের মালিকানায় বৈধ উপায়ে হস্তান্তর সেভাবে হতে পারে, যেভাবে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল হালাল করেছেন। অর্থাৎ ক্রয়, সন্ধি অথবা যুদ্ধের মাধ্যমে।

আবাসভূমির বিভিন্নতার কারণে মুসলমানদের শ্রেণীর বিভাগ

এসব বিষয়ের সঠিক তত্ত্ব জানার পর এখন একটি দৃষ্টিভংগীও লক্ষ্য করুন যে, ইসলামী আইন অনুযায়ী আবাস ভূমির বিভিন্নতার দিক দিয়ে স্বয়ং মুসলমানদের মধ্যে কি কি বিভিন্নতা দেখা যায়। এ ব্যাপারে সমগ্র আইনের ভিত্তি নিম্ন আয়াত ও হাদীসগুলোর উপর প্রতিষ্ঠিত ঃ

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يُهَاجِرُوْا مَا لَكُمْ مِّنْ وَّلَايَتِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا ج -

"যারা ঈমান এনেছে বটে, কিন্তু হিজরত করে দারুল ইসলামে আসেনি, তাদের সাথে তোমাদের বন্ধুত্বের কোনো সম্পর্ক নেই, যতোক্ষণ না দারুল কুফর থেকে দারুল ইসলামে হিজরত করে।"–(সূরা আনফাল ঃ ৭২)

فَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ اَوْلِيَاءَ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط(النساء : ٨٩)

"তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না, যতোক্ষণ না তারা আল্লাহর পথে হিজরত করে।"–(সূরা আন নিসা ঃ ৮৯)

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰى اَهْلِهٖ اِلَّا اَنْ يَّصَّدَّقُوْا ط فَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ط وَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰى اَهْلِهٖ وَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ

"(১) যে কেউ কোনো মুসলমানকে ভুলবশত হত্যা করে, তাকে একটি মুসলমান ক্রীতদাস মুক্ত করে দিতে হবে এবং নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশগণকে রক্তপণ দিতে হবে। তবে ওয়ারিশগণ যদি সদকা হিসেবে রক্তপণ ছেড়ে দেয়, তাহলে তা দিতে হবে না। (২) এবং যদি নিহত ব্যক্তি এমন দলের হয় যাদের সাথে তোমাদের শত্রুতা আছে এবং যদি সে মুসলমান হয়, তাহলে শুধু একটি মুসলমান ক্রীতদাস মুক্ত করে দিতে হবে। (৩) এবং যদি সে এমন দলের হয়, যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি হয়েছে, তাহলে তার ওয়ারিশদেরকে রক্তপণ দিতে হবে এবং একজন মুসলমান ক্রীতদাস মুক্ত করে দিতে হবে।"–(সূরা আন নিসা ঃ ৯২)

قال النبى صلى الله عليه وسلم انا برئ من كل مسلم اقام بين اظهر المشركين ـ وعن النبى صلى الله عليه وسلم ايضا من اقام مع المشركين فقد برئت منه الذمة او قال لاذمة له ـ

"নবী করীম (স) বলেন, আমি[১] ঐ মুসলমানের দায়িত্ব থেকে মুক্ত, যে মুশরেকদের মধ্যে থাকে। তিনি অন্যভাবেও বলেন, যে মুশরেকদের মধ্যে থাকে তার থেকে আমি দায়িত্বমুক্ত। অথবা তার জন্যে কোনো দায়িত্ব নেই।"

আবু দাউদের কিতাবুল জিহাদ অধ্যায়ে আছে, যখন নবী করীম (স) কাউকে সেনাধক্ষ্য করে পাঠাতেন, তখন তিনি তাকে অন্যান্য উপদেশের সাথে এ উপদেশও দিতেন ঃ

ادعهم الى الاسلام فان اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم الى الرحول من دارهم الى دار المهاجرين واعلمهم انهم ان فعلوا ذالك ان لهم ماللمهاجرين وان عليهم ما على المهاجرين فان ابوا واختاروا دارهم فاعلمهم انهم يكونون كاعراب المسلمين يجرى عليهم حكم الله الذى كان يجرى على المؤمنين ولا يكون لهم فى الفئ والغنيمة نصيب الا ان يجاهدوا مع المسلمين ـ(باب فى دعاء المشركين)

"তাদেরকে প্রথমে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেবে। যদি দাওয়াত গ্রহণ করে তাহলে তাদের উপর হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকবে। তারপর তাদেরকে আপন আবাসভূমি ত্যাগ করে দারুল ইসলামে আসতে বলবে। একথাও বলবে যে, দারুল ইসলামে এলে তাদের সেসব অধিকার মিলবে

১. 'আমি' শব্দটি তিনি রসূল হিসেবে বলেননি, বলেছেন ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে। তার অর্থ হলো এই যে, এ ধরনের কোনো মুসলমানের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্রের নয়।

যা মুহাজেরগণ পেয়ে থাকে। আর যেসব দায়িত্ব মুহাজেরগণের উপরে অর্পিত হয় তা তাদের উপরেও হবে। যদি তারা অস্বীকার করে এবং নিজেদের আবাস ভূমিতেই থাকতে চায়, তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দিবে যে তাদের অবস্থা মুসলিম বেদুইনদের মতোই হবে। মুসলিমদের মতো তাদের উপর আল্লাহর বিধি নিষেধ জারী হবে। কিন্তু ফাই এবং গনিমতের কোনো অংশ তারা পাবে না। তবে পাবে যদি মুসলমানদের সাথে মিলে জিহাদ করে।"

এসব আয়াত ও হাদীস থেকে হানাফী ফকীহগণ যে বিধান বের করেছে তা সংক্ষেপে বর্ণনা করছি।

এক ঃ দারুল ইসলামের মুসলমান

যে সকল জীবন ও ধন-সম্পদ দারুল ইসলামের গণ্ডির ভিতর হবে, ইসলামী রাষ্ট্রের[১] দায়িত্ব শুধু তার রক্ষণাবেক্ষণ করা। যেসব মুসলমান দারুল ইসলামের নাগরিক হবে, ইসলামের যাবতীয় আইন দীনের দিক দিয়েই নয় বরঞ্চ পার্থিব দিক দিয়েও তাদের উপর প্রযোজ্য হবে এবং তারাই পুরোপুরি বিধানগুলো মেনে চলবে। এ নীতি ইসলামী আইনের মৌল ও প্রধান নীতিগুলোর মধ্যে একটি। এর থেকে অনেক শাখা-প্রশাখা বা ধারা-উপধারা বিস্তার লাভ করেছে।

এক ঃ এ নীতির ভিত্তিতেই এ বিধান যে জান-মাল-ইজ্জতের রক্ষণ-ব্যবস্থা শুধু সেসব মুসলমান ভোগ করবে, যারা দারুল ইসলামের রক্ষণাধীন।

---

১. প্রাথমিক যুগে যখন সকল মুসলিম অধিকৃত এলাকা একই রাষ্ট্রের অধীন ছিল, তখন দারুল ইসলাম বলতে মুসলিম খলিফার রাষ্ট্রীয় সীমাকেই বুঝাতো। কিন্তু ইসলামী আইনের ভিত্তি যেসব মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত তা এমন যে, যখন দারুল ইসলাম খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে বিভিন্ন মুসলিম রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়লো, তখন আপনা-আপনি রাষ্ট্র মণ্ডলের (Commonwealth) ধারণা সৃষ্টি হলো। এ ধারণা অনুযায়ী প্রতিটি মুসলিম অধিকৃত এলাকা, তা সে দুনিয়ার যে কোনো প্রান্তেই হোক আর যে কোনো শাসকের অধীন হোক, সর্বাবস্থায় দারুল ইসলামের অংগ, অংশ। আর প্রত্যেকে মুসলমান, সে যেখানেই জন্মগ্রহণ করুক, দারুল ইসলামে প্রবেশ করার সাথে সাথে তার নাগরিক হয়ে পড়ে। অতপর সে সকল নাগরিক অধিকার (Rights of Citizenship) লাভ করে, এ শর্তে যে সে কোনো দারুল কুফরের সাথে নাগরিকত্বের সম্পর্ক বজায় না রাখে। বর্তমান ইসলামী রাষ্ট্রসমূহ এ নীতি মেনে চলুক আর নাই চলুক, ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে কোনো মুসলমান কোনো ইসলামী রাষ্ট্রে বিদেশী (Foreigner) নয়। একজন আফগানের অধিকার ও দায়িত্ব তুরস্কে এবং ইরানে তাই হবে, যা স্বয়ং আফগানিস্তানে হয়ে থাকে এবং একজন মুসলমানের এ প্রয়োজন হওয়া উচিত নয় যে, যদি সে একটি ইসলামী রাষ্ট্র থেকে অন্য কোনো ইসলামী রাষ্ট্রে যায়, তাহলে সেখানে নাগরিকত্ব লাভের জন্য তাকে কৃত্রিম পন্থা অবলম্বন করতে হবে। প্রত্যেক মুসলমান দারুল ইসলামের জন্মগত নাগরিক।

তাদের ছাড়া অন্যান্য মুসলমানদের রক্ষণ-ব্যবস্থা শুধুমাত্র দীনি ব্যবস্থা। প্রতিষ্ঠিত রক্ষণ-ব্যবস্থা নয়, যার ভিত্তিতে শরীয়তের বিচার অপরিহার্য হয়। ইমাম সারখসী বলেন ঃ

العصمة المقومة تكون بالاحراز -(المبسوط ج ١٠ ص ٣٠)

"প্রতিষ্ঠিত রক্ষণ-ব্যবস্থা শাসন কার্যের মাধ্যমে হয়।"

–(আল মাবসূত খঃ ১০, পৃঃ ৩০)

والعصمة بالاحراز والاحراز بالدار لابالدين -(ايضا ص ٥٣)

"রক্ষণ-ব্যবস্থা শাসন-ব্যবস্থার দ্বারা হয়। আর শাসন ব্যবস্থা রাষ্ট্র দ্বারা হয়, দ্বীনের দ্বারা নয়।"–(ঐ পৃঃ ৫৩)

দুই ঃ এ নীতি অনুযায়ী এ বিধানও নির্ণীত হয় যে, ইসলামী আইন যেসব কাজ হারাম করেছে তার থেকে দীনের দিক দিয়ে ও বিচার-শাসনের দিক দিয়ে দারুল ইসলামের মুসলমানদেরকে বিরত রাখতে হবে। কিন্তু যেসব মুসলমান দারুল ইসলামে নেই, তাদের বিষয়টি তাদের এবং আল্লাহর মধ্যে। অন্তরে দীনের প্রতি মর্যাদাবোধ থাকে তো নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকবে, নতুবা যা খুশী করবে। কারণ তাদের উপর বিধান কার্যকর করার ক্ষমতা ইসলামের নেই।

তিন ঃ এ নীতি থেকে এ মাসয়ালাও বের হয় যে, যেসব জান-মাল দারুল ইসলামের রক্ষণাধীন তা সব রক্ষিত, অতএব শরীয়তি বিধান ব্যতীত অন্য কোনো উপায়ে তাদের সাথে শত্রুতা করার অনুমতি দেয়া যাবে না। এ ব্যাপারে মুসলিম অমুসলিমদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। প্রত্যেক ব্যক্তিকে শত্রুতা করা থেকে বিরত রাখা হবে যে ইসলামী বিধানের অনুসারী হয়েছে, সে মুসলিমের সাথে শত্রুতা করুক বা অমুসলিমদের সাথে। প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির জান ও মালের রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে, যে দারুল ইসলামের রক্ষণাধীন তা সে মুসলিম হোক বা অমুসলিম হোক।

দারুল ইসলামে কোনো মুসলমান মুসলমান থেকে, মুসলমান জিম্মী থেকে, জিম্মী মুসলমান থেকে, জিম্মী জিম্মী থেকে, নিরাপত্তাপ্রাপ্ত হরবী অন্য নিরাপত্তাপ্রাপ্ত থেকে সুদ অথবা কোনো অবৈধ চুক্তিতে কারবার করতে পারবে না ; কারণ সকলের সম্পদ লোকের জন্যে রক্ষিত। একমাত্র ইসলামী আইনের বৈধ উপায়ে সে সম্পদ লাভ করা যায়।

فان دخل تجار اهل الحرب دار الاسلام بامان فاشترى احدهم من صاحبه درهما بدرهمين لم اجز ذالك الاما اجيزه بين اهل الاسلام وكذالك اهل

الذمة اذا فعلوا ذالك لان مال كل واحد منهم معصوم متقوم -

(المبسوط ج ١٤ ص ٥٨)

"হরবী ব্যবসায়ীগণ যদি নিরাপত্তাসহ দারুল ইসলামে প্রবেশ করে এবং সেখানে তাদের কেউ দুই দিরহাম দিয়ে এক দিরহাম খরিদ করে। তাহলে তার অনুমতি দেয়া হবে না। যা মুসলমানদের মধ্যে বৈধ, শুধু এমন কারবারের অনুমতিই দেয়া হবে। জিম্মীর ব্যাপারেও তাই। কারণ তাদের প্রত্যেকের সম্পদ প্রতিষ্ঠিত ও রক্ষিত।"–(আল মাবসুত খঃ ১৪, পৃঃ ৫৮)

এভাবে যদি কোনো কাফের দারুল কুফর থেকে দারুল ইসলামে আসে, অথবা দারুল হরব থেকে কোনো হরবী নিরাপত্তাসহ ইসলামী রাষ্ট্রে প্রবেশ করে। তাহলে তার নিকট থেকে সুদ গ্রহণ করা অথবা কোনো অবৈধ চুক্তিতে কারবার করা জায়েয হবে না। কারণ ইসলামী রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত নিরাপত্তা তার জান ও মাল রক্ষিত করে দিয়েছে এবং ইসলামী রাষ্ট্রের প্রদত্ত নিরাপত্তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা সকল নাগরিকের কর্তব্য। কিন্তু যদি কোনো হরবী নিরাপত্তা ব্যতিরেকে দারুল ইসলামে আসে তাহলে তাকে আটক করা, তার সম্পদ লুট করা, তাকে হত্যা করা এবং অবৈধ চুক্তিতে তার সাথে কারবার করা সবই ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে জায়েয। কারণ তার রক্ত ও সম্পদ বৈধ। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ তার সাথে কোনো অবৈধ চুক্তিতে কারবার করা জায়েয মনে করেন না। বিস্তারিত আলোচনা সামনে করা হবে।

দুই ঃ দারুল কুফর ও দারুল হরবে নিরাপত্তা প্রাপ্ত মুসলমান—

দারুল ইসলামের কোনো নাগরিক যদি নিরাপত্তাসহ সাময়িকভাবে দারুল কুফর অথবা দারুল হরবে যায়, তাকে ইসলামী পরিভাষায় বলে 'মুস্তামান' (নিরাপত্তাপ্রাপ্ত)। এ ব্যক্তি যদিও ইসলামী রাষ্ট্রের আওতার (JURISDICTION) বাইরে যাবার কারণে আমাদের রাষ্ট্রের আইনের ধরা-ছোয়ার বাইরে থাকে। কিন্তু তথাপি কতকটা ইসলামী রাষ্ট্রের রক্ষণাধীন সে থাকে এবং ইসলামী আইন পালনের দায়িত্ব থেকে পুরোপুরি মুক্ত হয় না। হেদায়া গ্রন্থে বলা হয়েছেঃ

العصمة الثابتة بالاحراز بدار الاسلام لاتبطل بعارض الدخول بالامان

(كتاب السير باب مستامن)-

"দারুল ইসলামের যে রক্ষণ-ব্যবস্থা বা রক্ষাকবচ, তা সাময়িকভাবে নিরাপত্তাসহ অন্যত্র গমনে বাতিল হয় না।"

–(কিতাবুস সিয়ার মুস্তামান অধ্যায়)।

এ নীতি অনুযায়ী নিম্নলিখিত শরীয়তের মাসয়ালা বের হয় ঃ

এক ঃ যে দারুল কুফরের সাথে দারুল ইসলামের চুক্তি সম্পাদিত হয়, সেখানে নিরাপত্তাপ্রাপ্ত মুসলমানের জন্যে অবৈধ চুক্তিতে কারবার করা জায়েয নয়। কারণ সেখানকার কাফেরদের জীবন ও ধন-সম্পদ বৈধ নয়। আর এ সবের বৈধতার কারণেই যখন অবৈধ চুক্তি বৈধ হয় তখন এ বৈধতা না থাকার কারণে আপনা আপনি সেটার বৈধতাও নষ্ট হয়ে যায়।

দুই ঃ যদি কোনো মুসলমান এ ধরনের দারুল কুফরে অবৈধ চুক্তিতে কারবার করে, বিশ্বাসঘাতকতা করে অথবা লুটপাট ও চুরি করে কোনো কিছু নিয়ে আসে, তাহলে ইসলামী রাষ্ট্র তার উপর কোনো মামলা দায়ের করবে না কিংবা তাকে ক্ষতিপূরণও[১] দিতে হবে না। অবশ্যি দীনের দিক দিয়ে তাকে ঐসব শরীয়ত বিরুদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেয়া হবে।

তিন ঃ দারুল হরবে নিরাপত্তাসহ যে ব্যক্তি প্রবেশ করে তার জন্যে অবৈধ চুক্তি বাদে অন্যান্য সমুদয় ব্যাপারে হানাফী ফেকাহর এসব বিধানই রয়েছে।

لو دخل اليهم تاجر بامان فسرق منهم جارية واخرجها ..... فهو مامور بردها عليهم فيما بينه وبين الله وان كان لايجبره الامام على ذالك (المبسوط ج ١ ص ٦١)-

> কোনো ব্যবসায়ী যদি নিরাপত্তাসহ দারুল হরবে যায় এবং সেখান থেকে কোনো দাসী চুরি করে নিয়ে আসে ---- তাহলে তার এবং আল্লাহর মধ্যস্থিত সম্পর্কের ভিত্তিতে সে উক্ত দাসীকে ফেরত দেবার জন্যে আদিষ্ট, কিন্তু ইমাম তাকে এরূপ করতে বাধ্য করবে না।-(আল মাবসুত ১ ঃ ৬১)

واذا دخل المسلم دار الحرب بامان فداينهم او داينوه او غصبهم او غصبوه لم يحكم فيما بينهم بذالك .... وانما ضمن المستامن لهم ان لايخونهم وانما غدر بامان نفسه دون الامام فيفتى بالردو لايجبر عليه فى الحكم -(ايضا ص ٩٥)

> "যদি কোনো মুসলমান নিরাপত্তাসহ দারুল হরবে প্রবেশ করে, তাদের কাছে ঋণ গ্রহণ করে অথবা তারা তার কাছে ঋণ গ্রহণ করে কিংবা সে তাদের মাল লুট করে বা তারাই তার মাল লুট করে, তাহলে দারুল ইস-লামে এর কোনো মীমাংসা করা যাবে না ------- নিরাপত্তাপ্রাপ্ত ব্যক্তি

১. এ শুধু সে অবস্থায় হতে পারে যদি চুক্তিতে এ ধরনের কোনো শর্ত না থাকে। অর্থাৎ ইসলামী আইনের অধীনে মাত্র কার্যের ভিত্তিতে সে মুসলমানকে অভিযুক্ত করা যাবে না। শুধু সন্ধির শর্ত অনুসারেই তাকে অভিযুক্ত করা যেতে পারে অথবা ঐ সবের ভিত্তিতে—যে সম্বন্ধে পূর্বে ইংগিত করা হয়েছে।

স্বয়ং তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা না করার দায়িত্ব নিয়েছে। এখন সে যে বিশ্বাসঘাতকতা করলো তা ইমামের চুক্তি অনুয়ায়ী করেনি, সে নিজস্ব চুক্তিতে বিশ্বাস ভংগ করেছে। সে জন্যে তাকে ফেরত দেবার কথা বলা হবে—কিন্তু বাধ্য করা হবে না।-(ঐ পৃঃ ৯৫)

(ইমাম আবু ইউসুফ এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেন। কারণ তিনি মুসলমানকে সকল ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান পালনে বাধ্য বলে মনে করেন) যদি কোনো নিরাপত্তাপ্রাপ্ত মুসলমান দারুল হরবে কাউকে হত্যা করে, অথবা কারো মালের ক্ষতি করে, তাহলে দারুল ইসলামে তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না। অবশ্যি দীনের দিক দিয়ে তার এরূপ করা নাজায়েয।

واكره للمسلم المستامن اليهم فى دينه ان يغدربهم لان الغدر حرام -

"দীনের দিকে একজন নিরাপত্তাপ্রাপ্ত মুসলিমের বিশ্বাসভংগ করা অবাঞ্ছিত। কারণ বিশ্বাসভংগ করা হারাম।"-(ঐ পৃঃ ৯৬)

কোনো নিরাপত্তাপ্রাপ্ত মুসলমান দারুল হরব থেকে কোনো কিছু অন্যায়ভাবে অথবা চুরি করে নিয়ে এলে তা মুসলমানদের জন্যে খরিদ করা মকরূহ। কিন্তু খরিদ করে ফেললে, সে খরিদ বাতিল ঘোষণা করা হবে না। কারণ আইনত ক্রয়-বিক্রয়ে কোনো দোষ নেই। কিন্তু যেহেতু মূলত এ মাল অন্যায়ভাবে অর্জিত, সে জন্যে দীনের খাতিরে তা ফেরত দিতে সে আদিষ্ট।

চার ঃ নিরাপত্তাপ্রাপ্ত মুসলমান দারুল হরবে হরবীদের কাছে সুদ নিতে পারে, জুয়া খেলতে পারে, মদ শূকরের মাংস, মৃত জীব তাদের কাছে বিক্রি করতে পারে এবং হরবীদের সম্মতিতে সকল উপায় তাদের মাল গ্রহণ করতে পারে। এ হলো ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত। ইমাম আবু ইউসুফ (র) এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেন। ইমাম সারাখসী প্রথমোক্ত ইমামদ্বয়ের যুক্তির যে উদ্ধৃতি দেন তা প্রণিধানযোগ্য।

নিরাপত্তাপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্যে দারুল হরবে সুদের উপর নগদ অথবা ধারে কারবার করা, মদ, শূকরের মাংস ও মৃত জীব তাদের কাছে বিক্রি করা ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে জায়েয। কিন্তু আবু ইউসুফ (র) নাজায়েয বলেছেন। তাঁর যুক্তি এই যে, মুসলমান যেখানেই থাক, ইসলামের বিধান মেনে চলতে বাধ্য, আর ইসলামী বিধানই এ ধরনের কাজ হারাম করেছে। লক্ষ্য করার বিষয় যে, নিরাপত্তাপ্রাপ্ত হরবী যদি আমাদের রাষ্ট্রে এমন কাজ করে তা জায়েয হবে না। অতএব এখানে যখন নাজায়েয তখন দারুল হরবেও নাজায়েয হওয়া উচিত। প্রথমোক্ত ইমামদ্বয় বলেন যে, এতো শত্রুর

মাল তার সম্মতিতে নেয়া হচ্ছে। আর মূলে এই রয়েছে যে, তাদের সম্পদ আমাদের জন্যে মুবাহ (বৈধ)। নিরাপত্তাপ্রাপ্ত এতটুকু দায়িত্ব নিয়েছিল যে, সে কোনো আত্মসাৎ করবে না। কিন্তু যখন সে চুক্তির মাধ্যমে তার সম্মতিতে এ মাল লাভ করেছে, তখন সে তো বিশ্বাস ভংগের অপরাধ থেকে বেঁচে গেল এবং অবৈধতা থেকে এমনভাবে রক্ষা পেল যে, এ মাল চুক্তি হিসেবে নয়, বরঞ্চ বৈধতার ভিত্তিতে নিয়েছে। এখন রইলো দারুল ইসলামে নিরাপত্তাপ্রাপ্ত হরবীর ব্যাপার। এ হলো পৃথক ব্যাপার, কারণ নিরাপত্তার কারণে তার মাল রক্ষিত হয়ে গেছে। এজন্য বৈধতার ভিত্তিতে নেয়া যাবে না।-(আল মাবসূত ১ পৃঃ ৯৫)

ইমাম আবু হানিফা (র) বলেন যে, দারুল হরববাসীদের মাল লুণ্ঠন করা বা কেড়ে নেয়া যখন মুসলমানদের জন্যে হালাল, তখন তাদের সম্মতিক্রমে তা নেয়া অনেকগুণে ভাল হওয়া উচিত। অর্থাৎ ইসলামী সেনাবাহিনীর আওতার বাইরে অবস্থানকারীদের জন্যে কোনো নিরাপত্তা নেই। অতএব মুসলমানদের জন্যে সকল সম্ভাব্য উপায়ে তাদের সম্পদ হস্তগত করা জায়েয।

–(আল মাবসুত খঃ ১, পৃঃ ১৩৮)

ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, মুসলমান যেহেতু দারুল ইসলামের অধিবাসী, এজন্যে ইসলামের বিধান অনুযায়ী সকল স্থানেই তাদের জন্যে সুদ গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। তার কাজের এ ব্যাখ্যা ঠিক নয় যে, সে কাফেরের মাল তার সম্মতিক্রমে নিচ্ছে। বরঞ্চ সে প্রকৃতপক্ষে সেই মাল ঐ বিশেষ ধরনের কারবারের ভিত্তিতে নিচ্ছে। কারণ সেই বিশেষ ধরনের কারবার (অর্থাৎ অবৈধ চুক্তি) যদি না হয়, তাহলে কাফের অন্য কোনো পদ্ধতিতে তার মাল দিতে রাজী হবে। যদি দারুল হরবে এরূপ করা জায়েয হয়, তাহলে মুসলমানদের মধ্যে দারুল ইসলামেও এ ধরনের কারবার জায়েয হবে যে, একজন এক দিরহামের বিনিময়ে দুই দিরহাম নিবে এবং দ্বিতীয় দিরহামটিকে হেবা বলে অভিহিত করবে।–(আল মাবসুত খঃ ১৪, পৃঃ ৫৮)

আমাদের উদ্দেশ্য হলো উভয় মতবাদের বিচার বিশ্লেষণ করা। আমরা শুধু এতটুকু বলতে চাই যে, স্বয়ং আবু হানিফা (র)-এর উপরোক্ত কথা থেকে এবং আমাদের উপরে উদ্ধৃত তাঁর মযহাবের অন্যান্য মাসয়ালাগুলো থেকে পাঁচটি বিষয় সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় ঃ

প্রথমতঃ এ কারবার শুধু সেই মুসলমানের জন্যে জায়েয যে দারুল ইস-লামের নাগরিক এবং নিরাপত্তাসহ দারুল হরবে যায়।

দ্বিতীয়তঃ এ কারবার শুধু হরবী কাফেরদের সাথে করা যেতে পারে, তাদের জীবন ও সম্পদ বৈধ।

তৃতীয়তঃ এভাবে যে মাল নেয়া হবে তা গনিমত হবে না। কারণ তা সদুপায়ে অর্জিত নয়, এতে দীনের কোনো মর্যাদা বৃদ্ধি হয় না এবং এতে এক-পঞ্চমাংশ নির্ধারিত হয় না। এ নিছক সম্পদ উপার্জন। এভাবে এটা 'ফাই'ও হবে না। কারণ 'ফাই' হচ্ছে রাষ্ট্রের মালিকানাধীন। এ মাল সে ব্যক্তি নিজে গ্রহণ করে—বায়তুলমালে জমা দেয় না।

চতুর্থতঃ এভাবে কাফেরের মাল নেয়া শুধু আইনগত অনুমতির পর্যায়ভুক্ত। বরঞ্চ বৈধতার শেষ সীমার উপর প্রতিষ্ঠিত। তার আইনগত দিক শুধু এতটুকু যে, যদি মুসলমান এমন করে তাহলে ইমাম সাহেবের মতে দীনের দিক দিয়ে মাল ফিরিয়ে দেবার ফতোয়া দেয়া যাবে না। পক্ষান্তরে আত্মসাত করা মাল যদিও বিচার বিভাগ থেকে ফেরত দিতে বাধ্য করা হবে না, দীনের দিক দিয়ে ফেরত দেবার নির্দেশ দেয়া হবে।

পঞ্চমতঃ নিরাপত্তাপ্রাপ্ত মুসলমান যেভাবে দারুল হরবের কাফেরের সাথে অবৈধ চুক্তিতে কারবার করতে পারে, অদ্রূপ সে সেখানকার মুসলমানদের সাথেও এরূপ করতে পারে। কারণ তাদের মালও বৈধ। এর প্রমাণ পূর্বে আমরা দিয়েছি। পরেও এ বিষয়ে আলোচনা করবো।

তিন ঃ দারুল কুফর এবং দারুল হরবের মুসলমান নাগরিক–

যেসব মুসলমান দারুল কুফরে বাস করে এবং দারুল ইসলামে হিজরত করে না, তারা ইসলামের রক্ষণ ব্যবস্থা বহির্ভূত। যদিও ইসলামের যাবতীয় বিধান এবং হালাল-হারাম মেনে চলা তাদের জন্যে ধর্মত অপরিহার্য, কিন্তু ইসলাম তাদের দায়িত্ব থেকে মুক্ত। নবী করীম (স) বলেন, গনিমত এবং ফাই-এ তাদের কোনো অংশ নেই। এ বিষয়ে হাদীসে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। পার্থিব দিক দিয়ে তাদের জান ও মাল অরক্ষিত। কারণ প্রতিষ্ঠিত রক্ষণ-ব্যবস্থা তাদের জন্যে নেই।

যদি এরূপ মুসলমান হরবী সম্প্রদায়ভুক্ত হয়, তাহলে তার জান ও মাল বৈধ হবে। এজন্য তার হত্যাকারীর উপর কিসাস তো দূরের কথা রক্তপণও আরোপিত হবে না। এমন কি কোনো কোনো ক্ষেত্রে কাফফারা পর্যন্ত দিতে হবে না। এ ব্যাপারে ফকীহগণের কিছু মন্তব্য আমরা হুবহু উদ্ধৃত করছি যাতে করে দারুল হরবের মুসলমান নাগরিকদের আইনগত পজিশন বুঝতে পারা যাবে ঃ

لاقيمة لدم المقيم فى دار الحرب بعد اسلامه قبل الهجرة الينا .....

اجروه اصحابنا مجرى الحربى فى اسقاط الضمان عن متلف ماله ....

مالـه كمال الـحربى من هذا الـوجه ولذالـك اجاز ابو حنيفة مبايعته على سبيل مايجوز مبايعة الـحربى من بيع الـدرهم بالدرهمين فى دار الـحرب ـ(احكام القران للجصاص ـ الـحنفى ج ٢ ص ٢٩٧)

"যে মুসলমান হবার পর হিজরত না করে দারুল হরবেই বাস করে, তার খুনের কোনো মূল্য নেই ---- আমাদের সাথীগণ তাকে হরবীর পর্যায়ভুক্ত করেছে। এজন্য যে, তার মালের ক্ষতি করলে তার কোনো ক্ষতিপূরণ নেই --- তার মাল এ দিক দিয়ে হরবীর মালের ন্যায়। এজন্য আবু হানিফা (র) তার সাথে ক্রয়-বিক্রয়ের সেসব পন্থা জায়েয রেখেছেন যা হরবীদের সাথে জায়েয। অর্থাৎ দারুল হরবে এক দিরহাম দুই দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করা—যার অর্থ সুদ।"

–(আহকামুল কুরআন লিল যাচ্ছাছ ও আল হানাফী খঃ ২, পৃঃ ২৯৭)

من فى دار الـحرب فى حق من هو دار االاسلام كالـميت ـ

(مبسوط ج ١٠ ص٦٤)

"যে দারুল হরবে থাকে সে যেন দারুল ইসলামবাসীদের জন্যে মৃতের ন্যায়।"–(আল মাবসুত খঃ ১০, পৃঃ ৬৪)

ان تترسو اباطفال المسلمين فلا باس بالرمى اليهم وان كان الرامى يعلم انه يصيب المسلم .... ولا كفراة عليه ولا دية ـ(ايضا ٦٥)

"যদি হরববাসী মুসলমান শিশুদেরকে ঢাল স্বরূপ ব্যবহার করে তাহলে তাদেরকে তীরের লক্ষ্য বানাতে কোনো দোষ নেই, যদিও তীর নিক্ষেপকারী জানতে পারে যে মুসলমানকেই তার লক্ষ্য বানানো হচ্ছে ---- এর জন্যে তাকে কাফ্ফারা এবং রক্তপণ কিছুই দিতে হবে না।"–(ঐ পৃঃ ৯৫)

واذا اسلم الـحربى فى دار الـحرب ثم ظهر المسلمون على تلك الدار ترك له ما فى يديه من مالـه ورقيقة وولـده الـصغار .... فاما عقاره فانها تصير غنيمة لـلمسلمين فى قول ابى حنيفة ومحمد وقال ابو يوسف استحسن فاجعل عقاره لـه ـ(ايضا ـ ٦٦)

"দারুল হরবে কোনো হরবী মুসলমান হবার পর সে দেশ যদি মুসলমানগণ জয় করে, তাহলে তার ধন-সম্পদ, তার ক্রীতদাস এবং তার নাবালেগ শিশুদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে----- কিন্তু তার স্থাবর সম্পত্তি মুসলমানদের গনিমত হিসেবে ব্যবহৃত হবে। এ হচ্ছে ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম

মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত। কিন্তু আবু ইউসুফ (র) বলেন, দয়াপরবশ হয়ে তার অস্থাবর সম্পত্তি ও তার অধিকারে থাকতে দেয়া হবে।"–(ঐ পৃঃ ৬৬)

واكره للرجل ان يطاء امته او امراته فى دار الحرب مخافة ان يكون له فيها نسل لانه ممنوع من التوطن فى دار الحرب .... واذا خرج ربما يبقى له نسل فيتخلق ولده باخلاق المشركين ـ(ايضا ص ٥٨)

"[ইমাম আবু হানিফা (র) বলেন], দারুল হরবে কোনো ব্যক্তি তার ক্রীতদাসীর সাথে অথবা আপন স্ত্রীর সাথে সহবাস করাকেও আমি মাকরূহ মনে করি, এ আশংকায় যে সেখানে তার কোনো সন্তান জন্মগ্রহণ করবে। কারণ মুসলমানদের জন্যে দারুল হরবকে তার আবাসস্থল বানানো নিষিদ্ধ। --- কারণ যদি সে তার সন্তানকে ছেড়ে চলে আসে তাহলে তার সন্তান মুশরেকদের আচার-আচরণ গ্রহণ করবে।"

এ প্রসংগে শেষ কথা আমি আশংকার সাথে বলতে চাই এবং তা হচ্ছে এই যে, ইমাম আযম (র)-এর মতে দারুল হরবের মুসলমান অধিবাসীদের পরস্পরে সুদ খাওয়া মাকরূহ। কিন্তু তারা যদি এমন কাজ করে তাহলে বাধা দেয়া যাবে না। ইমাম মুহাম্মদ (র) এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেন। তাঁর যুক্তি এই যে, এ দুজন মুসলমানের মাল গ্রহণ দ্বারা মালিকানা থেকে রক্ষিত।[১] মুসলমান এ দেশ জয় করার পরও যখন তাদের মাল গনিমত বলে অভিহিত করে না, তখন এ দুজনের কি অধিকার থাকতে পারে, একে অপরের মাল গনিমত হিসেবে গ্রহণ করার ? কিন্তু ইমাম আবু হানিফা (র) তাঁর মতের সপক্ষে যে আইনগত যুক্তি প্রদর্শন করেছেন, তার থেকে জানা যায় যে, বিভিন্ন আইনগত বিষয়ের জটিল ও সূক্ষ্ম পার্থক্য অনুধাবন করতে ইমাম সাহেবের ফেকাহ্ শাস্ত্রের জ্ঞান কত গভীর ও ব্যাপক ছিল। আমরা তাঁর বর্ণনা হুবহু উদ্ধৃতি করছি, যার দ্বারা আইনের মূলনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। তিনি বলেন ঃ

بالاسلام قبل الاحراز تثبت العصمة فى حق الامام دون احكام ـ الا ترى ان احدهما لو اتلف مال صاحبه او نفسه لم يضمن وهو اثم فى ذالك وانما تثبت العصمة فى حق الاحكام بالاحراز والاحراز بالدار لابالدين لان الدين مانع لمن يعتقده حقا للشرع دون من لايعتقده ـ وبقوة الدار يمنع عن ماله

১. অর্থাৎ একজন মুসলমানের মালের উপর আর একজন মুসলমানের মালিকানা শুধু এ কারণে হতে পারে না যে, সে যে কোনো উপায়ে সে মাল তার কাছ থেকে নিয়েছে।

من يعتقد حرمته ومن لم يعتقده فبثبوت العصمة فى حق الاثم قلنا يكره لهما هذا الضيع ولعدم العصمة فى حق الحكم قلنا لايومر ان يردما اخذه لان كل واحد منهما انما يملك مال صاحبه بالاخذ ـ
(المبسوط ـ ج ١٤ ص ٥٨)

"দারুল ইসলামের রক্ষণাধীনে আসার পূর্বে নিছক ইসলামের দ্বারা যে রক্ষণ- ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়, তা শুধু ইমামের অধিকারে, কিন্তু তা বিধানে নেই। দেখছেন না, যদি এ দুজন মুসলমানের মধ্যে একজন অন্যজনের মাল অথবা জান বিনষ্ট করে, তাহলে তার জন্যে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না? অথচ এরূপ করলে সে গোনাহগার হবে? কথা আসলে এই যে, বিধান অনুযায়ী রক্ষণ-ব্যবস্থা শুধু দারুল ইসলামের আওতার মধ্যে হলেই প্রমাণিত হয়। আর এ রক্ষণ-ব্যবস্থা রাষ্ট্রের কারণে, দীনের কারণে নয়। দীন তো শরীয়তের অধিকারের দিক দিয়ে শুধু তাদেরকেই বাধা দেয় যারা তার উপর বিশ্বাস রাখে। আর যারা বিশ্বাস রাখে না তাদেরকে বাধা দেয় না। পক্ষান্তরে রাষ্ট্র শক্তির মাধ্যমে মানুষের রক্ষা-ব্যবস্থা তাদের বিরুদ্ধেও করা হয়, যারা তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং যারা শ্রদ্ধাশীল নয় তাদের বিরুদ্ধেও। অতএব গোনাহ হবার কারণে যে রক্ষণ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়, তার ভিত্তিতে আমরা বলেছিলাম যে, তার গৃহীত সম্পদ ফেরত দেবার নির্দেশ দেয়া হবে না। কারণ এদের মধ্যে প্রত্যেকেই যখন একে অপরের সম্পদ হস্তগত করে তখন শুধু হস্তগত করার কারণেই তার মালিক হয়ে যায়।"

এখানে ইমাম সাহেব ইসলামী আইনের তিনটি বিভাগের প্রতিই ইংগিত করেছেন। বিশ্বাসমূলক আইনের দিক দিয়ে মুসলমানের সম্পদ রক্ষিত, তা সে দরুল ইসলাম, দারুল কুফর অথবা দারুল হরবে হোক না কেন। আর এ রক্ষণ-ব্যবস্থার ফল এই যে, এর ভিত্তিতে আল্লাহর নিষিদ্ধ পন্থায় সম্পদ গ্রহণকারী গোনাহগার হবে। শাসনতান্ত্রিক আইন অনুযায়ী দারুল ইসলামে অবস্থানকারী কাফেরের মালের যে রক্ষণ-ব্যবস্থা আছে, দারুল কুফরে অবস্থানকারী মুসলমানদের জন্যে তা নেই। এজন্য দারুল কুফরের অন্য কোনো মুসলমান যদি তা অবৈধ উপায়ে গ্রহণ করে তাহলে আল্লাহর নিকট সে গোনাহগার হবে। কিন্তু দুনিয়ায় তার উপর কোনো ইসলামী বিধান জারী হবে না। বৈদেশিক সম্পর্কের আইনের দৃষ্টিতে কাফেরদের মধ্যে অবস্থানকারী মুসলমান স্বীয় তামাদ্দুনিক অধিকার ও দায়িত্বের দিক দিয়ে সেসব কাফেরদেরই অবস্থার অংশীদার। এজন্য সেও এভাবে শুধু গ্রহণ করার দ্বারাই মালের মালিক

হয়ে যায়। ---- যেভাবে স্বয়ং কাফের মালিক হয়। অতএব এর ভিত্তিতে যদি দারুল কুফরে মুসলমান মুসলমানের নিকট থেকে সুদ গ্রহণ করে, অথবা মুসলমান কাফের থেকে বা কাফের মুসলমান থেকে সুদ গ্রহণ করে, তাহলে তারা তো এসব মালের মালিক হয়ে যাবে এবং তাদেরকে সে মাল ফেরত দেয়ারও নির্দেশ দেয়া হবে না, কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, সুদ গ্রহণকারী ও সুদদাতা মুসলমান গোনাহগারও হবে না।

শেষ কথা

এ পর্যন্ত আমরা ইসলামী আইনের যে বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপিত করলাম, তার দ্বারা মাওলানা মানাযের আহসান গিলানীর যুক্তির বুনিয়াদ একেবারে ধূলিস্মাৎ হয়ে যায়। এর থেকে প্রমাণ হয় যে ঃ

এক ঃ সকল গায়েরে জিম্মী কাফেরের জীবন ও ধন-সম্পদ বৈধ নয়। বৈধ শুধু ঐসব কাফেরের সম্পদ যারা যুদ্ধে লিপ্ত। অতএব সুদ গ্রহণ করা এবং অবৈধ চুক্তিতে কারবার করা যদি জায়েয হয়, তাহলে শুধুমাত্র যুদ্ধরত কাফেরদের সাথে। আর এসব করার অধিকার শুধু যেসব মুসলমানদের যারা দারুল ইসলামের নাগরিক, যাদের নেতা কোনো দারুল কুফরকে দারুল হরব ঘোষণা করেছে এবং যারা নিরাপত্তাসহ ব্যবসা প্রভৃতির জন্যে দারুল হরবে প্রবেশ করেছে।

দুই ঃ এক তো দারুল কুফর সর্বাবস্থায় দারুল হরব হয় না। আর যদি বিশ্বাসমূলক আইন অনুযায়ী তাকে দারুল হরব মনে করা হয়, তথাপি তার বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ আছে এবং প্রত্যেক শ্রেণীর বিধান পৃথক পৃথক। যাবতীয় অনৈসলামী রাষ্ট্রকে একই অর্থে দারুল হরব মনে করা এবং বিশেষ যুদ্ধাবস্থায় যেসব বিধান জারী করা হয়, তা যদি সর্বদা সেখানে জারী করা হয়, তাহলে তা শুধু ইসলামী আইনের প্রাণ শক্তিরই পরিপন্থী হবে না, বরঞ্চ তা হবে সুস্পষ্ট নির্দেশাবলীর পরিপন্থী এবং তার পরিণাম হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। জান-মালের বৈধতার ভিত্তিতে যেসব খুঁটিনাটি বিধান বের করা হয়, তা শুধু ততোক্ষণ পর্যন্তই বলবৎ থাকতে পারে, যতোক্ষণ পর্যন্ত দারুল কুফরের সাথে যুদ্ধাবস্থা বলবৎ থাকে। অতপর এ সমুদয় বিধান স্বয়ং দারুল হরবে মুসলমানদের সাথেই সংশ্লিষ্ট নয়, বরঞ্চ এমন দারুল ইসলামের নাগরিকদের সাথে সংশ্লিষ্ট যা দারুল হরবের সাথে যুদ্ধে জড়িত।

তিন ঃ ভারত (অবিভক্ত ভারত) সাধারণ অর্থে তখন থেকে দারুল কুফর হয়ে গেছে যখন থেকে এখানে মুসলিম শাসনের অবসান ঘটেছে। যে সময়ে শাহ আবদুল আজীজ দেহলভী (র) সুদ জায়েয হবার ফতোয়া দিয়েছিলেন। তখন প্রকৃতপক্ষে এ ভারত ভারতীয় মুসলমানদের জন্যে দারুল হরব ছিল। কারণ ইংরেজ জাতি মুসলিম শাসন বিলুপ্ত করার জন্যে যুদ্ধ করছিল। যখন মুসলিম শাসন পরিপূর্ণরূপে বিলুপ্ত হলো এবং ভারতীয় মুসলমান ইংরেজের গোলামী স্বীকার করে নিল, তখন ইহা তাদের জন্যে আর দারুল হরব রইলো

না। এক সময়ে ইহা ছিল আফগানিস্তানের মুসলমানদের জন্যে দারুল হরব এবং এক সময়ে তুরস্কের মুসলমানদের জন্যে দারুল হরব। কিন্তু এখন ইহা সমুদয় মুসলিম রাষ্ট্রের জন্যে দারুস সুলেহ (সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ রাষ্ট্র)। এজন্য মুসলমান রাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যে কেউ এখানে সুদ গ্রহণ করার এবং অবৈধ চুক্তিতে কারবার করার অধিকার রাখে না। অবশ্যি সীমান্তের কতিপয় স্বাধীন গোত্র একে দারুল হরব মনে করতে পারে এবং যদি তারা এখানে অবৈধ চুক্তিতে কারবার করে তাহলে হানাফী আইন মতে তাদের কাজকে জায়েয বলা যেতে পারে। কিন্তু এ শুধু আইনগত বৈধতা। আল্লাহর দৃষ্টিতে সে মুসলমান কখনো বাঞ্ছিত হতে পারে না, যে একদিকে নিজেকে মুসলমানও বলে, আর অপর দিকে সুদ, মদ্যপান, জুয়া, শূকরের মাংস এবং মৃত জীবের ব্যবসাকে ইসলামে বৈধ বলে অন্য জাতির সামনে প্রচার করে বেড়ায়। তার দৃষ্টান্ত এমন —যেমন ধরুন, কোনো ব্যক্তি তার ঋণগ্রস্ত ভাইকে গ্রেফতার করিয়ে জেলে পাঠায়—একথা জানা সত্ত্বেও যে তার হাতে কিছুই নেই এবং ফলে তার সন্তান-সন্তুতি অনাহারে মারা যাবে। আপনি বলতে পারেন যে, ঋণদাতার এমন করার অধিকার আছে এবং সে যাকিছু করছে তার সে আইনের আওতার মধ্যেই করছে। কিন্তু একথা কেউ অস্বীকার করতে পারে না যে, এ হলো আইনগত বৈধতার শেষ সীমা এবং যে মানুষ আইনের শেষ সীমায় অবস্থান করে সে প্রায়ই পশুর চেয়েও অধম হয়ে পড়ে।

চার ঃ ভারতীয় মুসলানদের অবস্থা কখনো এমন নয় যার জন্যে ফেকাহর ভাষায় 'নিরাপত্তাপ্রাপ্ত' শব্দ ব্যবহার করা যেতে পারে। নিরাপত্তাপ্রাপ্তের জন্যে প্রথম শর্ত এই যে, তাকে দারুল ইসলামের নাগরিক হতে হবে। দ্বিতীয় শর্ত হলো, দারুল হরবে তার অবস্থান অল্প সময়ের জন্যে হতে হবে। হানাফী আইন মতে নিরাপত্তাপ্রাপ্ত হরবীর জন্যে দারুল ইসলামে থাকার অনুর্ধ মুদ্দত এক বছর অথবা তার কিছু বেশী। এরপর নাগরিকত্ব পরিবর্তনের আইন (LAW OF NATURALISATION) অনুযায়ী তাকে জিম্মীতে পরিণত করা হয়। এর থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, নিরাপত্তাপ্রাপ্ত মুসলমানের জন্যে দারুল হরবে অবস্থানের মুদ্দত দু' এক বছরের বেশী হতে পারে না। ইসলামী শরীয়ত মুসলমানদেরকে দারুল ইসলামে একত্র করতে এবং মুসলমানদেরকে জিম্মী বানাতে অত্যন্ত আগ্রহান্বিত। এ কখনো এ অনুমতি দেয় না যে, কোনো ব্যক্তি দারুল হরবকে তার আপন আবাসভূমি বানিয়ে সেখানে বংশানুক্রমে সন্তান-সন্ততি উৎপাদন করুক এবং নিরাপত্তাপ্রাপ্তের ন্যায় জীবন যাপন করুক। এ যখন কোনো ব্যক্তির পক্ষে জায়েয নয়, তখন কোটি কোটি মুসলিম জনতার জন্যে এ কি করে জায়েয হতে পারে যে, তারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে

নিরাপত্তাপ্রাপ্তের জীবনযাপন করবে ? যেসব বৈধতার সুযোগ-সুবিধা 'নিরাপত্তাপ্রাপ্তির' অবস্থার জন্যে সাময়িকভাবে সামরিক প্রয়োজনে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিদেরকে দেয়া হয়েছিল, তা একদিকে গ্রহণ করবে এবং অপরদিকে সেসব বাধা-নিষেধ নিজেদের উপর আরোপ করবে যা সাময়িকভাবে নিরাপত্তাপ্রাপ্তকে ইসলামী আইনের বাধা-নিষেধ থেকে মুক্ত করে কাফেরদের আইন মেনে চলতে বাধ্য করে। এ কি করে হতে পারে ?

পাঁচ ঃ ভারতীয় মুসলমানদের সত্যিকার আইনানুগ পজিশন এই যে, তারা এমন এক জাতি যাদের উপর কাফেরগণ বিজয়ী হয়েছে। এককালে তাদের যে আবাস ভূমি ছিল দারুল ইসলাম তা এখন দারুল কুফর হয়ে পড়েছে। কিন্তু দারুল ইসলামের কিছু নিদর্শন এখনো অবশিষ্ট রয়ে গেছে। তাদের কর্তব্য এই যে, তারা কোনো দারুল ইসলামে স্থানান্তরিত হবে। এ যদি তাদের পক্ষে সম্ভব না হয়, তাহলে এ দেশে এখনো ইসলামের যেসব নিদর্শন অবশিষ্ট আছে, কঠোরতার সাথে তার রক্ষণাবেক্ষণ করবে এবং তাদের সম্ভাব্য সকল শক্তি প্রয়োগ করে পুনর্বার এ দেশকে দারুল ইসলাম বানাবার চেষ্টা করবে। কুফরী বিধানের অধীনে তারা যে জীবনযাপন করছে, তার প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাস একটি গোনাহ। যাকিছু ইসলামী নিদর্শনাবলী অবশিষ্ট আছে তা সব মিটিয়ে দিয়ে এ গোনাহকে অধিকতর বর্ধিত করাই কি এখন তাদের অভিপ্রায় ?

তরজুমানুল কুরআন, রমযান ১৩৫৫ হিজরী
ডিসেম্বর ১৯৩৬ খৃঃ ও জিলকদ ১৩৫৫ হিজরী
ফেব্রুয়ারী ১৯৩৭ খৃঃ

"সুদ এমন একটি বিরাট গোনাহ যে, একে সত্তরটি ভাগে বিভক্ত করলে তার সবচাইতে হালকা অংশটিও নিজের মায়ের সাথে যিনা করার সমান গোনাহের শামিল।"

—ইবনে মাজাহ, বায়হাকি